সমাজদর্শন-দীপিকা

ডক্টর প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়,

এম্. এ., এল্. এল্. বি., ডিপ্. জার্মাণ, ডি. ফিল্.,

অধ্যাপক, দর্শন-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;

প্রাক্তন অধ্যাপক, স্কটিশ্ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

পরম পূজনীয়া

স্বর্গতা

ক্ষীরদা দেবী,

নীহারিকা দেবী

ও

শ্যামাসুন্দরা দেবীর

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে

অর্পিত হইল

ভূমিকা

দার্শনিকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ও সংস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য লইয়া বর্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বর্তমানকালে সমাজ সম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা অনেক সময়েই সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মধ্যেই তাঁহাদের কায সমাপ্ত করেন; তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা পর্যাপ্ত মনে হইতে পারে; কিন্তু আদর্শাভিমুখী চিন্তাশীল মানবচিত্ত ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এই কারণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। আশা করি, বর্তমান গ্রন্থ ইহার একান্ত সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রয়োজন কতকাংশে পূরণ করিবে।

বর্তমান গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য মূলতঃ রচিত হইয়াছে; তবে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাও ইহার মধ্যে চিন্তা ও আলোচনার বিষয়বস্তু পাইবেন। এই পুস্তক রচনায় আমি যতদূর সম্ভব প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে বিষযবস্তু আহরণ করিয়াছি। আমি একদেশদর্শিতা পরিহারের চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন মতের গুণাগুণ নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছি। পাদটীকায় ইংরাজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছি --আমি একান্তভাবে আশা করি যে, উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা ঐগুলি পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষায় লিখিত রচনার সহিত পরিচয় লাভের চেষ্টা করিবে এবং অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া বৃহত্তর গ্রন্থ পাঠে আগ্রহ বোধ করিবে। সকলের সুবিধার্থ ভাষা ও বিষযবস্তুকে যথাসম্ভব সরল ও বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

দ্রুত রচনা ও মুদ্রণের জন্য গ্রন্থমধ্যে কোন কোন স্থলে কিছু-কিছু ত্রুটি হয়ত রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রী এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষায়তনের অনেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন—ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আমার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। পৃথক্‌ভাবে সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়; আমি সাধারণভাবে ইঁহাদের

সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার পূজনীয় পিতৃদেব অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং আমার কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যাপক এই পুস্তক রচনাকালে আমাকে নানা মূল্যবান্ উপদেশ দান করিয়াছেন ; গ্রন্থের প্রারম্ভে আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ইঁহাদের স্নেহের অবদানের কথা স্মরণ করি।

পরিশেষে আমি মডার্ণ বুক এজেন্সীর প্রাঃ লিঃ-এর সুযোগ্য পরিচালকদ্বয় শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং বাণী প্রেসের শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ইঁহাদের এবং ইঁহাদের সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইত না।

দর্শন-বিভাগ—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
আগস্ট, ১৯৬৩

শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট (ক)

পরিশিষ্ট (খ)

সমাজদর্শন-দীপিকা

প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু

১। সমাজদর্শনের অভ্যুদয় :

অতীতের কোন্ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ধরণীর বক্ষে মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাহার বিবর্তনের পর হইতেই সে ধীরে ধীরে উন্নততর বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিতেছে। সে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাহার পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল এবং বিবিধ প্রাকৃতিক বস্তুর উৎপত্তি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। সে নিজেই নানাভাবে এই সব প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিল। এইভাবে বিস্ময়ের অনুভূতি হইতে জন্মলাভ করিল মানুষের আদি বিজ্ঞান ও দর্শন।

মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময়সঞ্জাত প্রশ্ন কেবল বাহ্য জড়জগতেই সীমিত রহিল না। তাহার চিন্তনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসার লাভ করার ফলে তাহার নিজের সম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হইল। সে প্রশ্ন করিতে লাগিল : মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কী? বৃহৎ বিশ্বে তাহার স্থান কোথায়? এই জগতে তাহার আবির্ভাব কিসের ইঙ্গিত সূচনা করিতেছে? মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের মূল্য কী? মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মানুষ যখন মানুষ সম্বন্ধে চিন্তা আরম্ভ করিল, সে দেখিল যে, মানুষ সম্বন্ধে যে-কোন আলোচনা আরম্ভ করিতে হইলে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে দেখিতে হইবে, কারণ মানুষ প্রধানতঃ সামাজিক জীব।

সুতরাং দার্শনিক চিন্তা প্রসার লাভ করার ফলে মানুষের স্বরূপ, আদর্শ, মূল্যবোধ, পুরুষার্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা যখন প্রাধান্য লাভ করিল, তখন দার্শনিক স্বতঃই সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় লিপ্ত হইলেন। তাহার পর দর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুসারে যখন পৃথক্ পৃথক্ শাখার সৃষ্টি হইল, তখন দর্শনের অন্তর্ভুক্ত এক পৃথক্ শাখা হিসাবে সমাজদর্শন স্বীকৃতি পাইল।

ব্যক্তি তথা সমাজ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজদর্শনের অভ্যুদয় ঘটিল। অবশ্য, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'সমাজদর্শন'-পদটি আধুনিককালে অধিক প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্তু দর্শনের প্রগতির পর হইতেই দার্শনিক আলোচনায় সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যা অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়া আসিতেছে।

২। সমাজদর্শনের স্বরূপ (Nature of Social Philosophy) :

সমাজদর্শন কাহাকে বলে ? ইহার স্বরূপ কী ?—সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে বলিতে হয় যে, **যে শাস্ত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যক্তি তথা সমাজের আলোচনা করা হয়, তাহাকে সমাজদর্শন বলে।** সুতরাং সমাজদর্শনের স্বরূপ বুঝিবার জন্য 'সমাজ' ও 'দর্শন' এই দুইটির স্বরূপ সর্বাগ্রে নির্ণয় করা প্রয়োজন।

সমাজ একপ্রকার জনসমষ্টি বা জনসঙ্ঘ ; কিন্তু অন্যান্য জনসঙ্ঘের তুলনায় সমাজের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য জনসঙ্ঘের ন্যায় ইহা নিতান্ত সাময়িক বা আকস্মিক জনসমষ্টি নহে—ইহার একটি নিজস্ব আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আছে। তাহা ছাড়া, ইহার মূলে আছে কতকগুলি মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষে মানুষে পারস্পরিক সহযোগিতা। মানুষের সহিত মানুষের এই জটিল অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে।[১] সুতরাং সমাজ কেবলমাত্র জনসমষ্টি নহে ; পারস্পরিক সম্বন্ধই হইল সমাজের প্রধান ভিত্তি। এই সম্বন্ধ বাহির হইতে কতকগুলি মনুষ্যের উপর আরোপিত হয় নাই—ইহা সামাজিকতাবোধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সামাজিকতাবোধ একটি মানস অবস্থা—প্রতি মানুষই যে অপর মানুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেই চেতনাই

১ তুলনীয় : (ক) "Society may be regarded as the most general term referring to the *whole complex of the relations of man to his fellows.*" (*Encyclopædia of Social Sciences*) ; (খ) "Society is a group of human beings co-operating in the pursuit of several of their major interests, invariably including self-maintenance and self-perpetuation." (*Dictionary of Sociology*, Ed. by Fairchild) ; (গ) "The whole web of relationships which constitutes Man's life is known as Society." (Wright. *The Elements of Sociology*, p. 16) ; (ঘ) "(Society includes) every kind and degree of relationship entered into by men.........with one another." (MacIver. *Elements of Social Science*, p. ৪).

সমাজ সংগঠনে সহায়তা করে।[২] ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—ব্যক্তি সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সমাজ ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।[৩]

এই প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল: দর্শন কাহাকে বলে? এই প্রশ্নেরও একটি সুনির্ধারিত উত্তর দান করা কঠিন। কারণ, দর্শনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য লইয়া দার্শনিকদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, দর্শন হইল বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয়; আবার কেহ কেহ বলেন যে, দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিপরীত এবং উহাদের আলোচন-পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। কেহ কেহ মনে করেন যে, দর্শনের আলোচনাক্ষেত্রে তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)-এর কোন স্থান নাই, আবাব কেহ কেহ বলেন যে, তত্ত্ববিদ্যাই হইল প্রকৃত দর্শন। কাহারও কাহারও মতে ভাষাবিশ্লেষণ এবং ভাষার যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য নিবারণই হইল দর্শনের কায, আবার অনেকে মনে করেন যে, ইহা কখনই দর্শনের প্রকৃত কায হইতে পারে না, দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী। কাহারও কাহারও দর্শন জ্ঞানবিদ্যা (epistemology)-তে পরিসমাপ্ত হইয়াছে; আবার কেহ কেহ জ্ঞানবিদ্যা, যুক্তিশাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব (æsthetics), মনোবিদ্যা এই সকলগুলিকেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আবার দর্শন-আলোচনার উদ্দেশ্য লইয়াও মতভেদ আছে—একদলের মতে দর্শনের আলোচনা কেবলমাত্র বুদ্ধির তৃপ্তিদান করে, আবার অপর একদলের মতে ইহা জীবনাদর্শ নিরূপণে সহায়তা করে। চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মনে দর্শনলব্ধ জ্ঞান যে তত্ত্বজ্ঞান তথা অন্তর্দৃষ্টি দান করে তাহাই মোক্ষলাভে সহায়তা করে; এই কারণে দর্শনকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়। আমরা কোন বিশেষ মতবাদ গ্রহণ না করিয়া সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, **দর্শন সমগ্র বিশ্বসম্বন্ধে একটি সুসংবদ্ধ, চরম ব্যাখ্যা দান করিবার চেষ্টা করে—এইরূপ ব্যাখ্যা দান কতদূর যথার্থ এবং ইহা দান করিবার জন্য মানবমনের কতদূর**

২ এইজন্য MacIver বলিয়াছেন: "Society is an infinitely interwoven series of relationships, issuing from the wills and purpose, of beings who realize their likeness and their interdependence, in a word, their community. It is, therefore, in the first place a *state or quality of mind*." (*The Elements of Social Science*, p. 2).

৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সামর্থ্য আছে তাহার জন্য জ্ঞানের স্বরূপ, উৎস ও যাথার্থ্য এবং মূলপ্রত্যয়গুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধীয় আলোচনা দর্শনে স্থান পায়; আবার দার্শনিক বিশ্বসম্বন্ধে যে চরম ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাহারই আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন আদর্শের মূল্য কী এবং সেগুলি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্থিরীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়।

এইবার দেখা যাউক্ সমাজসম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনার স্বরূপ কী।

সমাজদর্শনের দুইটি দিক্ আছে—একটি হইল **সমালোচনামূলক** বা **বিচারমূলক** (critical), আর একটি হইল **গঠনমূলক** (constructive)। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজদর্শন বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বা সামাজিক বিজ্ঞান (social sciences)-তে ব্যবহৃত মূলপ্রত্যয়গুলি (fundamental concepts)-এর অর্থ আলোচনা করে এবং তাহাদের যাথার্থ্য (validity) বিচার করে। সুনির্বাচিত, সুসঙ্গত এবং সুনিশ্চিত অর্থপূর্ণ প্রত্যয় ব্যতীত কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতে পারে না। তাহা ছাড়া, বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান দ্বারা অনুসৃত পদ্ধতি (methods) এবং মূলসূত্রগুলি (fundamental principles)-ও দর্শন সমালোচনা করে ও ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌গুলি গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাও বিচার করে।[৪] সুতরাং বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানগুলি যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে এবং সেইগুলি যাহাতে সুসংবদ্ধ ও যথার্থভাবে জ্ঞানসঙ্কলন করিতে পারে, সেই কাযে সমাজদর্শন সহায়তা করে। ব্যক্তি তথা সমাজকে নানা দৃষ্টিকোণ (যথা, ধর্ম, নীতি, কলা, রাষ্ট্রনীতি, প্রাণিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী) হইতে বিচার করা যায়—এইগুলির কোন্‌টি কী পরিমাণে সত্য এবং একটির সহিত অপরটির কতদূর সমন্বয়সাধন করা যায়, তাহা বিচার করে সমাজদর্শন।

সমাজদর্শনের বিচার বা সমালোচনা কেবলমাত্র বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয় ও পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন কালে, যে সকল আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, নিয়ম ও প্রথা প্রচলিত আছে বা ছিল, সেগুলি সম্যক্ আলোচনা করিয়া উহারা কতদূর গ্রহণযোগ্য আর কতদূর

৪ যেমন, সামাজিক বিবর্তন ও ঘটনাসমূহ যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা যায় কি না, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে 'কারণ'-পদের তাৎপর্য কী, ইত্যাদি বিষয়ে সমাজদর্শন আলোকপাত করে।

পরিত্যাজ্য, উহাদের মধ্যে কোন সমন্বয়সাধন সম্ভব কি না এবং বিবিধ রীতি-নীতির যে ফলাফল ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা হইতে কি কি শিক্ষিতব্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও সমাজদর্শন সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে।

বলা বাহুল্য, সমাজদর্শন বিভিন্নক্ষেত্রে যে সকল সমালোচনামূলক কার্য করিয়া থাকে, তাহা হইতেই ইহার গঠনমূলক কার্য সাধিত হয়। বাস্তবিক, সমালোচনা ও গঠন পরস্পর সংযুক্ত—দর্শন যে সমালোচনা করে, তাহা কেবলমাত্র নঙর্থক (negative বা destructive) নহে, উহা সদর্থক (positive বা constructive)-ও বটে। সমাজদর্শন আদর্শ ও মূল্য নিরূপণ করে। বিভিন্ন সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের গৃহীতব্য প্রত্যয় ও অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি কী হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করে। আবার ব্যক্তি তথা সমাজের কল্যাণের জন্য আদর্শ কী হওয়া উচিত, তাহাও সমাজদর্শন স্থির করিবার প্রচেষ্টা করে। মানুষ তাহার চলার পথে কতকগুলি বিশেষ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়—এই আদর্শ সে কতকাংশে সমাজ হইতে গ্রহণ করে, আবার কতকাংশে পূর্বপ্রচলিত কতকগুলি আদর্শের পরিবর্তন ও পরিশোধন করিয়া উহাদের সমাজের সম্মুখে নবরূপে ন্যস্ত করে। এই আদর্শগুলি 'সত্যম্', 'শিবম্' ও 'সুন্দরম্'-কে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। সমাজ-দর্শনের কার্য হইল এই সকল বিভিন্ন আদর্শের মূল্য নিরূপণ (assessment of values)।[৫] অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্থা ও আদর্শের মূল্য নিরূপণই হইল সমাজদর্শনের গঠনমূলক অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয়।[৬]

সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচরণের মূল্য বিচারই হইল সমাজদর্শনের প্রধান কার্য। সমাজদর্শন

৫ সমাজদর্শনের দুইটি দিকের (সমালোচনামূলক এবং গঠনমূলক) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জিনস্‌বার্গ (Ginsberg) বলিয়াছেন: "Social philosophy consists of two parts, ***critical*** or ***logical,*** and ***constructive*** or ***synthetic.*** The former is concerned with the logic of the Social Sciences and with the validity of the methods and principles they employ...... On its constructive side, social philosophy is concerned with the validity of social ideas." (***Sociology***, p. 26).

৬ সমাজদর্শনের সাধারণতঃ যে সকল 'সংজ্ঞা' দান করা হয়, তাহাতে মূল্য-নিরূপণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যথা: (১) "(Social Philosophy means) interpretation and estimation of social phenomena in terms of ethics and intimate values." (***Dictionary of Sociology***); (2) "Social Philosophy...means mainly the effort to study values, ends, ideals." (Mackenzie, ***Outlines of Social Philosophy***, p. 14).

কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা (theoretical discussion)-তেই নিবদ্ধ না থাকিয়া বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্য কী করা যায়, তাহা আলোচনা করে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ কী করিয়াছে, কিরূপে করিয়াছে এবং কেন করিয়াছে এই প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তিতে সমাজদর্শন স্থির করে, মানুষের পক্ষে আরও কী করা উচিত এবং কিভাবে উহা করা উচিত। সুতরাং অতীত ও বর্তমানের মানুষকে বুঝিবার, জানিবার ও ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে সমাজদর্শন এবং তাহারই আলোকে বলিতে চাহে আগামী দিনের মানুষের পথপরিক্রমা কী হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজদর্শন সম্পূর্ণ নূতন কোন কিছু সৃষ্টি করে না—অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকেই ইহা মঙ্গল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করে।[৭]

বাস্তবিক, সমাজদর্শন বিবিধ অধীতব্য বিষয়গুলির মধ্যে এক অনুপম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিদ্যা (Sociology) এবং অন্যান্য সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান (social science)-গুলির নিকট হইতে বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে তথ্য বা উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে। সমাজে একটি বিশেষ রীতি বা প্রথার অথবা একটি বিশেষ সংস্থার উদ্বর্তন কিভাবে ঘটিয়াছিল, কিভাবে উহা প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিভাবে উহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, উহার কি পরিণতি ঘটিয়াছিল বা কোন্ পরিণতির পথে উহা চলিয়াছে ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করে সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিদ্যা। সুতরাং যে সকল তথ্য বা ঘটনার ফলে সমাজদর্শন গড়িয়া উঠে, সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করা এবং সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা করার কাযে লিপ্ত থাকে সমাজতত্ত্ব। অতএব সমাজদর্শনের আলোচনার উপাদান সংগ্রহ করে সমাজবিদ্যা বা সমাজতত্ত্ব। কিন্তু সমাজদর্শন স্বরূপতঃ সমালোচনা-মূলক (critical)—এই সমালোচনা সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হইতে পারে যদি কোন আদর্শের আলোকে ইহা সাধিত হয়। যাহা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর সমাজদর্শন তাহাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। চরম মঙ্গল বা পুরুষার্থের আলোচনা করে নীতিশাস্ত্র (ethics)। সুতরাং সমাজদর্শন যে আদর্শের

---

৭ **তুলনীয় :** "The Philosopher does not ask to find and follow a new thing.........Social philosophy is not up in the clouds at all. It is intensely practical: its simple advice is—Go on doing what you are doing now—only do it ***better*** and ***more completed.***" (E. J. Urwick, ***The Social Good***, p. 238).

আলোকে সমালোচনা কার্য করে তাহা নিরূপণের জন্য উহাকে নীতিশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে কোন আদর্শ গ্রহণ বা প্রচার করিতে হইলে, যে কোন পন্থা অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়াই যথেষ্ট নহে—দেখিতে হইবে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের পক্ষে ঐ আদর্শ পালন বা অনুসরণ করা সম্ভব কি না; অর্থাৎ সমাজদর্শনকে অসার কল্পনাবিলাসী হইলে চলিবে না। সমাজদর্শন যাহা আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা ব্যক্তি-মন তথা সমাজ-মনের পক্ষে কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহাও চিন্তা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, কোন আদর্শ মনের সাধারণ ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তাহা হইলে উহাকে পরিহার করিয়া গ্রহণযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য অপেক্ষাকৃত সরল আদর্শ স্থাপনের কথা ভাবিতে হইবে। এই বিষয়ে সমাজ-দর্শনকে মনোবিদ্যার, বিশেষতঃ সমাজমনোবিদ্যার, সাহায্য লইতে হইবে। কারণ মানুষ কী চাহে, মানুষের মনের স্বাভাবিক বৃত্তি কী, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, কেনই বা একটি সামাজিক প্রথা ও সংস্থা যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে এবং কেনই বা আর একটি প্রথা ও সংস্থা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আবার এক সমাজে যে রীতি বা প্রথা পরিচালিত হইতেছে অপর সমাজে কেনই বা তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় না জানিলে কোন আদর্শ, প্রথা বা সংস্থার স্থায়িত্ব ও অনুসরণযোগ্যতা সম্বন্ধে সমাজদর্শন অভিমত প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু এই সকল বিষয় সমাজমনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। সুতরাং সমাজদর্শনকে সমাজমনোবিদ্যার নিকট এ সম্বন্ধে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। ধরা যাউক্ যে, বিবাহ-রূপ সামাজিক সংস্থা (institution of marriage) সম্বন্ধে সমাজদর্শনে আলোচনা করিতে হইবে। বিভিন্ন সমাজে কত প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে বা ছিল, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করে সমাজবিদ্যা। মানুষ কেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে, উহার মূলে কাম ও অন্যান্য বৃত্তি কিভাবে কার্য করিতেছে, অবিবাহিত নরনারীর মনের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় কি না ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করে মনোবিদ্যা। সুতরাং সমাজে বাস্তব কী ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা সমাজ-বিদ্যার নিকট জানিয়া এবং সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের মনের সাধারণ ইচ্ছা কী তাহা মনোবিদের নিকট জানিয়া আদর্শ-বিবাহ কী হওয়া উচিত, বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য কী ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবেন দার্শনিক এবং

এই আলোচনাকালে তিনি মানুষের জীবনের চরম আদর্শ কী হওয়া উচিত তাহা নিরূপণের জন্য নীতিশাস্ত্রবিদের সাহায্য লইবেন। আবার, ধনসম্পত্তিতে মানুষের অধিকার, স্বত্ব বা স্বামিত্বের উদাহরণ লওয়া যাউক্। কিভাবে অধিকার বা স্বামিত্ব (ownership)-এর প্রত্যয় গঠিত হইয়াছে, বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সমাজে কত প্রকারের সম্পত্তি (property) স্বীকৃত হইয়াছে ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে সমাজবিদ্যা; মানুষ কেন তাহার স্বীয় অধিকারের বস্তু সাধারণতঃ ধরিয়া রাখিতে চাহে এবং প্রয়োজন না থাকিলেও অধিক হইতে অধিকতর সম্পত্তি আহরণ করিতে চাহে ইত্যাদি আলোচনা করে মনোবিদ্যা; মনুষ্য-সমাজে অপরের লোলুপদৃষ্টি হইতে সম্পত্তি রক্ষণের প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে ব্যবহারশাস্ত্র বা আইনশাস্ত্র: সম্পত্তি বা অর্থের প্রতি লোলুপতা উচিত নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি সঞ্চয় উচিত নহে ইত্যাদি বিষয় উপদেশ দান করে নীতিশাস্ত্র। এই সকল বিবিধ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজদার্শনিক চিন্তা করেন অধিকার, স্বত্ব বা স্বামিত্ব প্রত্যয়ের প্রকৃত তাৎপর্য কী, স্বোপার্জিত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সমাজ স্বীকার করিয়া লইবে কি না, ধনবৈষম্য থাকা উচিত কি না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমাজদর্শন এমনই এক শাস্ত্র যাহা সমাজবিদ্যা এবং সমাজমনোবিদ্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে গঠিত ও নীতিশাস্ত্রের আলোকে পরিচালিত।

৩। সমাজদর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি (Objections to Social Philosophy):

১ সমাজদর্শনের সম্ভাব্যতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে একদল লেখক সন্দিহান। তাঁহারা প্রশ্ন করেন: দর্শন কি সত্যই সমাজ তথা সামাজিক ঘটনাবলীর কোন স্পষ্ট ও সার্থক ব্যাখ্যা করিতে পারে?

এই প্রকার সন্দেহের কারণ হইল দর্শন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে, দর্শন কতকগুলি শুষ্ক বিমূর্ত (dry abstract concepts)-এর আলোচনায় নিযুক্ত থাকে এবং বাস্তবজীবনের সহিত উহার সংস্রব নাই। কিন্তু বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত যাঁহার প্রকৃত পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, দার্শনিক মাত্রই বিমূর্ত প্রত্যয় বা ভাষা

বিশ্লেষণ লইয়া রত থাকেন না।[৮] একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্ব সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ চরম ব্যাখ্যা দানই দার্শনিকের লক্ষ্য। তাহা ছাড়া, দর্শনের কয়েকটি শাখা (যথা, নীতিশাস্ত্র, ধর্মদর্শন ইত্যাদি) বাস্তবজীবনের সহিত নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, দর্শনের উদ্ভব ঘটে সমাজের এক বিশেষ কৃষ্টির প্রভাবে; আবার দর্শনও সমাজের কৃষ্টিকে প্রভাবিত করে।[৯]

বাস্তবিক, দর্শনের আলোচনা মানুষের জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ, ভাবধারা সব কিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম ও নীতির আলোচনার সহিত দর্শন বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সমাজের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর গতিপথ নির্দেশে দর্শন প্রভূত সহায়তা করিতে পারে।

(২) কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, দার্শনিক আলোচনার ফলে বিশেষ কোন সুবিধা হয় না—দার্শনিক আলোচনাব পরও যে সমস্যাটি যেরূপ ছিল সেইরূপ থাকিয়া যায়।[১০]

---

৮ অবশ্য সাম্প্রতিক কালের একদল দার্শনিক (Logical Positivists) ভাষা-বিশ্লেষণকেই দর্শনের প্রধান কায বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দর্শন সম্বন্ধে এই মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র বিবিধ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয়ের যাথার্থ্য নির্ধারণ করাই যদি দর্শনের একমাত্র কার্য হইত, তাহা হইলে দর্শনের নিজস্ব সমস্যা বলিয়া কিছু থাকিত না। দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাকে ইহার বিরুদ্ধবাদীরা 'under-labourer conception of Philosophy' আখ্যা দিয়াছেন। P. T. Winch এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন: "On this view philosophy is parasitic on other disciplines, it has no problems of its own but is a technique for solving problems thrown up in the course of non-philosophical investigation." (*The Idea of a Social Science*, p. 4.)

৯ তুলনীয়: (১) "Philosophy sustains the closest connection with the history of culture, with the succession of changes in civilisation. ...But philosophy is not a passive reflex of civilization ...Philosophy marks a change of culture. In forming patterns to be conformed to in future thought and action, it is additive and transforming in its role in the history of civilization." (J. Dewey, *Philosophy and Civilization*, pp. 7-8).

(২) "Philosophy is at once influenced and influential, an echoer, mocker, modifier and creator." (*Contemporary Philosophy*, Ed. by Jarrett & McMurrin)."

১০ তুলনীয়: "Myself when young did eagerly frequent
Doctor and saint, and heard great Argument
About it and about: but evermore
Came out by the same Door as in I went."

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, দর্শনে এমন অনেক সমস্যা আছে, যেখানে সমস্যার সমাধান অপেক্ষা উহার স্বরূপ-নির্ধারণ অধিকতর প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, দার্শনিক আলোচনা আমাদের চিন্তাকে সমুন্নত করে এবং আমাদের যে সকল যুক্তির মধ্যে অসারতা থাকে, সেগুলি আমাদের দেখাইয়া দেয়।

(৩) দার্শনিক আলোচনায় নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের ধারণা একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে এবং এই কারণ দার্শনিক আলোচনা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং উহাকে পারিমার্জিত করে। কিন্তু নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের ধারণা যেভাবে পরিবর্তনশীল, তাহাতে তথাকথিত এই দার্শনিক প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয় না, বা উহার ফল বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

নৈতিক আদর্শ বা মূল্যবোধের ধারণা যতটা পরিবর্তনশীল বলিয়া বর্ণনা করা হয়, মূলতঃ তাহা ততটা নহে ; কারণ বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের আদর্শের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকিলেও উহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য আছে। যেমন, মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, সকল সভ্যজাতির মধ্যেই সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি নৈতিক আদর্শের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।[১১] তাহা ছাড়া, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বকালের উপযুক্ত কোন মতবাদ গড়িয়া তোলা বা নির্দেশ করা কঠিন। বিভিন্ন দেশ ও কালের আদর্শের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে মিল থাকে ; কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং ঐ সকল সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন আদর্শের উদ্ভব হয়, সেইজন্য বিভিন্ন দেশ ও কালের আদর্শের মধ্যে বিষয়গত বা বস্তুগত পার্থক্য কিছু কিছু থাকিবে। কৃষ্টিমাত্রেরই একটা গভীরতা থাকে এবং সেই কারণ সামাজিক তথা কৃষ্টিমূলক সমস্যা ও আদর্শ সকল দেশে একই প্রকারের হইতে পারে না। অতএব আদর্শ ও মূল্যবোধের ধারণার পরিবর্তনশীলতার জন্য দর্শনকে দায়ী করা সমীচীন নহে। তাহা ছাড়া, দার্শনিকের কার্য হইল বিভিন্ন আদর্শের সমালোচনা করা এবং কোন্‌টি কতদূর গ্রহণযোগ্য

১১ এ ক্ষেত্রে Janet-এর মত লক্ষণীয়: "It is surprising how, amid great differences in time, place, and material circumstances, man has yet been so nearly the same. The moral legislators of the Hindoos, the Chinese, the Persians, the Hebrews, and the Greeks have all formed strikingly similar ideas of human morality." (*Theory of Morals*, p. 353).

তাহা নিরূপণ করা; কিন্তু দর্শন কাহাকেও কোন আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। সুতরাং দর্শন যদি কোন বিশেষ সমাজের উপর কোন বিশেষ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহার জন্যও দর্শনকে দাযী করা চলে না।

(৪) দর্শন তথা দার্শনিক যখন সকল সময় সমাজ সংস্কার করিতে সক্ষম হয না, তখন সামাজিক সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে দর্শনকে পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত।

উপরের এই আপত্তি যাঁহারা উত্থাপন করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, তাঁহারা সমাজ-দার্শনিক এবং সমাজ-সংস্কারক এই দুইজনের কর্মক্ষেত্র যে বিভিন্ন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দার্শনিক মূলতঃ সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন না, যদিও তাঁহার সমালোচনার ফলে কোন কোন সংস্কার সাধিত হইতে পারে। যিনি সংস্কারক তিনি এক বা একাধিক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হ'ন এবং উহাদের পশ্চাতে কি কি সম্ভাব্য কারণ আছে সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া কিভাবে উহাদের দূর করা যায় তাহা নির্ণয় করেন এবং উহাদের দূর করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহাও করিয়া থাকেন (যথা, লোকশিক্ষার ব্যবস্থা, সরকারকে উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন করিতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি)।[১২] সুতরাং দার্শনিকের ন্যায় সংস্কারক কোন সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমগ্র সমাজের আলোচনায় নিযুক্ত হ'ন না। যেমন, আমাদের দেশে পূর্বে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। দেশের তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারকগণ চিন্তা করিলেন যে, এই প্রথা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অযৌক্তিক। উহার পশ্চাতে যে সকল তথাকথিত যুক্তি ছিল সেগুলি যে অসার, সেগুলি যে সমর্থনীয় নহে সে বিষয়ে তাঁহারা প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন, সরকারকে

১২ **তুলনীয়:** "But a little must be added to make clearer the aim and interest of the social philosopher, as contrasted with those of the practical reformer..........The reformer finds himself face to face with *a fact*—any fact of the slum upon which he has seized—let us say, the under-feeding of the children. He sees this fact in close causal relation to other facts, such as under employment or drink or the community's apathy; and he is concerned to alter one or more of these causal facts as quickly as possible, in order to alter the dependent fact of under-feeding." (E. J. Urwick, ***A Philosophy of Social Progress***, p. 17).

হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিলেন, ইত্যাদি। এ কথা সত্য যে, সংস্কারক দার্শনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন, অনুপ্রাণিত হইতে পারেন, ইত্যাদি এবং দার্শনিক স্বয়ং সংস্কারকের ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। সুতরাং সংস্কার যদি কোন ক্ষেত্রে সার্থক না হয়, তাহার জন্য দর্শনের উপর দায়িত্ব আরোপ করা চলে না।

দ্বিতীয়তঃ, উপরের আপত্তির বিরুদ্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, চেষ্টা করিলেও বা ইচ্ছা করিলেও আমরা সামাজিক সমস্যা ও আদর্শের আলোচনা হইতে দর্শনকে একেবারে পরিহার করিতে পারি না। সমাজসম্বন্ধীয় যে-কোন সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে উহা কতকাংশে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে করিতে হইবে। আবার দার্শনিকও সমাজসম্বন্ধীয় আলোচনা একেবারে পরিহার করিতে পারেন না। দার্শনিক যদি সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাহা হইলে মানবসমাজের আলোচনা স্বতঃই দর্শনের অন্তর্গত হইবে।[১৩] এ কথা স্বীকার্য যে, দর্শনের সকল আলোচনাই সমাজের সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু দর্শনের যে-অংশ নীতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করে, তাহার সহিত সমাজের সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। তাহা ছাড়া, দার্শনিক আলোচনাগুলিও এক হিসাবে 'সামাজিক ঘটনা'—সমাজের মধ্যেই উহাদের উদ্ভব।[১৪] সুতরাং মনুষ্যসমাজের যে-কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সময় দর্শনকে বাদ দেওয়া চলে না। আবার, দর্শন যখন নিছক সত্যানুসন্ধানের কার্যে লিপ্ত থাকে, তাহাতেও শেষ পর্যন্ত সমাজেরই মঙ্গল সাধিত হয় এবং সমাজই উপকৃত হয়।[১৫]

---

১৩ P. Winch-এর ভাষায়: "Any worthwhile study of society must be philosophical in character and any worthwhile philosophy must be concerned with the nature of human society." (*The Idea of a Social Science*, p. 3).

১৪ তুলনীয়: "......Philosophies, besides being intellectual events, are also, and sometimes most conspicuously, social phenomena." (J. F. Mora, *Philosophy Today*, p. 115.)

১৫ Mora-র আর একটি উক্তি লক্ষণীয়: "......Philosophers must struggle to ferret out rational truths that are accessible, in varying degrees, to all men. The time philosophers spend on this task will prove to be not only philosophically, but also socially productive, more productive, indeed, than the time some philosophers devote indicating 'civilisations in decay'." (*Ibid.*, p. 135).

(৫) কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিবিধ সামাজিক সমস্যার কারণ নির্ধারণ ও উহার সমাধান, সামাজিক আদর্শের স্বরূপ নিরূপণ, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞানই যথেষ্ট। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজমনোবিদ্যা ইত্যাদি সামাজিক বিজ্ঞান যেখানে আছে, সেখানে সমাজদর্শনের আর পৃথক্ প্রয়োজন কী?

এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞান স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া যাইলেও তাহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের সমন্বয় সাধনের জন্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা 'সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী' (synoptic standpoint) হইতে বিবিধ সমস্যার আলোচনা করে। সমাজ-জীবনের যে একটা সমগ্রত্ব ও জটিলতা আছে তাহা কোন সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানই পূর্ণভাবে আলোচনা করিতে পারে না—যে অর্থে বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানগুলি এক একটি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ রচনা করিয়াছে, বাস্তব ক্ষেত্রে দৈনন্দিন সমাজজীবনে ঐরূপ পৃথক্ বিভাগ নাই। সুতরাং বিভিন্ন সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটা কৃত্রিমতা থাকিয়া গিয়াছে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের ভাব থাকিয়া গিয়াছে। দর্শন হিসাবে সমাজদর্শনের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার জন্য সমাজদর্শন এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছে।[১৬] তাহা ছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মূল প্রত্যয়গুলি (fundamental concepts)-এর সত্যাসত্য নির্ধারণের কাযেও দর্শন

১৬ E. J. Urwick-এর উক্তি এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়: "We will not expect too much of any separate Social Sciences. They cannot be determining Sciences of separate departments of social life and activity, for social life has no separate department or ends, but is a single complex whole, related to a single complex aim, in which all separate parts and aims are qualified by relation to all other parts and aims.......And finally, in order to get, not full explanation and guidance, for both are impossible, but a rather less incomplete explanation of the forces at work in our social life and of the significance of those forces and of the process which result from them, we must pass beyond sociology to a philosophy of social progress." (*A Philosophy of Social Progress*, p. 16).

সহায়তা করে। (পৃঃ ৪)। আবার, সমাজদর্শন বিভিন্ন আদর্শের সমালোচনা করিয়া উহাদের আপেক্ষিক মূল্যনির্ধারণ করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তির জীবন পরিচালনায় ইহা যথেষ্ট আলোকপাত করে। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানগুলি তাহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক ঘটনাগুলি সংগ্রহ, শ্রেণীকরণ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে জীবনদর্শন বা জীবনের মান ও আদর্শ কী হইবে বা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাহারা সাধারণতঃ নীরব থাকে। সমাজদর্শন বিবিধ সামাজিক ঘটনার বর্ণনাকে অতিক্রম করিয়া জীবনে চলার পথে আমরা কিভাবে অগ্রসর হইব তাহা বলিবার চেষ্টা করে। এই দিক্ হইতেও সমাজদর্শনের সার্থকতা আছে।

৪। সমাজদর্শনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা (Utility and Necessity of Social Philosophy):

পূর্ব অনুচ্ছেদে সমাজদর্শনের বিরুদ্ধে যে সকল সম্ভাব্য যুক্তি হইতে পারে আমরা তাহাদের প্রত্যুত্তরের প্রচেষ্টা করিয়াছি। ইহা হইতেই আমরা সমাজ-দর্শনের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারি। পূর্ব আলোচনার সূত্র অনুসরণ করিয়া আমরা এখানে সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি—

(ক) দর্শন পাঠ ও আলোচনার সাধারণ যে উপকার আছে, সমাজদর্শনের ক্ষেত্রেও তাহারই উল্লেখ করা যাইতে পারে। দর্শনের আলোচনামাত্রই বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্র পর্যালোচনা করিয়া সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে একটি চরম ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করে। সমাজদর্শনের ক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম নাই—অর্থাৎ সমাজদর্শন উহার নিজস্ব ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু, সামঞ্জস্যপূর্ণ, চরম ব্যাখ্যা দান করিবার প্রচেষ্টা করে।

(খ) দর্শন সর্বদা সত্যের অনুসন্ধান করে। সত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইল সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য। সত্যের পূজারী হিসাবে দার্শনিক তাঁহার চিন্তনে, আচারে, ব্যবহারে, আলাপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বিরোধী মতবাদসমূহের মধ্যে যে সকল আংশিক সত্য নিহিত থাকে দার্শনিক সেগুলির সমন্বয় সাধন করিবার প্রচেষ্টা করেন। সত্তা মাত্রই বহুমুখী বা বহুধর্মী; এক একটি মতবাদে উহার এক একটি বৈশিষ্ট্যের উপর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দার্শনিকের কার্য হইল ধীরভাবে উহাদের বিচার করা এবং যতদূরসম্ভব সমন্বয় সাধন করা।[১৭]

(গ) দর্শন বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও উহাদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলি সমালোচনা করিয়া উহারা কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা আলোচনা করে। তাহা ছাড়া, বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলগুলির মধ্যে বিরোধ থাকিলে তাহা কিভাবে দূর করা যায় এবং উহাদের মধ্যে কি ভাবে সমন্বয়সাধন সম্ভব তাহা দর্শন বিচার করে[১৮]। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য 'কারণ', 'বিবর্তন' ইত্যাদি কতদূর এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রয়োগ করা যায়, তাহা দর্শন সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করে। এক্ষেত্রে সমাদজর্শনের পক্ষে বিচার্য বিষয় হইল: সামাজিক ক্ষেত্রে কী যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিবর্তন পদের প্রয়োগ করা যায়? যে-ভাবে জীবজগতে বিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া যান্ত্রিকতাবাদীরা ব্যাখ্যা করেন, ঠিক ঐ ভাবে কি সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায়? যেভাবে জড়জগতে 'কারণ'-পদের ব্যবহার করা হয় সেইভাবে কি সামাজিক পরিবর্তনের 'কারণ'কে ব্যাখ্যা করা যায়?[১৯] সমাজজীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (freedom of

১৭ এ বিষয়ে দার্শনিক মার্ভিন (Marvin)-এর উক্তি লক্ষণীয়; "Truth is *Consistency. He that makes it a chief aim of his life in thought, in word and in deed to be consistent he is a philosopher*; and then the endeavour to bring consistency into the life and thought of the civilization of the day, this endeavour is philosophy." "He (Philosopher) must be *judicially minded*. His work as reconciler demands that he understand both sides of the controversy, and that he do justice to both" (*Introduction to Philosophy*, pp. 1 & 5).

১৮ তুলনীয়: "Philosophy can, and it seems urgently necessary just now that it should attempt to provide a critical apparatus for scrutinising and evaluating the methods and assumptions made by the social sciences, and particularly the more fundamental conception from which a synthesis of the social sciences might proceed." (Ginsberg, *Reason and Unreason in Society*, p. 123).

১৯ বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিবার কালে যান্ত্রিকতাবাদীরা মনে করেন যে, উহার পশ্চাতে কোন সর্বব্যাপিনী চিচ্ছক্তি (universal consciouness) কার্য করিতেছে না। ডারউইন্ মনে করেন যে কতকগুলি আকস্মিক পরিবর্তনের সংযোগে বিবর্তন ঘটিয়াছে; সেইরূপ ল্যামার্ক মনে করেন যে, পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহে হঠাৎ পরিবর্তন আসে। (P. B. Chatterji, *Outlines of General Philosophy*, Ch. X দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ কারণকেও ব্যাখ্যা করিবার কালে যান্ত্রিকতাবাদীরা বলেন যে পর্ববর্তী ঘটনা অনুবর্তী ঘটনার উদ্ভব ঘটায়—কোন উদ্দেশ্য দ্বারা উহা পরিচালিত হয় না।

individual will)-এর স্থান কোথায়? ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক স্বাধীনতা যদি থাকে, তাহা হইলে সমাজজীবনে কি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে? একমাত্র দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যদি সামাজিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে সামাজিক পরিবর্তনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা সম্ভব।

(ঘ) সমাজদর্শন কেবলমাত্র বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান কর্তৃক ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলির সমালোচনা বা যৌক্তিকতা নির্ধারণের মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখে না। সমাজদর্শন বিবিধ আদর্শের আপেক্ষিক মূল্য বিচার করে। বিবিধ সমাজে বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধ আদর্শ গঠিত হইয়াছে—যেমন, বিবাহ, পরিবার, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আদর্শ গঠিত হইয়াছে। সমাজদর্শনের কার্য হইল এইগুলির সুষ্ঠু বিচার করা এবং মূল্য নির্ধারণ করা। সুতরাং সমাজদর্শন ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে পথ নির্দেশে সহায়তা করে।[২০] বিবিধ উদ্দেশ্য বা আদর্শের যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ ব্যতীত কোন সমাজ-ব্যবস্থার বা সংস্থার সমালোচনা সম্ভব নহে। যে কোন সামাজিক সংস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে কোন্ উদ্দেশ্য বা আদর্শ সাধনে উহা সহায়তা করিতেছে, কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহার উদ্ভব হইয়াছিল এবং কোন্ উদ্দেশ্য উহার সাধন করা উচিত ছিল। এই কারণে যে-কোন সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনা স্বতঃই দর্শনে উপনীত হয়। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের পরিপূরক হিসাবে দর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়।

(ঙ) যে-কোন ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সমাজদর্শন একান্তভাবে সাহায্য করে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। এই সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য সমাজ-বিজ্ঞানীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত।

বাস্তবিকপক্ষে, সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শন ইহাদের মধ্যে কেহই অপরকে পরিহার করিয়া চলিতে পারে না। বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের

২০ সামাজিক বিজ্ঞানের কোন কোন লেখক মনে করেন যে, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির পক্ষে উদ্দেশ্য বা আদর্শ (goal or end) সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। যেমন, অর্থনীতি (economics) একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে উপায় (means) সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, কিন্তু উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে নীরব থাকিবে। কারণ, উদ্দেশ্য বিচার হইল নীতিশাস্ত্র (ethics)-এর কার্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ পার্থক্য রাখা চলে না, কারণ উদ্দেশ্য বা আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন উপায় থাকিতে পারে না।

জন্য এবং তাহাদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলির যৌক্তিকতা নির্ধারণ, তাহাদের দ্বারা পরিকল্পিত আদর্শ বা উদ্দেশ্য এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট উপায়সমূহের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যের জন্য সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের পক্ষে দর্শন অপরিহার্য। আবার অপর পক্ষে, দর্শন যখন ব্যক্তি তথা সমাজের নীতিবোধ, আদর্শ ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করে তখন উহা বাস্তবের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারে না। নীতির ক্ষেত্রে দার্শনিক যাহা উচিত এবং করণীয় বলিয়া মন্তব্য করিবেন, তাহা যেন এরূপ হয় যে, তাহা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবপর ; অর্থাৎ যাহা সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অসম্ভব, তাহা প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। সুতরাং দার্শনিকের আদর্শ যাহাতে অবাস্তব বা কল্পনামুখর না হইয়া পড়ে, সেইজন্য দার্শনিকের পক্ষে প্রয়োজন বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ[২১]। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু সমাজদর্শন একদিকে নিরপেক্ষ যুক্তির উপর এবং আর দিকে বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই হেতু আশা করা যায় যে, দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত আদর্শ ব্যক্তি তথা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজদর্শন যে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে কি কি করণীয় হইবে, তাহার একটি তালিকা প্রদান করিবে তাহা নহে। সমাজদর্শন সাধারণভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিবে সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে 'কর্তব্য'-পদের কী দ্যোতনা হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে ঠিক কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিলে সুখভোগ হইবে সমাজদর্শন তাহা নির্দেশ করে না—তবে ইহা সাধারণভাবে আদর্শের ভিত্তি ও প্রকারভেদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। মোট কথা, ব্যক্তি বিশেষ একদিকে স্বেচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন জীব, তাহার একটি নিজস্ব সত্তা আছে ; অপরদিকে সে সামাজিক জীব, সমাজের অঙ্গ, সমাজের মধ্যেই তাহার স্থান এবং সে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজে থাকিতে পারে না। ব্যক্তির এই দুই বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি তথা সমাজ সম্বন্ধে সুষ্ঠু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে চিন্তা করার জন্যই সমাজদর্শনের সার্থকতা।

৫। সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু (Scope of Social Philosophy) :

পূর্ব অনুচ্ছেদগুলির আলোচনা হইতে আমরা সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু বা আলোচনার পরিধি অনুমান করিতে পারি।

---

২১ **হোয়েফডিং (Höffding)-এর ভাষায় :** "What is ethically obligatory must be sociologically possible."

সাধারণভাবে বলা যায় যে, দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক—বিশ্বসংসারে এমন কিছু নাই যাহা কোন-না-কোন দর্শনের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠে না।[২২] এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজদর্শনের আলোচনাক্ষেত্রে সাধারণ দর্শনের ক্ষেত্র অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইলেও নিতান্ত স্বল্পপরিসর নহে। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত সকল প্রকার সমস্যাই কোন-না-কোন ভাবে সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ বলিতে পারা যায় যে, সকল সামাজিক সংস্থা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদির মূল বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের কারণ, অবাধগতি ও উদ্দেশ্য (causality, continuity ও teleology) বিচার করাই সমাজদর্শনের প্রধান বিচার্য বিষয়। অর্থাৎ যে কোন সামাজিক প্রথা, সংস্থা বা ঘটনা সম্বন্ধে সমাজদর্শন আলোচনা করেঃ উহা কেন হইয়াছে? উহা কিভাবে চলিয়া আসিতেছে বা আসিতেছিল? উহা কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে বা হইতেছিল? ঐ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কতদূর গ্রহণযোগ্য?

এখন আমরা পৃথক্‌ভাবে সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারিঃ

(১) সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল ব্যক্তি ও সমাজ লইয়া যে সামগ্রিক সত্তা গঠিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ নির্ধারণ। সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে যাইয়া সমাজদর্শনকে আলোচনা করিতে হইবে উহা জড়শক্তি (physical forces) দ্বারা চালিত, অথবা উহা অপেক্ষা উন্নততর কোন প্রাণ-শক্তি (vital force) উহার মধ্যে প্রবাহিত, অথবা উহার ভিত্তিমূলে আছে চেতনাশক্তি (conscious or mental force); আবার সমাজদর্শন প্রশ্ন করিবেঃ সমাজের মাধ্যমে কি কোন নৈতিক উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে, অথবা সমাজ মাত্রই নিছক জনসমষ্টি? তাহা ছাড়া, ব্যক্তি সম্বন্ধে সমাজদর্শন অনুসন্ধান করিবে সামাজিক জীবনের অংশ হিসাবে সমাজ মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্থান কোথায়, অন্যের সহিত তাহার কী সম্বন্ধ এবং প্রতিটি সামাজিক সংস্থা ও সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে ব্যক্তি-বিশেষের জীবনকে প্রভাবিত করে।[২৩]

২২ দর্শনের এই ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই Caird বলিয়াছেন যে, দর্শন চায় "to treat of all things in heaven and earth, to regard nothing as too high or sacred to be subjected to its enquiries." (*Philosophy of Religion*, p. 3).

২৩ তুলনীয়: "It (Social Philosophy) can take the socius or citizen, and explain what is involved in his membership of the whole social

(২) সমাজদর্শন বিবিধ সামাজিক সংস্থা (social institutions)-গুলির স্বরূপ লইয়া আলোচনা করে। এই প্রসঙ্গে সমাজদর্শন সমাজতত্ত্ব ও সমাজ-মনোবিদ্যা হইতে সাহায্য গ্রহণ করে। বিবিধ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আদিমকাল হইতে কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সমাজদর্শন সমাজতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করে; অপর পক্ষে মানবমনের কোন্ প্রবৃত্তি, বাসনা বা কামনা বিশেষ বিশেষ সংস্থা গঠনে প্রেরণা যোগাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সমাজদর্শনকে সমাজ মনোবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়।

(৩) বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞান কর্তৃক ব্যবহৃত মূল প্রত্যয়গুলির যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য নির্ধারণ সমাজদর্শনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাহা ছাড়া, বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞানের প্রধান মতবাদসমূহ এবং মূল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যতদূর সম্ভব সমন্বয় সাধন করা যায় সে কাযেও সমাজদর্শন উদ্যোগী হয়।

(৪) সাধারণভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে সামাজিক বিবর্তন ঘটিতেছে এবং যে পরিণতির পথে উহা চলিয়াছে, তাহা আলোচনা করা এবং তাহার তাৎপয নির্ধারণও সমাজদর্শনের আর একটি কার্য। সমাজদর্শন প্রধানতঃ পরিবার, সম্পত্তির অধিকার, রাষ্ট্র, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি সামাজিক সংস্থার বিবর্তনের মূলসূত্র আলোচনা করিয়া উহাদের তাৎপর্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা করে।

(৫) সমাজে যে সকল আদর্শ বা মান (ideal or standard) প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহাদের সমালোচনা ও তুলনামূলক বিচার সমাজদর্শনের কার্যসূচীর অন্তর্গত।

(৬) বিভিন্ন সমাজে এক এক প্রকারের কৃষ্টি (culture)-এর উদ্বর্তন ঘটিয়াছে। সমাজদর্শন এই সকল বিভিন্ন কৃষ্টির সমালোচনা করিয়া উহাদের তাৎপর্য বা অন্তর্নিহিত অর্থ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করে।

(৭) সমাজের চরম মঙ্গলের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকার জন্য প্রসঙ্গক্রমে যে সকল 'সামাজিক ব্যাধি' প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাদের মূল কারণ অনুসন্ধান করা এবং সেগুলির দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করা সমাজদর্শনের আর একটি করণীর কার্য। সমাজদর্শন যে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহা কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র 'মানবগোষ্ঠী' নহে। ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠী হইতে

group or any part of it, in his relations to other members, in his connexion with each of the institutions which help to give meaning to his actions." (Urwick, ***A Philosophy of Social Progress***, p. 24).

আরম্ভ করিয়া সমাজদর্শন শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবের চরম কল্যাণের আলোচনায় উপনীত হয়। সুতরাং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-বিশেষের স্থান সম্বন্ধে দর্শনকে আলোচনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, এই প্রসঙ্গে সমাজদর্শনকে চিন্তা করিতে হয় জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত। সমগ্র মানবসভ্যতার তাৎপর্য কী, ইহা কিসের ইঙ্গিত করিতেছে, ইহার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কী হইতে পারে, কিভাবে এবং কতদূর ইহার গতিকে সুষ্ঠু কল্যাণের পথে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে তাহার আলোচনাতে সমাজদর্শন শেষ পর্যন্ত লিপ্ত হয়।

৬। সমাজদর্শনের আলোচন-পদ্ধতি (Method of Social Philosohphy):

কোন শাস্ত্রের আলোচন-পদ্ধতি বলিতে বুঝায় ঐ শাস্ত্র অনুধাবন করার জন্য অর্থাৎ উহার উপাত্ত সংগ্রহ এবং উহাদের সম্যক্ ব্যাখ্যার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় বা প্রয়োজনীয়। সুতরাং সমাজদর্শনের পদ্ধতি কী হইতে পারে তাহা নিরূপণের পূর্বে আমাদের জানিতে হইবে সমাজদর্শনের প্রধান বিষয়বস্তু বা লক্ষ্য কী। সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় হইল বিবিধ সামাজিক ঘটনা, সংস্থা, রীতিনীতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ, সমালোচনামূলক মতবাদ গঠন করা। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা (experience) এবং সমালোচনা বা যুক্তি (reason) উভয় পদ্ধতিই সমাজদর্শন অনুসরণ করিয়া চলে। অর্থাৎ সমাজদর্শনের পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যে, উহা যেন অভিজ্ঞতা ও যুক্তি ইহাদের উভয়েরই সমন্বয় সাধন করে।

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৪) দেখিয়াছি যে, সমাজদর্শনের দুইটি দিক্ আছে—একটি সমালোচনামূলক আর একটি গঠনমূলক। বলা বাহুল্য, সমালোচনা বা গঠনের কার্য শূন্যে হইতে পারে না। বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতেই সমালোচনার কার্য সাধিত হইতে পারে। সুতরাং কোন্ সমাজের কী আদর্শ অনুসরণ করা উচিত—কোন্ সংস্থার কিভাবে উন্নতিবিধান করা সম্ভব, কোন্ রীতি বা প্রথা কতদূর গ্রহণযোগ্য ও কতদূর পরিত্যাজ্য, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের আদর্শ সম্পর্ক কী হওয়া উচিত—সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে হইলে সমাজের বাস্তব

অবস্থা কী সে বিষয় জ্ঞান প্রয়োজন। এই কারণ সমাজদর্শনকে কিয়দ্দুর অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি (empirical method) অনুসরণ করিতে হয়। সমাজদর্শন যখন অভিজ্ঞতার পদ্ধতি অনুসরণ করে, তখন ইহার সহিত একদিকে সহযোগিতা করে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস এবং অপরদিকে সমাজমনোবিদ্যা। সমাজদর্শন-পরিকল্পিত মান বা আদর্শ যাহাতে অবাস্তব বা অসার না হইয়া পড়ে, সেজন্য উহাকে বাস্তবঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (পৃঃ ১৭) এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি আবার নিজেই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। পরিসংখ্যান পদ্ধতি (statistical method) অথবা তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method)-এর মাধ্যমে আরোহমূলক সার্বিক বচন (inductive proposition) গঠিত হয় এবং উহার যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য পুনরায় বাস্তবঘটনার ক্ষেত্রে উহাকে প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় যে, উহা কতদূর সত্য। অর্থাৎ অবরোহপদ্ধতি (deductive method)-এর প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় পূর্বের সার্বিক সিদ্ধান্তটি সত্য কি না। (ইহাকে Mill বলিয়াছেন 'বিপরীত আরোহপদ্ধতি' বা Inverse Deductive Method)। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, গোষ্ঠী ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া বিবিধ সমাজ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান সার্বিক বচন রচনা করে, অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে বা হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ মতবাদ গঠন করে। এই পর্যন্ত সমাজদর্শন সমাজ-কেন্দ্রিকবিজ্ঞানগুলির সহযোগিতায় অভিজ্ঞতার পথ অনুধাবন করিয়া চলে। অবশ্য সাধারণ মানুষও সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনা ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে; তবে সাধারণজ্ঞান (commonsense knowledge) অসংবদ্ধ—উহাতে অনেক সময়ই শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। এই অভাব দূর করে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান (scientific knowledge)—উহা সুসংযত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাধারণজ্ঞান অপেক্ষা উন্নততর হইলেও উহা এক হিসাবে অসম্পূর্ণ। এইজন্য দার্শনিক কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। বিজ্ঞান প্রকৃতির এক একটি অংশকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা বহির্ভূত কোন কিছু লইয়া আলোচনা করে না। কিন্তু দর্শন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে সুচারু, সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিবার প্রচেষ্টা করে। সাধারণভাবে দর্শন সম্বন্ধে যাহা

প্রযোজ্য সমাজদর্শনের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। সমাজদর্শনও বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞান মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজ সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু, সুচিন্তিত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করে—এই স্থানেই সমাজদর্শন কেবলমাত্র বাহ্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া শুদ্ধচিন্তন বা যুক্তির পন্থা অবলম্বন করে। চিন্তন বা যুক্তির সাহায্যে সমাজদর্শন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া উহাদের তাৎপর্য বুঝিবার ও ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ সমাজদর্শন যেখানে সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করে, উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে, বিবিধ আদর্শের তুলনামূলক বিচার করে, তখন উহা যুক্তি, চিন্তন বা সমালোচনার পদ্ধতি (rational method) অবলম্বন করে। এই স্থানেই সমাজদর্শনের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝা যায়।[২৪]

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, সমাজদর্শনের পক্ষে **অভিজ্ঞতা ও চিন্তনের যুক্ত পদ্ধতি** (empirico-rational method) অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

২৪ সমাজদর্শন যে অভিজ্ঞতা লইয়া যুক্তিপূর্ণ চিন্তন শুরু করে, তাহা কোন বিশেষ প্রকারের অভিজ্ঞতা নহে—সমাজের সকলেরই ঐ প্রকার অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর ঘটিতেছে। তবে সাধারণ লোকের সহিত দার্শনিকের প্রভেদ এই যে, সাধারণ লোক যাহা বিনা বিচারে গ্রহণ করে এবং যে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করে না, দার্শনিক সেখানে উহার ভিত্তিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'ন। সাধারণ লোকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া Cole বলিয়াছেন : "The generality of men and women take their experience of the social scene around them unphilosophically. They do not reflect upon it : they merely accept it." (*Social Theory*, p. 2).

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজদর্শন ও অন্যান্য কয়েকটি শাস্ত্র

কোন বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উহাকে অন্যান্য কয়েকটি সদৃশ বিষয়ের সহিত তুলনা করা বাঞ্ছনীয়। এই কারণ আমরা সমাজদর্শনের সহিত উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিব।

১। সমাজবিদ্যা (সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব) ও সমাজদর্শন (Sociology and Social Philosophy):

সমাজদর্শন ও সমাজতত্ত্ব (বা সমাজবিজ্ঞান) উভয়েই সমাজ লইয়া আলোচনা করে; সুতরাং এই দুই বিষয়ের মধ্যে যে গভীর সংযোগ আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সম্বন্ধ বা সংযোগের স্বরূপ যথাযথ অনুধাবন করিবার জন্য ইহাদের বিষয়বস্তুর সহিত সম্যক্ পরিচিতি প্রয়োজন। সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সেইজন্য আমরা প্রথমে সমাজতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিয়া সমাজদর্শনের সহিত উহার কী সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিব।

(ক) সমাজতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যা কাহাকে বলে? (What is Sociology?)

বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব তরুণ-বিজ্ঞানগুলির অন্যতম—মাত্র শতাধিক বৎসর হইল পৃথক্ বিজ্ঞান হিসাবে ইহা স্বীকৃতি পাইয়াছে।[১] সেই কারণ ইহার বিষয়বস্তু, গবেষণার ক্ষেত্র, আলোচন-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত একটি সুনির্ধারিত মতবাদ গড়িয়া উঠে নাই।

সমাজতত্ত্ব বলিতে এমন এক বিজ্ঞান বুঝায় যাহা মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে। সামাজিক জীব হিসাবে মনুষ্য যাহা করিয়াছে, যাহা করিতে চায়, যাহা আদর্শ বলিয়া মনে করে, যে উপায়ে স্বীয় ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছে ও প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে, যেভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, যে সকল সামাজিক সংস্থা বা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, যে সকল গোষ্ঠীতে মনুষ্যসমাজ বিভক্ত হইয়াছে, যে সকল রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রথা

---

১ ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ সাম্প্রতিক কালে পৃথক্ বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলা হয়।

সে অনুধাবন করিয়া আসিতেছে ইত্যাদি সব কিছুই সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিৎ বা সমাজতত্ত্ববিদের সম্প্রদায় এক একটি অংশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—কেহ বা বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কেহ বা বিবিধ আচার-ব্যবহার অথবা সামাজিক বিধির উদ্ভবের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কেহ বা সমাজের অগ্রগতি লইয়া অধিকতর আলোচনা করিয়াছেন। আবার বিবিধ সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে—কেহ বা সমাজকে যান্ত্রিকতাবাদ (mechanistic standpoint)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন, কেহ বা জীববিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী (biological standpoint) হইতে দেখিয়াছেন, কেহ বা সমাজকে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী (psychological standpoint) হইতে দেখিয়াছেন, আবার কেহ বা ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] সেইরূপ অন্যান্য সমাজ-কেন্দ্রিক বা সামাজিক বিজ্ঞান (social science)-গুলির মধ্যে ইহার স্থান কোথায় সে বিষয় মতভেদ আছে—কেহ মনে করেন যে, ইহা অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, ব্যবহারশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানগুলির সহিত সমপর্যায়ভুক্ত নহে ; যেহেতু ইহা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে, সেইহেতু ইহা সকল সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির অন্যতম এবং ইহা বিশেষ কোন স্থান দাবী করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের স্বরূপ কী এবং ইহা কতদূর সার্থক হইয়াছে সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। যাহা হউক, এই সকল বিতর্কের মধ্যে কোন বিশেষ মতবাদ সমর্থন না করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, **সামাজিক জীব হিসাবে মানুষে মানুষে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ গঠিত হইয়াছে এবং ঐ সকল সম্বন্ধ হইতে যে সকল ঘটনা, ক্রিয়া, অবস্থা ইত্যাদি উদ্ভূত হইয়াছে এবং যে সকল সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হইতেছে, সেই বিষয় সুষ্ঠু, বৈজ্ঞানিক আলোচনাই হইল সমাজতত্ত্ব।**[৩] সমাজতত্ত্ব-

২ সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনার জন্য Pitirim Sorokin-রচিত *Contemporary Sociological Theories* দ্রষ্টব্য।

৩ তুলনীয়: "Sociology is the science of social relationships (structures), the consequences (functions) of those relationships for ongoing social systems and the processes of social change." (*Encyclopædia Americana*, Vol. XXV, Art. on Sociology).

বিদের মতানুসারে মানুষের আচরণ, চিন্তা ও কার্যপদ্ধতিকে সামাজিক জীবনের এবং পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রকাশ ভাবে বুঝিতে হইবে, কারণ সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না—সমাজের মধ্যেই জীব জন্মগ্রহণ করে এবং শৈশবে অসহায় অবস্থায় সে সম্পূর্ণরূপে সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজতত্ত্ব বহুবিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা করে—তবে এই সমস্যাগুলি প্রধানতঃ সামাজিক সংগঠন বা সংহতি সম্বন্ধীয়, সমাজমনঃ-সম্বন্ধীয়, সামাজিক পরিবর্তন-সম্বন্ধীয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধীয়, জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বিবর্তন ও অগ্রগতি সম্বন্ধীয়। সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের মূলে আছে রাষ্ট্রদর্শন, ইতিহাসদর্শন, জীবের বিবর্তন সম্বন্ধীয় বিবিধ মতবাদ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবিধ সংস্কার-সংক্রান্ত নানাবিধ অভিজ্ঞতা।[৪]

[এই প্রসঙ্গে 'সমাজকেন্দ্রিক বা সামাজিক বিজ্ঞান' (social science) এই পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সমাজকেন্দ্রিক বিজ্ঞানসমূহ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের যে কোন দিক্ বা বিষয় লইয়া আলোচনা করে—অর্থাৎ মানুষকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নরূপে গণ্য না করিয়া সামাজিক জীব হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বভাব, মানুষের আচরণ, মানুষ কি পাইতে পারে, মানুষের কি করা উচিত, মানুষের উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞান আলোচনা করে। নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, সমাজ-বিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞান শ্রেণীর অন্তর্গত।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সমাজকেন্দ্রিক বা সামাজিক বিজ্ঞান (social science) হইল একটি শ্রেণী (genus) এবং সমাজবিদ্যা বা সমাজতত্ত্ব (sociology) উহার অন্তর্গত একটি উপশ্রেণী (species)। তবে সকল সামাজিক বিজ্ঞান-গুলির মধ্যে সমাজবিদ্যাই মুখ্য বা প্রধান সামাজিক বিজ্ঞান।]

(খ) সমাজতত্ত্বের সহিত সমাজদর্শনের সম্পর্ক—

আমরা উপরে সমাজতত্ত্বের যে সকল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলাম, উহার

৪ Ginsberg-এর ভাষায়: "Broadly it may be said that Sociology has ~~had~~ a fourfold origin in political philosophy, the philosophy of history, biological theories of evolution and the movements for social and politial reform which found it necessary to undertake surveys of social conditions." (*Reason & Unreason in Society*, p. 2.)

আলোকে আমরা সমাজদর্শনের সহিত সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রচেষ্টা করিতে পারি।

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিক বিষয় লইয়া সম্পূর্ণ মতৈক্য নাই, একথা আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। সেই কারণে সমাজদর্শনের সহিত সমাজবিদ্যা বা সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক বিষয়ে মতভেদ আছে। (ক) কেহ কেহ মনে করেন যে, সমাজবিদ্যা সমাজদর্শন হইতে পৃথক্ হইতে নহে—তথাকথিত সমাজবিদ্যা কোন পৃথক্ বিজ্ঞান নহে, উহা সমাজদর্শনের নামান্তর। অপর আর একদল লেখক এই মতের বিরোধিতা করেন।[৫] তাঁহারা মনে করেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিদ্যার একটি নিজস্ব সত্তা আছে এবং ইহাকে দর্শনের অঙ্গ বলা চলে না। (খ) অপরপক্ষে আবার কোন কোন লেখক মনে করেন যে, দর্শন অসার কল্পনা-বিলাস মাত্র; এবং বস্তুনিষ্ঠ, সত্যানুসন্ধানী শুদ্ধ বিজ্ঞানের উচিত দর্শনের সহিত সংস্রব না রাখা। বলা বাহুল্য, এই অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা দর্শনের অপব্যাখ্যাই করেন এবং উহার প্রতি সুবিচার করেন না। আমরা এই দুই প্রকারের মতবাদ পরিহার করিয়া সমাজবিদ্যারূপ বিজ্ঞান ও সমাজদর্শন উভয়েরই আপেক্ষিক পার্থক্য স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

সমাজবিদ্যা ও সমাজদর্শন উভয়েই সমাজ ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত জীব হিসাবে মনুষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে; সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকা সম্ভব নহে—বরং তাহাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেকাংশে ঐক্য আছে। তবে বিষয়বস্তুর বিচার ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

সমাজবিদ্যা বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত—অর্থাৎ সমাজে বিবিধ রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রথা ইত্যাদি যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, বিবিধ সামাজিক

৫ জার্মানীর লুড্‌ভিগ্ স্টাইন্ (Ludwig Stein), রাৎসেন্‌হোফার (Ratsenhofer) এবং আমেরিকার আল্‌বিয়ান্ স্মল (Albian Small) সমাজবিদ্যাকে সমাজদর্শনের প্রকারভেদ মনে করেন।

স্টাইন্ তাঁহার এক রচনায় মন্তব্য করেন: "Sociology *is* social philosophy, a department of the whole philosophy which systematizes and brings into the most complete formulæ the unity of the different kinds of relations of men which are investigated separately by the respective specialisms." (*Sociological Papers*, 1904).

অপরপক্ষে আমেরিকার গিডিংস্ (Giddings) প্রমুখ লেখকগণ সমাজতত্ত্বকে দর্শন হইতে নিরপেক্ষ বিজ্ঞান মনে করেন।

সংস্থা যেভাবে রচিত হইয়াছে, উহারা যেভাবে ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ যে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পোষণ করে ও অনুধাবনের চেষ্টা করে সমাজবিদ্যা সেই সকল পর্যবেক্ষণ করে, তাহাদের মূলসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং যে সকল সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে সেইগুলি আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য রূপ অনুমানেরও চেষ্টা করে।

সমাজদর্শনও এইগুলি লইয়া আলোচনা করে; কিন্তু সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনামূলক নহে, উহা প্রধানতঃ সমালোচনামূলক। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব বা সমাজ-বিদ্যা যেখানে কেবল সামাজিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সমাজদর্শন সেখানে উহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান করিয়া উহাদের উপর মন্তব্য করে। মনুষ্যসমাজে কত প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল বা আছে, এবং মনুষ্যসমাজ বর্তমান বিবাহ-পদ্ধতিতে কোন্ কোন্ স্তরের মধ্য দিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করে সমাজবিদ্যা; কিন্তু মনুষ্যের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বিবাহের স্থান কোথায়—ইহাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কী সুবিধা হয় ও কী উন্নতি হয়, বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য কী, আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে সমাজদর্শন। (পৃঃ ৭) সেইরূপ সমগ্র মানবসমাজ কিভাবে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর কৃষ্টিধারা ও ঐতিহ্য কত বিভিন্ন প্রকারের আছে, তাহা বর্ণনা করে সমাজবিদ্যা; কিন্তু মানব-সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠি কী হইতে পারে, বর্তমান মানব-সভ্যতা কিসের ইঙ্গিত করিতেছে, কৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য কী, মানবসমাজে যে সকল বিবিধ কৃষ্টির উদ্বর্তন ঘটিয়াছে, তাহাদের আপেক্ষিক মান বা মূল্য কী হইতে পারে, মানবসমাজের চরম আদর্শ কী হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে সমাজদর্শন।[৬]

ইহার অর্থ এই নহে যে সমাজবিদ্যায় মূল্য সম্বন্ধীয় আলোচনার স্থান নাই।

৬ সমাজদর্শন যেহেতু আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করে, সেইজন্য উহার সহিত সমাজবিদ্যার পার্থক্য নির্দেশ কালে কোন কোন লেখক বলেন যে, সমাজবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ (positive) বিজ্ঞান এবং দর্শন আদর্শনিষ্ঠ (normative)। কিন্তু সমাজদর্শন কেবলমাত্র আদর্শ নির্ধারণের কার্যেই নিযুক্ত থাকে না; যদি তাহা হইত তাহা হইলে দর্শনের সহিত নীতিশাস্ত্র (ethics)-এর বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। দর্শন নীতিশাস্ত্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। সুতরাং কেবলমাত্র আদর্শনিষ্ঠা বা বস্তুনিষ্ঠার ভিত্তিতে ঐ দুইটির মধ্যে পার্থক্য টানা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

সমাজবিদ্যা মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং সমাজদর্শনও মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করে। তবে উহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকে। সমাজবিদ্যা যখন মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তখন সে লক্ষ্য করে কোন্ সমাজে কোন্ যুগে কি ভাবে কোন্ মূল্যবোধের ধারণা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ব্যক্তি তথা সমাজের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে।[৭] কিন্তু দার্শনিক যখন কোন মূল্য বা আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি উহা কতদূর গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত—মানুষের পরমপুরুষার্থের পক্ষে উহা সহায়ক অথবা পরিপন্থী—তাহাই আলোচনা করেন।

অবশ্য সমাজবিদ্যা ও সমাজদর্শনের এই পার্থক্য কার্যক্ষেত্রে সকল সময় রক্ষিত হয় না। কারণ, সমাজবিদ্যাবিৎ যে সকল মতবাদ (theory) গড়িয়া তুলেন, সেগুলি অনেক সময়ই আদর্শ, মূল্য ইত্যাদির আলোচনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না, অর্থাৎ, তাঁহারা সমাজসম্বন্ধীয় আলোচনাকালে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করেন তাহার সহিত মন্তব্য বা সমালোচনা আসিয়া যুক্ত হয়। ফলে, সমাজবিদ্যা দার্শনিক আলোচনা হইতে সকল সময় মুক্ত থাকিতে পারে না এবং সেইজন্য সমাজ-সম্বন্ধীয় কোন আলোচনাকে নিছক বৈজ্ঞানিক বা নিছক দার্শনিক এইভাবে সকল সময় অভিহিত করা চলে না।[৮]

যাহা হউক্, সমাজবিদ্যা ও সমাজদর্শনের মধ্যে আপেক্ষিক পার্থক্য থাকিলেও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে। (ক) সমাজবিদ্যা যে সকল মূল প্রত্যয় বিনা

৭ তুলনীয়: "As a science Sociology does not have as its objective the determination or modification of social values...To the sociologist values are among the data which he studies and not the end product of his labours" (*Encyclopaedia Britannica*, Art. on Sociology)

৮ তুলনীয়: ".........Social theory professes scientific objectives whereas social philosophy provides evaluative guides for future social behaviour. In practice, however, these tasks are often confused with one another......If we accept elements of social philosophy and social theory as persistent strands in the over-all development of social thought, it is important to note the changing relations between these two themes in human history." (*Modern Sociological Theory*, Ed. by Becker & Boskoff, p. 5).

উদাহরণস্বরূপ আমরা ডুর্কহাইম্ (Durkheim), হব্‌হাউস্ (Hobhouse) প্রমুখ লেখকগণের উল্লেখ করিতে পারি। ইঁহারা যদিও সমাজতত্ত্বের আলোচনা দর্শন হইতে পৃথক্ রাখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও ইঁহাদের রচনা শেষ পর্যন্ত অনেক স্থানে দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

বিচারে ব্যবহার করে, সেগুলির যাথার্থ্য লইয়া আলোচনা করে সমাজদর্শন। সুতরাং সমাজবিদ্যার মূল প্রত্যয়গুলি কিভাবে পরিমার্জিত করা যায় এবং উহার ভিত্তি সুদৃঢ় কি না, তাহা লইয়া অনুসন্ধান করে সমাজদর্শন। (খ) তাহা ছাড়া, বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিদ্যার বিবিধ শাখা যে সকল বিভিন্ন মতবাদ গঠন করে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেগুলির মধ্যে ঐক্য বা সংহতি স্থাপনে সহায়তা করে সমাজদর্শন। (গ) আবার, যদিও সমাজবিদ্যা নিজে চরম মঙ্গল বা পরমপুরুষার্থের আদর্শ নির্ধারণ করে না, তাহা হইলেও ইহার বিষয়বস্তু আলোচনাকালে সমাজের পক্ষে কোন্ আদর্শ মঙ্গলজনক সে প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে এবং এক্ষেত্রে সমাজবিদ্যাকে স্বতঃই সমাজদর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় ও উহার প্রদর্শিত পথে চলিতে হয়।[৯] সমাজবিদ্যার আলোচনায় স্বতঃই যে সকল দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলি সমাজবিদ্যার পক্ষে কোন বহিরাগত বা সম্পর্কহীন সমস্যা নহে।[১০]

অপরপক্ষে সমাজবিদ্যা বা সমাজতত্ত্বও দর্শনকে সাহায্য করে। দার্শনিক যখন মানবসমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করেন তখন সমাজসম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত হইতে হয় এবং এ বিষয়ে সমাজবিদ্যা "বাস্তব ঘটনা" সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং দার্শনিকের সমাজসম্বন্ধীয় চিন্তার উপাদান সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিদ্যা। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজবিদ্যা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে এবং সামাজিক ঘটনার মূলসূত্র বা সার্বিক

৯ F. J. Wright-এর **উক্তি লক্ষণীয়:** ".........Sociology takes Social Philosophy as a guide for its investigations.........As a Science, it is not the business of Sociology to enquire what is the highest good of Mankind, but, working for the highest good, it accepts the ruling of Social Philosophy as to what is the highest good; in a sense, Social Philosophy is the 'religion of Sociology'." (***Elements of Sociology***, p. 70).

১০ **তুলনীয়:** "......The philosophical problems which arise there (in sociology) are not tiresome foreign bodies which must be removed before sociology can advance on its own independent scientific lines. On the contrary, the central problem of sociology, that of giving an account of the nature of social phenomena in general, itself belongs to philosophy." (Winch, ***The Idea of a Social Science***, p. 43).

নিয়ম গঠন করে, দর্শন সাধারণতঃ সেগুলি গ্রহণ করিয়া স্বীয় চিন্তার পথে অগ্রসর হয়।[১১]

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, সমাজবিদ্যা ও সমাজদর্শনের মধ্যে কোন মূল বিরোধ নাই — উহারা পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক।

২। সমাজদর্শন ও মনোবিদ্যা (Social Philosophy & Psychology):

মনোবিদ্যা বলিতে এমন এক বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (positive science) বুঝায় যাহা মনের বিবিধ প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে। ব্যক্তি-বিশেষের মনের প্রকাশ ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটে বলিয়া উহা ব্যবহার-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান নামে পরিচিত।[১২]

সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল সমাজদর্শনের কার্য। কিন্তু মানুষকে বুঝিতে বা জানিতে হইলে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কী তাহা জানিতে হইবে; কিন্তু মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক হইল প্রধানতঃ মনের সম্পর্ক। সুতরাং মানুষকে বুঝা বা জানা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মান নির্ধারণ করা ও উহার উপর মন্তব্য করা প্রভৃতি কায সাধন করিতে সমাজ দার্শনিককে স্বতঃই মনের স্বরূপ (অর্থাৎ ব্যক্তি-মন তথা সমাজ-মন) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

সমাজ সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, সমাজ নিছক প্রাণহীন জনসমষ্টি নহে—উহার গতি ও বিবর্তন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে না। সজীব সচেতন জনমনের ঘাত-প্রতিঘাতেই সমাজ অগ্রগতির পথে চলিয়া থাকে। যে-কোন সামাজিক সংস্থার ঐতিহ্য, প্রথা বা আচরণের তাৎপর্য যথাযথ বুঝিতে হইলে উহার মূলে যে জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি ছিল তাহাদের জানিতে

১১ যদিও যুক্তিশাস্ত্রসম্মত ক্রম-অনুসারে বলিতে হয় যে, প্রথমে সমাজবিদ্যা এবং তাহার পর সমাজদর্শনের স্থান, ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক্ হইতে বলিতে হয় যে, মানবীয় চিন্তার আদিযুগে প্রথমে ছিল দর্শন এবং এই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজসম্বন্ধীয় সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা; কিন্তু আধুনিককালে বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিদ্যা গঠিত হইবার পর উহার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের আলোকে আবার নূতন করিয়া সমাজদর্শনের আলোচনা সুরু হইল।

১২ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা একটি তরুণ বিজ্ঞান এবং ইহার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা লইয়া মতভেদ আছে। আধুনিক মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু, সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত 'মনোবিদ্যা'—১ম অধ্যায়—দ্রষ্টব্য।

হইবে, অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমগ্র পরিস্থিতিটি বুঝিতে হইবে। এইজন্য সমাজসম্বন্ধীয় আলোচনার সহিত মনঃসম্বন্ধীয় আলোচনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।[১৩]

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১৬-১৭) বলিয়াছি যে, সমাজদর্শন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ সম্বন্ধে সুষ্ঠু যুক্তিসম্মত আলোচনা করে এবং এই আলোচনা বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইজন্য সমাজদর্শন যেমন একদিকে সমাজতত্ত্বের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করে, সেইরূপ অপরদিকে মনোবিদ্যার নিকট হইতেও উপাদান সংগ্রহ করে। যে-কোন সামাজিক পরিস্থিতি সম্যক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহা কেন ঘটিয়াছে জানিতে হইবে এবং এই 'কেন?'-এর উত্তর দান করিতে হইলে মানবমন পৃথক্‌ভাবে ও সমষ্টিগতভাবে উহাতে কী অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিতে হইবে।[১৪] যে-কোন সামাজিক পরিস্থিতি বা ঘটনা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উহার মূলে আছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া (interaction)। এই কারণে সামাজিক পরিস্থিতি (social situation) মাত্রই মনঃসঞ্জাত। সুতরাং মনোবিদ্যা-সংগৃহীত উপাত্ত (psychological data) সমাজদর্শনের পক্ষে অপরিহার্য। এইজন্য প্রতি সামাজিক ঘটনার একটা মানসিক ব্যাখ্যা (subjective meaning)-এর প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি-বিশেষের যে-কোন কার্য সামাজিক পদবাচ্য হইতে পারে যখন মন উহার উপর কোন 'অর্থ' আরোপ করে এবং এই অর্থ আরোপকালে অপরের সহিত উহার কী সম্বন্ধ আছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহা বিচার করে।[১৫] সমাজতত্ত্ব যখন কোন

১৩ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে টার্ডে (Tarde), লা বঁ (Le Bon), সিমেল (Simmel), গিডিংস (Giddings), কুলি (Cooley), রস (Ross), এলউড (Ellwood) ইত্যাদির রচনায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

১৪ সামাজিক ঘটনার মানসিক 'কারণ' নির্ধারণ করিবার জন্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ নিজেরাই বিবিধ 'মানসিক প্রত্যয়' ব্যবহার করেন। ওয়ার্ড (Ward) আবেগ বা প্রক্ষোভসমূহকে মূল 'সামাজিক শক্তি' (social force) বলিয়া মনে করিতেন। সামনার (Sumner) বলিতেন যে ক্ষুধা, কাম, অহমিকা ও ভয় এই কয়েকটি লোককে বিবিধ কার্যে প্রণোদিত করে। স্মল্ (Small)-এর মতে স্বাস্থ্য, অর্থ, সামাজিকতা, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং নীতিবোধ এই কয়েকটি জনমনের পক্ষে প্ররোচক।

১৫ Weber, Znaniecki, Thomas ইত্যাদি সমাজবিদ্যাবিৎ সমাজবিদ্যার আলোচনা কালে সামাজিক পরিস্থিতির উপর কী অর্থ মন দ্বারা আরোপিত হইতেছে (*subjective meaning*) তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। মাক্স ভেবেরের ভাষায়:

সামাজিক পরিস্থিতির 'অর্থ' বা 'তাৎপর্য' নির্ধারণের প্রচেষ্টা করে, তখন ব্যক্তি-বিশেষ উহার উপর ব্যক্তিগতভাবে কী অর্থ আরোপ করিতেছে তাহা দেখে না ; সমষ্টিগত-ভাবে জনগণ কী অর্থ আরোপ করিতেছে এবং জনমত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে ঐ সমষ্টিগত-অর্থ (inter-subjective meaning)-এতে কীভাবে 'অংশগ্রহণ' করিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সামাজিক দর্শনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সামাজিক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর তাৎপর্য নিরূপণ সম্ভব হইতে পারে যখন মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক পরিস্থিতির বিচার করা হয়।

সমাজের বহুমুখী সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া উহার সুষ্ঠু সমাধান প্রদানের প্রচেষ্টা সমাজদর্শনের আর একটি কার্য। অপরাধপ্রবণতা, বিদ্রোহ, দারিদ্র্য, বাতুলতা, আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি হইল বিবিধ সামাজিক সমস্যা—এই সকল সমস্যার সমাধান করিবার প্রাক্কালে দেখিতে হইবে বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কেন ইহারা ঘটে বা ঘটিতেছে। এই অনুসন্ধানের কার্যে মনোবিদ্যা সমাজদর্শনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।[১৬]

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিতে পারি যে, মনোবিদ্যার প্রসারের ফলে অপর একটি নূতন শাখার উদ্বর্তন হইয়াছে—ইহা সমাজমনোবিদ্যা নামে পরিচিত। সমাজের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জন-ব্যবহার এবং আন্তর্ব্যক্তিক ও আন্তর্গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব লইয়া আলোচনা করা হইল সমাজমনোবিদ্যার কার্য।[১৭]

"Action is social in so far as, by virtue of the subjective meaning attached to it by the acting individual, it takes account of the behaviour of others and is truely oriented in its course." (*The Theory of Social & Economic Organization*, p. 88).

১৬ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মনঃসমীক্ষণবাদ (psychoanalysis)-এর প্রসারের ফলে এই সকল সামাজিক সমস্যার কারণনিরূপণের সুবিধা হয়। মনঃসমীক্ষণ ব্যতীত যে সকল মনোবিদ্যা সম্বন্ধীয় মতবাদ সমাজবিদ্যার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ম্যাকডুগালের অভিপ্রায় বা হরমিক্ মতবাদ, ওয়াট্‌সনের ব্যবহারবাদ, লেভিনের গেস্টাণ্টবাদ এবং আড্‌লারের মতবাদ।

১৭ সমাজমনোবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত **মনোবিদ্যা** (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৬০-৬৫ দ্রষ্টব্য। সমাজমনোবিদ্যার লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, আর কেহ কেহ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ; এইজন্য কোন কোন লেখকের social psychology হইয়া উঠিয়াছে psychological social psychology, আর কাহারও কাহারও Social psychology হইয়াছে, sociological social psychology.

সমাজমনোবিদ্যার উদ্ভব ও প্রসারের ফলে সমাজতত্ত্ব (বা সমাজবিদ্যা) তথা সমাজদর্শনের সহিত মনোবিদ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে।[১৮] সমাজ-মনোবিদ্যা ইহাই দেখাইয়াছে যে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব সামাজিক পরিবেশের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়—ব্যক্তি-বিশেষ সমাজমধ্যে কী স্থান অধিকার করিয়া আছে বা কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা না জানিলে ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝা যায় না। এমনকি যাহাকে ব্যক্তি-বিশেষের মনের 'গোপনতম অংশ' বলা হয়, সেই অহং-বোধ (ego-consciousness) সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে অনেকাংশে গঠিত হয়।[১৯] সুতরাং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি-বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া সর্বদা আত্ম-প্রতিযোজনের চেষ্টা করে, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে আবার অন্য দ্বারা প্রভাবিত হয়।[২০]

সমাজসম্বন্ধীয় আলোচনার সহিত মনঃসম্বন্ধীয় আলোচনা কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধযুক্ত তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। ইহা হইতে সহজেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মনোবিদ্যা (বিশেষতঃ সমাজ-মনোবিদ্যা) এবং সমাজদর্শন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া দুইটিকে সমার্থক করিয়া ফেলিলে চলিবে না, কারণ এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ সত্ত্বেও মনোবিদ্যা এবং সমাজদর্শনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে—

(ক) সমাজদর্শন দর্শনের শাখাবিশেষ এবং দর্শন হিসাবে ইহা মনোবিদ্যা

---

১৮ অনেক লেখক এইজন্য Social Psychology ও Sociology এই দুই প্রত্যয় ব্যবহার না করিয়া microsociology ও macrosociology এই দুই নূতন পদ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথমটির কার্য হইল 'ক্ষুদ্র সমাজ' সম্বন্ধে আলোচনা—ব্যক্তি-বিশেষ কিভাবে আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের মধ্যে কার্য করে, তাহাই ইহা বর্ণনা করে। দ্বিতীয়টির আলোচ্য বিষয় হইল 'বৃহৎ সমাজ'—বহু ব্যক্তির সমাবেশে এই 'সমাজ'-গঠিত এবং সমষ্টিগত সমাজকে বর্ণনা করাই হইল ইহার কার্য। (Gillin-সম্পাদিত *For a Science of Social Man* দ্রষ্টব্য)।

১৯ তুলনীয়: "The self is essentially a social process." (George Mead)।

২০ এই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করিয়া Kimball Young ও Linton Freeman বলিয়াছেন: 'The concept of interaction has always been regarded as central to social psychology as well as to sociology.........Thus from birth on he (an individual) is part and parcel of a series of interconnected, interactional units, the model of which is the dyadic parent-child, child-child or adult relationship." (*Modern Sociological Theory*, Ed. by Becker & Boskoff, p. 550).

অপেক্ষা ব্যাপকতর। দর্শনের যে সামগ্রিক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার তাহা নাই। সুতরাং মনোবিদ্যা সমাজদর্শন অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর।

(খ) সমাজদর্শন সমাজ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করে, তাহা কেবল মনোবিদ্যা-সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত হয় না। বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞান-সমূহের (যথা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির) সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া সমাজদর্শন একটি চরম ব্যাখ্যা রচনার প্রচেষ্টা করে। সুতরাং মনোবিদ্যার যাহা দৃষ্টিভঙ্গী সমাজদর্শন তাহাকে একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীভাবে গ্রহণ না করিয়া অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গীভাবে গ্রহণ করে।[২১]

(গ) যদিও সমাজ ও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তাহা হইলেও সমাজদর্শনের বিচারে সমষ্টি অর্থাৎ সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানতঃ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (individualistic)—এক বা একাধিক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সহিত যাহা সম্বন্ধযুক্ত তাহাকে ইহা বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে।

(ঘ) সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে আদর্শ সম্বন্ধীয় আলোচনা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু মনোবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ (positive) বিজ্ঞান হওয়ার জন্য কোন কিছু হওয়া উচিত কি অনুচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করে না। যেমন, মনোবিদ্যা অনুসন্ধানের ফলে দেখিল কি কি কারণে মানুষের বাসনা পূর্ণ না হইলে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে। সমাজদর্শন ইহার আলোকে বিচার করে মানুষের ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে বাসনার কি প্রয়োজনীয়তা আছে, বাসনা কিভাবে সুসংযত করা কর্তব্য ইত্যাদি।

সুতরাং পরিশেষে আমরা মন্তব্য করিতে পারি যে, মনোবিদ্যা ও সমাজদর্শন পৃথক্ অথচ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত দুইটি শাস্ত্র।

৩। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Social Philosophy and Politics):

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ইহা রাষ্ট্রের গঠন ও কার্য, অন্য সামাজিক সংস্থার সহিত ইহার পার্থক্য, রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও বিবিধ

---

২১ তুলনীয়: "......Social life cannot be studied exclusively with the methods of the Psychologist." (Ginsberg, *Fundamentals of Sociology*, p. 2.).

নিয়মের স্বরূপ এবং উহাদের প্রতি আনুগত্যের যৌক্তিকতা, আদর্শ শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ইত্যাদি আলোচনা করে।[২২] যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে, সেই হেতু উহা স্বরূপতঃ আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (normative science)।

আমরা এ পর্যন্ত সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহার আলোকেই বলিতে পারি যে, সমাজদর্শনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ সুনিবিড়। সমাজদর্শন সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করে—সেই সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হইল রাষ্ট্র। সমাজ ও রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। সমাজের মধ্যেই রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটে—সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকের বাসনা, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদির ফলেই এক এক প্রকার সামাজিক অবস্থার মধ্যে এক এক প্রকার রাষ্ট্রের উদ্বর্তন ঘটে। অপরপক্ষে, রাষ্ট্রের উদ্বর্তন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার ফলেই সমাজের এক বৃহৎ জনসমষ্টি সুসংবদ্ধ বা ঐক্যপূর্ণভাবে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সংহতির ফলেই সমাজে ঐক্য, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতির সম্ভাবনা দেখা যায়। এই কারণে সমাজতত্ত্ববিৎ তথা সমাজদার্শনিক যখনই সামাজিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন তখনই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আলোচনায় উপনীত হন।[২৩] সুতরাং বলা যাইতে পারে যে,

২২ তুলনীয়: "The Science of Politics confines itself to the State, explaining its structure and functions, marking the peculiarity of its organization as distinguished from other societies, treating of the relations of the citizens to one another and to the States and of the government to the governed, the constituion and laws and all that belongs to the domain of national life." (Strickenberg, *Introduction to the Study of Sociology*, p. 80). এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইংরাজীতে Politics, Political Science এবং Political Philosophy অনেক সময় সমার্থক পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহাদের পারস্পরিক সূক্ষ্ম পার্থক্য অগ্রাহ্য করা বাঞ্ছনীয় নহে।

২৩ অবশ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রাচীন গ্রীকযুগে যখন নগর-রাষ্ট্রের প্রচলন ছিল, তখন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হইত না। তথাকথিত জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল বলিতে সামাজিক জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝাইত। এইজন্য জীবনের আলোচনা হইতেই সমাজ-জীবনের আলোচনার উদ্ভব হইত। কিন্তু সমাজ যত ব্যাপকতর হইতে লাগিল ততই ইহাকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত এক করিয়া রাখা সম্ভব হইল না। সমাজে বহুমুখী সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল এবং নানাবিধ সংস্থা স্থাপিত হইতে লাগিল। এইজন্য পরবর্তী কালের অনেক লেখক রাষ্ট্রকে অন্যতম সামাজিক সংস্থা হিসাবে বিচার করেন এবং সমাজ-জীবনের আলোচনা হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনা আরম্ভ করেন।

যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কং সেইহেতু সমাজ সম্বন্ধে সমাজদর্শন যে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করে সেই আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজদার্শনিকের সম্মুে বহু মূল্যবান্ উপাত্ত তথা চিন্তা ও আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করে বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় আচরণ ও আদর্শ সম্বন্ধে গভীর চিন্তন স্বতঃই দার্শনি আলোচনায় পর্যবসিত হয় এবং ইহারই ফলে রাষ্ট্রদর্শন (Politica Philosophy)-এর উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যখন রাষ্ট্রদর্শনের পর্যায়ে উপনী হয়, তখন সমাজদর্শনের সহিত সম্বন্ধ নিবিড়তর হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যখন আদর্শরাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে, তখন দার্শনিক আলোচনা ইহাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। অর্থাৎ দার্শনিকের ব্যাপ ও উদার—অথচ সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ—আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গ্রহণযোগ পথের ইঙ্গিত দেয়। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, যেম রাষ্ট্রবিজ্ঞান দার্শনিক চিন্তার উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া উহাকে সাহায্য করে, সেইরূ দর্শনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তাধারার উপর আলোকপাত করিয়া উহাকে আদর্শে সন্ধান দেয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের মধ্যে আপেক্ষিক পার্থক্য আছে, অথচ উহারা গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের মধ্যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যাউক্ :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। সুতরাং ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিে রাষ্ট্র তথা শাসনব্যবস্থার আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞান হিসাবে ইহা পর্যবেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া রাষ্ট্র সম্বে সাধারণ মতবাদ গঠনে অগ্রসর হয়। সমাজদর্শন কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমিত থাকিতে পারে না—ইহা প্রকল্প ও যুক্তির সাহায্যে দার্শনিক আলোচনা পথে অগ্রসর হয়।

(খ) কেবল আলোচন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নহে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রবিজ্ঞা ও সমাজদর্শনের পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করে কিন্তু সমাজদর্শন সমাজের সকল প্রকার সংস্থা লইয়াই আলোচনা করে—সুতরা রাষ্ট্রীয় সংস্থা ইহার অন্যতম আলোচ্য বিষয়, একমাত্র আলোচ্য বিষয় নহে অতএব বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজদর্শন অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর।

৪। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (Social Philosophy and Ethics):

নীতিবিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান—মানুষের আচরণ সৎ অথবা অসৎ, উচিত অথবা অনুচিত, ভাল অথবা মন্দ, তাহা বিচার করাই নীতিবিজ্ঞানের কার্য। মানুষের আচরণ তাহার চরিত্রের প্রকাশক বা পরিচায়ক; সুতরাং নীতিবিজ্ঞান চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে। কিন্তু চরিত্র তথা আচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে উহা কোন একটি আদর্শের আলোকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং নীতিবিজ্ঞানকে চরিত্রের আদর্শ বা জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। এই আদর্শ সুনির্ধারিত হইলে উহার আলোকে কোন্ কার্য করণীয় আর কোন্ কার্য অকরণীয়, কোন্‌টি কর্তব্য আর কোন্‌টি অকর্তব্য তাহাও আমরা বুঝিতে পারি।

মানুষের নৈতিক চরিত্র সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখনই তাহার আচরণ বিচার করা হয়, অর্থাৎ উহা নৈতিক বা অনৈতিক সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়।[২৪] আবার আমরা যদি নীতির বিবর্তন[২৫] অনুধাবন করি, তাহা হইলে নীতির উপর সমাজের প্রভাব বুঝিতে পারি। নৈতিকতা-বোধের আদি যুগে উহা সামাজিক প্রথার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। আদি যুগের মানুষ বিনা বিচারে তদানীন্তন সামাজিক প্রথার অনুশাসন মানিয়া চলিত। ক্রমশঃ তাহার বিচার ও বুদ্ধিশক্তি উন্নততর হওয়ার ফলে সে সামাজিক প্রথার নৈতিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং কতকগুলিকে ভাল আর কতকগুলিকে মন্দ বলিয়া মনে করিল। সুতরাং মানুষ সামাজিক জীব হিসাবেই নৈতিকতাবোধ প্রকাশের এবং নিজের ও অপরের কার্যের নৈতিকতা বিচারের সুযোগ লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, সমাজ ও ব্যক্তি-বিশেষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই নৈতিকতাবোধের প্রগতি সম্ভবপর হইয়াছে।

---

২৪ তুলনীয়: (১) "A man of the wood is no man at all; he is potentially human, but not actually so." (*Martineau*).

(২) "We only know the individual man as a member of some society; what we call his virtues are chiefly exhibited in his fellows." (*Sidgwick*).

২৫ নৈতিকতা বোধের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য P.B. Chatterji, *Principles of Ethics*, Ap. B, Sec. XVI.

সমাজ ও ব্যক্তি-বিশেষের নীতিবোধের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নীতিবিজ্ঞানের সহিত সমাজদর্শনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৪ ও ২০) বলিয়াছি যে, সমাজদর্শনের দুইটি দিক্ আছে—একটি সমালোচনামূলক, আর একটি আদর্শমূলক। সমাজদর্শনের এই আদর্শমূলক যে বিভাগ তাহার সহিত নীতি-বিজ্ঞান আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সমাজদর্শন যখন সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্থা ইত্যাদির মূল্য বিচার করে, তখন স্বতঃই সমাজদর্শনকে নৈতিক আদর্শ বা নীতিশাস্ত্র-নির্ধারিত আদর্শের আলোকেই উহা বিচার করিতে হয়। এই দিক্ হইতে বলা যায় যে, সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করে। আবার নীতিশাস্ত্র যখন কোন আদর্শ প্রচার করে, তখন উহার সম্ভাব্যতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সমাজদর্শন বিচার করে। সমাজদর্শন উহার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে যে, সামাজিক জীব হিসাবে এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের পক্ষে আদর্শবিশেষ পালন করা কতদূর বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সমাজদর্শনও নীতিবিজ্ঞানকে সাহায্য করে। মোটকথা, নৈতিক সমস্যা ও সামাজিক সমস্যা পরস্পরের সহিত একান্তভাবে বিজড়িত; সুতরাং একদিক্ হইতে যেমন নীতিবিজ্ঞান সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ আর এক দিক্ হইতে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।[২৬] সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে নীতির উদ্ভব এবং দর্শনের মূল্যবিচারের মধ্যে নৈতিক বিচার এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে—তাই নীতিবিজ্ঞান সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আবার নৈতিক মান সুনির্ধারিত হইলে দর্শন কর্তৃক মূল্যাবধারণ সুষ্ঠু হয়—তাই সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে আপেক্ষিক পার্থক্য আছেঃ

(ক) নীতিবিজ্ঞান প্রধানতঃ ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ বিচার করে আবার সামাজিক কল্যাণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করে। অবশ্য ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর

---

২৬ তুলনীয় : (ক) "Social Philosophy might indeed be said to be a part of Ethics or Ethics might be said to be part of it." (Mackenzie, *Outlines of Social Philosophy*, p. 16).

(খ) "...in fundamental principle development in social organisation, considered in its fullness, coincides with ethical development as conceived by rationalistic system. This is the fundamental relation between sociology as a science of facts and sociology as a philosophy of values." (L. T. Hobhouse, Art. on Sociology, *Encylopaedia of Ethics & Religion*).

হইতে পৃথক্ রাখা যায় না ; তবে বলিতে পারা যায় যে, নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ চিন্তা হইতে সামাজিক কল্যাণ চিন্তার পথে অগ্রসর হয়, আর সমাজদর্শন সামাজিক কল্যাণ চিন্তা করার ফলে ব্যক্তিগত কল্যাণ চিন্তা করে।

(খ) নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সমাজদর্শনের বিষয় অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর। নীতিবিজ্ঞান কেবলমাত্র নীতি লইয়া আলোচনা করে, কিন্তু সমাজদর্শন সমগ্র সমাজের সকল প্রকার সমস্যা লইয়া আলোচনা করে।

(গ) নীতিবিজ্ঞান হইল অন্তর্মুখী—ব্যক্তি বিশেষ কিভাবে কোন কার্যের উদ্দেশ্য ও উপায় চিন্তা করিতেছে, নৈতিক বিচারের সময় তাহা ইহা আলোচনা করে। সমাজদর্শন বহির্মুখী (objective বা external) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া প্রধানতঃ অগ্রসর হয়—মানুষের যে সকল ভাব, ধারণা ও আদর্শ সমাজের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ সেইগুলি সম্বন্ধেই দার্শনিক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

বলা বাহুল্য, নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের এই আপেক্ষিক পার্থক্য উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পথে অন্তরায় নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ

আমরা সকলেই সামাজিক জীব এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনায় 'সমাজ'-পদটি প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি ; অথচ 'সমাজ'-পদের একটি সুষ্ঠু সংজ্ঞাদান ও উহার স্বরূপনির্ধারণ নিতান্ত দুরূহ এবং ইহা বহু বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে সমাজের বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন ও আদর্শ আলোচনা করিব।

১। সমাজ কাহাকে বলে? (What is Society ?) :

আমরা প্রথম অধ্যায়ে (পৃ. ২-৩) বলিয়াছি যে, সমাজ হইল কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী জনসঙ্ঘ। ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে সমাজ বলিতে সকল প্রকার সামাজিক আচরণ এবং আন্তর্ব্যক্তিক সকল প্রকার সম্বন্ধই বুঝায় এবং এই অর্থে সমাজ বলিলে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা জনসংঘ না বুঝাইয়া বরং সমগ্র মানবসমাজকেই বুঝায়। এই মানবসমাজের একটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন রূপ আছে এবং ইহা মানবের অস্তিত্বের সহিত সমব্যাপক।[১]

জীবমাত্রই কোন-না-কোন প্রকার সমাজ সংগঠন করিয়া থাকে, তবে মনুষ্যমধ্যেই সমাজের অস্তিত্ব ও প্রভাব সর্বাধিক।[২] মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাজ প্রধানতঃ সহজাত সংস্কারদ্বারা পরিচালিত হয় ; কিন্তু মনুষ্যসমাজ মনুষ্যেতর জীবের সমাজ অপেক্ষা বহুগুণ জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মনুষ্যসমাজ-

---

১ অধ্যাপক জিন্স্বার্গ ব্যাপক অর্থে সমাজ (বা society) বলিতে বুঝিয়াছেন, "the whole complex of social behaviour and the network of social relations" এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে পৃথক্ পৃথক্ মানবগোষ্ঠী বা societies—ইহা বলিতে বুঝায় 'definite collection of people'. এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন : "Society is universal and pervasive and has no definite boundary or assignable limits. A society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behaviour which mark them off from others...." (*Sociology*, pp. 40 & 43).

২ তুলনীয় : "All animals are in their degree social, but the highest is of necessity the most social." (MacIver, *The Elements of Society*.p. 1) । মনুষ্যেতর প্রাণীর সামাজিক জীবনের বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য Alverdes, *Social Behaviour of Animal Life.*

মধ্যে মনুষ্যজীবনের বিবিধ চিন্তা, বাসনা-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, ধ্যানধারণা প্রভৃতি মূর্ত হইয়া উঠে। যে-কোন স্থানের যে-কোন কালের মনুষ্যজীবন পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, সমাজ ব্যতীত মনুষ্যের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। সমাজবদ্ধতা মনুষ্যজীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া বলা হয় যে, "মানুষ সামাজিক জীব"।

মনুষ্যসমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) সমাজ মাত্রেরই একটা নিজস্ব সংগঠন (organization) ও সংহতি (unity) আছে—সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংঘ ও সংস্থা আছে। ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া সামাজিক সংগঠন ও সংহতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে।

(খ) সমাজ স্থিতিশীল সংস্থা নহে। সমাজ সদা পরিবর্তনশীল—সামাজিক সংস্থা, সংঘ তথা সামাজিক প্রথা, আদর্শ সবেরই অল্পাধিক পরিবর্তন ঘটিতেছে।

(গ) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গঠিত। সমাজের এক অংশ অপর অংশের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, ঘনিষ্ঠ বা স্থূল ভাবে, নির্ভর করিয়া থাকে। সেইজন্য সমাজের এক অংশে যদি কোন পরিবর্তন আসে, অপর অংশে তাহার প্রভাব পড়িবে।

(ঘ) সমাজমধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তি তথা সংস্থাসমূহ একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাহাদের ভাবধারা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু এই সাদৃশ্য এইরূপ নহে যে, তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না—অর্থাৎ এই সাদৃশ্য পার্থক্যহীন ঐকাত্ম্য (identity) নহে। আবার এই সাদৃশ্যের সহিত বৈসাদৃশ্যও থাকে—অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে যাহার ফলে একজনের আচরণের সহিত আর-একজনের আচরণের সম্পূর্ণ মিল থাকে না। সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন সাদৃশ্যই না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতে পারিত না; আবার যদি তাহাদের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্যই না থাকিত, তাহা হইলে একের সহিত অপরের বিরোধের কোন অবকাশ থাকিত না, এমন কি পারস্পরিক সহযোগিতারও অনেক ক্ষেত্রে মূল্য থাকিত না। এইজন্য সমাজমাত্রেই থাকে বৈচিত্র্যের পশ্চাতে ঐক্য আর ঐক্যের পশ্চাতে বৈচিত্র্য—সাদৃশ্যের সহিত বৈসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের

সহিত সাদৃশ্য। তবে যে-কোন সামাজিক সংস্থায় বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যের প্রাধান্য থাকিলেই উহা সুসংগত ও সুগঠিত হইতে পারে।

(ঙ) সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা কতকাংশ নির্ভর করে তাহাদের মনোগত বৈশিষ্ট্যের উপর। যেমন, মাতা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে তাহা নির্ভর করে উহাদের সহজাত মানসিক বৃত্তির উপর। এই দিক্ হইতে বলা যায় যে, সমাজবদ্ধতা মানুষের মনোগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক (পৃঃ ৩, পাদটীকা ২)।

(চ) সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ ও গোষ্ঠীভেদ থাকে। গোষ্ঠীগুলি সাধারণতঃ সমধর্মী ও বিপরীত ধর্মী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তাহা ছাড়া, সমাজের অগ্রগতির ফলে সামাজিক সংঘ ও সংস্থা সংখ্যাধিক্য তথা বৈচিত্র্য লাভ করে।

(ছ) সামাজিক সংস্থা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্তই ধীরে ধীরে বিভিন্ন কালের মানুষের অভিজ্ঞতার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার সেগুলির কিছু কিছু পরিবর্তনও সাধিত হইতেছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা যায় যে, মানুষ যে সামাজিক পরিবেশ তথা কৃষ্টির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহা পরিবর্তনশীল ; তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষ চেষ্টা করিলে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব হইতে কতকগুলি বিষয়ে অল্পাধিক মুক্ত হইতে পারে, আবার হয়ত' সমাজের মধ্যে পরিবর্তনও ঘটাইতে পারে। এই বিষয়ে জৈবিক প্রভাব (biological influence)-এর সহিত সামাজিক প্রভাবের পার্থক্য ; কারণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্বপুরুষগণের (বিশেষতঃ মাতাপিতার) নিকট হইতে যে সকল দৈহিক প্রলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ লাভ করে তাহা অপরিবর্তিত থাকে এবং সেগুলির প্রভাব সে পরিত্যাগ করিতে পারে না।[৩]

(জ) সমাজ ও ব্যক্তিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমাজ বা সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তি এই দুইটি কল্পনাই অবাস্তব। একটি ব্যতীত অপরটির কোন সুষ্ঠু ধারণা সম্ভব নহে। আন্তর্ব্যক্তিক সংস্থা হিসাবে সমাজমাত্রেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশক, ব্যক্তি-বিশেষের আত্মস্ফূর্তির মূর্তরূপ, তাহার কর্মক্ষেত্র, তাহার অভিজ্ঞতা ও জীবনাদর্শের নিয়ামক, তাহার

৩ La Piere &c., *Social Psychology*, pp. 49, 52.

কৃষ্টির বাহক ও ধারক। সমাজেরই লীলাভূমিতে ব্যক্তিবিশেষ তাহার অহং-এর ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে।[৪]

আমরা সংক্ষেপে সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলাম। তবে সমাজের স্বরূপ ও সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য সম্বন্ধে সকল দার্শনিক একমত নহেন—বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে সমাজের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিব।

২। সমাজের উৎপত্তি—সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Origin of Society—Theory of Social Contract):

সমাজের উৎপত্তি কিভাবে ঘটিয়াছিল সে বিষয় বিভিন্ন চিন্তানায়ক বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। আমরা এস্থলে একটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিব—সেটি হইল 'সামাজিক চুক্তি'-মতবাদ। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) ও লক্ (Locke) এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) এই মতবাদের সমর্থক।[৫]

(ক) হব্‌সের মতবাদ—

হব্‌স্ মনে করেন যে, সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়া বসবাস করিতে শিখে নাই—সুতরাং এই অবস্থা ছিল সর্বজনীন এবং সর্বকালীন সংগ্রামের অবস্থা। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক হিংস্র শ্বাপদকুলের পারস্পরিক সম্পর্কের সহিত তুলনীয়। অবশ্য এই অবস্থায় সর্বদাই যে সকলে সকলের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা নহে; তবে সর্বদাই যুদ্ধ বা বিবাদের সম্ভাবনা থাকিত—ফলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিত না, সকলেই সকলকে ভয় করিত

৪ McIver-এর ভাষায়: 'Society is revealed as the extension of individuality, the transcendence... of self-enclosedness, the nurse of youth, arena of manhood and womanhood,...the repository of the gathered customs, the summed experience of life..." (*loc. cit.* p. 3).

৫ প্লেটো তাঁহার *Republic*-এ অনুরূপ মতের প্রচলন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে টমাস্ একুইনাস্ও এইরূপ মতবাদ সমর্থন করেন।

এবং একটি সাধারণ বিপদের অবস্থা সদাসর্বদা বিরাজমান থাকিত।[৬] এই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল অত্যন্ত "জঘন্য, পৈশাচিক ও স্বল্পস্থায়ী" (nasty, brutish and short)। হব্‌স্ তাঁহার এই মতের সপক্ষে কোন তথ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম অবস্থা মোটামুটি এইরূপ অশান্তিপূর্ণ ছিল।[৭]

মানুষ চিরকাল এই অবস্থা সহ্য করিতে পারে না। তাই মানুষ পরস্পরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া স্থির করিল যে, সকলে একজন নেতার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিবে। ইহার ফলে তাহার স্বৈরাচার বা স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব হইল; কিন্তু সে নিরাপত্তা লাভ করিল। এইভাবে সমাজে শান্তি স্থাপিত হইল—পশুত্বের অবস্থা হইতে সে দেবত্বের অবস্থায় উন্নীত হইল।[৮]

(খ) জন্ লকের মতবাদ—

অভিজ্ঞতাবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক লকও এই মতবাদের সমর্থক। তবে হব্‌সের ন্যায় লক্ মনে করেন না যে, আদিম প্রাকৃতিক অবস্থা অরাজকতা-পূর্ণ বা অশান্তিময় অবস্থা ছিল, বরং লক্ এই আদিম যুগকে শান্তিপূর্ণ এক স্বর্ণযুগ বলিয়াই মনে করিতেন। আজও পৃথিবীতে যে সকল আদিম জাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ অবস্থার অসুবিধা হইল যে, কেহ অন্যায় করিলে অন্যায়কারীকে বিধিসঙ্গত উপায়ে শাস্তিদানের এবং অন্যায় নিরোধের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই মানুষ স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক জনসমাজ (political community) গঠন করিল এবং উহারা আবার শাসকসম্প্রদায় গঠন করিয়া তাহাদের হস্তে

৬ বর্ষাকালে যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও সর্বদা যে বৃষ্টি হয় তাহা নহে, তবে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা সর্বদা থাকে, সেইরূপ আদিমকালে সর্বদাই যে যুদ্ধ হইত তাহা নহে, তবে সর্বদাই উহার সম্ভাবনা থাকিত। (হব্‌স্ তাঁহার *Leviathan*-গ্রন্থে এইরূপ উপমা দিয়াছেন।)

৭ মানুষ যে মানুষকে বিশ্বাস করে না, তাহার প্রমাণ আজও বিদ্যমান; সে সর্বদা অপরের হাত হইতে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে উদ্‌গ্রীব। হব্‌স্ তাঁহার বিশ্বাসের সপক্ষে প্রশ্ন করিয়াছেন: "...when going to sleep he (civilized man) locks his doors; when even in his house, he locks his chests....Does he not thereby as much accuse mankind by his actions as I do by my words?"

৮ আদিম যুগে যে অবস্থা ছিল *homo homini lupus*, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইল *homo homini dues.*

ক্ষমতা অর্পণ করিল। হব্‌স মনে করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাজা নির্বাচন করিয়া তাঁহার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু লক্‌ বলেন যে, জনসাধারণ প্রথমতঃ জনসমাজের নিকটই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল এবং শাসক নির্বাচনে জনসমাজের স্বাধীনতা ছিল।[৯]

(গ) জাঁ জাক্‌ রুসোর মতবাদ—

রুসোও মনে করিতেন যে, সুদূর অতীতে প্রাক্‌-সামাজিক এক অবস্থা ছিল। ইহা ছিল সাম্য ও মৈত্রীর অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত জীবন যাপন করিত—পৃথিবীতে তখন যেন স্বর্গতুল্য অবস্থা বিরাজ করিত। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা চিরস্থায়ী হইল না—মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলহ-বিদ্বেষ দেখা দিল। এই অবস্থা ক্রমশঃ দুর্বিষহ হইয়া উঠিল; তখন ইহার প্রতিকারকল্পে মানুষ এক সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তির ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় তাহার স্বাধীনতা খর্ব করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু আদিম মানুষেরা চুক্তিবদ্ধভাবে কোন রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করিল না—বরং তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছা (*volonte' gènérale* বা general or collective will)-এর অধীন করিতে স্থির করিল—এই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'-র অধীনে সকলেই থাকিবে এবং ইহা 'সমষ্টিগত মঙ্গল' (common good)-এর জন্য কার্য করিবে এবং সমষ্টিগত ইচ্ছাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইবে।[১০]

সমালোচনা :

সামাজিক চুক্তি সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রধান মতবাদ আছে, আমরা তাহাদের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু ইহাদের কোনটিই পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে :—

(ক) মানুষের যে প্রাক্‌-সামাজিক কোন অবস্থা ছিল এই মতবাদের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সুতরাং এই মতবাদ কল্পনার ভিত্তির উপর স্থাপিত।

৯ Locke-প্রণীত *Of Civil Government*, Bk. II, Ch. II, S 14 দ্রষ্টব্য।

১০ রুসো ১৭৫০ ও ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত এক রচনায় তাঁহার মতবাদের সূচনা করেন; পরে তাঁহার *Social Contract* গ্রন্থে (১৭৬২ খৃঃ অব্দে) এই মতবাদকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন।

(খ) এই মতবাদ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, সমাজসৃষ্টির পূর্বে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু সে মানুষ নিশ্চয়ই কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং পরিবারমধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছিল। পরিবার হইল সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ বা 'একক'; সুতরাং আদিম মানুষ সমাজের বাহিরে বা সমাজসৃষ্টির পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এ কথার যৌক্তিকতা নাই। সুতরাং এমন কোন অবস্থা চিন্তা করা যায় না, যখন মানুষ ছিল অথচ কোন সমাজ ছিল না।

(গ) 'চুক্তি'-সম্বন্ধীয় ধারণা সমাজে বহু পরে গঠিত হইয়াছে। যেখানে স্থায়ী সমাজব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে এবং ব্যবহারশাস্ত্র বা আইনবিজ্ঞানের ধারণা কিছু পরিমাণ প্রগতিলাভ করিয়াছে, কেবলমাত্র সেইরূপ অবস্থাতেই চুক্তিসম্বন্ধীয় ধারণা জন্মলাভ করিতে পারে। সুতরাং আদিম মানবের চুক্তি-সম্বন্ধে ধারণা ছিল এবং ঐ চুক্তিকে শ্রদ্ধা করিবার মত মনোভাব ছিল, ইহা সমর্থনযোগ্য নহে।

(ঘ) তাহা ছাড়া সাধারণতঃ যে সকল চুক্তি মানবসমাজে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেগুলি ব্যক্তিগত সুখসুবিধার জন্য সম্পাদিত হয়, সেগুলির স্থায়িত্ব একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকে এবং সেগুলিকে ভঙ্গ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে এই বর্ণনা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যদিই বা কোন দিন সমাজ সংগঠনের চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এ কথা বলা যায় না যে এই চুক্তি স্বল্পস্থায়ী অথবা লঙ্ঘনযোগ্য।[১১]

মোটকথা, সমাজবিহীন অবস্থায় ব্যক্তি কখন ছিলও না, থাকিতেও পারে না। সুতরাং চুক্তির ফলে এক বিশেষ সময়ে সমাজের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, এ কথা বলা যায় না। যতদিন মানুষের বিবর্তন ঘটিয়াছে, ততদিন কোন-না-কোন প্রকারের সমাজের অস্তিত্ব আছে।

১১ তুলনীয়: "Society is indeed a contract. Subordinate contracts for objects of mere occasional interest may be dissolved at pleasure—but the State ought not to be considered as nothing better than a partnership agreement in a trade of pepper and coffee, calico or tobacco, or some other such low concern, to be taken up for a little temporary interest and to be dissolved by the fancy of the parties. It is to be looked on with other reverence; because it is not a partnership in thing subservient only to the gross animal existence of a temporary and perishable nature." (Burke, *Reflections on French Revolution*.)

সুতরাং ইহা হইতে আমরা এই ধারণা লাভ করিতে পারি যে, যেহেতু সমাজবিহীন অবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেইহেতু মানুষ সম্বন্ধে যে-কোন সুষ্ঠু দার্শনিক চিন্তা করিতে হইলে অথবা কোন পরিকল্পনা করিতে হইলে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই উহা করিতে হইবে।

৩। সমাজ-বিবর্তন (Social Evolution) :

আমরা পূর্বে সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং ইহার বৈশিষ্ট্য-সমূহ আলোচনা করিয়াছি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমাজ সদা পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহা ক্রমশঃ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ও ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে কি ভাবে সমাজের বিবর্তন ঘটিয়াছে।[১২]

'বিবর্তন'-প্রত্যয়টি আধুনিক প্রাণিবিদ্যার অন্যতম অবদান। প্রাণিজগতের বিবর্তনসম্বন্ধীয় মতবাদ যাঁহারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম হইলেন ডার্‌উইন্।

ডার্‌উইনের মতানুসারে জীবজগতে বিবর্তনের ধারা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলে—(ক) জটিল প্রাণিসমূহের আদি বিবর্তন সরল এককোষবিশিষ্ট জীব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; (খ) জীবদেহে আকস্মিকভাবে (fortuitously অথবা by chance) নানা পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং বংশপরম্পরায় একই প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হইলে উহাদের সমষ্টিগত ফলে নূতন জীবের অভ্যুদয় ঘটে; (গ) পৃথিবীতে সকল জীবের উপযুক্ত স্থান নাই—এইজন্য প্রকৃতিরাজ্যে জীবজগতে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম চলিয়াছে (ডার্‌উইন্ ইহাকে 'বাঁচিয়া থাকার জন্য যুদ্ধ' বা 'জীবনসংগ্রাম'—struggle for existence—আখ্যা দিয়াছেন); (ঘ) এই সংগ্রামে সকলেই জয়ী হইতে পারে না—যাহারা

১২ অনেক আধুনিক লেখক 'সামাজিক বিবর্তন' পদটি পছন্দ করেন না— তাঁহারা 'সামাজিক পরিবর্তন' পদটি ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে, যেভাবে প্রাণিজগতে একই ধারায় বিবর্তন চলিয়াছে, সেভাবে সামাজিক বিবর্তন চলে না। সমাজে প্রতিনিয়তই বহু বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন ঘটিতেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনসমূহ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, এই সকল পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে পৃথক পৃথক সামাজিক অবস্থা এবং জটিলতর কার্য সাধনের জন্যই এইগুলি দেখা দিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনের ক্রম অনুসারে এই সকল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; সুতরাং বিবর্তন-পদটি ব্যবহারে বিশেষ আপত্তি করা উচিত নহে। তবে প্রাণী জগতের বিবর্তনের সহিত ইহার পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে।

অধিকতর শারীরিক শক্তির অধিকারী তাহারা জয়ী হইবে অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবে এবং অন্যেরা ধীরে ধীরে পৃথিবীর বক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে—আজও মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর নিম্নস্তরে এই সকল অবলুপ্ত জীবের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে যোগ্যতমের বিবর্তন (survival of the fittest) ঘটে। যাহারা 'উপযুক্ত' প্রকৃতি তাহাদের নির্বাচন করিয়া লয়—ডারুউইন্ ইহাকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) নাম দিয়াছেন। ডারুউইনের মতবাদ প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌গণ সকলে স্বীকার করেন নাই। ডারুউইন্ যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু এই যোগ্যতার মাপকাঠি কি হইবে সে বিষয়ে মতভেদ আছে—'যোগ্যতা' সর্বদাই আপেক্ষিক, ইহা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। যোগ্যতা কখনও শারীরিক শক্তির উৎকর্ষতা বুঝায়, কখনও চতুরতা বুঝায়, কখনও সাহস বুঝায়, কখনও বা আত্মগোপনের কৌশলও বুঝায়, আবার শিকারী জীবের ক্ষেত্রে শিকারের উপযুক্ত জীবের অস্তিত্বও বুঝায়। যাহা হউক্, প্রাণি-জগতে যে অর্থে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' সংঘটিত হয়, ঠিক সেই অর্থে সামাজিক ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক নির্বাচন সংঘটিত হয় না। প্রাণিজগতে জীবনসংগ্রাম বিশেষ বিশেষ প্রাণীর নিজস্ব ব্যাপার; কিন্তু মনুষ্যসমাজে ইহা অনেকাংশে সঙ্ঘগত বা দলগত ব্যাপার। মনুষ্যসমাজে প্রতিনিয়তই যে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে তাহা নহে—তবে বিভিন্ন দলের মধ্যে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, ইহা বলা যায়।

মোট কথা, সামাজিক বিবর্তনের মূলে যে কেবল সংগ্রাম, বিরোধ বা দ্বন্দ্ব কার্য করিতেছে—সামাজিক বিবর্তন যে কেবল অযোগ্যের উৎপাটন-নীতিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে—তাহা নহে। সমাজের স্থিতি, বিবর্তন ও প্রগতি অনেকাংশে পারস্পরিক বা আন্তর্ব্যক্তিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

আবার যে সকল ক্ষেত্রে সমাজে ধ্বংসনীতি কার্য করে, তাহা যে সকল সময় প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয়, তাহা না হইতে পারে। মানুষ নিজেই এমন অনেক কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করে যাহার ফলে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (যেমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশের প্রভাবে সংঘটিত হয়।)

সামাজিক সংগ্রামে যে যোগ্যতমমাত্রই বাঁচিয়া থাকিবে এমন কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। যেমন, দুইটি জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিলে অনেক সময় যাহারা শক্তিশালী বা যোগ্যতম তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয় এবং তাহারা

অনেকে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয়; ফলে যুদ্ধের শেষে সমাজমধ্যে দুর্বল ও অক্ষম (অর্থাৎ 'অযোগ্য') ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়া যায় (পৃঃ ৫৬-৫৭)।

সমাজ সংগঠনের মূলে আছে আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ এবং উহা মূলতঃ মানসিক সম্পর্ক। মনের বিবর্তনকে সম্পূর্ণরূপে জৈব বিবর্তনের নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।[১৩]

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, জীবজগতে বিবর্তনের ধারা যেভাবে বা যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলে, সমাজে তাহা সেইভাবে এবং সেই নীতি অনুসরণ করিয়া চলে না।[১৪] সামাজিক বিবর্তনের কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এইগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

সামাজিক বিবর্তনের ধারা বর্ণনা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে, সমাজের উৎপত্তি কবে, কোথায় কিভাবে হইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই। আমরা যতদূর জানি, ব্যক্তি যতদিন আছে, সমাজও ততদিন আছে (পৃঃ ২)।

সমাজের আদিযুগে সমাজমধ্যে কার্মিক প্রভেদ ও স্তরবিভাগ ব্যাপক ছিল না বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মাত্র কয়েকটি গোষ্ঠীতে সমাজ বিভক্ত ছিল।[১৫] সুতরাং আদি সমাজ ছিল গোষ্ঠী বা স্তরের বৈচিত্র্য-বিহীন। কিন্তু যেখানেই নূতন গোষ্ঠী গঠিত হইয়াছিল, সেখানেই ব্যক্তির জীবনে

১৩ Lloyd Morgan-উক্তি লক্ষণীয়:—"While mental evolution as such is still dependent upon organic evolution, it is no longer wholly subservient to organic needs; nor is it, save to a limited extent, conditioned and controlled by natural selction."

১৪ এইজন্য ম্যাক্ আইভার (MacIver) বলিয়াছেন: "Man follows his own road, widely diverging from that of all other animals. It is his nature to do so, and he must in doing so meet the demands of the universal nature to which he belongs." (*Society*, p. 541).

১৫ সমাজ-বিবর্তনের একেবারে প্রাথমিক স্তরে কোন অর্থনীতিমূলক, কৃষ্টিমূলক, ধর্মমূলক সংস্থা বা গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে নাই। শ্রমগত বিভাগেরও বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। শিকার বা অন্য কোন উপায়ে আহার্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠী বা প্রাথমিক যৌথ সংস্থা গঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, প্রকৃতিগত পার্থক্য (যেমন, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য, যুবক ও বৃদ্ধের পার্থক্য)-এর ভিত্তিতে কিছু কিছু সামাজিক স্তর-ভেদ দেখা দিয়াছিল ইহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি।

গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল এবং গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের পক্ষে ঐ গোষ্ঠীর রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাহা ছাড়া, গোষ্ঠীমধ্যে একপ্রকারের অস্পষ্ট সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল—এইজন্য গোষ্ঠীর সব কিছুতেই সকলের অধিকার ছিল। মোটকথা, বর্তমান যুগের সমাজে যেমন নানা আদর্শ, লক্ষ্য, ধর্ম, নীতি, বৃত্তি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া বহু বৈচিত্র্যময় সংস্থা বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে, আদিম সমাজে সেরূপ কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য, প্রভেদ, স্তরবিভাগ, প্রসার ইত্যাদি যদি বর্তমান সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়, বৈচিত্র্যহীনতা, অব্যাপকতা, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদিই ছিল আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ক্রমশঃ জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল, মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইল, নূতন নূতন উপায়ে মানুষ প্রতিযোজনের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল, নূতন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সংঘ স্থাপিত হইতে লাগিল। এইভাবে নানা দিকে সমাজের সম্প্রসারণ ঘটিতে লাগিল এবং নব নব বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা দিল। পরিব্যাপ্তি বা সম্প্রসারণই হইল সামাজিক বিবর্তনের প্রধান ধর্ম।[১৬] বলা বাহুল্য, সমাজের সম্প্রসারণ সকল ক্ষেত্রে যে নিরঙ্কুশভাবে ঘটিয়াছে তাহা নহে; সকল সামাজিক গোষ্ঠীই কোন-না-কোন সময় সম্প্রসারণের পথে বাধা পাইয়াছে এবং ইহাদের অগ্রগতি মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হইয়াছে। সুতরাং কোন সরলরেখার পথে যে সামাজিক বিবর্তন চলিয়াছে তাহা নহে। আবার এই সম্প্রসারণ বা পরিব্যাপ্তি যে সকল সময় বা সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে হইয়াছে তাহা নহে—কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা হঠাৎ বা আকস্মিকভাবেও সংঘটিত হইয়াছে।

সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি যে, (ক) আদিম সমাজ প্রথমে কতকগুলি অল্পাধিক নির্দিষ্ট রীতিনীতি বা প্রথার অধীন ছিল। এই সকল প্রথা বা রীতিগুলির মধ্যে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টিমূলক প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য ছিল না; (খ) ইহার পরবর্তী অবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবারগত, ধর্মীয় ইত্যাদি সংস্থা দেখা দিল; এবং (গ) তাহারও পরে স্ব স্ব

১৬ তুলনীয়: "Diffusion should be regarded as one of the most important factors in social evolution." (MacIver *op. cit.*, p. 596).

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠান—যথা, বিদ্যায়তন, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক সংস্থা, যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বিবর্তন ঘটিল। সামাজিক ধারাকে যদি এই তিনটি প্রধান ক্রম বা পর্যায়ে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, প্রথম পর্যায়ে যাহা অব্যক্ত ও অব্যাপ্ত ছিল, তাহা ধীরে ধীরে ব্যক্ত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি যে, যদিও বিভিন্ন সংস্থা রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তথাপি তাহারা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক—অর্থাৎ গোষ্ঠীর সকল সংস্থা গোষ্ঠীরই কতকগুলি আচার-ব্যবহারের প্রকাশক এবং ব্যক্তি-বিশেষের সেগুলি লঙ্ঘন করিবার স্বাধীনতা নাই। তৃতীয় পর্যায়ে দেখি যে, সংস্থার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দুই বহুল—সেগুলি আর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নহে এবং একই প্রকার রীতিনীতির বা প্রথার পরিচায়ক নহে। সুতরাং এই পর্যায়ে আসিয়া সামাজিক সংস্থাগুলি মূলক স্বাধীনতা পাইয়াছে বা পাইবার আশা রাখে, এ কথা বলা চলে। এইগুলির মাধ্যমে বহু মনের বহু বৈচিত্র্যময় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। (পৃঃ ২৪-৬৫ এবং ৫ম অধ্যায়, ৩য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যদিও বৃহৎ মানবসমাজের বিবর্তনের সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা নাই, তাহা হইলেও ইহার মূলসূত্রগুলি নিরূপণ করিলে আমরা সমাজের স্তরভেদ, শ্রেণীভেদ এবং সমাজের গতিপথ অনেকাংশে বুঝিতে পারি। অবশ্য কোন সমাজের বিবর্তন যে দিকে হইতেছে বা এ পর্যন্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যে সকল সময় যাইবে বা সামাজিক বিবর্তনের পূর্ববর্তী পর্যায় আলোচনা করিলেই যে পরবর্তী পর্যায় সঠিকভাবে অনুমান করা যাইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই -নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সমাজ কোন নূতন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নূতন পথেও চলিতে পারে।

৪। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা (Explanation of the nature of Society from different standpoints) :

(ক) যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ (Society from the mechanistic standpoint) :

পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে সকল প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সাহায্যে যান্ত্রিকতাবাদীরা সামাজিক সকল ঘটনা ব্যাখ্যা

করিবার প্রচেষ্টা করেন।[১৭] ইঁহারা মনে করেন যে, সামাজিক ঘটনাপুঞ্জের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নাই—এইগুলি অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনারই তুল্য। যেমন সৌরজগতে গ্রহগুলি পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে একটি বিশেষ পথ রচনা করিয়া চলে, সেইরূপ সামাজিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যক্তি এইভাবে চলিতে থাকে। সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যাকালে অতিপ্রাকৃত কারণের উল্লেখ করা উচিত নহে, আবার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদিও কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

জড়জগতে বিবর্তনের ধারা যে পথে চলে, সামাজিক বিবর্তনও সেই একই পন্থা অনুসরণ করিয়া চলে। প্রকৃতির সকল বিভাগেই যেমন দেখা যায় যে, সব কিছু পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেইরূপ সামাজিক জীবনের সকল ঘটনাই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়[১৮]—সমাজের মধ্যে যত কিছু সংস্কার সৃষ্টি হইয়াছে, মানুষ যাহা কিছু আবিষ্কার করিয়াছে, মানুষ যে সকল রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে—সবই সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির পীড়নে এবং নিছক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তাহা ছাড়া, জড়প্রকৃতিতে যেমন জড়শক্তির সমতা রক্ষিত হয়, সেইরূপ সামাজিক ক্ষেত্রেও শক্তির সমতা রক্ষিত হয়; সুতরাং একদিকে ঐ শক্তির ব্যয় হইলে অপর দিকে ব্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকে না (যেমন, যুদ্ধবিগ্রহে যদি জনশক্তির অপচয় হয়, তাহা হইলে সমাজের অন্য ক্ষেত্রে ঐ শক্তি ব্যয়িত হইতে পারে না)।

সমালোচনা :

যান্ত্রিকতাবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সজীব, সচঞ্চল, মনোবিশিষ্ট মানুষ লইয়া যে সমাজ গঠিত, সেই সমাজকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না। সমাজ যে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাহা নহে; কিন্তু সমাজের যে একটা জৈবিক ও মানসিক দিক্ আছে তাহা অগ্রাহ্য করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই মত গ্রহণ করিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান থাকে না এবং ব্যক্তি-বিশেষকে সম্পূর্ণরূপে

১৭ এইজন্য এই প্রকার সমাজবিদ্যাকে অনেক সময় 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' (Social Physics) বলা হয়। ইহার সমর্থকেরা পদার্থবিদ্যার প্রত্যয় ব্যবহার করা পছন্দ করেন ; যথা, "Man is the molecule of society". "Social Life is an energistic phenomenon."

১৮ যে সকল লেখক ভৌগোলিক পরিবেশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়কে Geographical School বলে।

সমাজের অধীন করিয়া ফেলা হয়। অপর পক্ষে, ব্যক্তি-বিশেষ যে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহার মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করিতে পারে সে সম্ভাবনাও অস্বীকার করা হয়।

(খ) জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ (Society from the biological Standpoint):

একদল লেখক জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজের স্বরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন।

জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজকে একটি প্রাণময় সত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কল্পনা করা হয় যে, ব্যক্তির যেমন প্রাণ আছে, সমাজেরও সেইরূপ প্রাণ আছে—সামাজিক ঘটনাসমূহ প্রাণেরই প্রকাশ। সমাজের সংগঠন জীব-দেহেরই সংগঠনের অনুরূপ; জীবদেহে যেমন ধীরগতিতে প্রচয় বা পরিবর্তন ঘটে, সমাজদেহেও সেইরূপ হয়, আবার জীবজগতে যেমন বিবর্তনের ফলে নূতন নূতন জীবের আবির্ভাব ঘটে, সমাজজীবনেও সেইরূপ বিবর্তনের গতি আছে এবং উহার ফলে নূতন নূতন সামাজিক সংস্থা, সংঘ ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। জীবজগৎ যে নিয়মদ্বারা পরিচালিত হয়, সমাজও সেই নিয়মদ্বারা পরিচালিত হয়, কারণ সমাজও প্রাণেরই প্রকাশ।[১৯]

এখন সমাজজীবনের সহিত প্রাণিদেহের তুলনা করা যাউক্। সমাজের সহিত জীবদেহের গঠনবৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট মিল আছে। প্রাণিজীবনের একটি প্রধান গঠনবৈশিষ্ট্য হইল যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া উহারা মিলিতভাবে একটি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। ঐ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহারা অসংখ্য কোষের সমন্বয়। এই কোষগুলির আবার প্রত্যেকেরই নিজস্ব কার্যবৈশিষ্ট্য আছে। এইভাবে দেখা যায় যে, ইহারা ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর এইরূপ পর্যায়ক্রমে সাজান আছে—উহাদের যেমন একদিকে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য আছে, সেইরূপ অপরদিকে উহারা সমবেতভাবে সমগ্রদেহের জন্য কার্য করে।

সমাজদেহেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সমাজও অসংখ্য ব্যক্তি লইয়া গঠিত। ঐ সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে বিবিধ সংস্থা গঠিত হয় এবং ইহাদের লইয়া আবার

১৯ স্পেন্সার, হিকেন্, লিলিয়েনফেল্ড্ ইত্যাদি এই মতের সমর্থক।

সমাজদেহ গঠিত হয়। ব্যক্তি হইল সমাজজীবনের 'একক' এবং ব্যক্তি জীবদেহের কোষের সহিত তুলনীয়। সেইরূপ বিবিধ সামাজিক সংস্থাগুলি প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত তুলনীয়।[২০]

প্রাণিদেহ মাত্রেরই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে—উহা হইল জীবদেহের সংরক্ষণ। বিভিন্ন কার্যের মধ্য দিয়া প্রাণি-বিশেষ এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। সমাজজীবনের পক্ষেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। সমাজও উহার বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে একটি সাধারণ লক্ষ্য পালনের চেষ্টা করে এবং উহা হইল সাধারণভাবে সমাজজীবনের ধারা অব্যাহত বা অক্ষুন্ন রাখা।

প্রাণিদেহের বিভিন্ন কোষ এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে। এই কারণে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুস্থ থাকিলে সমগ্র জীবদেহই সুস্থ থাকে, আবার জীবদেহ সুস্থ থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুস্থ থাকে। অপরপক্ষে, যে-কোন অঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িলে সমগ্র দেহের সুস্থতা ব্যাহত হয় এবং সমগ্র দেহ অসুস্থ হইলে দেহস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে পারে না।[২১] তথাকথিত সমাজ-দেহ সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। সমাজের প্রতিটি অংশই কোন না কোন ভাবে অপর অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির এবং সংঘ ও সংস্থাগুলির উন্নতি বা অবনতির ফলে সমগ্র সমাজের উন্নতি বা অবনতি ঘটে এবং সমগ্র সমাজের উন্নতি বা অবনতি ঘটিলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

২০ জৈব মতবাদ (organismic theory) ব্যাখ্যা করিয়া MacIver ও Page বলেন: "This view......conceives society as a biological system, a greater organism, alike in its structure and its functions, exhibiting the same kind of unity as the individual organism and subject to similar laws of development, maturation and decline. Society's cells are individual persons, its organs and systems are associations and institutions." (*Society* p 43). যাঁহারা এই মতবাদের অনুভক্ত, তাঁহারা জীবদেহের শ্বাসযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সকল অংশেরই এক একটি সমতুল্য অংশ সমাজদেহে 'আবিষ্কার' করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণীর জীবনেতিহাস যেমন শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য এই তিনটি স্তরে বিভক্ত, সেইরূপ সমাজেরও অনুরূপ তিনটি স্তর আছে।

২১ ঈশপের গল্পমালা বা কথামালার একটি গল্প উল্লেখযোগ্য। একবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (যথা, মুখ, হস্ত, পদ ইত্যাদি) যুক্তি করিল যে, তাহারা পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করে অথচ উদর উহা দ্বারা উপকৃত হয়। এই মনে করিয়া তাহারা আহার সংগ্রহ বন্ধ রাখিল এবং তাহার ফলে সমস্ত দেহ দুর্বল হইয়া পড়িল এবং উহার প্রতিক্রিয়া আবার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দেখা দিল, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকে আবার দুর্বল হইয়া পড়িল।

সমূহের উন্নতি বা অবনতি ঘটে। মোটকথা, জীবদেহে বিভিন্ন অংশের মিথস্ক্রিয়তার অনুরূপ মিথস্ক্রিয়তা দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে দেখা যায় বলিয়া সামাজিক সম্বন্ধকেও জৈব সম্বন্ধ বলা যায়।

আবার জীবদেহে যেমন প্রচয় বা পরিবর্ধন (growth বা development) আছে, সমাজজীবনেও অনুরূপ পরিবর্ধন আছে। তাহা ছাড়া, প্রাণীর যেমন বিবর্তন (evolution) ঘটিয়া থাকে, সমাজেরও সেইরূপ বিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

সমালোচনা :

সমাজের সহিত জীবদেহের অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও সমাজকে সম্পূর্ণরূপে 'জীব' বা 'প্রাণী' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য আছে :

(ক) ব্যক্তিকে সমাজজীবনের 'কোষ'-রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রাণিদেহের কোষসমূহের এক একটি অঙ্গে এক একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কার্য আছে। কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তিগণের সমাজ মধ্যে মাত্র একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ও কার্য নাই—একই ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার 'অংশ' বা 'কোষ'-রূপে বিভিন্ন কার্য সাধন করিয়া থাকে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়—যিনি গৃহে গৃহকর্তা, তিনি হয়ত' তাঁহার কর্মস্থলে কর্মচারী, দোকানে ক্রেতা, বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী, ধর্মমন্দিরে ঈশ্বরানুরক্ত ভক্ত ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক ক্ষেত্রে বিবিধ সংস্থা ও ব্যক্তি-বিশেষের স্থান অবস্থার তারতম্য অনুসারে পরিবর্তিত হইতে পারে। যেমন, শান্তির সময় যাঁহারা অধ্যাপনার কার্যে বা ব্যবসায় কার্যে লিপ্ত থাকেন, যুদ্ধের সময় আবার তাঁহারাই রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন। কিন্তু জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে না।

(গ) প্রাণীর জীবনরক্ষার জন্য যে অর্থে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, পরিপাককার্য, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কার্য সাধিত হয় এবং তাহার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র থাকে, সেই অর্থে সমাজদেহ-মধ্যে অনুরূপ কোন কার্য সাধিত হয় না বা তজ্জন্য কোন পৃথক্ যন্ত্রও থাকে না। আবার অপরপক্ষে দেখা যায় যে, মনের প্রকাশের জন্য দেহযন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজমনের ঐরূপ কোন দেহের প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) জীবদেহে যেমন পরিবর্তন সাধিত হইতেছে সমাজদেহেও সেইরূপ সর্বদা পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। তবে জীবদেহের কতকগুলি পরিবর্তন ভিতর হইতে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে আসে, কিন্তু সমাজজীবনে ঐরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতে প্রাণিমাত্রেরই মধ্যে কতকগুলি সুপ্ত বৈশিষ্ট্য থাকে এবং কালের গতিতে ধীরে ধীরে ঐগুলি বিকশিত হয়; ঐ গুলির মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত থাকে, ঠিক সেই অনুসারেই ঐ সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ লাভ করে। যেমন, উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে একটি বটবৃক্ষের বীজ হইতে ঠিক একটি বটবৃক্ষ জন্মলাভ করিবে এবং উহা ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া মহীরুহে পরিণত হইবে। সেইরূপ উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে একটি মানবশিশু ধীরে ধীরে বড় হইয়া শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পর্যায় অতিক্রম করিয়া বার্ধক্যে উপনীত হইবে। কিন্তু সমাজজীবনে ঐরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে এবং পর্যায়ক্রমে কোন পরিবর্তন আসে না—তাই সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সকল সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন সাধারণ নিয়মের কথা বলা চলে না।

(ঙ) প্রাণিজগতে বিবর্তন যেভাবে সংগঠিত হয়, ঠিক সেইভাবে সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হয় না। জীবের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিয়া ডারউইন্ বলেন যে, প্রাণিজগতে সর্বদাই সংগ্রাম চলিতেছে এবং এই জীবনসংগ্রামে যাহারা যোগ্যতম অর্থাৎ অধিক দৈহিক শক্তিসম্পন্ন তাহাদেরই প্রকৃতি নির্বাচন করিয়া লয় এবং যাহারা দুর্বল তাহারা পরাজিত হইয়া পৃথিবীর বক্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে; অর্থাৎ বিবর্তন অর্থে বুঝিতে হইবে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। এইরূপ পদ্ধতিতে কিন্তু সমাজবিবর্তন সংঘটিত হয় না। সমাজে সমাজে যে সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না তাহা নহে, কিন্তু সাধারণতঃ এই সংঘর্ষের ফলে একটি সমাজ অপরটির নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া অবলুপ্ত হইয়া যায় না। অধিকাংশ সময়ই সমাজে সমাজে সংঘর্ষের অর্থ হইল পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (যেমন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এক সমাজের সহিত অপর সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা)। এইরূপ মিথষ্ক্রিয়ার ফলে দুইটি সমাজেরই সংগঠন ও সংহতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়।

(ছ) আবার জীবজগতে নূতন জাতির বিবর্তন সম্ভব হইতে পারে যখন পূর্বপুরুষগণের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তন উভয় পুরুষের মধ্যে সংক্রামিত বা ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। কারণ যে অর্থে প্রাণিদেহ

হইতে নূতন বংশধরের জন্ম হয়, সেই অর্থে এক সমাজ হইতে আর এক সমাজের জন্ম হয় না।[২২]

(চ) সমাজের মধ্যে যে অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অপ্রতিজনে অক্ষম ব্যক্তি নাই, তাহা নহে; কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাজে যেমন সাধারণতঃ অযোগ্য, অক্ষম প্রভৃতির স্থান নাই এবং যোগ্যতমের বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে অযোগ্যদের ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া যাইতে হয়, মনুষ্য সমাজে (অন্ততঃ যে অংশ সুসভ্য ও আলোকপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করে সেই অংশে) দুর্বল, অযোগ্য, অশক্ত, বা অক্ষমদের বিনাশের কোন চেষ্টা করা হয় না, পরন্তু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে নানাভাবে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করা হয়। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগরিত হওয়ার ফলে মনুষ্যসমাজে অযোগ্য, অশক্তেরা নির্মমভাবে নিধনপ্রাপ্ত হয় না।[২৩]

সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও সমাজকে সম্পূর্ণরূপে প্রাণি-দেহের সমতুল্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। এ কথা সত্য যে, প্রাণিদেহের ন্যায় সমাজমধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা মিথষ্ক্রিয়তা দেখা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজকে এক প্রকার জীব বা প্রাণী বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রাণিবিদ্যার নিয়মগুলি সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অনেক সময় প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সে জন্য সমাজবিদ্যাকে প্রাণিবিদ্যার নামান্তর বলিয়া গণ্য করা যুক্ত হইবে না। সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যাকালে প্রাণিবিদ্যার প্রত্যয়গুলির প্রয়োজন থাকিলেও উহারা সমাজবিদ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।[২৪]

---

২২ তুলনীয়: "The succession of individuals, one generation constantly taking the place of its predecessor, is a necessary condition of heredity and variation. But societies do not die and leave offspring to succeed them." (Urwick, *Philosophy of Social Progress*, p. 52).

২৩ মনুষ্যসমাজে নীতিবোধ জাগরণের উল্লেখ করিয়া হাক্সলি (Huxley) বলিয়াছেন: "Its influence is directed, not so much to the survival of the fittest, as to the fitting of as many as possible to survive. It repudiates the gladiatorial theory of existence." (*Evolution and Ethics*, p. 82).

২৪ এইজন্য টার্ডে (Tarde) মন্তব্য করিয়াছেন: "If it is useful to sociologize biology, it is harmful to biologize sociology."

(গ) মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ (Society from the psychological standpoint) :

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে : (ক) সমাজ কি স্বরূপতঃ মানসিক সত্তাবিশিষ্ট ? (খ) যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমাজ-মনের বৈশিষ্ট্য কি কি ? (গ) সমাজ-মন কি ব্যক্তি-মন হইতে পৃথক্ এবং ইহার কি অতি-ব্যক্তিক কোন সত্তা আছে ?

সমাজ সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে দেখিলাম যে সমাজকে নিছক যন্ত্র বলিয়া অথবা প্রাণিবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। সমাজ যেহেতু মনোবিশিষ্ট মানুষ লইয়া গঠিত, সেই হেতু ইহার একটা মানসিক দিক্ আছে বলা যায় এবং কেবল 'জড়' বা 'প্রাণ' এইরূপ কোন প্রত্যয় সামাজিক জীবনের ব্যাখ্যার জন্য পর্যাপ্ত নহে। সমাজ মাত্রই আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ (interpersonal relationship)-এর ভিত্তিতে গঠিত —সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তি-মনের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি-আবেগ সবকিছু রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং সমাজস্থ ব্যক্তি-মনের বৈশিষ্ট্য-সমূহ সমগ্রভাবে সমাজের মানসিক রূপ গড়িয়া তোলে। অর্থাৎ যেহেতু ব্যক্তি ব্যতীত সমাজের অস্তিত্ব নাই এবং যেহেতু ব্যক্তিমাত্রই মনোবিশিষ্ট প্রাণী, সেই হেতু বলা যায় যে, সমাজেরও একটি মানসিক রূপ (mental as pelt) আছে।[২৫]

এখন প্রশ্ন উঠে : সমাজের এই 'মানসিক রূপ' থাকার ফলে কি কোন পৃথক্ সমাজ-মন গঠিত হয় ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি কি ?

একদল লেখক সমাজ-মনের পৃথক্ এবং অতিব্যক্তিক (separate and super-individual) অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ইঁহারা মনে করেন যে, বিভিন্ন ব্যক্তির মনের মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে সমাজ-মন গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে এরূপ সংহতি ও ঐক্যের সৃষ্টি হয় যে, সেজন্য সমাজস্থ ব্যক্তিগণ একই ভাবে চিন্তা করে, একই অনুভূতি বোধ

২৫ জিন্‌সবার্গ 'সমাজ-মন'—প্রত্যয়টি পছন্দ না করিলেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন : "From the controversies between the opposed schools we do learn at any rate this much, that individuals are intrinsically and essentially related to one another, and that society is not an 'artificial product' . . . . It is also easy to see that relations that hold them together are essentially *mental* in character, dependent on ideas, feelings, desires, sentiments, purposes." (*The Psychology of Society*, p. 47).

করে এবং একই লক্ষ্যকে পাইবার উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া থাকে।[২৬] অবশ্য সঙ্ঘ যত ক্ষুদ্র হয়, এই সংহতি ও ঐক্য দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে। সমাজমনের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুভূতির প্রাধান্য থাকে; কিন্তু বিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ দেখা দেয় সামাজিক সচেতনতা বা আত্মচেতনার অবস্থা, সামাজিক স্মৃতি ও সামাজিক আদর্শবোধ।

সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদানপ্রদান ও আলাপ-আলোচনার ফলে সমাজ-মধ্যে আত্মচেতনার একটি ভাব রূপ পরিগ্রহ করে এবং এইভাবে সুদৃঢ় জনমতও গঠিত হয়। ব্যক্তি-মন যেমন কেবলমাত্র বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং স্মৃতি ও কল্পনার সাহায্যে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত বর্তমানকে গ্রথিত করে, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ স্মৃতির সাহায্যে অতীতের সহিত বর্তমানের এবং কল্পনার সাহায্যে বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংযোগ স্থাপিত হয়—জাতীয় বা সামাজিক স্মৃতি থাকার ফলেই সামাজিক জীবনের ঐতিহ্য (tradition) স্থাপিত হয়। সমাজ যত পুরাতন হয়, সামাজিক স্মৃতির সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয়তাও তত বৃদ্ধি পায়। আবার চিন্তা ও আলোচনার প্রসার লাভ এবং সামাজিক স্মৃতির ব্যাপকতালাভের ফলে কতকগুলি আদর্শ গঠিত হয় ও এইগুলি সমাজ-মনকে স্থায়িরূপ দান করিয়া থাকে। ইহার ফলে কতকগুলি অনুভূতির সৃষ্টি হয়;[২৭] যেমন, স্বাদেশিকতার আদর্শবোধের

---

২৬ তুলনীয়: "The social mind is the phenomenon of many individual minds in interaction, so playing upon one another that they simultaneously feel the same sensation or emotion, arrive at one judgment and perhaps act in concert." (Giddings, *Principles of Sociology*, p. 134).

২৭ তুলনীয়: "A more perfect integration of the elements of social consciousness and a complex organisation of the social mind is effected deliberatively, through rational discussion. The essential steps of the process are, the genesis of *social consciousness*, the evolution of *social memory*, and the evolution of *social values*.......In its self-consciousness a community has a living bond of union......But even self-consciousness in any given manifestation is only a momentary bond......It acquires continuity through the development of another phase of the social mind, namely, the social memory......In combinations of the intellectual products with desires, therefore, there is a final integration of the elements and products of the social mind.....They are social values......(Giddings, *Ibid.*, pp. 137, 140, 147).

জন্য জাতীয় তথা সামাজিক জীবনে বা সমাজ মনে গৌরব, অহঙ্কার ইত্যাদি অনুভূতি দেখা দেয়।[২৮]

সমালোচনা :

যে সকল চিন্তানায়ক সমাজকে মনোবিশিষ্ট সত্তারূপে কল্পনা করেন আমরা তাহাদের মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন রুশো, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক, ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক, ডুর্কহাইম্, গিডিংস প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ। অবশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহারা ইহাদের মতবাদ গঠন করিয়াছেন এবং ইহাদের মতবাদের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্যও আছে।

এই মতবাদের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা সমাজের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য সত্ত্বেও যে ঐক্য আছে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা ছাড়া, সমাজ যে কৃত্রিম জনসমাবেশ মাত্র নহে, যান্ত্রিকতাবাদ ও জৈববাদের প্রত্যয় যে সমাজের ব্যাখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে—সেই বিষয়েও এই মতবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত এবং এই সম্পর্ক হইল প্রধানতঃ মনের সম্পর্ক, সুতরাং সমাজের আলোচনার পক্ষে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য।

কিন্তু প্রশ্ন হইল সমাজ-মনের পৃথক্ কোন সত্তা বা অস্তিত্ব আছে কি না এবং এই সমাজ মন ব্যক্তি-মন অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বা উচ্চতর সত্তাসম্পন্ন কি না। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিবার ত্রুটি হইল যে, এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে সমাজ-মনের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ইহার বিরুদ্ধে বিবিধ আপত্তি উঠিতে পারে :

(ক) 'সমাজ-মন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করিলে এই ধারণা জন্মাইতে পারে যে, ব্যক্তির যেমন মন আছে, সমাজেরও ঠিক সেইরূপ মন আছে। কিন্তু ব্যক্তির মানসিক জীবনে যে ঐক্য আছে, সমাজ জীবনেও ঠিক ঐরূপ ঐক্য নাই। সমাজ মনের সমর্থকেরা দাবী করেন যে, সমাজ-মনের প্রভাবে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ একই ভাবে চিন্তা করে, একই অনুভূতিবোধ করে বা একই ইচ্ছাদ্বারা

[২৮] কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাদেশিকতাবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট গৌরববোধকে রূপ দিয়া বলিয়াছেন :

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

প্রণোদিত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু জনমনের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার মধ্যে এইরূপ ঐক্য সকল সময় দেখা যায় না। সমাজের মধ্যে এত বিভিন্ন লোক থাকে, তাহাদের মানসিক ভাবধারা এত পৃথক্ হয় যে, অনেক সময়ই তাহাদের মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা বৈপরীত্য বা বিরোধ দেখা যায়।

(খ) সমাজ-মনের উপর যদি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে সমাজের অঙ্গরূপে কল্পনা করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যক্তি-বিশেষের যে নিজস্ব মূল্য আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। অপরপক্ষে সমাজ সংহতিপূর্ণ একপ্রকার জনসমষ্টি —ব্যক্তিরূপে তাহার পৃথক্ কোন মূল্য থাকিতে পারে না।[২৯]

(গ) সমাজ-মনকে যদি ব্যক্তিমন হইতে উচ্চ পর্যায়ের বা শ্রেয়ঃ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে সমাজকে যেন দেবতার পদে উন্নীত করা হয় এবং যাহা সামাজিক মত বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ইহার ফলে সমাজের কর্ণধাররূপে যাঁহারা সমাজের মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা অকারণ স্বেচ্ছাচারী বা অতিরিক্ত কঠোর হইয়া উঠিতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষের যে একটা পৃথক্ ও নিজস্ব মত থাকিতে পারে এবং উহা যে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এবং সমর্থনীয় হইতে পারে, সে কথা সমাজের কর্ণধারগণ ভাবিয়া দেখেন না। ইহার ফলে সমাজের প্রগতির পথ কতকটা রুদ্ধ হইতে পারে।[৩০]

(ঘ) তাহা ছাড়া, সমাজ-মনের প্রকাশ কি ভাবে ঘটে এবং উহাকে কি ভাবে বুঝা যায়, সে বিষয় যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ সমষ্টিগত ইচ্ছা বা সমষ্টিগত চেতনা (collective will বা collective

---

২৯ তুলনীয়: "There is no virtue in mere collectivity or even wholeness. All values are values for persons......" (Ginsberg, *Psychology of Society*, p. 48).

৩০ F. J. Wright-এর উক্তি লক্ষণীয়: "It is the fundamental error of all theories of 'group' or 'social' or 'national' minds to neglect this fact, the fact that men and women are individuals, that Society and Community exist for the development of individual personality, happiness for the group must mean the happiness of individuals, and this is not attained when the individual personality is sunk in an amorphous indistinct group 'personality' which takes no account of individuals, which, indeed, destroys the foundation of society, for it leads to the glorification and deification of the group and substitutes a false god for the personality of the individual." (*Elements of Sociology*, p. 96).

consciousness) পদটি ব্যবহার করিয়াছেন।[৩১] কিন্তু কোন ইচ্ছা যে সমষ্টিগত তাহা কিরূপে জানা যাইবে? কেহ কেহ (যথা, রুসো) মনে করেন যে, রাষ্ট্রের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মাধ্যমে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই মত পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অভিমত মাত্রই যে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে এমন কোন অর্থ নাই—বরং অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অভিমত জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে পারেন। কেহ কেহ (যথা, ম্যাকেঞ্জি) মনে করেন যে, কোন সমাজ বা কোন সঙ্ঘ মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও বিচার-বিবেচনার দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়, তাহাই সমষ্টিগত ইচ্ছা—এক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের বলে কোন কিছু নির্ধারিত না হইয়া যাহা সমষ্টির পক্ষে মঙ্গলজনক তাহাই গৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে সংখ্যালঘুর (এমন কি বিশেষ কয়েক জনের অভিমতও) গৃহীত হইতে পারে।[৩২] সমাজের কল্যাণের পক্ষে ইহা আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনার দ্বারা সুযুক্তির ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকল সময় সম্ভবপর নয়—সমাজের আয়তন যত বৃদ্ধি পায়, ততই এই অসুবিধা দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, যেখানে ইহা সম্ভবপর হয়, সেখানেও ইহাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বা কার্যে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা কতদূর 'সাধারণ' (common বা general) সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। সুতরাং

৩১ 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' (collective will) পদটি রুসো তাঁহার রচনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। (অবশ্য তাঁহার পূর্বে স্পিনোজা 'সাধারণ ইচ্ছা', সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল—common will, common good—এই দুই প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।) রুসো মনে করিতেন যে সমষ্টিগত ইচ্ছার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। ইহা হইল একটি অতি ব্যক্তিক (super-individual) সত্তা এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য থাকে তাহা এখানে অবলুপ্ত হইয়া যায়। হেগেলীয় দর্শনে এই মতের কতকাংশ পুনরাবৃত্তি ঘটে। মনোবিৎ ভুণ্ট (Wundt) 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র অস্তিত্বে বিশ্বাসী—তবে তিনি 'ব্যক্তিগত মন' হইতে পৃথক সমষ্টিগত ইচ্ছার কথা বলেন না। মনোবিৎ ম্যাকডুগাল সঙ্ঘ মন (Group mind) প্রত্যয়টি ব্যবহার করিয়াছেন। নব্য হেগেলীয়-গণের মধ্যে বোসাঙ্কে (Bosanquet) এই মতকে নবরূপ দান করিয়াছেন—তিনি বলেন যে, ইহা এক আদর্শরূপে ব্যক্তিমনে বিরাজমান এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ইহার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রই সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশক রুসোর এই অভিমত পরবর্তী কালের অনেক লেখক পরিত্যাগ করেন। ক্রমশঃ সমষ্টিগত ইচ্ছা' এই প্রত্যয়টির বিরুদ্ধেই অনেকে অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অতি-ব্যক্তিক ইচ্ছা (over-individual will)-রূপে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলা যায়।

৩২ Mackenzie, *Outlines of Social Philosophy*, p 54

বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তি-মনকে অতিক্রম করিয়া অতি-ব্যক্তিক কোন সমষ্টিগত ইচ্ছার (যাহা সমাজমনের পরিচায়ক-রূপে বিবেচিত হইতে পারে) পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। তাহা ছাড়া, আমরা ব্যক্তিগত জীবনে দেখিতে পাই যে, কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়া করিবার পূর্বে আমাদের বিচার বিবেচনা বা উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে চিন্তনের প্রয়োজন হয়। যদি অতি-ব্যক্তিক কোন সমাজ-মনের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ মনের পক্ষে এইরূপ পৃথক্ বিচার-বিবেচনার সম্ভাবনা কোথায়?

এইজন্য যদিও সমাজের একটি মানস রূপ (mental side) আছে, তথাপি তাহা ব্যক্তি-মন হইতে পৃথক্ বা অতি-ব্যক্তিক কোন স্বাধীন সত্তা নহে। সমাজ-মন ও ব্যক্তি-মন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং সামাজিক অবস্থার তথা ব্যক্তি-মনের তারতম্য অনুসারে কোথাও সমাজ-মন অস্পষ্ট, অপরিস্ফুট বা অব্যক্ত থাকিয়া যায়, কোথাও বা উহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রূপ ধারণ করে—কিন্তু কোথাও ব্যক্তি-মন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথগ্‌ভাবে উহার ঊর্ধ্বে বিরাজ করে না বা বিভিন্ন ব্যক্তি-মনের বৈশিষ্ট্যসমূহের "গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক" (G. C. M.) ভাবে অবস্থান করে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পৃথক্ অতি-ব্যক্তিক সমাজ-মনের অস্তিত্বের কল্পনাকে সমালোচনা করিলেও সামাজিক ঘটনা ও সংস্থার মানসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মিথস্ক্রিয়তা, ও সহযোগিতা এবং ব্যক্তি-মনের উপর পরিবেশের প্রভাব আমরা অস্বীকার করি না।[৩৩]

---

৩৩ এইজন্য G.D.H. Cole মন্তব্য করিয়াছেন :"...though neither Society nor the various associations which it includes are 'persons', they approach far more nearly to being persons than to being either mechanical or organic." (*Social Theory*, p. 14).

সেইরূপ জিন্‌স্‌বার্গও সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন : "Men do indeed share in a common life and contribute to a collective achievement, yet nothing but confusion can result from hypostatizing this life and ascribing to it a reality, over and above the reality of the lives which individuals live in relation with one another." (Ginsberg, *Psychology of Society*, p. 94).

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানসমূহে ব্যবহৃত সকল প্রত্যয়গুলি আজও সুনির্ধারিত হয় নাই এবং সেই কারণ অন্যান্য বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয় কিছু কিছু ইহাতে ব্যবহার করিতে হয়, অথচ তাহাদের মূল অর্থ পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে না। মনোবিদ্যার 'মন'-পদটি যে ঐক্য ও সংহতি নির্দেশ করে, সমাজবিদ্যায় ঠিক তাহা করে না। হব্‌হাউস্ (Hobhouse) এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন : "Social inquiry suffers from nothing so much as a lack of technical terms. It has to use... conceptions elaborated in other sciences. What we must most eschew is any term suggesting a form of unity realized in some other whole than the particular social whole which we are considering." (*The Metaphysical Theory of the State*, p. 131).

(ঘ) উদ্দেশ্য সাধনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ (Society from the teleological standpoint) :

পূর্বের আলোচনার আলোকে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজের নিজস্ব একটি সংহতি ও ঐক্য আছে এবং ইহা কতকাংশে প্রাণিদেহের সহিত তুলনীয়। আবার সমাজ যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের সকলেই মনোবিশিষ্ট প্রাণী এবং যেহেতু সমাজমাত্রই পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত, সেই হেতু সমাজের একটি মানসিক রূপ আছে। যদিও ইহার অর্থ নহে যে, সমাজগঠনকারী বিভিন্ন ব্যক্তির বাহিরে উহাদের নিয়ন্ত্রণকারী পৃথক্ কোন সমাজ-মন আছে, তাহা হইলেও সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যাদির মাধ্যমে কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। সুতরাং সমাজকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য সমাজ কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায় বা কোন্ লক্ষ্যের পথে উহা অগ্রসর হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন।

মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাজের সহিত মনুষ্যসমাজ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাজে মনুষ্যসমাজ অপেক্ষা অধিকতর ঐক্য বা সঙ্ঘবদ্ধতা আছে এবং উহা অপেক্ষাকৃত সরল। ইহার কারণ হইল যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে যুক্তি বা স্বাধীন ইচ্ছার স্থান নাই—ইহারা মোটামুটি প্রকৃতিদত্ত সহজাত বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা এবং যুক্তি ও কল্পনার ক্ষমতা থাকার জন্য মনুষ্যসমাজে নব নব অভিপ্রায় নানাভাবে ব্যক্ত হয়। মনুষ্যসমাজের এক একটি সংস্থা এক এক প্রকার উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা লক্ষ্যের পরিচায়ক। প্রকৃতি যে সকল উদ্দেশ্য সমাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে সেগুলির ভিত্তিতে ও সেগুলির অল্পাধিক পরিবর্তন সাধন করিয়া এবং আরও অনেক উদ্দেশ্য সংযুক্ত করিয়া মানুষ আরও অনেক নূতন উদ্দেশ্য ও নূতন লক্ষ্যের সৃষ্টি করে। এইভাবে মনুষ্যসমাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বহুমুখিতা ও জটিলতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য, ইহার অর্থ নহে যে, সমাজের সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে সকল মানুষই পূর্ণভাবে সচেতন থাকে। মানুষ তাহার চেতনার অগোচরে অনেক উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হয়। তাহা ছাড়া, সমাজের অগ্রগতির ফলে সামাজিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতনা ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়।

যদি আমরা পরিবার-রূপ সামাজিক সংস্থাটির কথা চিন্তা করি, তাহা হইলে উদ্দেশ্যসাধনের বিষয়টি কতকাংশে উপলব্ধি করিতে পারি। পরিবারের মূলে

আছে স্ত্রী-পুরুষের মিলন এবং তাহার ফলে নূতন জীবের জন্মদান। ধীরে ধীরে পরিবারের মধ্যেই স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি অনুভূতিগুলি প্রকাশ পায় এবং ঐগুলি চরিতার্থতা বা আত্মপ্রকাশের পথ লাভ করে। তাহা ছাড়া, পরিবারের মধ্যেই গুরুজনের আদেশপালন, নিয়মানুবর্তিতা, শিশুর লালন-পালন অপরের সহিত সহযোগিতায় পারস্পরিক মঙ্গলবিধান করা ইত্যাদি শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। এইভাবে পরিবাররূপ সংস্থা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে আদর্শ পরিবার সংগঠিত হয় এবং কতকগুলি সু-উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা নহে, তবে আদর্শ পরিবারে এইভাবে নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা আছে সে কথা বলা যায়। পরিবাররূপ সামাজিক সংস্থাটির পক্ষে যাহা প্রযোজ্য, অন্যান্য সামাজিক সংস্থার পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য। আমরা চিন্তা করিলেই ইহাদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ধারণা লাভ করিতে পারি।

আবার এক একটি সমাজের বিবিধ সংস্থা সমাজের কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করে অর্থাৎ ঐ সমাজের সকল সংস্থাই যেন ঐ সমাজের প্রতিভূস্বরূপ কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বিবিধ সামাজিক প্রথা, সংস্থা ও কার্যাদির উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে সাধারণ ঐক্য বা সংহতি আছে এবং উহারা বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত।[৩৪] তবে সকল সমাজের মধ্যে একই প্রকারের বা পরিমাণের ঐক্য থাকে না। তাহা ছাড়া, একই সমাজের মধ্যে কখনও এই ঐক্য দৃঢ়ীভূত হয়, আবার কখনও ইহা শ্লথ হয়।

সমগ্র সমাজের আদর্শ কী—সমগ্র সমাজ ঠিক কোন্ পথে চলিয়াছে—তাহা হয়ত' সকল সময় আমরা নিরূপণ করিতে পারি না। তবে এইটুকুমাত্র আশা করিতে পারি যে, **আদর্শ সমাজের অভিপ্রেত লক্ষ্য স্বরূপতঃ নৈতিক**

৩৪ তুলনীয়: "...all institutions, all groupings, all relationships, and all the social activities of individuals are subordinate to the general aims and purposes of society; and that therefore social life is to be regarded as the Great Institution to whose purposes all particular purposes are relative." (Urwick, *A Philosophy of Social Progress*, p. 137).

লক্ষ্য হইবে। সুতরাং সামাজিক কোন ঘটনা বা সংস্থার ব্যাখ্যা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী (ethical or moral standpoint) হইতে করাই বাঞ্ছনীয়।[৩৫]

অতএব আমরা পরিশেষে মন্তব্য করিতে পারি যে, মানবসমাজ একপ্রকার জনসমষ্টি—মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে উহা গঠিত। সমাজকে ব্যাখ্যা করিবার কালে উহাকে কতকগুলি পৃথক্ ব্যক্তির সমাবেশ বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। সমাজকে যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা ঠিক হইবে না—যন্ত্র ও তাহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক তাহা অপেক্ষা নিগূঢ়তর। কিয়দংশে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক প্রাণী ও প্রাণীর বিভিন্ন অংশের সহিত তুলনীয়; কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত তুলনা করা চলে না। সুতরাং জীববিজ্ঞানের বিবিধ প্রত্যয়দ্বারা সমাজের সুচারু ব্যাখ্যা হয় না। সমাজের একটি মানসিক রূপ আছে, তবে ব্যক্তি-মনের ঊর্ধ্বে পৃথক্ কোন সমাজ-মনের কল্পনা বাঞ্ছনীয় নহে। সমাজকে ব্যাখ্যার জন্য সমাজের বিভিন্ন সংস্থা তথা রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস চলিয়াছে বা যে লক্ষ্যের পথে তাহারা চলিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে, অর্থাৎ 'উপায়-উদ্দেশ্য' এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের বিচার করিতে হইবে।[৩৬] সামাজিক সমষ্টি যান্ত্রিক সমাবেশ বা রাসায়নিক সংমিশ্রণ নহে —উহা প্রধানতঃ উদ্দেশ্যসাধনাভিমুখী আন্তর্ব্যক্তিক সংহতি[৩৭]; অবশ্য আমাদের মধ্যে ভেদ থাকিতে পারে, সমাজের মূল উদ্দেশ্যবিরোধী কার্য অনেকে করিতে পারে, —কিন্তু তাহা সত্ত্বেও (অর্থাৎ বিভেদের পশ্চাতে) এক অন্তর্নিহিত ঐক্য কিছু-না-

---

৩৫ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করিয়া Urwick বলিয়াছেন: "The essence of the ethical view is that it alone defines the place and social quality of each institution and each social functioner in relation to the whole scheme of agreed purposes of the social life in which all have their place." (*Ibid.*, p. 145.)

৩৬ এইজন্য Talcott Parsons সমাজের সংজ্ঞাদানকালে মন্তব্য করিয়াছেন: "Society may be defined as the total complex of human relationships in so far as they grow out of action in terms of *means-end relationship*." (*Encyclopaedia of Social Sciences*, Art. on Sociology).

৩৭ MacIver তাঁহার এক গ্রন্থে সামাজিক সংহতির আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন: "The question is whether the synthesis is purely mechanical or chemical" —ইহার উপর Hetherington ও Muirhead টিপ্পনী করেন: "The answer, we must believe, is that it is neither, but *teleological*." (*Social Purpose*, p. 74).

কিছু পরিমাণে কার্য করিতে থাকে। এই উদ্দেশ্য আবার কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহা বিচারের জন্য দেখিতে হইবে উহা কত দূর ব্যক্তি তথা সমাজের নৈতিক আদর্শের অনুকূল হইয়াছে।

৫। সামাজিক আদর্শ (Social Ideal)—

সর্বজনীন মঙ্গল (বা জনকল্যাণ)-এর আদর্শ (Idea of Common Good):

পূর্ব অনুচ্ছেদে সমাজকে অভিপ্রায়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সামাজিক সংগঠন, সংস্থা, রীতিনীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা-কালে উহারা যে লক্ষ্যপথে বা আদর্শ অনুযায়ী চলিয়াছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন এবং ঐ লক্ষ্য বা আদর্শ যদি নীতি-অনুযায়ী হয়, তবেই ইহা সমর্থনযোগ্য। সাধারণতঃ যে আদর্শ সমাজের সাধারণ মঙ্গল বা জনকল্যাণের চেষ্টা করে, তাহাই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে: সর্বজীবন মঙ্গল কাহাকে বলে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সরল—যাহা সমাজের সকলের পক্ষে মঙ্গলকর বা কল্যাণকর তাহাই 'সর্বজনীন মঙ্গল'। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে জটিলতার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ 'সমাজের সকলের' এবং 'মঙ্গলকর' এই দুই পদের অর্থ লইয়া মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আধুনিক কালে যে সকল মতবাদ সর্বজনীন বা সামাজিক মঙ্গলের আদর্শকে সমর্থন করে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বেন্থাম্, মিল, ও তাঁহার অনুবর্তিগণের উপযোগবাদ বা হিতবাদ (utilitarianism), স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় মতবাদ এবং আদর্শবাদী দার্শনিকগণের কল্যাণবাদ বা পূর্ণতাবাদ (eudæmonism বা perfectionism)।

(১) বেন্থাম্, মিল্ প্রমুখ উপযোগবাদিগণ বলেন যে, যে কার্য সকলকে সুখদান করে তাহারই উপযোগিতা আছে এবং তাহাই করণীয়।[৩৮] অথবা তাহা যদি

---

৩৮ প্রাচীনকালে প্লেটো তাঁহার *Republic* গ্রন্থে (Bk. IV, 420) অনুরূপ মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেন: "So we must consider whether our aim in establishing Guardians is to secure the greatest possible happiness for them, or happiness is something of which we should watch the development in the whole commonwealth."

সেইরূপ মিল্ (Mill) বলেন: "the happiness which forms the...standard of what is right in conduct, is not the agent's own happiness, but that of all concerned." (*Utilitarianism*, Ch. II).

সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যতজনকে সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব সুখী করা উচিত, অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখবিধানই (greatest happiness of the greatest number) আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি আছে :

(ক) প্রথমতঃ, যে সুখকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয়, সেই সুখের অর্থ কী? সেই সুখ কি প্রকারের? সেই সুখ বলিতে কি কেবল ইন্দ্রিয়সুখ বুঝায়? বেন্থাম সুখের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন এবং কোন গুণগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সমাজের মঙ্গলের জন্য কেবল পরিমাণগতভাবে অধিক সুখ অন্বেষণ করিলেই চলিবে না—যাহা গুণগতভাবে শ্রেয়ঃ তাহা অনুসন্ধান করাই কর্তব্য। মিল্ ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং গুণগতভাবে উৎকর্ষ সুখের অনুসন্ধানই নৈতিক আদর্শানুগ বলিয়াছেন। কিন্তু এই গুণগত পার্থক্য কি ভাবে নিরূপণ করা যাইবে? মিল্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বহুদর্শী ও বিজ্ঞ লোক তাঁহারা যে সুখকে উচ্চতর বলিবেন তাহাই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তাঁহাদের অভিমত নিশ্চয়ই তাঁহাদের খেয়ালমত নহে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আদর্শ আছে যাহার আলোকে তাঁহারা সুখের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা নির্ণয় করেন এবং মিলের উচিত ছিল ঐ আদর্শের ইঙ্গিত দান করা। (খ) দ্বিতীয়তঃ, বেন্থাম, মিল্ প্রমুখ দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই আত্মসুখ কামনা করে; কিন্তু তাহা হইলে কি করিয়া আশা করা যায় যে, মানুষ পরসুখ অনুসন্ধান করিবে? ইহার উত্তরে বেন্থাম্ বলেন যে, কয়েকটি বাহ্য প্ররোচক (external sanctions) আমাদের সর্বজনীন সুখবিধানের কার্য করিতে বাধ্য করিবে; সেইরূপ মিল্ আন্তর প্ররোচক (internal sanction)-এর উল্লেখ করেন। কিন্তু প্ররোচকের ফলে বাধ্য হইয়া যদি কেহ বিশ্বজনীন সুখ অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে উহাকে ঠিক নৈতিক কার্য বলা যায় না; কারণ বাহ্য শক্তির চাপে পড়িয়া যাহা করা যায়, তাহা স্বরূপতঃ নৈতিক কার্য নহে—নৈতিক কার্য স্বেচ্ছায় সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) হারবার্ট স্পেন্সারও সর্বজনীন সুখবিধানের আদর্শ সমর্থন করেন; তবে তিনি সমগ্র পরিস্থিতি জৈবিক বিবর্তনবাদ (biological evolution)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা জীবদেহের সহিত জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যে সম্বন্ধ

তাহার সহিত তুলনীয়। যেমন সমগ্র দেহের সুস্থতা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সুস্থতা নির্দেশ করে, সেইরূপ সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধিত হইলে সমাজস্থ সকল ব্যক্তির মঙ্গল সাধিত হইবে। (৪-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই কারণ স্পেন্সার মনে করেন যে, সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের নিজেদের সুখবিধানের জন্যই সমাজের মঙ্গল করিতে বাধ্য হ'ন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করার ফলে তাঁহারা সামাজিক মঙ্গলবিধানে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এই অভ্যাস তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং আজকের দিনে আমরা সামাজিক মঙ্গলবিধানের অভ্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং স্বতঃই সর্বজনীন মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করি। স্পেন্সার আরও আশা করেন যে, বিবর্তনের অগ্রগতির ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও সামাজিক কল্যাণবিধানের ইচ্ছার মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যাইবে এবং পরিণামে বিশ্বজনীন কল্যাণ বিরাজ করিবে।

স্পেন্সারের মতবাদও অধিকাংশ নীতিবিদ্ গ্রহণ করেন নাই। যদি আমাদের পূর্বপুরুষগণ সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বাধ্য হইয়া আত্মসুখের আশায় সামাজিক কল্যাণ বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে সমাজকল্যাণাকাঙ্ক্ষী বলা যায় না। আবার আমরা যাহারা বংশপরম্পরায় পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে সমাজ কল্যাণের ইচ্ছা পাইয়াছি, আমরাও প্রকৃতপক্ষে সমাজকল্যাণকামী পদবাচ্য হইতে পারি না—কারণ বংশগতির প্রভাবেই আমরা ঐরূপ হইয়াছি, স্বেচ্ছায় নহে। তাহা ছাড়া, জৈবিক বিবর্তনের উপমার সাহায্যে সামাজিক তথা নৈতিক বিবর্তনের পূর্ণ ব্যাখ্যা চলে না।[৩৯]

(৩) মার্ক্সীয় দর্শনে কোন নৈতিক আদর্শের সার্বভৌমিকত্ব স্বীকার করা হয় না—বলা হয় যে, মানুষই মানুষের সকল ধারণা ও আদর্শের প্রবর্তক এবং মানুষের ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী বা আদর্শ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত। সনাতন নীতি, ধর্ম প্রভৃতি সবকিছুই 'বুর্জোয়া'-মনোবৃত্তির পরিচায়ক।[৪০] মার্ক্সবাদিগণ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—তাঁহারা ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা সামাজিক উন্নতির মাধ্যমে

৩৯ বেন্থাম, মিল্ ও স্পেন্সারের মতবাদের জন্য দ্রষ্টব্য P. B. Chatterji, *Principles of Ethics*, Chs. XI & XII

৪০ **তুলনীয়:** **"Law morality, religion are so many bourgeois prejudices, behind which lurk in ambush just so many bourgeois interests." (Marx & Engels, *Manifesto of the Communist Party*).**

ব্যক্তিগত উন্নতির কথা বলেন।[৪১] তাহা ছাড়া তাঁহারা কল্যাণ বলিতে কোন আত্মিক কল্যাণ বুঝেন না—দৈহিক সুখের অনুকূল বস্তুসমূহের প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতা এবং অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ, তাঁহাদের মতে ইহাই হইবে কল্যাণের নির্দেশক।

কিন্তু মার্ক্সীয় মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হইল যে, ইহা নীতিকে জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াছে এবং ইহা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। সুতরাং সমগ্র সমাজের সুখবিধানের প্রচেষ্টায় মার্কস্‌বাদ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছে এই অভিযোগ অনেকে করিয়া থাকেন।

(৪) ভাববাদী দার্শনিকেরা আত্মিক উন্নতি (spiritual progress)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সর্বজনীন মঙ্গলের আদর্শ চিন্তা করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, সমাজ ও ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত; সুতরাং সামাজিক মঙ্গল ও ব্যক্তিগত মঙ্গল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার ভাববাদিগণ ইহাও বলেন যে, সমগ্র বিশ্বই হইল এক বিরাট্ চিচ্ছক্তির প্রকাশ এবং মানুষের মধ্যে দেবত্ব সুপ্ত আছে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল এই দেবত্বের বিকাশসাধন—ক্ষুদ্র স্বার্থকে দমন করিয়া সামাজিক কল্যাণবিধানের পথে মানুষের আত্মবিকাশ করিতে হইবে। সুতরাং স্বীয় আত্মবিকাশের জন্য মানুষের কর্তব্য হইল সামাজিক বা সর্বজনীন মঙ্গলবিধানের প্রচেষ্টা।

ভাববাদিগণের এই আদর্শ অনেকাংশে শ্রেয়ঃ। তবে তাঁহাদের এই নৈতিক মতবাদের সহিত যে তাত্ত্বিক মতবাদ সংশ্লিষ্ট আছে, সে সম্বন্ধে অনেকে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন।

আমরা উপরে জনকল্যাণ বা সর্বজনীন মঙ্গল সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিলাম। কোন বিশেষ মতবাদ সমর্থন না করিয়া আমরা এখানে সর্বজনীন মঙ্গলের আদর্শের তাৎপর্যের উল্লেখ করিব—

(ক) সমাজে কোন মানুষই অপরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ একাকী বাস করিতে পারে না—এইজন্য ব্যক্তিগত মঙ্গল ও সামাজিক মঙ্গল ওতঃ-

---

৪১ Bax বলেন: "The ethic and religion of Socialism seek not the ideal society through the ideal individual, but conversely the ideal individual through the ideal society." (*The Ethics of Socialism*, p. 19).

প্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক মঙ্গল বিধান না হইলে ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।

(খ) সর্বজনীন মঙ্গল ব্যক্তিগত মঙ্গল হইতে পৃথক্, বা ব্যক্তিগত মঙ্গল হইতে শ্রেয়ঃ বা উচ্চতর কোন আদর্শ নহে। সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকার জন্য সর্বজনীন মঙ্গলের সহিত ব্যক্তিগত মঙ্গলের পার্থক্য বা বিরোধিতা থাকা উচিত নহে।[৪২] এই দুই আদর্শের ভিতর যদি বৈপরীত্য বা পৃথকত্ব রাখা যায়, তাহা হইলে উহার পরিণাম অনেক সময় শুভ হয় না। আবার যদি সর্বজনীন মঙ্গলের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার এবং ব্যক্তি-বিশেষ সামজিক মঙ্গলের উপায়-স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(গ) সামাজিক বা সর্বজনীন মঙ্গলের পক্ষে কোন্‌টি প্রয়োজনীয় বা ঐরূপ মঙ্গলবিধানের পক্ষে কোন্ কার্যটি সহায়ক, তাহা যে সকল সময় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছাদ্বারা স্থিরীকৃত হইবে, তাহা নাও হইতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সমাজে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন্ আদর্শ গ্রহণযোগ্য তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে—এমনকি একজন বিশেষ ব্যক্তির মতও গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৪৩]

৪২ জিন্‌স্‌বার্গের ভাষায়: "...the good of the whole, like any other good, must be good for persons...The good of the whole cannot be something distinct from and opposed to the good of the members who in successive generations constitute that whole." (*Psychology of Society*, pp. 48-49).

৪৩ সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ যে সকল সময় তথাকথিত সমষ্টিগত ইচ্ছা (collective will)-এর প্রকাশক হইবে তাহা নহে। সমষ্টিগত ইচ্ছার সম্ভাবনাতে বিশ্বাস না করিলেও সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না; আবার বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা নিছক দৈহিক শক্তির প্রাধান্য দ্বারা জনকল্যাণের স্থায়ী আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রাণিজগতের ধারা যেভাবে চলে সেভাবে কোন নৈতিক আদর্শের বিবর্তন সম্ভব নহে। আলেকজাণ্ডার (Alexander)-এর উক্তি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়: "Persuasion and education, in fact, without destruction replace here the process of propagation of its own species and destruction of the rival ones, by which in the national world species become numerically strong and persistent." "Persuasion corresponds to the extermination of the 'rivals', for the victory of mind over mind consists in persuasion." (*International Journal of Ethics*, Vol. II, No. 4).

(ঘ) জনকল্যাণ কিসে হইবে? আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন নীতিবিৎ বিভিন্ন উত্তর দিয়াছেন। যাঁহারা সুখবাদী তাঁহারা বলেন যে, জনসাধারণের সুখবিধানেই তাহাদের চরম কল্যাণ; কিন্তু এই মতবাদের অসুবিধা হইল যে, বিভিন্ন ব্যক্তির সুখের ধারণা বিভিন্ন—একজনের যাহাতে সুখ, হয়ত' অপরের তাহাতে দুঃখ। তাহা ছাড়া, সুখের মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য আছে—কোন্ প্রকারের সুখ বাঞ্ছনীয় সে বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। আবার সুখ মাত্রই স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু জনকল্যাণের আদর্শে যে কল্যাণের কল্পনা বা মঙ্গলের চিন্তা করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং চরম আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কেবল সুখকেই আদর্শ করা যায় না।

আবার, যাঁহারা জড়বাদী তাঁহারা প্রয়োজনীয় এবং ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন ও প্রাচুর্যকে জনকল্যাণের জন্য একমাত্র আবশ্যকীয় উপাদান মনে করেন। ইহাদের যে আবশ্যকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু একমাত্র ইহাদেরই জনকল্যাণের প্রয়োজনীয় উপায়রূপে স্বীকার করা যায় না। জীবনধারণের জন্য অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়রূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সংস্থান করা এবং পরিমিত ভোগ ও আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করা জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ইহাতেই পর্যাপ্ত কল্যাণ সাধিত হয় না—নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতি-বিধানও জনগণের চরম কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। অন্ন চিন্তার পর অন্য চিন্তার প্রয়োজন। এই 'অন্য চিন্তা' হইল আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তা।[৪৪] সুতরাং **যাহাতে নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, তাহাই চরম কল্যাণের নিদর্শক**। জনসাধারণের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হইলে তাহারা নৈতিক উৎকর্ষতাকে চরম লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিতে শিখিবে।[৪৫] অবশ্য এই প্রকার আদর্শ সুদূরপরাহত; কিন্তু যতদিন না চরম কল্যাণের ধারণা মানসিক তথা চারিত্রিক প্রগতির পরিচায়ক না হয়, ততদিন পর্যন্ত সামাজিক বিরোধ বা অশান্তি থাকিয়া যাইবে।[৪৬]

---

৪৪ "Man shall not live by bread alone"—বাইবেলের এই উক্তি স্মরণযোগ্য।

৪৫ তুলনীয়: "The only true good is to be good." (Green, *Prolegomena to Ethics*, p. 295).

৪৬ এইজন্য গ্রীন (Green) মন্তব্য করিয়াছেন: "Until the object generally sought as good comes to be a state of mind or character of which the

(ঙ) এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিচার্য বিষয় হইল: জনকল্যাণের পরিধি কত দূর ? 'সর্বজনীন' বা 'সাধারণ' কল্যাণ কি কেবল একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে অথবা 'সর্ব' বা 'সাধারণ' বলিতে সমগ্র মানবসমাজকে বুঝাইবে ? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, মানুষের যত উন্নতি বা মানসিক বিস্তার ঘটে, ততই 'সমাজ' সম্বন্ধে তাহার ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে। স্বীয় ক্ষুদ্র পরিবার বা গোষ্ঠীকে অতিক্রম করিয়া মানুষ ক্রমশঃ বিশ্বমানবের কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে পারে। অবশ্য সমাজের বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে স্বীয় সমাজের প্রতি অনুরাগ বিশ্বজনীন কল্যাণচিন্তার পরিপন্থী হইয়া উঠে। তবে আমাদের সম্মুখে সর্বদাই বিশ্বজনীন বা সর্বমানবের কল্যাণের আদর্শ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানবসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগস্থাপন ও ভাবের আদান-প্রদানের অনেক সুবিধা হইয়াছে—সেইজন্য আজ আর মানবসমাজের এক অংশ অপর অংশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় নাই এবং এই কারণে পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু দার্শনিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমাদের কর্তব্য হইল বিশ্বমানবের কল্পনা চিন্তা করা—যেখানেই মানুষে মানুষে 'আমি' ও 'তুমি'-র সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে সেখানেই পরস্পরের উচিত পারস্পরিক মঙ্গলচিন্তা।[৪৭] "সকলের

attainment or approach to attainment, by each is itself a contribution to its attainment by every one else, social life must continue to be one of war..." (*Ibid.*, p. 297).

৪৭ দার্শনিক মার্টিন বুবের (Martin Buber) মনে করেন যে, 'আমি'-'তুমি'-র সম্পর্কই হইল মানুষের অস্তিত্বের বিশেষ পরিচায়ক। তিনি বলেন: "That essence of man which is special to him can be directly known only in a living relation. The gorilla, too, is an individual, a termitary, too, is a collective, but *I* and *Thou* exist only in our world, because man exists, and the *I*, moreover, exists only through the relation to the *Thou*." (*Between Man and Man*, p. 246).

তরে আমরা সকলে”—এই বাণী দ্বারা আমাদের সকলকে চলার পথে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে[৪৮]।

আমরা সর্বজনীন মঙ্গলের আদর্শের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলাম। বাস্তবিক সামাজিক সংহতি, স্থায়িত্ব ও প্রগতি সম্ভব হইতে পারে না যদি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমগ্র সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে না পারে। সমাজ ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নহে এবং প্রকৃত সামাজিক কল্যাণ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির কল্যাণের পরিপন্থী হইবে না—ব্যক্তি-বিশেষকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আবার ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা আছে এবং সমাজকল্যাণের নামে ব্যক্তিকে যেন সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিদান না করা হয় সে বিষয়েও সমাজের কর্ণধারগণের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৪৮ “জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি
সে জাতি মানবজাতি”

—কবির এই উক্তি দার্শনিক আদর্শের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য। আজকের দিনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (U. N. O) এই আদর্শেই গঠিত হইয়াছে; কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, পররাজ্যলোলুপতা, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ফলে জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলন কেবলই বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তি ও সমাজ

সমাজ ও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা সম্ভব নহে, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে কেহ সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আবার কেহ ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটির আলোচনা অন্যটির আলোচনায় পর্যবসিত হয়। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য পূর্ব অধ্যায়ে সমাজ সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা করিয়াছি—আমরা তথায় সমাজের বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ, উদ্ভব ও আদর্শ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।[১] মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বলিতে কী বুঝায়? মানুষ কিসের প্রেরণায় সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়? কিভাবে তাহার সামাজিকীকরণ ঘটে? সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি?—এই সকল প্রশ্ন হইবে বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি (Social Nature of man) :

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব—সমাজের বাহিরে মানুষের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই।[২] মানুষের আদিম অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, কোন-না-কোন সামাজিক অবস্থার মধ্যেই সে সর্বদাই বাস করিত। আদিম অবস্থায় বর্তমান সমাজের ন্যায় জটিলতা অবশ্য ছিল না, তথাপি মানুষ একেবারে সমাজবিহীন

---

১ এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা নানাভাবে ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি—তাহাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি, সামাজিক জীব হিসাবে তাহাকে বুঝিতে পারি এবং তাহার কৃষ্টির মাধ্যমে তাহার পরিচয় পাইতে পারি। আবার প্রতি ক্ষেত্রেই বিষয়গত (objective) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিতে পারি যে, এ পর্যন্ত সে কী হইয়াছে, কী করিয়াছে এবং কী পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, আদর্শগত (normative) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করিতে পারি যে, তাহার কার্যাবলী কতদূর সমর্থনযোগ্য, তাহার উন্নতি বা প্রগতি কতদূর হইয়াছে, কোথায় কোথায় তাহার পদস্খলন ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ লক্ষ্যপথে তাহার চলা উচিত।

২ আরিষ্টটলের একটি বিখ্যাত উক্তি হইল যে, মানুষ সামাজিক জীব—যে মানুষ সামাজিক নহে, সে হয় পশু আর না হয় দেবতা।

অবস্থায় বাস করিত না। ক্ষুদ্রতম সামাজিক গোষ্ঠী হইল পরিবার—যে কোন যুগেই ব্যক্তি-বিশেষের প্রাথমিক অস্তিত্ব পরিবার হইতে বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নহে। সুতরাং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা যে ব্যক্তি-বিশেষের জীবন বহুলাংশে গঠিত এবং প্রভাবিত হয় ইহা আমরা সহজেই বলিতে পারি।[৩]

জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই ব্যক্তি-বিশেষকে 'সামাজিক জীব' বলা যায়। এ কথা সত্য যে, ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয় না এবং উহা বিভিন্ন 'উপাদান'-এর সমন্বয়।[৪] কিন্তু শিশু যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে পিতামাতা এবং অন্যান্য বয়স্ক লোকের উপর নির্ভরশীল এবং সে তাহাদের নিকট হইতে বহু বিষয় শিক্ষালাভ করে ও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এমন কি, যে সকল ক্ষমতা তাহার ভিতর সুপ্তভাবে থাকে, সেইগুলিও সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, প্রতি শিশুই তাহার জন্মের প্রারম্ভে তাহার পিতামাতা প্রভৃতির মাধ্যমে তাহার পূর্বতন সমাজের আচার, আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যতই তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, ততই সে তাহার সমসাময়িক সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে, অর্থাৎ প্রতি শিশুর জীবনই অতীত ও বর্তমান সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে অনেকাংশে গড়িয়া উঠে।[৫]

সমাজের উপর ব্যক্তি-বিশেষ নানাভাবেই নির্ভরশীল। সমাজের মধ্যে থাকিয়া মানুষ নিরাপত্তা বোধ করে; তাহার বর্ধনের সুযোগ লাভ করে; নানাবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে; নানাবিধ সুখসুবিধা ও আরামসম্ভোগের সুযোগ

৩ তুলনীয়: "Not only is man a being who only attains his real nature in society, he is a being who has always lived in some form or other in society even if his earliest society was only that of the family group." (C.E.M. Joad, *Guide to Politics & Morals*, p. 37).

৪ ব্যক্তিত্বের বিবিধ উপাদান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত 'মনোবিদ্যা' (পৃ: ২৪৫-২৭৫) দ্রষ্টব্য।

৫ অধ্যাপক মুইয়ারহেড্ (Muirhead) বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "The soul comes into the world already stamped with a meaning determined by its relation to all that went before......It sums up the tendencies and traditions of the past out of which it has sprung" (*Elements of Ethics*).

লাভ করে, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে রূপদান করিতে পারে।[৬] এইজন্য মানুষ যে স্বাধীনতা চাহে তাহা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার স্বাধীনতা নহে—তাহা হইল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা সহযোহিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতা।[৭] বাস্তবিক সম্পূর্ণরূপে একা থাকা মানুষের স্বভাবগত ধর্ম নহে অন্যের সহিত সাহচর্যের মাধ্যমেই সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়।[৮] ব্যক্তি-বিশেষ তাহার স্বীয় পরিবর্ধনের জন্য এবং তাহার জৈবিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সামাজিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল—এমন কি তাহার ব্যক্তিত্বের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের জন্যও তাহাকে সমাজের উপর কতকাংশে নির্ভর করিতে হয়।[৯] অবশ্য মানুষ যে কেল যান্ত্রিকভাবে সামাজিক পরিবেশ দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা নহে; সে আবার নিজ প্রভাব দ্বারা সামাজিক পরিবেশকেও পরিবর্তিত করে। মোট কথা, সমাজ ও ব্যক্তি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা অগ্রগতির পথে চলে।

মানুষ যদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি প্রকাশিত না হইয়া ব্যাহত হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্যশিশু

৬ তুলনীয়: "Man is dependent on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity, and the multitude of definite services which society provides. He is dependent on society for the content of his thoughts, his means, his aspirations, even many of his maladies of mind and body." (MacIver & Page, *Society*, p. 8).

৭ ইহাকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে "Freedom through interdependence." অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষ যে কেবল সহযোগিতাই পায় তাহা নহে, বহুক্ষেত্রে তাহাকে বিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। সহযোগিতা ও বিরোধিতা লইয়াই ব্যক্তি-বিশেষের জীবন।

৮ এইজন্য অধ্যাপক Mackenzie বলিয়াছেন: "...it is not natural for a man to be alone, and that some form of social unity is implied in his essential structure." (*Outlines of Social Philosophy*, p. 35.)

এই প্রসঙ্গে এরিশ্ ফ্রোম্ (Erich Fromm)-এর মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি মনে করেন যে, মানুষ যখন শৈশবের পরনির্ভরশীলতা কাটাইয়া উঠিল, তখন সে স্বাধীন হইল। কিন্তু এই স্বাধীনতার ফলে সে যেন অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; তাই প্রতি মানুষ অন্যের সঙ্গ কামনা করিতে থাকে—সে যেন তাহার 'স্বাধীনতা' হইতে মুক্তি (escape from freedom) চায়।

৯ সমগ্র প্রাণিজগতেই পরিবর্ধনশীলতা দেখা যায়; মনুষ্যজীবনেও ইহা আছে। মনুষ্যেতর পশুরা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অনেকসময় থাকে, মনুষ্যজীবনেও তাহা দেখা যায়। আবার মানুষের যুক্তিশক্তি থাকার জন্য তাহার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ইহাদের যথাক্রমে vegetative aspect, animal aspect এবং characteristic of man as man বলিয়াছেন। (*Ibid.*, pp. 34-37).

যদি কোন মনুষ্যেতর পশু কর্তৃক অপহৃত হইয়া তাহার দ্বারা লালিত-পালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে মনুষ্যোচিত বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায় না।[১০]

মনুষ্যমনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অহং-বোধ। মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে একা থাকিত, তাহা হইলে তাহার মধ্যে অহং-বোধের ধারণা বিকশিত হইতে পারিত না। শিশু যতই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তি যতই তাহাকে নানাভাবে আদর করে, তিরস্কার করে, তাহার কার্যের সমালোচনা করে, ততই সে আত্মসচেতন হইয়া উঠে—এইভাবে সে নিজের সম্বন্ধে "আমাকে" বলিয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং তাহার মধ্যে "আমাকে" ও "আমি" এই দুই ধারণার সমন্বয়ে অহংবোধ গঠিত হয়।[১১]

সমাজের মধ্যে থাকার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার সুযোগ লাভ করে। আবার সেগুলির অল্পবিস্তর পরিবর্তনও সে সাধন করে। ব্যক্তিবিশেষ সামাজিক কৃষ্টির অধিকারিরূপে অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে,—সে ব্যক্তি-বিশেষ সামাজিক জীবনের কৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে কার্য করে। বাস্তবিক প্রতি ব্যক্তিই পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সংযোগকরূপে কার্য করে।[১২]

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, যেহেতু ব্যক্তি সমাজের মধ্যেই জন্মলাভ করে এবং সমাজাতিরিক্ত বা সমাজ-

---

১০ একবার এক ব্যাঘ্রের গহ্বরে দুইটি মনুষ্যশিশুকে পাওয়া যায়; উহারা এক ব্যাঘ্র কর্তৃক লালিত-পালিত হইতেছিল। উহাদের মধ্যে যেটি বড় তাহার নাম দেওয়া হয় কমলা। সে কোনরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারিত না এবং কোনরূপ স্বাভাবিক মনুষ্যজনোচিত ব্যবহার প্রকাশ করিতে পারিত না। (গ্রন্থকারের 'মনোবিদ্যা', পৃঃ ২৭৩ দ্রষ্টব্য)।

১১ সামাজিক কার্যাবলীর মাধ্যমে যে ব্যক্তি-বিশেষের অহং-বোধ জাগরিত হয়, সে বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রইস্, বল্ডউইন্, জেম্স্, কুলি ও মীড্। তবে এ বিষয়ে মীড্ (Mead)ই অগ্রণী। Mead-রচিত *Mind, Self and Society* এবং Royce-রচিত *World & the Individul*, Series II, Lec. VI দ্রষ্টব্য।

১২ MacIver & Page-এর ভাষায়: "Every individual is the offspring of a social relationship, itself determined by pre-established mores....The individual is neither beginning nor end, but a link in the succession of " (*Society*, p. 46).

বহির্ভূত জীবনধারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে, প্রতি ব্যক্তিই স্বভাবতঃ সামাজিক প্রকৃতি বিশিষ্ট। অবশ্য ইহার এই অর্থ নহে যে, প্রতিব্যক্তিরই সামাজিকতাবোধ আছে বা সকলে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে—আমরা যখন ব্যক্তি-বিশেষের সামাজিক প্রকৃতির উল্লেখ করি, তখন সমাজের সহিত প্রতি ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করি।

২। সামাজিক প্রকৃতির মনোগত ভিত্তি (Psychological basis of social nature):

মানুষের সামাজিক প্রকৃতির কারণ কি? সমাজবদ্ধ জীবভাবে মানুষ কেন বাস করে? সমাজ হইতে বিচ্যুতি মানুষের পক্ষে দুর্বিষহ কেন? মানুষের মনে এমন কী আছে যে জন্য সে সামাজিক জীব হিসাবে বাস করিতে চায়? —এই সকল প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন মনোবিৎ বিভিন্নভাবে দিয়াছেন।

মানুষের প্রকৃতি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, তাহার ভিতর দুইটি ভিন্নমুখী প্রকৃতি কার্য করিতেছে—একদিকে সে রুক্ষ, কঠোর, দুর্বিনীত, স্বার্থপর আবার অপর অপরদিকে সে দয়ালু, কোমল, বিনীত, পরার্থপর; মানুষ একদিকে সমাজের অন্য সকলের সহিত সুখশান্তিতে বাস করিতে যেমন অপারগ, অপরদিকে সে সমাজের অন্য সকলের সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রার্থনা করে।[১৩] মানব-প্রকৃতিতে এই দুই বিপরীত ধর্মের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া উহা এত রহস্যজনক বলিয়া বোধ হয় এবং মনোবিদের পক্ষেও উহার বিশ্লেষণ এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, সেই কারণ একটি সর্ব্বাদিসম্মত মত পাওয়া দুরূহ।

বিভিন্ন মনোবিৎ যে সকল বৃত্তির সাহায্যে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিব।

(ক) **যূথচারিতাবৃত্তি**—ডঃ ট্রটার (Dr. Trotter)[১৪] মনে করেন যে, সকল সামাজিক বন্ধনের মূলে আছে যূথচারিতাবৃত্তি (instinct of gregariousness)। যূথচারিতাবৃত্তির ফলে একজন অপরের প্রতি সহানুভূতি-

১৩ কান্ট ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই বলেন যে, মানব মনে 'অসামাজিক সামাজিকতাবোধ' (ungesellige Geselligkeit-উন্‌গেসেলিগে গেসেলিগ্‌কাইট্—unsocial sociableness) আছে।

১৪ তাঁহার *Instincts of the Herd in Peace and War* দ্রষ্টব্য।

শীল হইয়া উঠে, যাহা দলীয় মতবাদ বলিয়া গৃহীত হয় তাহার প্রতি দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা জাগে এবং তাহা তাহারা মান্য করে, যূথ বা সঙ্ঘ কর্তৃক যাহা সমর্থিত হয় তাহা নীতিমূলক বা নৈতিক বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সঙ্ঘের উপর নির্ভরশীলতা হইতে ধর্মীয় ভাবের অভ্যুদয় হয়। মোট কথা, মানুষের মধ্যে যূথচারিতা বা সঙ্ঘচারিতা (gregariousness বা herd-instinct) আছে বলিয়াই সে সামাজিক বা সমাজবদ্ধ জীব।

অধ্যাপক ম্যাকডুগালও যূথচারিতাবাদের একজন উৎসাহী সমর্থক। নির্জনতা বা একাকিত্বের ফলে যে অস্বস্তি জাগে এবং দলবদ্ধ বা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য যে তৃপ্তি দেখা দেয়, তাহা হইল যূথচারিতাবৃত্তির ফল। ম্যাকডুগাল্ মনে করেন যে, মানবমনের চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তিই তাহার বিবিধ কার্যের প্ররোচক--যূথচারিতা ইহাদের অন্যতম। এইজন্য মানুষ বিবিধ জনসমাবেশ পছন্দ করে—সে ভীড়ের মধ্যে, সভার মধ্যে, শোভাযাত্রার মধ্যে অথবা যে কোন প্রকার জনসমাবেশের মধ্যে থাকিতে পছন্দ করে। জনসমাবেশের মধ্যে থাকিয়া সে যে কার্য করে বা যাহা উপভোগ করে, একাকী থাকিলে সে হয়ত' তাহা করিতে পারে না।[১৫]

কেবলমাত্র কোন বিশেষ সহজাত প্রকৃতির উল্লেখ দ্বারা সামাজিক প্রবৃত্তি বুঝান যায় না। সহজ প্রবৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত সরল এবং ইহাদের মাধ্যমে জটিল সামাজিক বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সামাজিকতা প্রবৃত্তি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ইহা কেবল যূথ মধ্যে অধিষ্ঠান বা বিচরণে তৃপ্তি নহে, ইহার মধ্যে থাকে অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া পাইবার আশা। তাহা ছাড়া যূথচারিতা কতদূর সহজাত বলা যাইবে সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন, কারণ তাঁহারা বলেন যে,

১৫ ম্যাকডুগাল্ (McDougall) উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে. আমরা অনেক সময় বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও এক ঘণ্টা ধরিয়া ফুটবল খেলা দেখিতে পারি, তাহার কারণ আমরা জনসমাবেশের মধ্যে থাকি—একাকী থাকিলে ঐভাবে আমরা উহা করিতে পারিতাম না। তাঁহার ভাষায়: "It would be absurd to suppose that it is merely the individual's interest in the game that brings huge crowds together. What proportion of the ten thousand witnesses of a football match would stand for an hour or more in the wind and rain if each man were isolated from the rest of the crowd and saw only the players." (*Introduction to Social Psychology*, pp. 73, 74).

ইহা প্রকাশ করিত, কিন্তু সকল শিশু তাহা করে না।[১৬] একমাত্র অভিজ্ঞতার ফলেই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার পক্ষে অন্যের প্রয়োজন আছে। আবার সকল প্রাণী—বিশেষতঃ কয়েকপ্রকার মাংসাশী প্রাণী—যূথচারী বলিয়া মনে হয় না।[১৭] পরিশেষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সহজাত বৃত্তির মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে কোন সুচারু ব্যাখ্যা দান করে না—একই বৈশিষ্ট্যের উহা বিভিন্ন ভাষায় পুনরুক্তি করে মাত্র।[১৮]

(খ) **অপত্যস্নেহ প্রভৃতি কোমল অনুভূতি**—কেহ কেহ মনে করেন যে, কোমল অনুভূতি হইতে সামাজিক প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়াছে। ডারউইন্ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অপত্যস্নেহ (parental feeling)-রূপ কোমল রস হইতে বিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে সামাজিক বৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়াছে।

ম্যাকডুগালও ইহা সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে, অপত্যস্নেহই হইল একমাত্র অকৃত্রিম পরার্থানুভূতি (altruistic feeling)। ইহা আদিতে কেবলমাত্র মাতৃত্ব বৃত্তিতেই প্রকাশমান ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা পিতৃত্ববোধেও সংক্রামিত হয়।[১৯] যে বিশ্বজনীন অনুভূতি বা পরার্থানুভূতি অপত্যস্নেহরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই সামাজিক বৃত্তির ভিত্তিস্বরূপ।

ইহা স্বীকার্য যে, পারিবারিক সংস্থার মধ্যে পরার্থপরতাবৃত্তির প্রকাশের সুযোগ ঘটে এবং ইহার মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তি-বিশেষ আত্মত্যাগের প্রাথমিক সুযোগ লাভ করে। তাহা ছাড়া, মাতৃত্ববৃত্তি হইতে পরার্থানুভূতি কী ভাবে বা কোন্ কোন্

১৬ ইহার উত্তরে আবার বলা যাইতে পারে যে, সকল সহজপ্রবৃত্তিই জন্মের সময় হইতে প্রকাশ পায় না।

১৭ ম্যাক্‌ডুগাল্ ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যূথচারিতারূপ সহজাত প্রবৃত্তিকে সার্বিক, সহজাত সামাজিকবৃত্তি (social instinct) বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তাঁহার ভাষায়: "...it is not clear that it (gregarious instinct) is the root of all social life—the carnivorous family of some species, for example, enjoying a social life without...any such instinct." (*An Outline of Psychology*, p. 154).

১৮ সহজাতবৃত্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত মনোবিদ্যা, পৃঃ ৪৪২, দ্রষ্টব্য।

১৯ ম্যাক্‌ডুগাল্ (McDougall) তাঁহার নিজ মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন: "I have maintained that the protective impulse of the parental instinct is a truly altruistic factor and the only altruistic factor in human nature ; that from its prompting all truly altruistic striving, directly or indirectly, proceeds." (*op. cit.*, p. 138).

পর্যায়ের মধ্য দিয়া পিতৃত্ববোধে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে তাহা আমাদের জানা নাই। আবার যে অর্থে মাতৃত্ববৃত্তি একটা সহজাতবৃত্তি, সে অর্থে পিতৃত্ববৃত্তি বলিয়া পৃথক্ কোন সহজাতবৃত্তি আছে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই মতবাদ অনুসারে সামাজিক বৃত্তি মাত্রই পরার্থানুভূতির নামান্তর এবং পরার্থানুভূতি-মাত্রই শেষ পর্যন্ত মাতৃত্ববৃত্তি হইতে উদ্ভূত— কিন্তু এই দুই মতেরই যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, সামাজিক বৃত্তিকে গৌণ স্থান দান করিয়া উহাকে অন্য একটি মুখ্য বা প্রাথমিক বৃত্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় সামাজিক বৃত্তির মূলেও আত্মরক্ষা ও জাতির নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার উদ্দেশ্য কার্য করিতেছে।[২০]

(গ) **কাম ও আক্রমণাত্মক বৃত্তি** (Love and Agression)—ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামিগণ মনে করেন যে, কাম ও আক্রমণবৃত্তি হইল সামাজিক জীবনের ভিত্তি। তাঁহারা বলেন যে, প্রেম ও ঘৃণা, অথবা কাম ও আক্রমণ (বা বিদ্বেষ), এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক জীবনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।[২১] ফ্রয়েড্ বিশেষ করিয়া বিদ্বেষ অথবা আক্রমণাত্মক বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি মনে করেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষভাবাপন্ন—প্রতি মানুষই অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আদিম যুগে মানুষে মানুষে এই পারস্পরিক মনোভাব বিশেষভাবে প্রকট ছিল; কিন্তু সভ্যতার ফলে মানুষ এই মনোভাব নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন করিতে শিখিয়াছে। এই অবদমন সম্ভব হইয়াছে কামবৃত্তি

২০ এই আপত্তিকে ব্যাখ্যা করিয়া জিন্‌স্‌বার্গ (Ginsberg) সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন : ".. as to the social impulses, there is no reason for regarding them as derivative. They arise in the same way as other impulses and have the same biological significance as other impulses, viz., Survival value. They are complex new responses and in all probability not mere expansions of old feelings. In any case they seem to contain elements that differ in kind from family affection, they have no relation to nearness in blood and are more capable of development and transference than the tender emotion that exists between members of the same family." (*Psychology of Society*, p 16).

২১ ফ্রয়েড্ এই প্রসঙ্গে দার্শনিক শোপেন্‌হাওয়ার-প্রদত্ত একটি উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। অতিরিক্ত শীতের প্রভাবে উত্তাপ-সংরক্ষণের জন্য সজারুরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি বসে, কিন্তু উহার ফলে আবার তাহাদের কাঁটা পরস্পরকে লাগার জন্য তাহারা একটু সরিয়া বসে। সেইরূপ সমাজস্থ ব্যক্তিরা একবার খুব সঙ্ঘবদ্ধ হয়, আবার তাহার পরই তাহাদের ঐক্য বা ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হইয়া যায়।

(Eros)-এর ফলে। ফ্রয়েড্ সকল প্রকার আকর্ষণকেই যৌন কামের নামান্তর মনে করেন; তবে সকল আকর্ষণের ক্ষেত্রেই যে কামবস্তুর সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহা নহে, এই সকল ক্ষেত্রে বলা যায় যে কাম হইল উদ্দেশ্য-ব্যাহত; অন্যের প্রতি যে কোন রকমের আকর্ষণ, কোমলতা, সহানুভূতি ইত্যাদি দেখা যায়, তাহাই হইল উদ্দেশ্য-ব্যাহত কাম (aim-inhibited sexuality)। কামের তাড়নায় কেবল যে পারিবারিক সংস্থা সংগঠিত হয় তাহা নহে, ইহারই ফলে সকল প্রকার সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। কোন বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি নির্ভর করে ঐ গোষ্ঠী বা সঙ্ঘমধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা অনুরাগ এবং সঙ্ঘ বহির্ভূত অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরাগের উপর। আবার সঙ্ঘমধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গ যখন সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর নেতা বা দলপতির সহিত ঐকাত্ম্য-ভাব বোধ করে, তখন ঐ সংহতি দৃঢ়তর হয়। এই দলপতি আবার পিতৃ-প্রতিকল্প (father-substitute)। আদিম যুগে পারিবারিক গোষ্ঠীর কর্তা কঠোর হস্তে তাঁহার অধীন সকলকে দমন করিতেন—ইহার ফলে পরিবারস্থ অন্য পুরুষেরা যদৃচ্ছ তাহাদের কাম পরিতৃপ্ত করিতে পারিত না এবং পরিবারস্থ কর্তার সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়া শাস্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিত; সেইরূপ বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলে দলপতির সহিত 'মানসিক ঐক্য' স্থাপন করিবার চেষ্টা করিত। সুতরাং সামাজিক ঐক্য ও সংহতি নির্ভর করে একদিকে দলপতির সহিত ঐক্যবোধের উপর এবং অপরদিকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক আকর্ষণের উপর।

ফ্রয়েডীয় মতবাদ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, তিনি 'কাম' (libido) প্রত্যয় দ্বারা সকল প্রকার সামাজিক সংগঠন ও আচরণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার ব্যাখ্যা অনেক সময় একদেশদর্শী ও কষ্টকল্পিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আদিম পারিবারিক সংস্থার যে বর্ণনা দান করিয়াছেন তাহা সকলে গ্রহণ করেন না; তাহা ছাড়া, আদিম সমাজমাত্রই পিতৃশাসিত বলিয়া তিনি যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, কারণ তিনি মাতৃশাসিত (matriarchal) পরিবার তথা সমাজ-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন নাই। আবার, কেহ কেহ এই আপত্তিও উত্থাপন করিয়াছেন যে, ঘৃণা বা বিদ্বেষকে প্রেম বা কামের সমতুল্য বলিয়া বর্ণনা করা উচিত নহে; কারণ বিদ্বেষ বা আক্রমণাত্মক বৃত্তি বলিয়া প্রাথমিক কোন বৃত্তি নাই—আত্মসাম্মুখ্য বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যাহত হইলে উহা আক্রমণাত্মক বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হয়। যৌন কামকে সমাজের

ভিত্তিরূপে গণ্য না করিয়া মানুষে মানুষে পারস্পরিক আলোচনা, পারস্পরিক মেলামেশার ইচ্ছাকে একটি মূল বৃত্তিরূপে গণ্য করা উচিত। ফ্রয়েড্ পারিবারিক সংস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পারিবারিক জীবনে পিতা বা কর্তার যে স্থান, সমাজ-জীবনে দলপতিরও সেই স্থান। এই মতবাদও পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। পারিবারিক জীবনে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীগুলি ঐভাবে গঠিত নহে। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ ও বিবিধ সামাজিক সংস্থা পারিবারিক আদর্শে গঠিত হইয়াছিল, ইহা না বলিয়া মানুষের মনে সামাজিক বৃত্তি আছে বলিয়াই সে পারিবারিক সংস্থা অব্যাহত রাখিয়াছে এবং ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃহত্তর সামাজিক সংস্থা গঠন করিতে পারিয়াছে, ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত।[২২]

(ঘ) **অনুকরণবৃত্তি**—টার্ডে (Tarde)[২৩] মনে করেন যে, সামাজিক ঐক্য ও সংহতির মূলে আছে অনুকরণ (imitation)। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মিথক্রিয়া সামাজিক বন্ধনের কারণ। সকল জটিল সামাজিক ক্রিয়াকেই অনুকরণ (imitation) ও আবিষ্কার (invention) এই দুই প্রক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা যায়। বিবিধ ব্যক্তির বাহ্য আচরণে যে সাদৃশ্য দেখা যায় ও উহাদের মধ্যে যে সাধারণ আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা যায়, তাহাদের সব কিছুরই মূলে আছে অনুকরণ। আর নূতন আবিষ্কারের ফলে সম্ভব হয় সামাজিক অগ্রগতি। অনুকরণের সাফল্যের ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য (যাহার ফলে 'সামাজিক দূরত্ব' বা social distance-এর সৃষ্টি হয়) কমিয়া যায় এবং সামাজিক সংহতি বা ঐক্য বৃদ্ধি পায়। অনুকরণের ফলে যে সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তাহাই 'সামাজিক প্রক্রিয়া'।

তবে বাহ্য আচরণের ক্ষেত্রে যে ভাবে প্রতিবর্তক (reflex) ক্রিয়ার ন্যায় যান্ত্রিক-ভাবে অনুকরণ-ক্রিয়া সাধিত হয়, ভাবধারা ও আদর্শের ক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপ হয় না।

---

২২ **তুলনীয় :** "The family...is a social group...in the interpretation of which it is necessary to take account of the wider society, of which, as it would seem, the family is always an integral, but not self-sufficient element" (M. Ginsberg, *Sociology*, p. 107).

২৩ Tarde-রচিত *Social Laws* **দ্রষ্টব্য।** Tarde-**এর** পূর্বে Bagehot **অনুরূপ মত তাঁহার** *Physics & Politics* (1873) **গ্রন্থে প্রকাশ করেন।**

অন্যের ভাবধারা ও আদর্শ গ্রহণ অভিভাবন (suggestion)-এর ফলে সাধিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব; কিন্তু সে অভিভাবনের অধীন বলিয়াই সামাজিক জীব হইতে পারিয়াছে।[২৪]

এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কেবলমাত্র অনুকরণের মাধ্যমে সকল প্রকার সামাজিক আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। সকল সময়ই যে আমরা অনুকরণ করিয়া চলি তাহা নহে। তাহা ছাড়া, অনুকরণের প্রবৃত্তি দ্বারা সমাজ তথা সামাজিক সংহতির উৎপত্তি হইয়াছে ইহাও বলা যায় না। পূর্ব হইতে কোন-না-কোন আকারে সমাজ না থাকিলে মানুষের মনে অনুকরণের ইচ্ছা জাগরিত হইত না—মানুষ সামাজিক জীব বলিয়াই সে সমাজের অন্য সকলের সহিত সমতা রক্ষা করিতে যায় এবং তাই সে অন্যের অনুকরণ করে; কিন্তু সে অনুকরণ করে বলিয়া সামাজিক জীব ইহা বলা যায় না।[২৫]

অনুকরণের স্বরূপ কী সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ কেহ অনুকরণকে প্রতিবর্তক ক্রিয়ারূপে গণ্য করেন, আবার কেহ বা ইহাকে সহজাত বৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া, আবার ঐচ্ছিক অনুকরণও আছে। সুতরাং অনুকরণবৃত্তি বলিয়া একটি কোন সুনির্দিষ্ট, সার্বিক প্রক্রিয়া নাই যাহার সাহায্যে সকল প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

অভিভাবন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও সামাজিক অনুকরণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে যে, কেনই বা এক বিশেষ প্রকারের আদর্শ বা ভাবধারার আবেদন এত তীব্র বা কার্যকরী হয়, আবার কেনই বা আর এক প্রকারের আদর্শ কার্যকরী হয় না। অভিভাবন তখনই কার্যকরী হয়, যখন অভিভাবনের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি অনুভূতি বা আবেগ থাকে।

পরিশেষে আমরা মন্তব্য করিতে পারি যে, **কোন একটি বিশেষ প্রত্যয়ের সাহায্যে সকল প্রকার সামাজিক ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না**: সামাজিক পরিস্থিতি মাত্রই অল্পবিস্তর জটিল এবং একটি মাত্র মূল সূত্র পূর্ব হইতে

২৪ প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, Aristotle-এর মত ইহার ঠিক বিপরীত; কারণ তিনি বলেন "Similars do not make a state."

২৫ Le Bon Sidis প্রভৃতি অভিভাবনশক্তির উল্লেখ করেন। তুলনীয়: "Man is a social animal no doubt, but he is social because he is suggestible." (Sidis, *The Psychology of Suggestion*, p. 310).

কল্পনা করিয়া লইয়া উহার আলোকে সকল সামাজিক আচরণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলে ঐ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যারই নামান্তর হইয়া পড়ে অথবা উহা নিতান্ত কষ্টকল্পিত হয়। সামাজিক ব্যবহারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ক্রিয়ার উত্তরে প্রতিক্রিয়া করা, অথবা কোন ক্রিয়া করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া আশা করা; অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়াই হইল সামাজিক আচরণের স্বরূপ। ইহারই ফলে আমরা নিজেদের বুঝিতে পারি বা নিজেদের 'অহং' সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি, আবার অন্যকেও বুঝিতে পারি। অবশ্য ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে সকল সময় একই লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা করে বা প্রত্যেকেই যে অপরের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলে বা সকল কার্যই যে সামাজিক মঙ্গলবিধানের কার্যে নিয়োজিত হয় তাহা নহে। সামাজিক কার্য সহযোগিতামূলকও হইতে পারে, আবার বিরোধিতামূলকও হইতে পারে। সুতরাং যূথচারিতা বা কাম বা কোমল অনুভূতি বা অনুকরণবৃত্তি অথবা এইরূপ কোন তথাকথিত প্রাথমিক বৃত্তি হইতে সামাজিক বৃত্তিকে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। **সামাজিক বৃত্তি কোন গৌণ বৃত্তি নহে—ইহা স্বরূপতঃ মুখ্য বৃত্তি। অন্যের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যের সহযোগিতায় অথবা বিরোধিতায় নিজেকে সমাজের মধ্যে ব্যক্ত করাই হইল সামাজিকতাবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য।**

৪। সামাজিকীকরণ (Socialization):

যদিও ব্যক্তিমাত্রই সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও ব্যক্তি-বিশেষ প্রথম হইতেই সমাজের সকল ভাবধারা, আদর্শ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারে না। শৈশব হইতে ধীরে ধীরে কতকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়া ব্যক্তি-বিশেষ সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এইভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। অর্থাৎ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্যক্তি-বিশেষ সম্পূর্ণরূপে সামাজিক হয় না, তাহাকে (জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক) সামাজিকতা আয়ত্ত করিতে হয়। অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সামাজিকীকরণের অর্থ ইহা নহে যে, মানুষ অসামাজিক জীব হিসাবে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পর সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়। **মানুষ সামাজিকতাবোধ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং সামাজিকীকরণের ফলে একটি বিশেষ সমাজের আদর্শ ও**

ভাবধারা গ্রহণ করিয়া উহার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়ে।[২৬]

বলা বাহুল্য, এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কোন সরল প্রক্রিয়া নহে—কতকগুলি বিবিধ প্রক্রিয়ার সহযোগিতায় সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। এই সকল বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে এবং ইহারা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে।

শিশু-জীবনের প্রথম হইতেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহাকে প্রভাবিত করে—সমাজ যেভাবে শিশুকে গ্রহণ করে, সমাজ তাহার নিকট হইতে যাহা আশা করে, তাহা তাহার মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করে। সমাজে শিশু যে প্রারম্ভিক মর্যাদা বা স্থান (initial status) লাভ করে, তাহা তাহার সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে সমাজে ও যে পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই সমাজ ও সেই বিশেষ পরিবার আশা করে যে, শিশু সেই বিশেষ সমাজ ও বিশেষ পরিবারের আদর্শ, প্রথা বা রীতিনীতির আলোকেই বর্ধিত হইবে এবং তাহা দ্বারা তাহার জীবনকে রূপায়িত করিয়া তুলিবে। সুতরাং সমাজ যখন সাগ্রহে শিশুকে গ্রহণ করে, তখনই তাহার সামাজিকীকরণ সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে। অপরপক্ষে শিশু যদি অবাঞ্ছিত সন্তান হয়,[২৭] তাহা হইলে সে সযত্নে লালিতপালিত হয় না, অনেক সময় তুচ্ছ অপরাধে কঠোর শাস্তি ভোগ করে এবং সে পিতামাতার আন্তরিক স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে; ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যাহত হয়। আবার শিশু যদি অতিরিক্ত আদর-যত্নে লালিতপালিত হয়, তাহা হইলেও তাহার ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই শিশু তাহার সামাজিক পরিবেশের সহিত সুষ্ঠু প্রতিযোজন করিতে সক্ষম হয় না এবং তাহার ফলে তাহার সামাজিকীকরণ কিছু পরিমাণ বিঘ্নিত হয়।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে; যথা, (ক) প্রাথমিক

---

২৬ সামাজিকীকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। 'Socialize'-পদের সংজ্ঞাদান করিয়া Watson বলিয়াছেন যে, ইহা হইল 'the process of teaching the individual through various relationships, educational agencies and social controls. to adjust himself to living in his society." (*Dictionary of Sociology*, Ed. by Fairchild).

২৭ শিশু নানা কারণে তাহার পিতা বা মাতার বা উভয়ের নিকট অবাঞ্ছিত হইতে পারে; যথা, বিবাহ-বহির্ভূত হওয়ার জন্য, বহু সন্তানের পরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য, অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে জন্মলাভের জন্য, জন্মের অব্যবহিত পরেই পিতা বা মাতার মৃত্যু ঘটার জন্য, যেখানে পুত্র-সন্তানের একান্ত বাসনা ছিল, সেক্ষেত্রে কন্যা জন্মানর জন্য ইত্যাদি।

মর্যাদাই সামাজিকীকরণের একমাত্র নির্ধারক হইতে পারে না; (খ) কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির (যেমন, পিতার বা মাতার বা পিতামহের বা পিতামহীর) মনোভাবই শিশু বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত তাহা নির্ধারণ করে না; (গ) একজনের নিকট যে অবাঞ্ছিত অপরের নিকট সে বাঞ্ছিত হইতে পারে (যেমন, কোন শিশু মাতার নিকট অবাঞ্ছিত, অথচ পিতার নিকট বাঞ্ছিত হইতে পারে); (ঘ) জন্মের সূচনায় যে অবাঞ্ছিত ছিল, সে নিজ গুণে বা অবস্থার তারতম্যে বাঞ্ছিত হইয়া উঠিতে পারে, অন্ততঃ তাহার অবাঞ্ছিতভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে; (ঙ) একই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে (যেমন, দরিদ্র পরিবারের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছে এমন একজন ব্যক্তি দরিদ্রজনোচিত জীবনযাত্রার মান বা আদর্শকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া ঐভাবে অভ্যস্ত হইতে পারে; আবার ঐ একই পরিবারের মধ্যে বর্ধিত হইয়া অপর একজন উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে)—সুতরাং একটি বিশেষ পরিবেশের একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রভাব সকলের উপর আছে এমন কথা বলা যায় না।

সামাজিকীকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার ফলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা প্রধানতঃ মানসিক। প্রতি সমাজেরই এক একটি নিজ নিজ কৃষ্টি আছে এবং এই সকল কৃষ্টির প্রভাবে কতকগুলি আদর্শ ও ভাবধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতি ব্যক্তি অন্যের সহিত আচরণের মাধ্যমে এবং বিবিধ সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে ঐ সকল আদর্শ ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসে। সকল ক্ষেত্রেই সকল ব্যক্তি যে উহাদের গ্রহণ করে তাহা নহে—অনেকে কোন কোন আদর্শ গ্রহণ করে এবং কোন কোনটি বর্জন করে। এই গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ আরও ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে যেন অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং একদিকে সে যেমন সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, অপরদিকে সে উহার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

জন্মের পর হইতেই শিশুকে যখন পিতামাতা ও অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্কেরা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে, তখন হইতেই তাহাদের আদর্শ অনুসারে শিশুর সামাজিকীকরণের সূত্রপাত হয়। (অবশ্য শিশু যদি কাহারও নিকট অবাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে সে শিশুর প্রতি যে ঔদাসীন্য বা বিরক্তি দেখায়, তাহার বিরুদ্ধে শিশুমনও নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং তাহার সামাজিকীকরণ অন্য পথে চলিতে পারে)। শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের নানাপ্রকার আকার ইঙ্গিত বুঝিতে ও অনুকরণ করিতে

শিখে এবং প্রচলিত ভাষা আয়ত্ত করিতে থাকে। ভাষা যতই আয়ত্ত হয়, ততই উহা সামাজিকীকরণের অন্যতম প্রধান সহায়ক হইয়া উঠে।

পারিবারিক সংস্থার মধ্যে সামাজিকীকরণের যে সূত্রপাত হয়, তাহাই ক্রমশঃ শিক্ষায়তন ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং দৃঢ়তর হয়; শিক্ষায়তন ব্যতীত ক্রীড়া-সঙ্ঘ, ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিবিধ আমোদপ্রমোদ ও উৎসবাদির মাধ্যমেও সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়।[২৮] মোট কথা, যেখানেই ব্যক্তি-বিশেষ **পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবার এবং অন্যকে প্রভাবিত করিবার সুযোগ লাভ করে, যেখানেই তাহার সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের প্রয়োজন হয়, সেখানেই কোন-না-কোন ভাবে তাহার সামাজিকীকরণ ঘটে।**

যেহেতু শিক্ষায়তনের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমাজ তথা রাষ্ট্র সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষায়তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রই ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে, ব্যক্তি-বিশেষ কী শিক্ষা করিবে, কোন্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে, কিভাবে সামাজিক জীব হিসাবে সমাজ মধ্যে আচরণ করিবে। এইখানেই রাষ্ট্রের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। অনেক একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র শিক্ষায়তনের মাধ্যমে এইরূপ প্রচেষ্টা করে যে, ব্যক্তি-বিশেষ যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা না করিতে পারে, যেন সকল কাযে সে নিজেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধীন দাস মনে করে। কিন্তু ইহা বাঞ্ছনীয় নহে, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ সাধন করা। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ব্যক্তি-বিশেষ স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিয়া সমাজের সহিত যতদূর সম্ভব সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিযোজন করিতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিকীকরণের দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাদের ঐ দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(ক) একদিকে দেখিতে

২৮ তুলনীয়: "(Socialization process) is a socio-psychological process, whereby the personality is created under the influence of the educational institutions...It is a process centered fundamentally around the School, the base of all organized educational efforts and aims, which gives the whole educational process a definite direction." (*Dictionary of Sociology*. Ed. by Fairchild).

হইবে যে, ব্যক্তি-বিশেষ যেন অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিয়া আদর্শ-বিচ্যুত, উচ্ছৃঙ্খল, অসামাজিক জীবে পরিণত না হয় ; (খ) অপর দিকে দেখিতে হইবে যে, সে যেন স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতাবিহীন 'সমাজ-দাস'-এ রূপান্তরিত না হয়। সামাজিকীকরণের শিক্ষার লক্ষ্য হইবে ব্যক্তি-বিশেষকে আত্মমর্যাদাশীল, সুষ্ঠু-প্রতিযোজনশীল ব্যক্তিরূপে গড়িয়া তোলা।

৫। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদ বা সমষ্টিবাদ (Individualism & Socialism or Collectivism):

ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ কী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে, এই বিষয় দুইটি বিপরীত মতবাদ প্রচলিত আছে। একটিতে **ব্যক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব** আরোপ করা হয়—ইহা হইল **ব্যক্তি, স্বাতন্ত্র্যবাদ** (individualism)। অপরটিতে **ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টি বা সমাজের উপর গুরুত্ব** আরোপ করা হয়—ইহা হইল **সমষ্টিবাদ বা সমাজবাদ** (socialism[২৯])।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদ এই দুইটি মতবাদই তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচিত হইতে পারে—পদ্ধতিগত (methodological), রাষ্ট্রতত্ত্বগত (political) ও সমাজতত্ত্বগত (sociological)। অবশ্য এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিতে পারে না।

(ক) **পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গী** হইতে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবর্তন করা হয় তাহাতে বলা হয় যে, যে কোন সামাজিক ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপাদি লক্ষ্য করা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং যে কোন সামাজিক গোষ্ঠী আলোচনার সময় উহাকে 'স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট' পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপরপক্ষে, পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজবাদিগণ বলেন যে, সমাজ তথা সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক গোষ্ঠী বুঝিবার কালে উহাদের সর্বদা সামগ্রিক (holistic) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা

২৯ ইংরাজি socialism-পদটি একটি বিশেষ মতবাদ বুঝাইতে পারে। আবার বিশেষ প্রকার সমাজ ব্যবস্থাও বুঝাইতে পারে। প্রথমোক্ত অর্থে আমরা বাংলা প্রতিশব্দ করিতে পারি 'সমাজবাদ', আর দ্বিতীয়োক্ত অর্থে ইহার প্রতিশব্দ করিতে পারি 'সমাজতন্ত্র'।

করা প্রয়োজন, কারণ যে কোন সামাজিক গোষ্ঠী বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে উহার মূলগত ঐক্য নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা এক বিকৃত রূপ ধারণ করে।[৩০]

বলা বাহুল্য, এই দুইটি মতবাদই সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইহাদের কোনটিই সমর্থনযোগ্য নহে। যেমন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজকে আলোচনা করা যায় না, সেইরূপ সমাজের যে সমগ্রত্ব আছে তাহাও অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ; সুতরাং সমাজের আলোচনায় ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিলে তাহা অবাস্তব হইয়া যাইবে। আবার ব্যক্তি মাত্রই সামাজিক জীব—সমাজের মধ্যে থাকিয়া পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সে কার্য করে। সুতরাং যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি কার্য করে, তাহা না জানিলে ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে একটিমাত্র পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারেন না এবং এই কারণ **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়ই বাঞ্ছনীয়**। যে কোন সামাজিক সংস্থা, প্রথা, বা রীতিনীতি মনঃসঞ্জাত, আবার যে কোন ব্যক্তির মনই সামাজিক সংস্থা, প্রথা বা রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত। এইজন্য ব্যক্তি বা সমাজ যে কোন একটির আলোচনায় অন্যটির আলোচনা আসিয়া পড়ে। সুতরাং মাত্র একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে।[৩১]

---

৩০ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অধ্যাপক Hayek বলিয়াছেন: "...there is no other way towards an understanding of social phenomena but through our understanding of individual actions directed towards other people and guided by their expected behaviour." (*Individualism: True and False*, p. 8), অপর পক্ষে সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অধ্যাপক Frank Knight বলেন: "the individual is not a datum and social policy ought not to treat him as such. ...The social game ..goes on continuously generation after generation, with players constantly dropping out and being replaced." (*Freedom and Reform*, pp. 283-84).

৩১ এ বিষয়ে অধ্যাপক Ginsberg-এর অভিমত অবধানযোগ্য; তিনি বলেন: "most sociological investigations...are concerned with structural relations in their bearing on individuals or groups. In so far as they deal with the 'meaning' of social processes, they do not confine themselves to 'understanding' in the sense of what can be known by looking within the mind....Psychology, however, cannot claim ultimacy or primacy in sociological explanations. Institutions are the products of minds, but conversely minds are shaped by institutions." (*On the Diversity of Morals*, p. 160).

(খ) রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাষ্ট্রবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়।

রাষ্ট্রতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, **রাষ্ট্রের প্রজারা যখন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী স্ব স্ব কার্য্য করিতে পায়** (বিশেষতঃ স্বীয় মতবাদ পোষণ ও প্রচার করিতে পারে), **তখনই রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গল**। আধুনিক কালে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ এই মতের একজন প্রধান সমর্থক। তিনি তাঁহার *On Liberty* নামক পুস্তকে এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মূল বক্তব্য হইল যে, প্রতি মানুষ যদি অন্য মানুষকে তাহার রুচি, ইচ্ছা বা আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিবার স্বাধীনতা দান করে, তাহাতেই রাষ্ট্রের মঙ্গল।[৩২] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিল্ স্বাধীন প্রচেষ্টার নীতি (*laissez faire*) সমর্থন করেন—এই নীতি অনুযায়ী প্রতি ব্যক্তিরই যে কোন অর্থনৈতিক লেনদেন চালাইবার স্বাধীনতা আছে। ইহাতেই তাহার সুখ। প্রতি ব্যক্তিই যদি স্বাধীনভাবে নিজের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার যোগফলে সমগ্র সমাজের কল্যাণ তথা সুখ হইবে। সুতরাং কোন প্রকার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতাই হইল অর্থনৈতিক আদর্শ। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দৃষ্টিতে **রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন মূল্য নাই**[৩৩]—ইহার মূল্য আপেক্ষিক। একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা যাহাতে আর

৩২ মিলের ভাষায়: "Mankind are greater gainers by suffering each other to live as seems good to themselves than by compelling each to live as seems good to the rest."

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। প্রাচীন গ্রীক্ সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কিছু কিছু প্রসার লাভ করে। প্লেটোর *Dialogues* সমূহে আমরা এমন অনেক ব্যক্তির সহিত পরিচিত হই যাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি ইঙ্গিত করে। তাঁহার *Republic* গ্রন্থে Glaucon এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তি মাত্রই স্বার্থপর এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষণের জন্য ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধীয় নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

প্লেটোর *Protagoras* গ্রন্থে Hippias বলেন: "By nature like is a kin to like, whereas law is the tyrant of mankind and often compels us to do many things which are against nature." আবার সুখবাদী (Hedonist) এপিকিউরাস্ (Epicurus) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করেন। খৃষ্টীয় Reformation-এর যুগে এই মতবাদ সমর্থিত হয়। আধুনিক যুগে হব্‌স্, হিউম্, বেন্থাম্, মিল্ প্রভৃতি ইহা প্রচার করেন।

৩৩ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম বাণী হইল: "To every man full liberty, provided he does not interfere with the like liberty of another." অধ্যাপক Joad-এর ভাষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন—"(*a*) That each individual is equally far-sighted and has an equal capacity for

একজন খর্ব না করিতে পারে, তাহাই দেখা হইল রাষ্ট্রের কর্তব্য। কোন কোন চরমপন্থী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী শেষ পর্যন্ত নৈরাষ্ট্রবাদ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে **পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থনযোগ্য নহে**। (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে মত সমর্থন করেন তাহার পরিণাম অনেক সময়ই ক্ষতিকর। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে, ব্যক্তিমাত্রেরই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এইরূপ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়। তাঁহারা আশা করেন যে, যে বক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যায়, সে অপরের স্বাধীনতায় কখনও বাধা দেয় না। কিন্তু মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশে ক্ষেত্রেই এই আশা অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। (খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে লোকে অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন উপায় (তাহা যত হীনই হউক্ না কেন) গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।[৩৪] (গ) রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর অন্ততঃ অপ্রয়োজনীয় সংস্থা —এই ধারণাও ভুল। এ কথা সত্য যে, কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমর্থনযোগ্য নহে; এবং রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কখনও ভুল করিতে পারে না ইহাও বলা যায় না। কিন্তু ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, রাষ্ট্রমাত্রই অকল্যাণকর ও অপ্রয়োজনীয় সংস্থা। **আদর্শ রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতার শত্রু নহে**, বরং ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিবিধ শত্রু আছে এবং রাষ্ট্র তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মর্যাদা দিবার চেষ্টা করে।[৩৫]

knowing what he wants. (*b*) That each individual possesses an equal power of obtaining what he wants, and an equal freedom of choice. (*c*) That the satisfaction of the wants of all individuals is identical with the well-being of the community as a whole." (*Introduction to Modern Political Theory*, p. 31). ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মানুষের শুভবুদ্ধি ও শুভসঙ্কল্পে এইরূপ নিরঙ্কুশ বিশ্বাস দ্বারা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩৪ বাস্তবিক বর্তমানকালে কেহ অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতা সমর্থন করেন না। এইজন্য G. D. H. Cole মন্তব্য করিয়াছেন: "Capitalism cannot be individualistic today and has long ceased to extol unregulated competition as an ideal. As a prejudice laissez faire survives... ; as a doctrine deserving of theoretical respect it is dead." (*Encycl. of Soc. Sc.*, Art. on *Laissez Faire*).

৩৫ তুলনীয়: "There are many enemies of liberty besides the state and it is in fact by the state that we have fought them." (L.T. Hobhouse, *Elements of Social Justice*, p. 83).

তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থনীয় না হইলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি গুণ হইল যে, ইহা **প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয়** এবং ব্যক্তি-বিশেষ যাহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া সমাজের দাস না হইয়া পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে বলে। প্রতি ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব হইল একটি অনুপম সত্তা (unique being) এবং এই কারণ এক ব্যক্তির স্থান অন্য কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না।[৩৬] কোন সামাজিক সংস্থাই সম্পূর্ণরূপে অন্য কোন ব্যক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। কোন সংস্থারই উচিত নহে কোন আদর্শবোধ বা মূল্যবোধ ঐ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর চাপাইয়া দেওয়া—প্রতি ব্যক্তিরই সম্মুখে বহুবিধ বিকল্প আদর্শ আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে একটি নির্বাচন করার ক্ষমতাই ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।[৩৭]

এইবার রাষ্ট্রীয় **সমাজবাদের** আলোচনা করা যাউক্। এই মতবাদ অনুসারে **ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য থাকিবে**। সমাজবাদীরা আশঙ্কা করেন যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে সমাজ তথা জনগণের স্বার্থ বিপন্ন হইবে এবং তাহাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হইবে। এইজন্য ব্যক্তির সকল শিক্ষাদীক্ষা এবং কার্যকলাপ সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজের সর্বাপেক্ষা সুসংহত সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রেরই এই নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা উচিত।

সমাজবাদ এমন সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে যে অনুসারে সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকলের মধ্যে যেন সাম্যের সৃষ্টি হয়।[৩৮] কিন্তু এই সাম্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজন

৩৬ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মধ্যে আমেরিকার যোশিয়া রইস্ (Josiah Royce) বিশেষভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অনুপমত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত *World and the Individual*, *Conception of God* ও *Problems of Immortality* দ্রষ্টব্য। সমাজতত্ত্ববিৎ জিন্‌স্‌বার্গ (Ginsberg) ব্যক্তিত্বের অনুপমত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন: "Though the individual consists largely of his social relations, there is thus a core of individuality in each person which is in the last resort, unshareable and incommunicable." (*On the Diversity of Morals*, p. 157).

৩৭ এই মতবাদের সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন David Riesman; তাঁহার রচিত *Individualism Reconsidered* দ্রষ্টব্য।

৩৮ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ন্যায় সমাজবাদও একটি প্রাচীন মতবাদ। প্লেটো তাঁহার Republic-এ এক বিশেষ প্রকারের সমাজবাদ প্রচার করেন। (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সমাজবাদের বিবিধ প্রকারভেদ আছে (সমাজবাদের বিভিন্ন শ্রেণীর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Joad, *Introduction to Modern Political Theory*)। সমাজবাদের একটি চরম রূপ হইল সাম্যবাদ (বা communism)।

অর্থনৈতিক সমতা। এইজন্য সমাজবাদীরা অর্থনৈতিক সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমাজে যাহাতে কোন প্রকার ধন-বৈষম্য না থাকে সে দিকে বিশেষভাবে অবহিত থাকিতে বলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা সমর্থন করেন। সমাজবাদীরা বলেন যে, ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল হইল যে, কতকগুলি লোকের হাতে অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হয়—ফলে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ধনীরা শোষক এবং নির্ধনেরা শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিবার জন্য সমাজবাদীরা যে সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন তাহাতে শিল্প-সংস্থায় ও সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বামিত্ব থাকিবে না—উহার পরিবর্তে তাঁহারা শিল্প প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক সত্তা রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রসাৎ প্রক্রিয়া (nationalisation)-এর মাধ্যমে উৎপাদনের উপাদানগুলি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইলেই উৎপন্ন দ্রব্যগুলি জনকল্যাণের জন্য প্রস্তুত হইবে এবং সুসমভাবে বণ্টিত হইবে। সমাজবাদের লক্ষ্য হইল এক শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করা—যে সমাজে ধনী-দরিদ্রের, প্রভু-ভৃত্যের, শাসক-শাসিতের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই এবং যে সমাজ সকলেই সকলের সহিত মৈত্রী ও সাম্যের সূত্রে গ্রথিত [৩৯]

সমাজবাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ন্যায় ইহাও একটি **চরম মতবাদ** এবং ইহাও **একদেশদর্শী**। (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সেইরূপ সমাজবাদ ব্যক্তির সত্তা অগ্রাহ্য করিয়া সমাজের সমষ্টিগত সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইহার ফলে ব্যক্তি তাহার নিজস্ব সত্তা হারাইয়া সমাজ তথা রাষ্ট্রের একনায়কত্বের অধীন হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সমষ্টিবাদ বা সমাজবাদ প্রচলিত হইলে রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকেন, কেবল তাঁহাদেরই সার্বভৌমত্ব

৩৯ তুলনীয়: "The distinction between socialism and capitalism is not in the character of the productive mechanism but in the location of the ownership of Capital, Land and Business. The effect of complete socialism would be to wipe out entirely what has been called 'property' or 'ownership' income, and leave only 'service' or 'doership' income...... There would be no possibility of deriving income from the ownership of production goods, or from what in socialistic terminology is called the 'exploitation of labor'." (Fairchild, *Dictionary of Sociology*, p. 297).

ও একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব স্থাপিত হয়। ফলে শ্রেণীহীন সমাজ-স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং শাসক-গোষ্ঠী একটি নূতন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। (খ) এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাদৃত ত' হয়ই না, পরন্তু ব্যক্তি যেন সমাজের দাস হইয়া পড়ে। নীতিদর্শনের দিক্ হইতে ইহাই হইল চরম সমাজবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি। মানুষকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রাধীন রাখার ফলে তাহার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কার্য করিবার ক্ষমতা ব্যাহত হয় এবং তাহার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতাও লুপ্ত হইয়া যায়। (গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের কার্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন মাত্র একটি নির্দিষ্ট মান বা আদর্শ অনুসারে চলে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং নূতন উদ্ভাবনের ক্ষমতা ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সমাজবাদের **গুণ** হইল যে, সম্পূর্ণরূপে সমাজের বাহিরে ব্যক্তির পৃথক্ সত্তা যে থাকিতে পারে না তাহার প্রতি ইহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা ছাড়া, মানুষে মানুষে অযথা পার্থক্য বা বৈষম্যের সৃষ্টি হওয়ার ফলে রাষ্ট্রে অযথা ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় ; এবং এই কারণে সমাজবাদীরা সামাজিক বৈষম্য দূর করা ও সকলকে সমান সুযোগ দানের যে কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

পরিশেষে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই দুইটি বিরোধী মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদ ইহাদের দুইটির মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে, আবার উহাদের যে কোন একটি চরম রূপ ধারণ করিলে তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে, কেহই বিশুদ্ধ বা অমিশ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজবাদ সমর্থন করিতে বা সেই অনুসারে কার্যক্ষেত্রে চলিতে পারেন না। সমাজ (তথা রাষ্ট্র) এবং ব্যক্তি পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে এবং উভয় মিলিয়া একটি 'সমগ্র-সত্তা'। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণ সর্বদাই পরস্পর বিরোধী হইতে পারে না।[৪০] **প্রকৃত সমাজ**

৪০ তুলনীয়: (১) "It does not appear however, that there is any real opposition between the principles of Individualism and of Socialism. The good of all can certainly not be secured if the nature of each is cramped and undeified." (J. S. Mackenize, *A Manual of Ethics*, p. 300).

বাদের আদর্শ অনুসারে কোন রাষ্ট্র চলিলে তাহা ক্রমশঃ জনকল্যাণ-মূলক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া উচিত, কারণ জনগণকে নিপীড়ন করিয়া বা তাহাদের সমাজের দাসরূপে পরিণত কখনও সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিয়া সমগ্র সমাজ তথা ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করে।[৪১]

(গ) **সমাজবিত্তা বা সমাজতত্ত্বগত** (sociological) দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজের উৎপত্তি ও স্বরূপ আলোচনা কালে এবং সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ (বিশেষতঃ আদর্শ সম্বন্ধ) নিরূপণ কালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদ এই দুই পৃথক্ মতবাদের সৃষ্টি হয়।

সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ হইবে—ব্যক্তি সমাজের অধীন থাকিবে অথবা সমাজ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইবে—তাহার সমাধান কল্পে এক-দল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অপর একদল সমাজবাদ সমর্থন করেন। সমাজের মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণই ব্যক্তিগণকে পরিচালিত করিবেন, ইহাই সমাজবাদীরা বলিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা রাষ্ট্রীয় সমাজবাদে রূপান্তরিত হয়। আমরা এইমাত্র রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ আলোচনা করিয়াছি এবং ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সমাজের উৎপত্তি ও স্বরূপ আলোচনাকালে **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের** সমর্থকগণ মনে করেন যে, **সমাজমাত্রই কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত** অর্থাৎ **সমাজের ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিতান্তই বাহ্য ও আকস্মিক—উহারা কোন অন্তর্নিহিত যোগসূত্র দ্বারা গ্রথিত নহে।** মানুষ নিজের সুবিধার জন্যই সমাজবদ্ধ হইয়াছে। সমাজবদ্ধ হইলেও মানুষ তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। এই মতবাদের বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছে সামাজিক চুক্তিবাদে। (পৃঃ ৪৩)।

অপর একদল লেখক **সমাজবাদ** সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, **সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ। মানুষ স্বভাবতঃ বা**

---

৫০ (২) "No one can really be an absolute individualist, any more than any one can be an absolute socialist. For the individual and society interact on one another and depend on one another." (A. D. Lindsay, Art. on Individualism, *Encycl. of Soc. Sc.*).

৪১ **এইজন্য বলা হইয়াছে :** "A society in which socialism is well established will necessarily, and almost automatically, demand and achieve a democratic form of state." (Fairchild, *op. cit.*, p. 296).

স্বরূপতঃ একটি সামাজিক জীব এবং সমাজাতিরিক্ত তাহার নিজস্ব কোন পৃথক্ অস্তিত্ব বা সত্তা থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ প্রাণি-দেহের উপমা প্রদান করা হয়—প্রাণি-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যেমন দেহ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সমগ্র দেহের উপর নির্ভরশীল, সেইরূপ ব্যক্তিও সমগ্র সমাজের উপর নিভরশীল। (সমাজসম্বন্ধীয় জৈব মতবাদ, পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য)। চরম সমাজবাদীরা আবার সমাজের একটা অতি-ব্যক্তিক (super-individual) অস্তিত্ব কল্পনা করেন, তাহারা বলেন যে, এই অতি-ব্যক্তিক সমাজ হইল এক মনোবিশিষ্ট সত্তা এবং ইহার প্রকাশ ঘটে সমষ্টিগত ইচ্ছা (collective will)-এর মাধ্যমে। (পৃঃ ৬১-৬২)।

আমরা পূর্বে (পৃঃ ৫১-৬৭) সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, সামাজিক চুক্তিবাদ বা জৈববাদ বা অনুরূপ কোন একটি বিশেষ মতবাদ দ্বারা সমাজের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয় বাঞ্ছনীয়। যে কোন ব্যক্তির কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, একদিকে সে আত্মনির্ভরশীল, আত্মনিয়ন্তা, স্বাধীন ইচ্ছাব অধিকারী; আবার অপরদিকে সে পরনিভরশীল, পরের দ্বাবা প্রভাবিত, এমন কি অন্যের ইচ্ছার নিকট সে মাথা নত করে। একদিকে তাহার আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গী, সে অনুপম, তাহার যথাযথ বিকল্প (substitute) পাওয়া দুরূহ; আবার অপরদিকে অন্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, সে অন্যকে অনুকরণ করে, অন্যের আদর্শ গ্রহণ করে।[৪২] মানুষ যে সকল সামাজিক সংস্থার মধ্যে বিচরণ করে, সেগুলি মনোবিশিষ্ট মানুষ দ্বারা পরিকল্পিত, গঠিত ও সংরক্ষিত হইলেও তাহাদের অতি-ব্যক্তিক ও পৃথক্ মানসিক সত্তা নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তিই উহাদের প্রভাব হইতে বিমুক্ত নহে। সুদূব অতীতে মানুষের বিবর্তন ঘটিবার পর হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পব হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন

৪২ জিন্‌স্‌বার্গ (Ginsberg)-এর ভাষায়: "Looked at in this way, individuals can be seen to be at once self-determining and interdependent, though in what degree, depends upon the type of social structure and the relation of the individual to it." (*op. cit.*, p. 160).

মানুষের ভিতর দুইটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন: "In the relations between the individual and the group, this constant tendency of Nature appears as the strife between two equally deep-rooted human tendencies, individualism and collectivism." (*The Ideal of Human Unity*, p. 15)

থাকিতে পারে না, সেইরূপ একটি আর একটির মধ্যে লয়প্রাপ্তও হয় না। সুতরাং সমাজ আগে, তাহার পর ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি আগে, তাহার পর সমাজ— এইরূপ আলোচনা নিরর্থক।[৪৩]

(ঘ) উপসংহার ও মন্তব্য: বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, **সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই এবং থাকা উচিত নহে এবং এইজন্য বাস্তবক্ষেত্রে একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না।** মানুষের মধ্যে দুইটি স্বভাব আছে—একদিকে আছে তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা বোধ (sense of individuality) এবং অপর দিকে আছে তাহার সামাজিকতা বোধ (sense of sociality)।[৪৪] মানুষের মধ্যে এই দুইটি ধারণা পরস্পরের পরিপূরকরূপে কার্য করে—মানুষ সামাজিক অথচ তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের ক্ষমতা আছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বর্ধন (development) লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, দুইটি আপাতবিরোধী প্রক্রিয়া কার্য করিতেছে—একটি হইল আত্মপ্রকাশ বা আত্ম-স্বতন্ত্রীকরণ (individualisation), অপরটি হইল সামাজিকীকরণ (socialisation)। মানুষ এই জগতে একটি পৃথক ব্যক্তিভাবে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু জন্মের পরমুহূর্ত হইতেই সে বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের চেষ্টা করে। সে ধীরে ধীরে যতই বড় হইতে থাকে, ততই সে সমাজের আদর্শ ও ভাবধারা গ্রহণ করিতে থাকে, নিজেকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে থাকে, নিজের স্বার্থও বুঝে এবং পরের জন্যও কাজ করিতে শিখে। কিন্তু সকল সময়ই সে সমাজের

---

৪৩ তুলনীয়: "The individual is not prior to society or society to the individual. Community is not precedent to competition or competition to community. From the first, competition and community, society and the individual, have been co-ordinate. Society and the individual have always been acting and reacting upon each other; competition and community have always been limiting each other." (Giddings, *Principles of Sociology*, p. 399).

৪৪ এক্ষেত্রে কয়েকটি পদের অর্থের তারতম্য লক্ষ্য করিতে হইবে: সমাজবাদ (socialism) এবং individualism (আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদ) হইল সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে মতবাদ; সামাজিকতা (sociality) ও ব্যক্তিত্ব (individuality) হইল ব্যক্তিবিশেষের দুইটি গুণ; এবং সামাজিকীকরণ (socialization) ও আত্মস্বতন্ত্রীকরণ (individualization) হইল দুইটি প্রক্রিয়া (process)।

আদর্শ বা চিন্তাধারার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে না বা সমাজের সকল আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি গ্রহণ করিতে পারে না এবং সেই কারণ মধ্যে মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে। তাহা ছাড়া, সে যখন সমাজের আদর্শকে গ্রহণ করে, সেই গ্রহণের মধ্যেও তাহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এইভাবে সামাজিকীকরণের সহিত চলে আত্মপ্রকটীকরণ বা আত্মবৈশিষ্ট্যের প্রকাশ (self-assertion বা self-expression)। আত্মবৈশিষ্ট্য প্রকাশের এই বাসনার জন্য মানুষ সম্পূর্ণরূপে একটি অনুকরণশীল যান্ত্রিক সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয় না। সামাজিকীকরণের ফলে মানুষে মানুষে বৃহত্তর যোগসূত্র স্থাপিত হয়, মানুষের সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সে অন্যের সহিত সহযোগিতা করে; আবার আত্মস্বতন্ত্রীকরণ বা আত্মবৈশিষ্ট্য প্রকাশের দ্বারা মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, অন্যের প্রভাব স্বীকার না করিয়া অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, অর্থাৎ আত্মসাম্মুখ্যের প্রচেষ্টা করে।[৪৫] এই দুইটি বিপরীত বৃত্তি থাকার জন্য কখনও ব্যক্তি সমাজের আধিপত্য স্বীকার করে, আবার কখনও সমাজকে অগ্রাহ্য করে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের মিলন কখনও স্থায়িভাবে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে না। সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ, সংঘাত, অপপ্রতিযোজন দেখা দেয় এবং ইহার জন্য ব্যক্তি-বিশেষের মনে হতাশা ও ব্যর্থতার ভাব দেখা দিতে পারে। যাহারা সমাজবিরোধী কার্য

৪৫ এই দুই প্রক্রিয়া (individualization ও socialization)-কে ব্যাখ্যা করিয়া MacIver বলিয়াছেন: "By 'socialization' we mean the process by which social beings establish wider and profounder relationships with one another in which they become more bound up with and more dependent on another, in which they develop the sense of their obligation to and responsibility for others, in which they grow more perceptive of the personality of themselves and of others and build up the complex structure of nearer and wider association......Individualization on the other hand is the process in which men become more autonomous or self-determining, in which they advance beyond mere imitativeness or acceptance of standards which come to them with only an outer sanction, in which they become less bound by tradition and custom in the regulation of their lives, less submissive to authority and dictation in matters of thought and opinion, recognizing that each is a unique focus of being......" (*The Elements of Social Science*, pp. 144-45).

করিতে যাইয়া প্রতিহত হয়, তাহাদেরই মনে যে কেবল ক্ষোভের সঞ্চার হয় তাহা নহে, এমন কি সমাজের অনুশাসনের ফলে অনেক আদর্শবাদী ব্যক্তির মনেও ব্যর্থতার ভাব দেখা দিতে পারে। সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক এমনই যে, একবার উহা পূর্ণ সামঞ্জস্যের পথে অগ্রসর হয়, আবার ঐ সামঞ্জস্য ব্যাহত হইয়া সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক যেন সুরহীন হইয়া পড়ে। এই কারণ সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ মিলনও সম্ভব হয় না, আবার পূর্ণ বিচ্ছেদও ঘটে না।[৪৬]

সমাজ ও ব্যক্তির বাস্তব সম্পর্ক যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে উহার পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন কতকগুলি আদর্শ পরিকল্পনা করিতে পারে :

(ক) ব্যক্তি সমাজের বাহিরে বা সম্পূর্ণরূপে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না ; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তি সমাজের দাসরূপে পরিণত যাহাতে না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।[৪৭]

(খ) ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অধিকার থাকিবে, নহিলে সে সামাজিক যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অর্থ স্বার্থপরতাবৃদ্ধি নহে। ইহা কেবলমাত্র ব্যক্তির স্বরূপের প্রকাশ ও স্বীয় মূল্য বা মর্যাদা উপলব্ধি করা। ব্যক্তি যখন তাহার স্বরূপ ও মূল্য বুঝিতে পারে, তখন সমাজমধ্যে সে স্বীয় দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একটি নৈতিক দিক্ আছে। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এই অর্থ নহে যে, অপরকে অহেতুক পীড়ন করিতে হইবে বা অপরের সহিত বিরোধ করিতে হইবে ; অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে।

৪৬ MacIver ও Page-এর ভাষায় : "Conflicts and clashes, repressions and revolts are always occuring. Within every group, and between groups, there is an incessant struggle of diverse and opposing interests. There are frictions, maladjustments, competitive jealousies and intolerances, sheer repressions and exploitations...Social integration is never complete, never totally harmonious." (*Society*, pp. 52-53),

সেইরূপ Frank Knight মন্তব্য করিয়াছেন : "Man says he is a social being, which is true to a degree. In general men are more or less social and antisocial in relations within groups of infinite variety to which they belong, but are predominantly antisocial across group boundaries."

৪৭ ক্যাণ্টের অন্যতম অমর বাণী স্মরণ রাখিতে হইবে : "Treat humanity, whether in thy own self or in that of others, always as an *end* and never merely as a means."

(গ) সমাজ যদি কঠোর অনুশাসনের বশবর্তী হয়, সামাজিক প্রথাগুলি আক্ষরিক অর্থে প্রতিপালনের উপর যদি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি হয় না—ব্যক্তির মধ্যে যখন সামাজিকতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্য যুগপৎ প্রকাশের সুযোগ লাভ করে এবং পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে উহারা কার্য করে, তখনই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল।

(ঘ) সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজ সংগঠনকারী প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই যতদূর সম্ভব সামাজিকতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন বাঞ্ছনীয়। প্রতি ব্যক্তিরই কর্তব্য হইল আত্মশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করা এবং সমাজের যুক্তিপূর্ণ নির্দেশগুলি মান্য করা ও সকলের সহিত সহযোগিতায় সমগ্র সমাজের কল্যাণের চেষ্টা করা।[৪৮]

(ঙ) সমাজকে পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সাধারণতঃ কোন আদর্শ অনুধাবন করা বা কোন কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে। (অবশ্য সামাজিক কর্তব্য ব্যতীত সমাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই এমন কর্তব্য থাকিতে পারে।) প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে বুদ্ধ, চৈতন্য ইত্যাদি মহাপুরুষ সমাজ ত্যাগ করিয়া কি ভ্রান্ত পথ অনুধাবন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র পরিবার বর্জন করিলেও বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

(চ) প্রতি ব্যক্তিরই একটা সমাজাতিরিক্ত সত্তা আছে—ইহাকে সম্পূর্ণরূপে কোন একটি সর্বজনীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা একটি কোন সাধারণ সামাজিক প্রত্যয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সুতরাং সামাজিক জীব হিসাবে যদিও মানুষের অধিকাংশ কর্তব্যই সমাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলেও এমন কতকগুলি কর্তব্য থাকিতে পারে যেগুলির সহিত সমাজের পরোক্ষ সংযোগ থাকে। যেমন, একজন চিত্রকরের চিত্রকর হিসাবে এমন কতকগুলি কর্তব্য

৪৮ রাইট (Wright) এই আদর্শের প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন: "The personality of a man is, to the social scientist, that marriage of individuality and sociality which expresses itself in freedom of thought and outlook, reverence for self, and respect for others and for Society, and that desire for the realisation of happiness for all men and a longing to do one's part in this realisation which is the inevitable consummation of this union." (*The Elements of Sociology*, p. 198).

থাকিতে পারে (যথা, রঙের তুলিগুলি যথাযথভাবে পরিষ্কার রাখা) যাহাদের সহিত সমাজের অন্য সকলের প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই (অবশ্য তাঁহার অঙ্কিত চিত্র একদিকে সামাজিক ঘটনা ও আদর্শের প্রতীক হইতে পারে এবং অপরদিকে সমাজকে প্রভাবিত করিতে পারে)। সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষ এই দুই শ্রেণীর কর্তব্যের সম্মুখীন হইতে পারে এবং তাহাকে হয়ত' এইজন্য মধ্যে মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হয়।[৭৯]

(ছ) ইহা ব্যতীত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব (যাহা কতকাংশে বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং কতকাংশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে ঘটিত) ব্যতীতও মানুষের মধ্যে এমন একটি শাশ্বত অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে, যাহা হইল দেশকালাতীত এবং যাহাকে দার্শনিক আখ্যা দিয়াছেন 'আত্মা'। ব্যক্তি-বিশেষের স্বরূপ এই আত্মা হইল নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং ইহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজবিদ্যার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত এই অতীন্দ্রিয় সত্তারূপ আত্মা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিচালিত নহে। সুতরাং দেহধারী জীব হিসাবে মানুষ সমাজের 'অংশ' হইলেও, মানুষের আত্মা ইহার ঊর্ধ্বে। এই শুদ্ধ আত্মাই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ; আত্মার এই স্বাধীনতার মধ্যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা নাই—এই আত্মা দৈনন্দিন সামাজিক নীতির ঊর্ধ্বে হইলেও ইহা কোন দুর্নীতিপরায়ণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।[৫০]

৪৯ এই প্রসঙ্গে বৃটিশ দার্শনিক ব্র্যাডলে (F. H. Bradley)-রচিত *Ethical Studies* গ্রন্থে "Ideal Morality" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তাঁহার ভাষায়:— "...the good self is the self which realizes (1) a social; (2) a non-social ideal; the self, first which does, and, second, which does not directly and immediately involve relation to others." "It is a moral duty for the artist or the inquirer to lead the life of one, and a moral offence when he fails to do so. But...it is impossible, without violent straining of the facts, to turn these virtues into social virtues or duties to my neigebour....Man is not man at all unless social but man is not much above the beasts unless more than social. "(pp.219, 222-23)

৫০ অবশ্য এই শেষোক্ত দার্শনিক মতবাদ সকল দার্শনিক গ্রহণ করেন না। তবে ইহা অনেক প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক কালে সমাজদর্শনের উপর পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের অন্যতম E. J. Urwick আত্মা (soul) এবং অহং-প্রত্যয়-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব (self)-এর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি উক্তি লক্ষণীয়: "This is what th

সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা পারস্পরিক সম্বন্ধের সম্ভাব্য আদর্শের উল্লেখ করিলাম। সকল সময়ই যে এই দুই-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সমাধান করা যাইতে পারে তাহা নহে, তবে দার্শনিকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে বিরোধের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে আশা করা যায়।

sociologist means by the individual—a social product individualized into a separate unit but necessarily subordinate to the social unity and inseparable from it. But to the social philosopher such a conception is profoundly unsatisfying..." "He (Man) is conscious of an end which is not society's, however selfishly he interprets it, dimly conscious, too, of an overlord other than society; conscious again that he exsists for a purpose not to be described as a social purpose." "As *selves*, and still more as social persons, we owe a debt to nature and society to which it is hard to assign any limits. As *souls* we owe no debt at all." "Society is paramount over us *qua* selves, but powerless over us *qua* true individuals or souls." অবশ্য সামাজিক কর্তব্য অবহেলার বিষয় নহে, কারণ "the social services are also the things that are God's." (*A Philosophy of Social Progress*, pp. 177, 184, 187, 188, 191).

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও সংস্থা

আমরা এ পর্যন্ত সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছি। সমাজমাত্রই একটি জটিল জনসমষ্টি—এই সমষ্টির আয়তন, স্থায়িত্ব ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ইহার ফলে বিভিন্ন প্রকারের জনসমষ্টির উদ্ভব হয়। ইহাদের বিভিন্ন প্রকার নামকরণ হইয়া থাকে—যথা, সমাজ, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ, সম্প্রদায় ইত্যাদি। আবার এই সকল জনসমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়ম ও আদর্শ অনুসৃত হয় এবং কালক্রমে কতকগুলি ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল আদর্শ ও ঐতিহ্যের বাহকরূপে কতকগুলি সংস্থা দেখা দেয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের কার্যসূচী হইল বিবিধ সামাজিক সমষ্টির ও সংস্থার বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য ও মূল্য নিরূপণ করা। তবে এই কার্যের প্রধান অন্তরায় হইল সুনির্ধারিত প্রত্যয় ও সংজ্ঞার অভাব। একই প্রত্যয় বিভিন্ন লেখক (এমন কি, একই লেখক বিভিন্ন সময়) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, গোষ্ঠী ও সংঘ, সমাজ ও সম্প্রদায় এই সকল পদ প্রায়ই সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[১] সুতরাং ইহাদের আপেক্ষিক পার্থক্য নিরূপণ এবং স্থূল সংজ্ঞা নির্ধারণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

১। গোষ্ঠী (Group):

(১) গোষ্ঠী কাহাকে বলে? (What is a Group):

গোষ্ঠী বলিতে এমন এক জনসমষ্টি বুঝায় যাহার মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে[২]; যথা, পরিবার, রাজনৈতিক

---

১ তুলনীয়: "One of the greatest of difficulties which at the present day beset the social analyst is the confused nature of his vocabulary. Unlike the students of most other sciences he must accept the terms of everyday life. These terms are lacking in all precision...This is the case with terms society, community, association. The looseness with which these terms are often used even by professed authorities is remarkable...." (MacIver, *Community*, p. 22).

২ তুলনীয়: "By a group we mean any collection of social beings who enter into distinctive social relationships with one another. A group then...involves *reciprocity* between its members." (MacIver & Page, *Society*, p. 14).

দল, মিতালি সংঘ, জনতা ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলিতে সমগ্র মনুষ্য সমাজই বুঝায় ; কিন্তু এই সুবৃহৎ জনসমষ্টি দেশগত, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপক অর্থে সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে গুণগত পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল পরিমাণগত —ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমন্বয়েই সমাজ ; আবার গোষ্ঠীমাত্রই অল্পবিস্তর সামাজিক। সুতরাং সমাজের স্বরূপ আলোচনাকালে স্বতঃই গোষ্ঠীর আলোচনা আসিয়া পড়ে।

গোষ্ঠী নানাপ্রকারের হইতে পারে এবং বিভিন্ন মূল সূত্র অনুসারে বিভিন্ন লেখক গোষ্ঠীকে ভাগ করিয়াছেন। কেহ গোষ্ঠীর আকার অনুসারে, কেহ গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা কাম্য বস্তু (object of interest) অনুসারে, কেহ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে, কেহ ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে, কেহ গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব অনুসারে গোষ্ঠীকে ভাগ করিয়াছেন। আবার এই সকল বিভিন্ন সূত্র অনুসারে গোষ্ঠীকে ভাগ করিয়া যে সকল উপশ্রেণী হয়, সেগুলি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নহে।

গোষ্ঠী যে প্রকারেরই হউক, উহা ব্যক্তিকে লইয়াই গঠিত। একদিকে গোষ্ঠী যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে, অপরদিকে সেইরূপ গোষ্ঠী সংগঠনকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক ভাব গোষ্ঠীর উপর প্রতিভাত হয়। সুতরাং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে ; যেমন—(ক) কেহ কেহ মনে করেন যে, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত, একে অপরকে খর্ব করিবার চেষ্টা করে ; (খ) কেহ কেহ বলেন যে, গোষ্ঠী-চেতনা ব্যক্তি-মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন বা ব্যাপৃত করিয়া রাখে ; (গ) আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, গোষ্ঠী-মনের প্রত্যয়ই ভ্রান্ত এবং উহা যদিই বা থাকে, তাহা হইলেও ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সকল চরম মতবাদ অতিশয়োক্তি ও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। বাস্তবিক, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্পর্ক হইল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক—গোষ্ঠী ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং ব্যক্তি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এবং একে অপরের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত নহে।

বর্তমানের তুলনায় আদিম যুগের মানুষের সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত সরল এবং সমাজের গোষ্ঠী সংখ্যাও ছিল অনেক কম। কিন্তু সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহার সহিত গোষ্ঠী সংখ্যাও

বাড়িতে থাকে। একই মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। একই মানুষ একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, একটি বিদ্যায়তনের ছাত্র, একটি ফুটবল ক্লাবের সদস্য, আবার একটি রাজনৈতিক দলের উৎসাহী কর্মী হইতে পারে।

কতকগুলি গোষ্ঠীর সদস্য ব্যক্তি জন্মাবধিই হয়; যেমন, প্রতি ব্যক্তিই কোন একটি বিশেষ জাতির মধ্যে এবং কোন একটি বিশেষ পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে—ইহার উপর তাহার কোন ঐচ্ছিক স্বাধীনতা নাই। আবার অপর কতকগুলি গোষ্ঠীর সে ইচ্ছাপূর্বক সদস্য হয় এবং সে উহার সদস্য থাকিবে কিংবা থাকিবে না, তাহা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে (যেমন, কোন ক্লাব বা সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়া)। আবার ঐ গোষ্ঠী তাহার জীবনের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহাও অনেকাংশ নির্ভর করে সে কতদূর উহার উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য থাকিবে। একদিকে যেমন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা, অপরদিকে সেইরূপ গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তি-বিশেষের মনোভাবও তাহার সমষ্টিগত কার্যকে বুঝিবার সহায়তা করে।

(২) গোষ্ঠীর প্রকারভেদ (Types of Groups):

(ক) পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুসারে গোষ্ঠীকে **প্রাথমিক, প্রধান** (primary) **এবং মাধ্যমিক বা অপ্রধান** (secondary) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীকে সামাজিক সংহতির কেন্দ্রস্বরূপ বলা যায়। এই গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ থাকে—একে অন্যের সহিত 'সামনা-সামনি' বা 'মুখো-মুখি' (face to face) দাঁড়াইতে পারে।[৩] এই প্রকার সাক্ষাৎপরিচয়-

---

৩ সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে 'primary group' পদের প্রচলন করেন আমেরিকার চাল্‌স্ কুলি (Charles Horton Cooley)। অবশ্য তিনি নিজে primary group-এর বিপরীত হিসাব secondary group-পদটি ব্যবহার করেন নাই; পরে অন্য লেখকেরা ইহার প্রচলন করিয়াছেন।

Cooley প্রাথমিক গোষ্ঠী বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন: "By primary groups I mean those characterised by intimate face-to-face association and cooperation. They are primary in several senses but chiefly in that they are fundamental in forming the social nature and ideals of the individual. The result of intimate association, psychologically, is a certain fusion of individualities in common whole, so that one's very self, for many purpose at least, is the common life and purpose of the group. Perhaps the simplest way of describing this wholeness is by saying that it is a 'we". (*Social Organisation*, p. 23).

সম্ভূত গোষ্ঠী হইল যেন সামাজিক সংগঠনের মূল ভিত্তি (যেমন, পরিবার, ক্ষুদ্র বিদ্যালয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংস্থা, পল্লীদল ইত্যাদি)। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ভিতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল পারিবারিক গোষ্ঠী (family group)—সমাজদেহের ইহাই হইল যেন 'একক' বা মূল কোষ (unit cell)। এই প্রকার গোষ্ঠী হইতে আমাদের সামাজিক জীবনের শিক্ষা সুরু হয়। ইহারই মধ্যে পরস্পরের সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরস্পরের সহিত মেলামেশি কবিতে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে, ভাবের আদান-প্রদান করিতে, এবং সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে শিক্ষালাভ করি। কেবলমাত্র পরিবারই নহে, খেলার সঙ্গীদল, বন্ধুর দল, ক্লাব, গ্রামের পল্লীমঙ্গল আসর, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তিবিশেষের সামাজিকীকরণ ঘটিয়া থাকে। এই ভাবে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে এবং ইহাদের মধ্যে প্রতি ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় বা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। গোষ্ঠী মধ্যে প্রতি ব্যক্তিরই যে পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট কার্য আছে তাহা নহে—পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিযাব মাধ্যমে যেন প্রতি ব্যক্তিই নিজেকে প্রকাশ করিবাব এবং অন্যের সহিত বিরোধিতা বা সহযোগিতা করিবার সুযোগ লাভ করে এবং এই ভাবে সে গোষ্ঠীমধ্যে তাহাব স্থান কবিয়া লয়।[8]

প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিবার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ গোষ্ঠীর সহিত ঐকাত্ম্য-ভাব বোধ করিতে শিখে। এইরূপে গোষ্ঠীব মধ্যে থাকার জন্যই ব্যক্তি-বিশেষ 'আমি'-কে ভুলিযা 'আমরা'-র কথা চিন্তা করিতে পাবে ; অর্থাৎ এইভাবেই ব্যক্তি-বিশেষ অন্যেব কথা এবং সমগ্র গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করিতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক গোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের 'আমরা'-জ্ঞান ('We'-consciousness) থাকে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ণ ঐক্য, সামঞ্জস্য বা শান্তি বিরাজ করে ; এই গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্ষেত্রবিশেষে বা ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অন্ততঃ তীব্র প্রতিযোগিতার ভাবের সৃষ্টি হয়।

৪ MacIver ও Page-এর ভাষায় : "The face-to-face group is the nucleus of all organization...it is the unit cell of the social structure. The primary group, in the form of the family, initiates us into secrets of society. It is the group through which, as playmates and comrades, we first give creative expression to our social impulses. It is the breeding ground of our mores, the nurse of our loyalties. It is the first and generally remains the chief focus of our social satisfactions. In these respects the face-to-face group is *primary* in our lives." (*Society*, p. 219).

প্রাথমিক গোষ্ঠীকে 'প্রাথমিক' বলার কারণ হইল যে, এইরূপ গোষ্ঠী মধ্যেই সামাজিকতাবোধ সম্বন্ধে ব্যক্তি-বিশেষের প্রারম্ভিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভাবী কালের বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিবর্তনও এইরূপ গোষ্ঠী হইতে আরম্ভ হয়। তবে প্রাথমিক গোষ্ঠী হইলেই যে তাহা সকল সময় সুশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দিবে তাহা নহে; যেমন কয়েকজন অসৎ বালক মিলিয়া যে দল গঠন করে বা কয়েকজন গুণ্ডা মিলিয়া যে দল গঠন করে তাহার মধ্যে সুশিক্ষা ত' নাই, বরং উহা দ্বারা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।[৫]

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা চাক্ষুষ পরিচয় বা সাম্‌না-সামনি (face-to-face) আলাপের সুযোগ থাকে। কিন্তু ইহাকেই কি প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ বলা উচিত? অর্থাৎ যেখানে সাক্ষাৎ বা চাক্ষুষ পরিচয় নাই, অথচ ঘনিষ্ঠতা বা ঐকাত্ম্য-বোধ আছে, সেখানে যে গোষ্ঠী গঠিত হয়, তাহাকে কি 'প্রাথমিক' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? বলা বাহুল্য যে, চাক্ষুষ পরিচয়কেই প্রাথমিক গোষ্ঠীর একমাত্র প্রধান গুণ (sole essential property) বলা যায় না। বিচারালয়ে বিচারক, জুরী, আসামী, উকিল ইহাদের সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিলেও উহা প্রাথমিক গোষ্ঠী নহে; সেইরূপ বিদ্যালয়ে কঠোরমনা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সহিত ছাত্রছাত্রীদের চাক্ষুষ পরিচয় থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা নাই বলিয়া উহাকে হয়ত' প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা চলিবে না। অপরপক্ষে এমন গোষ্ঠী থাকিতে পারে যেখানে উহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও 'হৃদয়ের মিল', 'আমরা সকলে'-এইরূপ অনুভূতি বোধ থাকিতে পারে; যেমন, বিভিন্ন দেশের বয় স্কাউট্ (Boy Scout)-দের মধ্যে, আন্তর্জাতিক রোটারী সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত যোদ্ধাদের মধ্যে এইরূপ

৫ অসৎ বা সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা মিলিয়া যে দল গঠন করে তাহাকে 'দুর্বৃত্ত দল' (gang) বলা হয়। এইরূপ দলের মধ্যেও অন্যান্য দল বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকে,—যেমন, অধিকাংশ সময়ই এইরূপ দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সমগ্র দলের জন্য এককভাবে কার্য করে, তাহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতার ভাব গড়িয়া উঠে, সমগ্রভাবে তাহারা কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। আবার, দলভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ পদাধিকার বা ক্ষমতালাভের জন্য প্রতিযোগিতা, এমন কি বিরোধিতার ভাব প্রবল হইয়া উঠে—এইজন্য দলের মধ্যে সহজেই বিভিন্ন চক্রান্তকারী ক্ষুদ্রতর দল বা গোষ্ঠী দেখা দিতে পারে। বিশেষ বিবরণীর জন্য F. M. Thrasher, *The Gang* দ্রষ্টব্য।

ঐক্যভাব আসিতে পারে। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, চাক্ষুষ আলাপ প্রাথমিক গোষ্ঠীর একমাত্র প্রধান ধর্ম নহে, কারণ ইহা থাকাই যথেষ্ট নহে ; এইরূপ গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা, মানসিক ঐক্যবোধ—গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিরা যদি এই মানসিক ঐক্যবোধ না করে, তাহা হইলে প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আসিতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র স্থানগত নৈকট্য (spatial contiguity) বা সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে পারে না।*

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বিপরীত হইল, অপ্রধান বা অপ্রাথমিক গোষ্ঠী। কেহ কেহ ইহাকে গৌণ বা মাধ্যমিক গোষ্ঠী (secondary group) বলেন। অপ্রধান গোষ্ঠীসমূহে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থাকে না, ইহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে না এবং এই প্রকার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরোক্ষ ও বাহ্য। প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের নিবিড়তা যে-ভাবে গড়িয়া উঠে, অপ্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে তাহা হয় না। অপ্রাথমিক গোষ্ঠী অনেক সময়ই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয় এবং কতকগুলি পূর্ব প্রকল্পিত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়—উহার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই উহা পরিসমাপ্ত হয় ও উহার অন্তর্গত ব্যক্তিরা পূর্বতন বিশ্লিষ্ট বা একক অবস্থায় যেন ফিরিয়া যায় (প্রাথমিক গোষ্ঠীরও মূলে উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না)। যেমন, খেলার মাঠে দর্শকদের যে গোষ্ঠী, তাহা অপ্রাথমিক—খেলা দেখিবার উদ্দেশ্য লইয়া উহা গঠিত এবং খেলার সমাপ্তির সহিত উহা সমাপ্ত। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য দুইটি বিপরীত পক্ষ মিলিত হইলে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়, কিন্তু এইরূপ আলোচনার বিষয়বস্তু এবং নিয়মাবলী মোটামুটি সুনির্ধারিত। এইরূপ গোষ্ঠীর সভ্যদের উপর সমগ্র গোষ্ঠীর প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

আমরা পূর্বে (পৃঃ ১০৯) আলোচনা করিয়াছি যে, সাক্ষাৎ পরিচয় (face-to-face acquaintance)-কে প্রাথমিক গোষ্ঠীর একমাত্র পরিচায়ক বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না—উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের গভীরতা। যদি তাহা

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Ellsworth Faris, *The Nature of Human Nature.*

হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাবকেই অপ্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যাইবে না।

অপ্রাথমিক গোষ্ঠী অনেকাংশে নিয়মানুগ (formal), বিধি-নিষেধের কাঠামোতে গঠিত, সংস্থাগত (institutional) এবং নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের হৃদ্যতাবিহীন (impersonal)[৭]। অপ্রাথমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা স্থানগত বা কালগত হইতে পারে—কিন্তু উহা প্রধানতঃ মানসিকদূরত্ব

সকল গোষ্ঠীকে প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক এই দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না এবং এইজন্য অনেকে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী একটি তৃতীয় গোষ্ঠী বা অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী (intermediate group)-এর কথা বলেন।

বলা বাহুল্য, প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক গোষ্ঠীর সীমারেখা সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নহে। এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট গুণের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রভেদ করা সম্ভব নহে, যেমন সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও প্রাথমিক গোষ্ঠীসুলভ অন্তরের মিল থাকিতে পারে, আবার সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলেও অন্তরের মিল ও সহযোগিতার মনোভাব না থাকিতে পারে (যেমন, একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিবদমান বা বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়)। আবার যাহা আদিতে অপ্রাথমিক ছিল—অর্থাৎ সুপরিকল্পিত বিশেষ নিয়ম অনুসারে পরিচালিত এবং অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ছিল—তাহা ক্রমশঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে পারে। যেমন, একটি শিক্ষায়তন বা একটি বাণিজ্য সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যদের যে গোষ্ঠী, তাহা প্রথমে অপ্রাথমিক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে গঠিত হইলেও ধীরে ধীরে প্রাথমিক-গোষ্ঠী-সুলভ গুণাবলী অর্জন করে।

(খ) গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের তারতম্য অনুসারে গোষ্ঠীকে **অস্থায়ী গোষ্ঠী, স্বল্পকালস্থায়ী, দীর্ঘকালস্থায়ী এবং স্থায়ী গোষ্ঠী** এই কয় ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

অস্থায়ী গোষ্ঠী— ইহা হঠাৎ গঠিত হয় এবং ক্ষণকাল পরেই উহা ভাঙিয়া যায়। যেমন, রাস্তা দিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে কয়েকটি অগ্নিনির্বাপক গাড়ী

৭ এইজন্য Faris প্রমুখ লেখকগণ প্রাথমিক গোষ্ঠীর বিপরীতকে গৌণ বা মাধ্যমিক বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা formal, institutional ও impersonal এই শব্দগুলি primary'-শব্দের বিপরীতার্থক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

বা দমকল যাইতেছে এবং কয়েকজন মিলিয়া উহা দেখিতে লাগিল ও ইহার ফলে একটি গোষ্ঠী গঠিত হইল। ইহা নিতান্তই অস্থায়ী—দমকলগুলি চলিয়া যাইবার পরই ঐ গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া যায়। এই প্রকার গোষ্ঠী ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না।

স্বল্পকালস্থায়ী গোষ্ঠী— ইহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়। ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের উপর। ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইবার পর উহা সাধারণতঃ ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন, দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং উহার প্রতিকারকল্পে হয়ত' একটি দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতি গঠিত হইল; দুর্ভিক্ষের অবসানে ঐ সমিতিরও পরিসমাপ্তি ঘটিবে। অবশ্য কোন ক্ষেত্রে এইরূপও হইতে পারে যে উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হইবে না এইরূপ বিশ্বাস হইতেও গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

দীর্ঘকালস্থায়ী গোষ্ঠী— ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থায়ী। ইহারা বহুদিন ধরিয়া বহুজনের কোন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। যেমন, একটি বিদ্যায়তনের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা লইয়া যে মিলিত গোষ্ঠী তাহা অনেকদিন স্থায়ী। এই প্রকার গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটিলেও সংস্কাররূপে ইহা একটি স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ইহার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে।

স্থায়ী গোষ্ঠী— জাতি, রাষ্ট্র, গ্রাম ইত্যাদিকে মোটামুটি স্থায়ী গোষ্ঠী বলা চলে। ইহার অন্তর্ভুক্তি ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছাধীন নহে—ব্যক্তি-বিশেষ ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, একেবারে চিরস্থায়ী গোষ্ঠী বলিয়া কিছুই হইতে পারে না। কালের গতিতে জাতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি সব কিছুরই অবলুপ্তি ঘটিতে পারে। তবে সাধারণতঃ ইহাদের স্থায়িত্ব বহুদিন ধরিয়া চলিতে পারে এবং ব্যক্তি-মনের উপর ইহাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্থায়িত্বের ভিত্তিতেও গোষ্ঠী বা সঙ্ঘকে সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা সম্ভব নহে। যেমন, অস্থায়ী ও স্বল্পকালস্থায়ী গোষ্ঠী অথবা দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী বা চিরস্থায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমারেখা টানা অনেক সময়ই দুরূহ হইয়া পড়ে। তবে মোটামুটিভাবে গোষ্ঠীকে অস্থায়ী (temporary) এবং স্থায়ী (permanent) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(গ) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার তারতম্য অনুসারে গোষ্ঠীকে **বৃহৎ ও ক্ষুদ্র** এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে আবার পুনরায়

বিবিধ উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী হইল দুইজনেব সমষ্টি, ইহার উপবে হইল তিনজনেব সমষ্টি।

সাধারণভাবে গোষ্ঠীকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ কবা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাব ভিত্তিতে কবা যায় না, অর্থাৎ এমন কথা বলা যায না যে, এতগুলি ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইলে উহা বৃহৎ গোষ্ঠীব পর্যায়ে পডিবে এবং উহাব নিম্নে যাহা থাকিবে তাহা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে যাহাব সদস্য সংখ্যা দুইটি কিংবা তিনটি কিংবা চারিটি অথবা উহাবও সামান্য বেশী তাহা যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু কখন যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ধীবে ধীবে বৃহৎ হইয়া পডে তাহা নির্ধাবণ কবা কঠিন।

সমাজবিদ্যায দুই বা তিন ব্যক্তিবিশিষ্ট গোষ্ঠী আলোচনাবও মূল্য আছে, কাবণ ঐরূপ গোষ্ঠী আলোচনাব মাধ্যমে বৃহৎ গোষ্ঠীব গঠন (constitution) ও প্রচয় (development) বুঝিবাব সুবিধা হয়। তাহা ছাডা, এইরূপ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হইতে পাবে যাহা বৃহৎ গোষ্ঠীতে প্রকাশিত হয় না, এবং ব্যক্তি-বিশেষও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, বৃহৎ গোষ্ঠীতে সেভাবে কবে না। সুতবাং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব বুঝিবাব সুবিধা হয। আবাব ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দ্বারা অনুধাবন কবিলে বৃহৎ গোষ্ঠীব মধ্যে যে কৃষ্টি পবিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার মূলসূত্র বা উৎপত্তিও কতকাংশে বুঝা যায়। বৃহৎ গোষ্ঠীব সামগ্রিক আচবণের মূলে যে কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিথষ্ক্রিয়া আছে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলিরও পারস্পবিক মিথষ্ক্রিয়া উহার মূলে থাকে। সুতবাং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আলোচনা বৃহত্তব সামাজিক জীবনের সংগঠন এবং কৃষ্টি ও ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব বুঝিবাব সহায়তা করে।[৮]

ক্ষুদ্র গোষ্ঠীব আলোচনার মূল্য ও তাৎপর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন সিম্‌মেল (Georg Simmel) ও তাঁহার অনুগামিগণ। সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সবলতম গোষ্ঠী হইল দ্বিতয়ী বা দ্বয়ী অর্থাৎ দুই সদস্য-বিশিষ্ট

৮ ক্ষুদ্র গোষ্ঠী (small groups)-এর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া Hare, Borgatta ও Bales তাঁহাদের সম্পাদিত *Small Groups* গ্রন্থের ভূমিকা (Preface)-এ বলিয়াছেন: 'In the study of small groups we are concerned with the microspic study of sub-cultures, just as we are concerned with the microspic study of small social systems. Similarly, in the total process which goes on in small groups we are observing the process by which personality elements are developed and elaborated in the individual. The study of small groups is thus a method for the study of social systems, of culture and of personality—all three."

গোষ্ঠী (dyad)। জটিলতর সামাজিক গোষ্ঠীর সংগঠনের রূপরেখা ও উপাদান সুপ্তভাবে ইহার মধ্যে থাকে। ইহা যে ভবিষ্যতে বিস্তৃততর রূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়াই ইহার সামাজিক তাৎপর্য আছে তাহা নহে; দ্বয়ীর নিজস্ব এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা বহুজন দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় না; যথা—(১) এইরূপ গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও সমানুভূতি এমনভাবে প্রকাশিত হয়, যাহা বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভব নহে। (২) দুইজনে মিলিয়া এমন অনেক কার্য গোপনে করিতে পারে যাহা প্রকাশ্যে অনেকে মিলিয়া করা যায় না; গোপন রাজনৈতিক চক্রান্ত এইরূপে অনেক সময় জন্মলাভ করে। (৩) অন্য প্রকার গোষ্ঠীর সহিত দ্বয়ীর পার্থক্য হইল যে ইহাতে যে কোন একজন গোষ্ঠী হইতে বিদায় লইলে গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া যায়। (৪) আবার বৃহত্তর গোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অনেক সময় এইরূপ মনে হয় যে, তাহাদেব নিজস্ব ব্যক্তি-চেতনার উপর যেন একটা অতিব্যক্তিক সামগ্রিক চেতনা প্রভাব বিস্তার করিতেছে (যদিও এই ধারণা অযৌক্তিক; পৃঃ ৬৩)—তাহাদেব অন্ততঃ এই ধাবণা থাকে যে, গোষ্ঠীর চাপে পড়িয়া ঐচ্ছিক স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে। দ্বয়ীর মধ্যে পাবস্পরিক মিল থাকিলে এইরূপ মনোভাব দেখা যায় না।

তাহা ছাড়া, দ্বয়ীর আলোচনাব আব একটি প্রয়োজন হইল যে, দ্বয়ীর অন্তর্ভুক্ত দুইজনের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে উহার আলোকে দুইটি গোষ্ঠীর (যথা, দুইটি রাষ্ট্রের বা দুইটি পরিবারের) মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিবার সুবিধা হয়।

দুইজনে মিলিয়া যেমন দ্বয়ী গঠন করে, সেইরূপ **তিনজনে মিলিয়া ত্রয়ী** (**triad**) গঠন করে। যেমন, ক, খ, গ তিন জনে মিলিযা যে গোষ্ঠী গঠন করে তাহাকে ত্রয়ী বলা যায়। যেখানে দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্য নাই, সেইরূপ স্থলে অনেক সময় তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে পারে এবং উহার ফলে গোষ্ঠীর সংগঠন দৃঢ় হয়। অবশ্য ইহার বিপরীতও হইতে পারে, অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় এবং বিভেদ প্রকট আকার ধারণ করে। আবার এমনও হইতে পারে যে, তৃতীয় ব্যক্তির চাতুরীর ফলে ত্রয়ী ভাঙ্গিয়া গিয়া আবার দুইটি দ্বয়ীর সৃষ্টি হইতে পারে; যেমন, গ-এর আবির্ভাবে ক ও খ-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং এই বিরোধে গ গোপনে ক ও খ-এর সহিত এমন ভাবে মিলিত হইতে পারে যে ক-গ এবং খ-গ এই দুইটি দ্বয়ীর সৃষ্টি হইল।[৯]

---

৯ Simmel-এর মতের জন্য দ্রষ্টব্য K H Wolff, *The Sociology of Georg Simmel.*

অবশ্য ত্রয়ীর মধ্যে কে 'তৃতীয় ব্যক্তির স্থান' গ্রহণ করিবে এবং সে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহা পূর্ব হইতে স্থির করা কঠিন। তবে ত্রয়ী মাত্রেই তিনটি সাধারণ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে : যথা, ক-খ, ক-গ এবং খ-গ। এই তিন শ্রেণীর সম্বন্ধ ব্যতীত আরও তিনটি সম্বন্ধের সৃষ্টি হইতে পারে ; যথা, (ক)—(খ, গ), (খ)—(ক, গ) (গ)—(ক, খ), অর্থাৎ খ ও গ-এর যে যুক্ত সম্বন্ধ তাহাকে ক এক বিশেষভাবে বুঝিবে ও প্রতিক্রিয়া করিবে ; অনুরূপভাবে ক ও গ-এর যুক্ত সম্বন্ধের প্রতি খ-এর এবং ক ও খ-এর যুক্ত সম্বন্ধের প্রতি গ-এর নিজস্ব মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে।

সামাজিক গোষ্ঠীকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করার যে সার্থকতা কিছু আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, দ্বয়ী ও ত্রয়ীর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আলোচনাও যে সমাজ জীবনকে বুঝিবার পক্ষে অনেক সাহায্য দান করে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহার অসুবিধা হইল যে, বৃহৎ গোষ্ঠীর সংখ্যা নির্দেশের কোন উপায় নাই এবং এই শ্রেণীর বিভাগে বৃহৎ গোষ্ঠীকে পৃথক্‌ভাবে না বুঝিয়া উহাকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সহিত তুলনা করিয়া জানিতে হইবে।

(ঘ) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের স্বীয় গোষ্ঠীর প্রতি এবং গোষ্ঠীর বহির্ভূত অন্যের প্রতি মনোভাবের তারতম্য অনুসারে গোষ্ঠীকে **স্ব-দল বা অন্তর্গোষ্ঠী** (in-group) এবং **পরদল বা বহির্গোষ্ঠী** (out-group) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যদি সমগ্র গোষ্ঠীর সহিত ঐক্য বোধ করে, তাহা হইলে স্বীয় গোষ্ঠীর প্রতি "আমাদের গোষ্ঠী" এইরূপ মনোভাব দেখা দেয়। অপরপক্ষে অন্তর্গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের "তাহারা" এইরূপ মনে করে। অর্থাৎ একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যখন নিজেদের কথা চিন্তা করে, তখন অন্যের সহিত পার্থক্য টানিয়া থাকে, যেমন, "আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাহারা মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র," "আমরা বড়রা, তাহারা ছোটরা", "আমরা ভারতীয়েরা, তাহারা অভারতীয়েরা", "আমরা বৈদান্তিকেরা, তাহারা নৈয়ায়িকেরা"—এইভাবে আমরা জীবনে বহুক্ষেত্রেই স্বদলীয়দের সহিত পরদলীয়দের প্রভেদ করিয়া থাকি। যাহাদের স্বদলীয় মনে করা যায়, তাহাদের সহিত ঐকাত্ম্যবোধ করার জন্য 'সমজাতিভুক্তির চেতনা' (consciousness of kind) দেখা দেয়। গোষ্ঠীর বহির্ভূত অন্য ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ঔদাসীন্য হইতে আরম্ভ করিয়া আক্রমণাত্মক ভাব পর্যন্ত যে কোন রকমের বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দিতে পারে। সমাজের যত প্রসার ঘটিতেছে, সমাজের মধ্যে তত বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিতেছে ;

কোন মানুষের পক্ষেও সকল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকা বা সকল গোষ্ঠীর প্রতি সমভাব পোষণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং কোন গোষ্ঠীর প্রতি কেহ সমগোত্রীয়তার ভাব পোষণ করে এবং কাহারও প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেয় ও এইভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও পৃথকত্বের ভাব দেখা দেয়। ইহাদের কতকগুলি অন্তর্গোষ্ঠী বা স্বদল (In-group বা We-group) হইয়া দাঁড়ায়, আর কতকগুলি বহির্গোষ্ঠী (Out-group বা they-group) হয়।

এই প্রকার গোষ্ঠী বিভাগ অনেক পরিমাণে সমর্থনীয় হইলেও ইহার অসুবিধা হইল যে, সকল গোষ্ঠীকেই সকল সময় এই দুই সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যেগুলির অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও ব্যক্তি-বিশেষ স্বদলের প্রতিই উদাসীন থাকে, পরদলের প্রতি ঐরূপ মনোভাব থাকে না। তাহা ছাড়া, এমনও হইতে পারে যে, যাহার সহিত একদিন ঐকাত্ম্যবোধ ছিল, কালক্রমে তাহারই প্রতি বিরাগ জন্মিতে পারে ; আবার, ইহার বিপরীতও হইতে পারে, অর্থাৎ যাহার প্রতি বিরাগ ছিল, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে। যেহেতু, মনোভাব সদা পরিবর্তনীয় এবং ইহা বস্তুগত (objective) নহে, সেই হেতু ইহার ভিত্তিতে স্থায়ী এবং সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণীকরণ সম্ভব হইতে পারে না।

(ঙ) গোষ্ঠীমাত্রই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে, সুতরাং গোষ্ঠীমাত্রেরই লক্ষ্যবস্তু বা কাম্যবস্তু (object of interest) থাকে।[১০] ইহার ভিত্তিতে ম্যাক্‌আইভার (MacIver) গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ (association)-এর শ্রেণীকরণ করিয়াছেন। কাম্যবস্তু মাত্রই ইচ্ছা বা বাসনার প্রকাশক। কতকগুলি বিষয়বস্তুর উপর আমরা চরম মূল্য (ultimate value) আরোপ করি—এগুলি কেন চাই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে, অর্থাৎ অন্য কোন কিছু লাভের জন্য এইগুলি চাহি না, ইহাদের নিজগুণের জন্যই ইহাদের ভাল লাগে। অপরপক্ষে,

১০ ম্যাক্‌আইভার *interest*-পদটির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন : "By *interest* we mean any aim or object which stimulates activity towards its attainment....An interest involves, therefore, some consciousness, however vague, of a satisfaction to be attained and some resultant activity towards its attainment. It is more than *need*....An interest is any object of the will. It is in that sense objective, something sought or pursued." (MacIver, *The Elements of Social Science*, p. 61). তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ম্যাক্‌আইভার এই প্রসঙ্গে 'association' এই পদটি ব্যবহার করিয়াছেন, 'group' পদটি ব্যবহার করেন নাই।

আমাদের কতকগুলি কাম্যবস্তু আছে যেগুলির আপেক্ষিক মূল্য আছে, অর্থাৎ উহারা অন্য কোন কিছু লাভের সহায়ক বলিয়া উহাদের কামনা করা হয়; সুতরাং যাহার জন্য ইহাদের কামনা করা হয়, তাহা হইতে ইহার মূল্য ব্যুৎপন্ন (derived) হয়। চরম কাম্যবস্তুরগুলির কতকগুলি সাধারণ এবং কতকগুলি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করে। যেগুলি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যগত সেগুলি আবার স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিচায়ক হইতে পারে, আবার বিশেষ মানসিক প্রেরণার পরিচায়ক হইতে পারে। আপেক্ষিক কাম্যবস্তুরগুলির কতকগুলি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে এবং কতকগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে।

নিম্নের তালিকাতে[১১] ম্যাক্‌আইভার বর্ণিত বিভিন্ন কাম্য বস্তুর শ্রেণীকরণ দেখান হইয়াছে; ইহারই ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে:
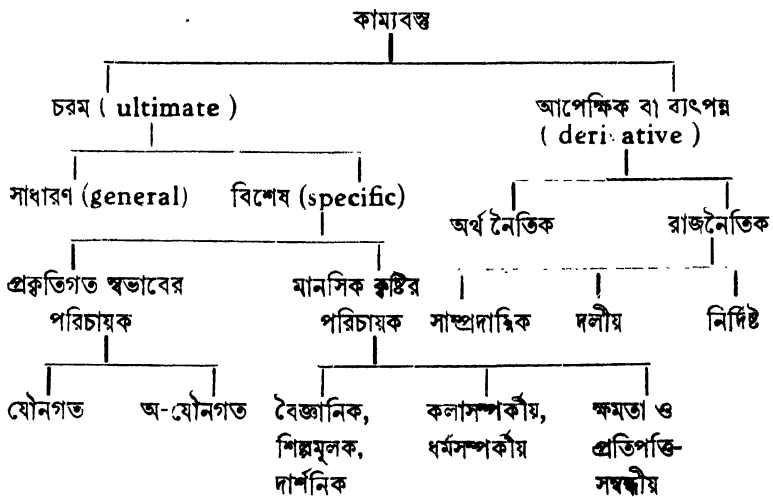
ম্যাক্‌আইভার কর্তৃক অনুসৃত এই শ্রেণীকরণকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। তিনি সাধারণ ও বিশেষ কাম্য বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছেন, অথবা যাহা প্রকৃতিগত স্বভাবের পরিচায়ক (those that reveal primarily the physical

১১ MacIver, *op. cit*, pp. 69-71; ম্যাক্‌-আইভার কর্তৃক অনুসৃত শ্রেণীকরণকে উপরের তালিকার আকার দিয়াছেন Wright (তাঁহার *Elements of Sociology*, p 86 দ্রষ্টব্য)।

সেইরূপ Sapir বলিয়াছেন যে, গোষ্ঠী সংগঠন সহায়ক কাম্যবস্তু বহুবিধ হইতে পারে, যথা—Economic, Political, Vocational, Meliorative, Propagandist, Racial এবং Religious. (*Encycl of Soc Sc*, Art. on Group).

nature) এবং মানস স্বভাবের পরিচায়ক (those that reveal primarily the psychical nature) এই দুই-এর যে পার্থক্য করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট নহে। তাহা ছাড়া, মানবীয় কাম্যবস্তুর সম্পূর্ণ তালিকা দান সম্ভব নহে।

মন্তব্য ঃ আমরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গোষ্ঠীর কতকগুলি সম্ভাব্য শ্রেণীকরণ বর্ণনা করিলাম। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইহাদের কোনটিই একেবারে ত্রুটিহীন নহে। বাস্তবিক, মানবীয় সমাজের গোষ্ঠীর কোন সম্পূর্ণ তালিকা দান সম্ভব নহে, গোষ্ঠীগুলি প্রাণবান্ সমাজের পরিচায়ক—ইহারা পরিবর্তনশীল এবং পরস্পরের সহিত অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই কারণ গোষ্ঠীগুলির সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ কঠিন।[১২] তাই বলিয়া শ্রেণীকরণের উপকারিতাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না; এইরূপ শ্রেণীকরণ সমাজের জটিল সংগঠন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সাহায্য করে।

(৩) মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ (Group from the psychological standpoint) :

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যখন গোষ্ঠীর স্বরূপ আলোচনা করা হয়, তখন উহার প্রধান বিচার্য বিষয় হইল তথাকথিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিই পরস্পরের সহিত মানসিক যোগ অনুভব করে কি না। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট মানসিক সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন একটি গোষ্ঠী রচিত হয়। সুতরাং যে কোন জনসমাবেশ গোষ্ঠী গঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। গোষ্ঠী গঠিত হইতে হইলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং ইহার অন্তর্গত প্রতি ব্যক্তিই যেন নিজেকে এবং অন্য সকলকে 'সমগ্র' বা 'গোষ্ঠী'-ভুক্ত বলিয়া মনে করে। অতএব, কেহ যদি নিজেকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপরে অর্থাৎ যদি গোষ্ঠীর অন্য সকলে তাহাকে গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে না করে, তাহা হইলেও গোষ্ঠী গঠিত হইতে পারে না।

১২ রাইট্ (Wright)-এর মন্তব্য লক্ষণীয়: "It is evident that no formal classification will serve rigidly to define social groupings which are... historical entities undergoing great changes. Ends and means tend to intermingle, interests overlap and combine...Society is a thing of life and movement and change, and cannot be analysed with the strict objective regard to general structure which obtains in the material sciences." (*op. cit.*, pp. 89-90).

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে 'মানসিক সংযোগ' উহার স্থায়িত্ব এবং সংহতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া গোষ্ঠীর আকার উহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। গোষ্ঠী যেখানে ক্ষুদ্র এবং সাক্ষাৎপরিচয়-সম্ভূত সেখানে উহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। অপরপক্ষে, গোষ্ঠী যত ব্যাপক হয় এবং উহা যত প্রসার লাভ করে, তত ঘনিষ্ঠ আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক রাখা কঠিনতর হয়। তাহা ছাড়া, গোষ্ঠী প্রসার লাভ করার ফলে উহার মধ্যে আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা উপ-গোষ্ঠী (sub-group) দেখা দিতে পারে। গোষ্ঠী মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারে, সেইরূপ তাহাদের ব্যবধান আবার সুদূর হইতে পারে; আবার উপগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কেরও সেইরূপ তারতম্য ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া, গোষ্ঠীগুলির আপেক্ষিক মানও বিভিন্নরূপ হইতে পারে—কতকগুলি গোষ্ঠী একই মর্যাদার স্থান বা স্তর অধিকার করে, আবার কতকগুলির মধ্যে স্তরভেদ থাকে, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর 'মান' উর্ধ্বস্তরের আর কোন গোষ্ঠীর 'মান' নিম্নস্তরের।

ব্যক্তিকে লইয়া গোষ্ঠী গঠিত। সুতরাং গোষ্ঠী মধ্যে ব্যক্তির আচরণ—অর্থাৎ ব্যক্তি কিভাবে গোষ্ঠীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত প্রতিযোজন করে এবং গোষ্ঠী মধ্যে কোন্ ভূমিকায় কার্য করে—লক্ষ্য করা উচিত। যে সকল গোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে গঠিত (formal), সেগুলির ক্ষেত্রে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক—বিশেষতঃ ব্যক্তি-বিশেষের ভূমিকা—অনেকাংশে সুনির্ধারিত। কিন্তু যে সকল গোষ্ঠী নির্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীতে গড়িয়া উঠে নাই (informal), সেগুলির মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের ভূমিকা পূর্ব হইতে সুনির্ধারিত থাকে না এবং তাহার স্থান সে নিজেই করিয়া লয়; মোট কথা, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক কোন নির্দিষ্ট সার্বিক নিয়ম অনুসারে চলে না। বলা বাহুল্য, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের উপরই গোষ্ঠীর সংগঠন নির্ভর করে—ব্যক্তি-বিশেষ অপরকে কিভাবে দেখে এবং অপরে তাহাকে কিভাবে দেখে, এই দুই-এর উপর নির্ভর করে গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য এবং গোষ্ঠী মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব ভূমিকা।

যে কোন গোষ্ঠীর কার্যপরিক্রমা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহা গোষ্ঠী সংগঠনকারী ব্যক্তিগণের কোন-না-কোন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হইয়াছিল। ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় কোন গোষ্ঠীভুক্ত হয়, তখন সে ঐরূপ গোষ্ঠীভুক্তির দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজস্ব কোন প্রয়োজন মিটাইতে চাহে (অবশ্য ঐরূপ 'প্রয়োজন' বলিতে সকল সময় স্বার্থানুসন্ধান বুঝায় না)। তবে ইহার অর্থ এই নহে

যে, সকল গোষ্ঠীর মধ্যে সকল ব্যক্তির সকল 'প্রয়োজন' মিটান সম্ভব হয়, বরং অধিকাংশ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, গোষ্ঠীভুক্ত কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষ প্রভাব বা প্রতিপত্তি আয়ত্ত করিয়াছে এবং গোষ্ঠী তাহাদের প্রয়োজনই অপেক্ষাকৃত বেশী মিটাইতেছে। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মানুষের একটি সাধারণ প্রয়োজন হইল যে সে সামাজিক জীব হিসাবে দলভুক্ত হইয়া থাকিতে চাহে এবং একেবারে সম্পুর্ণরূপে গোষ্ঠীবিহীন হইয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। গোষ্ঠীমাত্রই এই দলভুক্তি বা যুথচারিতার দাবী মিটাইতে পারে এবং ব্যক্তিবিশেষকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দান করে। আবার গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব ও বিস্তারের ফলে নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত গোষ্ঠীসমূহে যেরূপভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা চলে, একনায়কত্ববিশিষ্ট গোষ্ঠীতে সেইরূপ চলে না—প্রথমোক্ত প্রকার গোষ্ঠীতে অধিক সংখ্যক লোকের প্রয়োজন মিটাইবার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে মাত্র গোষ্ঠীনায়ক এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কয়েকজনের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা হয়।

যদিও গোষ্ঠীমাত্রই একাধিক প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে পারে, তাহা হইলেও কোন গোষ্ঠীই একজন ব্যক্তির সকল প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে না। এইজন্য প্রতি ব্যক্তিই একাধিক গোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত হয়। ইহার ফলে অনেক সময় এইরূপ হইতে পারে যে, একটি গোষ্ঠীতে ব্যক্তিবিশেষ যাহাদের সহিত মিলিতভাবে কার্য করিল, অপর আর একটি গোষ্ঠীতে হয়ত' তাহাদেরই বিরোধিতা করিল। আবার এক গোষ্ঠীতে বিরোধিতা অপর গোষ্ঠীর সৌহার্দ্যের পথে অন্তরায় ঘটায়। এইজন্য সকল গোষ্ঠীর প্রতি সমভাবে নিষ্ঠা দেখান সম্ভব হয় না।

ইহা ছাড়া এমনও হইতে পারে যে, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আদর্শ বা কার্যসূচী ব্যক্তিবিশেষকে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বই যেন গোষ্ঠীর সহিত একাত্মভাব বোধ করিতে লাগিল। যেমন, ব্যক্তিবিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সহিত এমনভাবে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিতে পারে যে, ঐ দলের আদর্শ, আশা, আকাঙ্ক্ষা তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পরিচালিত করে।

প্রতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, গোষ্ঠী মধ্যে গোষ্ঠীর নিজস্ব কতকগুলি ধারণা (ideas) বা বিশ্বাস (beliefs) গড়িয়া উঠে। এইগুলি গোষ্ঠীকে সমষ্টিবদ্ধভাবে কার্যে প্রণোদিত করে। গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন হইতে বিশ্বাস বা ধারণার সৃষ্টি হয়, আবার এই সকল বিশ্বাস সুগঠিত হইলে

নূতন নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হয়। সকল সময়ই যে বিশ্বাসগুলি সুযুক্তির উপর স্থাপিত হয় তাহা নহে ; বরং অনেক সময়ই যুক্তি (reason)-এর পরিবর্তে যুক্ত্যাভাস (rationalization) বর্তমান থাকে। গোষ্ঠীর বিশ্বাস উহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে বা বিশ্বাস সৃষ্টি করে, আবার ব্যক্তির বিশ্বাস গোষ্ঠীর বিশ্বাসকে সৃষ্টি করে। এইভাবে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া চলিতে থাকে।[১৩] গোষ্ঠী যত স্থায়িত্ব লাভ করে ও পুরাতন হয়, ততই উহার সমষ্টিগত ধারণা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়—এবং উহার পরিবর্তন সাধন সুকঠিন হইয়া পড়ে। গোষ্ঠীর বিশ্বাস স্থায়ী রূপ ধারণ করিলে উহা আবার ব্যক্তি-বিশেষকে আকর্ষণ করে। যেমন, যেখানে বিভিন্ন আদর্শবাদী রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে, সেখানে যে দলের আদর্শ ও বিশ্বাস ব্যক্তি-বিশেষের বিশ্বাসের অনুরূপ, ব্যক্তি-বিশেষ তাহার প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং তাহাতে সে যোগদান করে। গোষ্ঠী যত ব্যাপক ও বৃহদাকার হয়, ততই উহার সমষ্টিগত ধারণা বা বিশ্বাস লইয়া পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ কমিয়া যায় এবং সেই কারণে যে বিশ্বাস একবার গঠিত হইয়াছে, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সহজে তাহার পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।[১৪]

বিপদের সময় (যথা, যুদ্ধকালীন অবস্থায়) সমগ্র গোষ্ঠীর পক্ষে নৈতিক মনোবল (morale) রক্ষা করা কঠিন হয় এবং উহা অনেকাংশে নির্ভর করে গোষ্ঠী-নেতার ব্যক্তিত্বের উপর।[১৫]

সাধারণ মন্তব্য (General Comments) :

আমরা উপরে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গোষ্ঠীর আলোচনা করিলাম। আমরা দেখিলাম যে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে ব্যক্তিমাত্রই একাধিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের কতকগুলির মধ্যে তাহার অন্তর্ভুক্তি তাহার

১৩ অবশ্য এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যেখানে গোষ্ঠীর কয়েকজন ক্ষমতাশালী পরিচালক জোর করিয়া অন্যের উপর নিজেদের বিশ্বাস চাপাইয়া দেয়।

১৪ এরূপ অবস্থায় এমন হইতে পারে যে, কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, বোধ হয় অপরে উহা বিশ্বাস করে, সুতরাং উহাতে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল (যদিও প্রকৃত-পক্ষে কেহ কাহারও মনের খবর রাখে না)। এরূপ অবস্থাকে কেহ কেহ 'pluralistic ignorance' আখ্যা দিয়াছেন।

১৫ নৈতিক মনোবল ও নেতৃত্ব (Morale ও Leadership)-এর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Young, *Handbook of Social Psychology*, Chs. XIV & XV.

ইচ্ছাধীন নহে, আর কতকগুলিতে তাহার অন্তর্ভুক্তি তাহার ইচ্ছাধীন। গোষ্ঠীজীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা একদিকে যেমন উদারতার সৃষ্টি করে, সেইরূপ আর একদিকে আবার সঙ্কীর্ণতারও সৃষ্টি করে—ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে ভুলিয়া যখন সমগ্র গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে, তখন এক হিসাবে তাহার মনের প্রসারতা ঘটে ; আবার যদি সে স্বীয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ব্যতীত অন্য কাহারও কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই হিসাবে সে সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়ে।

গোষ্ঠী মধ্যে ব্যক্তির কোন্ আদর্শ অনুসরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করা যায় :

(ক) সাধারণভাবে গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তি-বিশেষের অনুরক্তি, আসক্তি বা বা নিষ্ঠা (loyalty) থাকা উচিত। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীর প্রতি বা গোষ্ঠীর নেতার প্রতি অন্ধভক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যক্তি-বিশেষের উচিত **যতদূর সম্ভব বিচার-বিবেচনা করিয়া গোষ্ঠীর নির্দেশ গ্রহণ করা।**

(খ) যদিও বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ গোষ্ঠী গঠিত হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কর্তব্য হইল যাহাতে সর্বজনীন কল্যাণ হয় তাহার চেষ্টা করা এবং যাহাতে বহু লোকের মধ্যে মিলন ও ঐক্য সাধিত হয় তাহার চেষ্টা করা।[১৬] যদিও কার্যক্ষেত্রে এইরূপ আদর্শ অনুধাবন করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব না হইতে পারে, তাহা হইলেও সর্বদা একটি **সর্বজনীন দৃষ্টি-ভঙ্গী গঠন করিবার চেষ্টা করা উচিত।**

১৬ এই প্রসঙ্গে আমরা আমেরিকার দার্শনিক যোশিয়া রইস্ (Josiah Royce)-এর উল্লেখ করিতে পারি। তিনি কোন বিশেষ লক্ষ্য (cause)-এর প্রতি নিষ্ঠা (loyalty)-কে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়াছেন (তাঁহার *Philosophy of Loyalty*, পৃঃ ১৬, ১৭ দ্রষ্টব্য)। আবার এই লক্ষ্য বা আদর্শ (cause) কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন : "Loyalty respects individuals, but aims to bring them together into one common life. Its command to the loyal is: Be one undivided soul of many a soul. It recognises that, when apart, individuals fail, but that when they try to unite their lives into higher common selfhood, to live as they were exressions, the organs of one ideally beautiful *social group*, they win the only possible fulfilment of the meaning of human existence." (*William James & Other Essays*, p. 56).

(গ) যেমন গোষ্ঠীর কার্যে ব্যক্তি-বিশেষের আত্মনিয়োগ করা উচিত, সেইরূপ **প্রয়োজন হইলে গোষ্ঠীর বা উহার নেতার কার্যের সমালোচনা করিবার মত সৎসাহস থাকা উচিত**। "ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার গোষ্ঠী আমারই ; স্থতরাং তাহার সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে"—এইরূপ মনোভাব বাঞ্ছনীয় নহে। গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠীর বিভেদ অনেক সময় বাড়িয়া চলে ; কিন্তু যতদূর সম্ভব বহির্গোষ্ঠীর প্রতি বৈরিভাব ত্যাগ করা উচিত।

অতএব প্রয়োজন হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে যতদূর সম্ভব **গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ** থাকিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্যক্তি-বিশেষ গোষ্ঠী-বিহীন জীবন যাপন করিবে। ইহার অর্থ হইল যে, যেখানে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি গোষ্ঠী বিবদমান থাকে, সেখানে ভালমন্দ নির্বিচারে কোন গোষ্ঠীর সহিত সর্বদা নিজেকে জড়িত রাখা উচিত নহে। স্বদলই হউক্ আর পরদলই হউক্, যে দল বা গোষ্ঠী ন্যায়ের পথ অনুসরণের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া ব্যক্তি-বিশেষের মনে হইবে, সেই দল বা গোষ্ঠী সমর্থন করা উচিত।

মোট কথা, যদিও আন্তর্দলীয় বিরোধের অবসান ঘটাইবার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত মানব সমাজ আয়ত্ত করে নাই, তাহা হইলেও প্রতি ব্যক্তির এমনভাবে কার্য করা উচিত যাহাতে বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধিত হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, শান্তি ও সংহতি রক্ষিত হয়।

২। সম্প্রদায় (Community)—

(১) সম্প্রদায় কাহাকে বলে ?

সম্প্রদায় হইল বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠী। ইহা হইল এমনই একটি জনসমষ্টি বা জনসমাবেশ যাহার স্থায়িত্ব হইল দীর্ঘ এবং যাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সাধারণ জীবন যাপন করে। এই সাধারণ জীবন-যাপন সম্ভবপর হইবার কারণ হইল যে, ইহার মূলে আছে কোন একটি সাধারণ ভিত্তি, যেমন, ভাষাগত ভিত্তি, ধর্মীয় ভিত্তি, ভৌগোলিক ভিত্তি ইত্যাদি। সম্প্রদায়ের মূলে এই সাধারণ ভিত্তি থাকার জন্য উহার মধ্যে একটি সংহতি (organization) গড়িয়া উঠে এবং সুসংবদ্ধ সম্প্রদায়ই সমাজকে সুদৃঢ় করিয়া তোলে। সম্প্রদায়ই হইল ব্যাপকতম সামাজিক গোষ্ঠী এবং ইহার মধ্যে আবার বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থাকিতে পারে। সম্প্রদায়ের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং

সাধারণতঃ জন্মাবধি সে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। তবে একই ব্যক্তি বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে স্থাপিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, কোন সম্প্রদায়মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্ভুক্তি আবার কতকাংশে নির্ভর করে তাহার মনের উপর—অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ যদি মনে মনে বোধ করে যে সে বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তবেই ঐ অন্তর্ভুক্তি দৃঢ়তর হয় এবং সম্প্রদায়েরও সংহতি দৃঢ়তর হয়। বিরাট্ ও ব্যাপক সমাজ অপেক্ষা সম্প্রদায় অনেকাংশে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং সমাজ অপেক্ষা সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।[১৭] আবার ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্প্রদায়ও সামাজিক জনসমষ্টি; সুতরাং সমাজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নাই। ব্যাপক অর্থে সমাজ হইতেই উহার অংশরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়; আবার সামাজিক সম্প্রদায় সমূহের সুসংহতি, শৃঙ্খলা ও উন্নতি সমগ্র সমাজেরই উন্নতি বিধান করে।

ম্যাক্‌আইভার প্রমুখ লেখকগণ সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক সীমানার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সম্প্রদায় বলিতে এমন একটি অন্তরঙ্গ সাধারণ জীবন বুঝায় যাহা একটি গ্রাম বা একটি নগর বা একটি জিলা বা একটি দেশের সীমানার মধ্যে গড়িয়া উঠে। সুতরাং কোন জনসমষ্টি সম্প্রদায় নামের যোগ্য হইতে হইলে উহা যে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে গঠিত হইয়াছে তাহা যেন পার্শ্ববর্তী অন্য অংশ হইতে পৃথক্ করা যায়। এইরূপ সুস্পষ্ট সীমারেখার মধ্যে যে সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রণালী গঠিত হয়, তাহার মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক অধিকতর

---

১৭ তুলনীয়: (১) "By Community is to be understood a group of social beings living a common life, including all the infinite variety and complexity of relations which result from that common life or constitute it." (Ginsberg, *The Psychology of Society*, p. 120).

(২) "By a 'Community' I mean a complex of social life, a complex including a number of human beings living together under conditions of social relationship, bound together by a common, however constanly changing, stock of conventions, customs and traditions and conscious to some extent of common social objects and interests...'Community' is essentially a subjective term, and the reality of it consists in the consciousness of it among its members." (G. D. H. Cole, *An Introduction to Social Theory*, pp. 25, 26).

(৩) "The community has more limited self-sufficiency than society, but within those limits has closer association and deeper sympathy." (Fairchild's *Dictionary*, Art. on Community).

ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পায়। সুতরাং সম্প্রদায় হইল বিরাট্ ও ব্যাপক অনির্দিষ্ট মানবসমাজের ঠিক বিপরীত।[১৮]

তবে আমরা বলিতে পারি যে, ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতেই কেবল সম্প্রদায় গঠিত হয় না। যদিও অতীতে অধিকাংশ সম্প্রদায় একটি ক্ষুদ্র সীমা রেখার মধ্যে গঠিত হইত, তাহা হইলেও আধুনিককালের উন্নততর পরিবহন ও যোগাযোগ রক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কোন সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে সীমিত থাকে ইহা বলা যায় না; আবার উহার সীমানাও সকল স্থানে নির্ধারণ করা যায় না। তাহা ছাড়া, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে কোন সম্প্রদায়কে বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, কেহ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কি না তাহা নির্ভর করে সে নিজেকে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করে কি না। যেমন, ভৌগোলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর সকল ইহুদী বোধ করিতে পারে যে তাহারা একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আবার ভৌগোলিক সীমানা ব্যতীত, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ভিত্তি ইত্যাদির ফলেও সম্প্রদায় গঠিত হয়।

এই কারণ কোন কোন লেখক বলেন যে সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র উহার গঠন (structure)-এর সাহায্যে বর্ণনা করা পর্যাপ্ত হয় না; উহাকে প্রক্রিয়া (process)-রূপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।[১৯]

১৮ তুলনীয়: "By a community I mean any area of common life, village, or town, or district or country or even wider area. To deserve the name of community, the area must be somehow distinguished from other areas...All community is a question of degree...The one extreme is the whole world of men, one great but vague and incoherent common life. The other extreme is the small *intense* community." (MacIver, *Community*, pp. 22, 23).

ম্যাকাইভার কর্তৃক সম্প্রদায় (বা community) পদটি পছন্দ হইবার কারণ হইল যে, ব্যাপক ও বিরাট্ সমাজ অপেক্ষা সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট রূপ আছে এবং ইহার মধ্যে মানুষের বিভিন্ন আদর্শ ও সংস্থা মূর্ত হইতে পারে। সম্প্রদায়ে অবস্থানের ফলেই ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে 'অহংবোধ', এবং সামাজিকতা-বোধ যুগপৎ দেখা দেয়। (*Ibid.*, Preface ও Bk. III, Ch. III দ্রষ্টব্য)।

১৯ লিণ্ডেম্যান (E C. Lindeman) সম্প্রদায়কে গঠন ও প্রক্রিয়া (process ও function) এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বর্ণনা করার পক্ষপাতী। (তাঁহার *The Community* গ্রন্থ এবং *Encyclopaedia of Social Sciences*-তে 'Community'-পদের উপর তাঁহার নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(২) **সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ :**

সঙ্ঘ (Association)-ও একপ্রকারের সামাজিক গোষ্ঠী। ইহা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কৃত্রিম গোষ্ঠী—**কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি ব্যক্তি মিলিয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করে।**[২০] কতকগুলি ব্যক্তি যখন বিশেষ অভাব বোধ করে, তখন ঐ সাধারণ অভাব দূর করিবার জন্য তাহারা মিলিত বা যুক্তভাবে প্রচেষ্টা করে এবং ঐ সমবেত প্রচেষ্টাকে রূপদান করিবার জন্য তাহারা সঙ্ঘ গঠন করে ; যেমন, ফুটবল ক্লাব, ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কোন একটি বিশেষ কার্যের মাধ্যমে সাধিত হয় না—সুতরাং উহা সাধন করিবার জন্য একাধিক কার্য করা হয় বা বিবিধ কর্মপন্থা অনুসরণের চেষ্টা করা হয় ; এই কারণেই সঙ্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করে। সমাজ বা সম্প্রদায় মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্ভুক্তি তাহার ইচ্ছাধীন নহে এবং সে ইচ্ছা করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উহা পরিত্যাগও করিতে পারে না। অপর পক্ষে, সঙ্ঘ-গঠন, সঙ্ঘের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্ভুক্তি এবং সঙ্ঘের স্থায়িত্ব ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছাধীন। তাহা ছাড়া, সম্প্রদায় মাত্রই জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে এবং বহুবিধ আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ উহা হইতে উদ্ভূত হয়, কিন্তু সঙ্ঘ একটি বিশেষ বা প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, সকল সময়ই যে সকল সঙ্ঘের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তাহা নহে—অভাবের অস্পষ্ট অনুভূতি হইতে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়াও সঙ্ঘের উদ্ভব হইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে দেখিতে পাই যে, সংঘের সহিত সম্প্রদায়ের কয়েকটি পার্থক্য[২১] বিদ্যমান আছে :

---

২০ তুলনীয় : (১) 'By Association we mean a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to securing a specific end or specific ends." (Ginsberg, *op. cit.*, p. 121).

(২) By an 'association' I mean any group of persons pursuing in common purposes or system or aggregation of purposes by a course of co-operative action extending beyond a single act and for this purpose, agreeing together upon certain methods of procedure..." (Cole, *op. cit.*, p 121).

২১ সম্প্রদায় (community) ও সঙ্ঘ (association), **এই দুইএর পার্থক্যের** আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য MacIver, *Community* পৃঃ ২৩-২৮ এবং *The Elements of Social Science*, পৃঃ ৮-১০।

(ক) এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সংঘ গঠিত হয়; কিন্তু ঐরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কোন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলে না—সম্প্রদায় অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়। এইজন্য সঙ্ঘ যে অর্থে নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়, সম্প্রদায় সেই অর্থে হয় না।

(খ) সম্প্রদায় হইল সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ—ইহা হইতে বিভিন্ন সঙ্ঘের উদ্ভব হয়। সম্প্রদায়ের যদি একটি সামগ্রিক সত্তা আছে বলা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সংঘ উহার অংশ।

(গ) সম্প্রদায় মাত্রেরই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আছে। কিন্তু সঙ্ঘ স্থায়ী, অস্থায়ী নানা প্রকারের হয়; যদি এমন হয় যে, যে উদ্দেশ্যের জন্য সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল তাহা সাধিত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ সঙ্ঘেরও অবসান ঘটে।

(ঘ) সম্প্রদায় মাত্রই অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং ইহার আয়তন অল্প-বিস্তর বৃহৎ। কিন্তু সংঘ নানা প্রকারের হইতে পারে, দুই ব্যক্তিকে লইয়া ক্ষুদ্রতম সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে, আবার বহু ব্যক্তির সমাবেশেও সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে।

সম্প্রদায় ও সংঙ্ঘের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহার অর্থ নহে যে দুইটির মধ্যে বিরোধ আছে। সম্প্রদায় মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের যে জীবন মানুষ যাপন করে তাহার ফলে বহু প্রয়োজনের উদ্ভব হয় এবং এইগুলিকে পূরণের জন্যই আবার নানা প্রকারের সঙ্ঘের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সভ্যতার বিকাশের ফলে সম্প্রদায়ের যত অগ্রগতি ঘটে, সংঘও তত বৃদ্ধি পায়। বাস্তবিক বর্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আদিম যুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের কল্পনা আজ অবাস্তব। আজ সম্প্রদায় মাত্রই নানা সংঘে বিভক্ত এবং সবগুলি মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করিয়া নানা দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

৩। সংস্থা (Institution) —

(১) সংস্থা কাহাকে বলে?

'সংস্থা' পদটির সংজ্ঞাদান আরও দুরূহ। সাধারণতঃ **ইহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পারস্পরিক ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট রূপ বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বজনস্বীকৃত (অন্ততঃপক্ষে বহুজন স্বীকৃত ও অনুসৃত) নীতি বা কর্মপন্থা বুঝায়।** অনেক সময় সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই নীতি রূপ লাভ করে। এই কারণে সংস্থা পদের

আর একটি সংজ্ঞা হইয়াছে সামাজিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠান (**association** বা **establishment**)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধীয় যে নীতি বা আদর্শ জনমনে বিরাজ করে ও জনমনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যাহা অদৃশ্য থাকিয়া জনমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই আবার ক্ষেত্রবিশেষে বাহ্যরূপ লাভ করে ; যথা শিক্ষায়তন, ধর্মমন্দির ইত্যাদি। সুতরাং সংস্থার মনোগত রূপ ব্যতীত একটি বাহ্য রূপও থাকিতে পারে।

বস্তুতঃ 'সংস্থা' পদেব অর্থ হইল যাহা সম্যক্‌রূপে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এই স্থাপনা যে সকল ক্ষেত্রেই বাহ্যরূপ ধারণ করিয়া কোন গৃহ বা অনুরূপ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে তাহা নহে ; ইহা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত আচরণের আদর্শরূপে কেবলমাত্র জনমনেই বিরাজ করিতে পাবে।[২২]

সামাজিক সংস্থা হঠাৎ গঠিত হয় না—উহা ধীরে ধীরে সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত হয়। সুতরাং **সংস্থামাত্রই সামাজিক ঐতিহ্য** (tradition), **কৃষ্টি** (culture) ও **আদর্শ** (ideal)-এর **পরিচায়ক**।

(২) সামাজিক সংস্থার গঠন ও বিবর্তন :

সামাজিক সংস্থা কোন একটি মনের বা মাত্র কয়েকটি মনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য দ্বারা গঠিত নহে—উহা **বহু মনের প্রকাশক**। ইহা এক দিকে জনমনের

২২ **তুলনীয় :** "Institution : (1) An enduring, complex, integrated, organized behavior pattern through which social control is exerted and by means of which the fundamental social desires or need are met. (2) An organization of a public or semi-public character, involving a directive body, and usually a building or physical establishment of some sort, designated to serve some socially recognized and authorized end." (Fairchild's *Dictionary of Sociology*).

ইংরাজি Institution-পদের অর্থে এই দুইটি দিক্ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। (ইহা লাতিন 'instituere'-পদ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ হইল 'to cause to stand' বা দণ্ডায়মান করিয়া রাখা।) যাহা একদিক্ হইতে মনোগত আদর্শ তাহারই বাহ্যরূপ হইল প্রতিষ্ঠান। অর্থের এই দুইটি দিকের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া Cole বলিয়াছেন : "We may define an 'institution' as a recognised custom or form of social tradition or idea, manifested in and through human beings either in their personal conduct and relationships or through organised groups or associations. Thus the institution of monarchy is manifested in a king, and the social recognition accorded to him." (*op. cit.*, p. 43).

ইচ্ছার পরিচায়ক, আবার আর এক দিকে ইহা জনমনের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে।[২৩] অর্থাৎ একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ হইল বহু লোক বহু দিন ধরিয়া একটি বিশেষ ধারায় কার্য করিয়া আসিতেছিল —কালের গতিতে বহুজন অনুসৃত এই কর্মপন্থা এবং সংশ্লিষ্ট ভাবধারা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া থাকে। আবার উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহা জনমনকে বিশেষ পথে পরিচালিত করে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহু মনের ইচ্ছা সংস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইলেও সকলেরই ইচ্ছা একই লক্ষ্যের প্রতি থাকে না—বহু বিরোধ, বহু বিতর্কের মধ্য দিয়া উহা একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

সংস্থা মাত্রই **বহু মনের ইচ্ছার সঙ্গমস্থলস্বরূপ**; কিন্তু ইচ্ছামাত্রই কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে বা লক্ষ্যে পৌছাইতে চায়। সুতরাং সংস্থামাত্রই ইচ্ছা বা আদর্শের মূর্তরূপ। সকল সময়ই যে সকল সংস্থায় এই আদর্শ সুস্পষ্টভাবে মূর্ত হইয়া উঠে তাহা নহে—অধিকাংশ সময়ই ইহা অব্যক্ত বা অস্পষ্ট আকারে থাকে। তাহা ছাড়া, সকল সংস্থার মধ্যে যে যৌক্তিক আবেদন থাকে বা সকল সংস্থা যে যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করিয়া স্থাপিত হয় তাহাও নহে।[২৪] আবার সকল সংস্থার উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য যে সকলের পক্ষে একই রূপ হইবে তাহা নহে; যেমন, শিল্প-সংস্থার আপাত উদ্দেশ্য শ্রমিকের নিকট যেরূপ, মালিকের নিকট সেইরূপ না হইতে পারে। সংস্থাসমূহ যেন পরীক্ষণ ও ভ্রান্তি-পরিহার পদ্ধতি (trial-and-error method) অনুসরণ করিয়া চলে। এই জন্য সংস্থাসমূহের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা (বিশেষতঃ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মূল্য নিরূপণ) প্রয়োজন।

---

২৩ Hetherington ও Muirhead-এর ভাষায় : "An institution is a special society—'a meeting-point of wills'. It is an organization, created and sustained by individual wills, and equally creating and sustaining them." (*Social Purpose*, p. 119).

২৪ Ginsberg-এর উক্তি লক্ষণীয় :. "In all institutions there is therefore a social element, but it must be remembered that they are never the result of a single mind, and do not as a rule embody clearly conceived rational purpose. They are the meeting-point of many minds, and the result of the clash, between idea and idea, will and will, and therefore contain within themselves elements of selfishness, of vanity, of cruelty, as well as of self-sacrifice, devotion and human kindness. The rational element in institutions must, therefore, not be exaggerated ..." (*op. cit*., p. 123).

প্রতি সমাজেই এমন অনেক সংস্থা আছে যাহা সুদূর অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে—ঠিক কিভাবে কোন্ যুগে উহার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা জানা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সংস্থা গঠনের পরবর্তী কালে ব্যক্তিবিশেষ উহার গঠন-কার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই—সে জন্মাবধিই সংস্থার মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায় এবং সংস্থার মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে এই প্রকার সুপ্রাচীন সংস্থাসমূহের গঠনের আদিতে অংশ গ্রহণ না করিলেও ইহাদের সংরক্ষণে সহায়তা করে। প্রাচীন সংস্থাসমূহের পরিচালনায়, সংরক্ষণে এবং উহাদের গতি অব্যাহত রাখায় ব্যক্তিবিশেষ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়া থাকে। অপর পক্ষে, সমাজস্থ ব্যক্তিসমূহ যদি কোন একটি বিশেষ সংস্থার মধ্যে কোন অর্থ খুঁজিয়া না পায়, তাহারা যদি উহাকে উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে ঐ সংস্থার প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে বা একেবারে অবলুপ্ত হইবে।

(৩) সংস্থার আদর্শ

প্রতি সংস্থারই কতকগুলি নীতি বা আদর্শ থাকে ; ঐ সকল নীতি বা আদর্শ অনুসারে উহা সংস্থাধীন ব্যক্তিবর্গকে পরিচালিত করে। সকল সময়ই যে দৈহিক শক্তি দ্বারা নিয়মের অনুশাসন প্রতিপালন করিতে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় তাহা নহে—বরং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সাধারণ সম্মতি (common consent)-এর দ্বারা সংস্থার নিয়মাবলী অনেক সময় প্রতিপালিত হয়।[২৫] আশা করা যায় যে, জনসাধারণ সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিবে এবং যদি মানিয়া না চলে, তাহা হইলে সমাজস্থ অন্য যাহারা উহাদের মানিয়া চলে তাহাদের অপ্রিয় হইবে। যেহেতু আশা করা যায় যে, সমাজের অনেকেই সামাজিক সংস্থার নিয়মাবলী মানিয়া চলিবে, সেই হেতু ইহাও আশা করা যায় যে, উহারা 'আকাশ-কুসুম' বা অবাস্তব পরিকল্পনা নহে—তবে উহারা আদর্শমূলক।

সামাজিক সংস্থাগুলি পরিপালনের ফলে একদিকে কতকগুলি অধিকারের সৃষ্টি হয়, আবার অপরদিকে কতকগুলি কর্তব্যেরও সৃষ্টি হয়। আশা করা যায় যে, আদর্শ

---

২৫ কোন কোন লেখক অবশ্য মনে করেন যে, আদিতে কোন সংস্থাই স্বাধীন চিন্তা বা সাধারণ সম্মতি হইতে উদ্ভূত হয় নাই ; যথা. রাসেল বলেন : "All our institutions have their historic basis in Authority." (*Principles of Social Reconstruction* p 23).

সংস্থার ভিত্তি হইবে নৈতিক—অপরের অধিকার স্বীকার করা এবং স্বীয় কর্তব্য সাধন করার মাধ্যমে এই নৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।[২৬]

(৪) সংস্থার মূল্য বিচার:

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থার মূল্য কি হইতে পারে তাহাই দর্শনের পক্ষে বিবেচ্য বিষয়।

সংস্থার প্রধান মূল্য হইল যে, বিবিধ সংস্থার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। শিশু যদিও সমাজ মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও জন্মাবধিই সে সমাজের সকল রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি জানে না। সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত আদর্শ ও নিয়মাবলী সে ধীরে ধীরে শিক্ষা করে এবং

২৬ তুলনীয়: (১) "The term institution...will mean a particular type of normative pattern that affects human action in terms of a social system. It refers to those particular normative patterns (1) conformity with which is generally to be expected, and (2) failure to conform with which is generally met with the moral indignation of those individuals who are involved in the same general social system and who are aware of the failure." (M. J. Levy, Jr., *The Structure of Soci*   p. 102).

(২) "A pattern gov   ning action in a social system will be called institutionalized' in so far as it defines the main modes of the *legitimately expected* behaviour of the persons acting in the relevant social roles, in so far as conformity with these expectations is of strategic structural significance to the social system ...It is an *ideal* pattern, but since conformity is legitimately expected it is not a 'utopian' pattern." (Parsons, 'The Position of Sociological Theory', *American Sociological Review*, 1948, Vol. 13).

(৩) "Institution: A Practice, law, custom etc. which is a material and persistent element in the life or culture of an organized social group.

Any association, custom or relationship consciously approved by a society and organized and maintained through prescribed rules and agencies." (Webster's *Dictionary*).

আমরা উপরে সামাজিক সংস্থা যে আদর্শাভিমুখী তাহার উল্লেখ করিলাম। তবে কখনও কখনও সামাজিক বিদ্রোহ বা অনুরূপ কোন ঘটনার ফলে জনসাধারণের মধ্যে আদর্শহীনতা বা লক্ষ্যের অনির্দিষ্টতার ভাব জাগিতে পারে। [ইহাকে Durkheim, Parsons ইত্যাদি লেখক *Anomie* (আদর্শ-ভ্রষ্টতা, লক্ষ্যহীনতা) বলেন—ইহা institutionalization-এর বিপরীত অবস্থা]।

এইভাবে তাহার সামাজিকীকরণ আরম্ভ হয়। (পৃ: ৮৬)। ইহারই ফলে সে সমাজ মধ্যে সামাজিক জীব হিসাবে বাস করিতে শিক্ষা করে, সে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে, অন্যের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করে। মোট কথা, বিবিধ সামাজিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেই ব্যক্তি-বিশেষ স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। যদি পরিবার না থাকিত, যদি বিদ্যায়তন না থাকিত, যদি রাষ্ট্র না থাকিত, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষ আত্মপ্রকাশের এবং অন্যের সহিত আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ লাভ করিত কি করিয়া? সুতরাং **ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকতাবোধ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সামাজিক সংস্থাসমূহের অবদান অপরিসীম**।

কেহ কেহ সংস্থা ও সংস্থাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আচারাদির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে—

(ক) বিবিধ সংস্থাগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিগুলির এককালে উপকারিতা থাকিলেও উহাদের প্রয়োজনীয়তা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায় এবং উহারা তখন প্রগতির সহায়ক না হইয়া উহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া উঠে।[২৭]

ইহা সত্য যে, অনেক সমাজে এমন অনেক আচার-ব্যবহার বা রীতি-নীতি প্রচলিত আছে যেগুলির এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্থা মাত্রই অপ্রয়োজনীয় ভারস্বরূপ নহে। কোন সংস্থা যদি অচলায়তন বা স্থবির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার প্রভাবাধীন ব্যক্তিগণের উচিত উহার দোষত্রুটি দূর করিয়া উহাকে যুগোপযোগী করিয়া তোলা। সংস্থাকে পরিহার করিয়া বা ধ্বংস করিয়া সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সামাজিক

---

২৭ রাসেল (Bertrand Russell) তাঁহার *Principles of Social Reconstruction* গ্রন্থে (পৃ: ৪২) মন্তব্য করিয়াছেন: "Our institutions are not yet suited either to the instinct developed by our new circumstances or to our real beliefs. Institutions have a life of their own, and often outlast the circumstances which made them a fit garment for instinct. This applies in varying degrees, to almost all the institutions which we have inherited from the past." কিন্তু রাসেল এইরূপ মন্তব্য করিলেও তিনি সংস্থার প্রভাবমুক্ত জীবনযাপন করিতে নিশ্চয়ই উপদেশ দেন নাই বরং উহাদের পুনর্গঠন বা সংস্কার (reconstruction) সম্বন্ধেই তিনি তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

পরিবেশ বা মানসিক সংগঠন এইরূপ যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে সংস্থার প্রভাবমুক্ত জীবন যাপন করিতে পারে না—ঐরূপ জীবন স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর হইবে।

(২) কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, সংস্থাগুলি প্রধানতঃ জাগতিক সুখ-সুবিধাবিধান এবং সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই সংগঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা আত্মিক উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা কোথায়?

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা আত্মিক উন্নতি সাধন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। সামাজিক পরিবেশের সহিত মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন এবং উহার ফলে ক্রমশঃ ব্যক্তি-বিশেষের আত্মিক উন্নতি হয়।

(৩) আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব হইল অপরিবর্তনীয়। সামাজিক সংস্থার অনুশাসন তাহার স্বভাবজাত বৃত্তির মধ্যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে না।

এই আপত্তিও পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ যদিও মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা যায় না, তাহা হইলেও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বা সামাজিক সংস্থার অনুশাসনগুলির ফলে বা সামাজিক শিক্ষণের দ্বারা মানুষের সহজাতবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং তাহাদের প্রকাশভঙ্গিমাকে মার্জিত করা যায়; তাহা ছাড়া, সামাজিক সংস্থার বৈচিত্র্য অনুযায়ী সহজাতবৃত্তিগুলি বিবিধভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে।[২৮] এই প্রসঙ্গে অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন সহজাতবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অবদমিত (repressed) করিলে তাহার ফল ভাল হয় না, বরং ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিকার দেখা দিতে পারে।

২৮ **তুলনীয়:** (১) "There is very little evidence of change in congenital tendencies, but in regard to the mode of realization of inherited tendencies, human nature appears to be malleable." (Ginsberg, *op. cit.*, p. 125 fn.).

(২) "Almost any instinct is capable of many different forms according to the nature of the outlets which it finds. The same instinct which leads to artistic or intellectual creativeness may under other circumstances lead to a love of war." (Russell, *op. cit.*, p. 40).

সামাজিক সংস্থার যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও উহার প্রতি অন্ধ ভক্তি সকল সময় মঙ্গলজনক নহে। সংস্থা-প্রদর্শিত আদর্শগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহাদের পরিবর্তনও সাধন করিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীনত্বের মোহে যে অন্ধ, সে জড়বিশেষ; আবার কেবলমাত্র নবীনত্বের মোহে যে উদ্দাম বিদ্রোহী, সে সামাজিক সংগঠনকে ধ্বংস করে। সুতরাং আমাদের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা উচিত—যেমন একদিকে নিছক প্রাচীনত্বের জন্য সমাজের জীর্ণ শীর্ণ সংস্কার বা বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকা উচিত নহে, সেইরূপ অপর দিকে "একটা কিছু নতুন কর্ রে, একটা কিছু নতুন কর্" এইরূপ মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাহা কিছু পুরাতন বা প্রাচীন তাহা ধ্বংস করা বা পরিত্যাগ করাও উচিত নহে।[২৯]

মোট কথা, সামাজিক সংস্থার মূল্য বিচারকালে একদিকে, লক্ষ্য করিতে হইবে উহা কতদূর সামাজিক সংহতি এবং সুষ্ঠ আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং অপরদিকে দেখিতে হইবে উহা ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কতদূর সহায়তা করিতেছে। সকলক্ষেত্রেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংস্থা ব্যক্তির জন্য, ব্যক্তি সংস্থার দাস নহে।[৩০]

২৯ নূতনত্বের মোহমুগ্ধ বিদ্রোহী মনকে সংযত হইতে উপদেশ দিয়া ব্রাড্‌লি (Bradley) বলিয়াছেন: "It is not wrong, it is a duty, to take the best that there is and to live up to the best. It is not wrong, it is a duty, standing *on the basis of the existing*, and *in harmony with its general spirit*, to try and make not only oneself but also the world better." ইহার পর সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক আদর্শ হইতে পৃথক্ তথাকথিত "স্বাধীন মতবাদ" পরিপোষণের নিন্দা করিয়া তিনি বলিয়াছেন "... having theories of one's own in the face of the world is not far from having practice in the same direction; and if the latter is (as it often must be) immorality, the former has certainly stopped at the threshold." (*Ethical Studies*, p. 200).

৩০ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সুযুক্ত মন্তব্য: "An excessive love for novelty, a passion for changing ancient usages and institutions is often as injurious to society as a blind veneration for whatever is old...The views of reformers should in all cases be subjected to careful and searching criticism." (P. B. Chatterji, ***Principles of Ethics***, Ap. B, p. cii).

ষষ্ঠ অধ্যায়

পারিবারিক সংস্থা ও বিবাহ

মানুষ মাত্রেই কোন-না-কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ইহাই ক্ষুদ্রতম প্রাথমিক গোষ্ঠী যাহার সহিত ব্যক্তিমাত্রই আজন্ম জড়িত এবং ইহার অন্তর্ভুক্তি তাহার ইচ্ছাধীন নহে। পারিবারিক সংস্থার মাধ্যমেই প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আত্ম-প্রকাশের সুযোগলাভ করে এবং ইহার মধ্যেই প্রতি ব্যক্তির শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরিবারের বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন, প্রভাব, প্রয়োজনীয়তা, আদর্শ ইত্যাদিই হইল বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধেয় বিষয়।

১। পরিবার কাহাকে বলে? (What is a family?)

যদিও আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, লালিত-পালিত হইয়াছি এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছি, তাহা হইলেও পরিবারের একটি সুষ্ঠ সংজ্ঞাদান করা কঠিন। যে-কোন পরিবারকে অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—পরিবার মাত্রেরই একটি মানসিক সংগঠন আছে; ইহার মূলে আছে যৌনবৃত্তি, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের বাসনা, অনুরাগ, অধিকার ও প্রভুত্বের ইচ্ছা, আত্মত্যাগের ইচ্ছা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি; এবং ইহার নিজস্ব কয়েকটি ঐতিহ্য, আদর্শ ও ভাবধারা আছে। পরিবারের ব্যাপকতা ঘটে নূতন শিশুর জন্মগ্রহণের ফলে এবং নূতন শিশুর আবির্ভাব সম্ভব হয় স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে; সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিবারকে বলা যায় যে, **পরিবার হইল এমন এক গোষ্ঠী যাহা যৌন সম্পর্ক দ্বারা সুনির্ধারিত এবং যাহা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের কার্যে নিযুক্ত থাকে।**[১] কিন্তু ইহাতে পরিবার-পদের সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, কারণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যৌন সম্বন্ধ দ্বারা গঠিত নহে; আবার এমন অনেক পরিবার আছে যাহা সন্তানহীন। এইজন্য পরিবার-পদের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সংজ্ঞা বাঞ্ছনীয়। **পরিবার বলিতে দুই বা ততোধিক**

১ তুলনীয়: "The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and up-bring of children." (MacIver, *Society*, p. 238).

ব্যক্তির এমন এক গোষ্ঠী বুঝায় যাহা বিবাহসম্পর্ক, রক্তসম্পর্ক অথবা দত্তকগ্রহণের ফলে সৃষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত, যাহারা একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহারা পারিবারিক কার্যে পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এবং একই আদর্শ, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে অংশ গ্রহণ করে।[২] সুতরাং পারিবারিক সম্পর্কের এমন একটি ঘনিষ্ঠতা আছে যাহার মধ্যে বাহিরের লোকের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা নাই[৩], যেখানে প্রতি পদেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের সহিত মিথস্ক্রিয়া ঘটিতেছে এবং যেখানে পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী সকলে চলিবার চেষ্টা করে বা চলা উচিত বলিয়া একটি ধারণা আছে। আবার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে প্রতি সমাজে বা সম্প্রদায়ে কতকগুলি নিয়ম বা বিধি গড়িয়া উঠে।[৪]

নৈতিক আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিবারস্থ সকলেই সমগ্র পরিবারের কল্যাণের জন্য কার্য করিবে, ইহাই আশা করা যায় (অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শের অনেক সময় বিচ্যুতি ঘটে)। পারিবারিক সংস্থার মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের

---

২ তুলনীয়: (১) "A family is a group of two or more persons joined by ties of marriage, blood or adoption, who constitute a single household, who interact with each other in their respective familial roles and who create and maintain a common culture." (R. F. Winch, *The Modern Family*, p. 14).

(২) "A family is a group of two or more persons related by blood, marriage or adoption and residing together." (American Bureau of Census).

অবশ্য পারিবারিক সংস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল হইতে পারে। ইহার জটিল সংগঠনের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Parsons-রচিত প্রবন্ধ 'Social Structure of the Family' (R. N. Anshen-সম্পাদিত গ্রন্থ *The Family: its Functions & Destiny*).

৩ অবশ্য বিবাহ বা দত্তকগ্রহণের ফলে বাহিরের লোকই অর্থাৎ অন্য পরিবারের লোক আর এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এই অন্তর্ভুক্তির পর একই সময় আর কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নহে। এইজন্য অন্য অনেক গোষ্ঠী বা সংস্থার ক্ষেত্রে যেমন একই ব্যক্তি একাধিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, পরিবারের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে।

৪ কেহ কেহ পরিবারের সংজ্ঞাদানকালে উহা যে সামাজিক অনুশাসন বা বিধিসম্মত গোষ্ঠী তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; যথা, "Family: One or more men living with one or more women in a *socially sanctioned* and more or less enduring sex relationship, with socially recognized rights and obligations, together with their offspring." (Fairchild, *Dictionary of Sociology*).

মিলন এমন এক রূপ ধারণ করিতে পারে যাহা মধুর, ঘনিষ্ঠ অথচ দায়িত্বপূর্ণ এবং স্বার্থহীন সম্বন্ধে রূপান্তরিত হইতে পারে। মানুষ একাকী থাকিলে যাহা বিকশিত হইত না, যাহা কেবলমাত্র অতৃপ্ত বা উচ্ছৃঙ্খল কামরূপে থাকিয়া যাইত, তাহাই অন্যের সাহচর্যে ও অন্যকে বুঝিবার প্রচেষ্টায় এক অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ সমাজমধ্যে সামাজিক জীব হিসাবে জন্মগ্রহণ করিলেও সমাজে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উপযুক্ত হইবার জন্য তাহাকে কতকগুলি সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারা শিক্ষা বা গ্রহণ করিতে হয়—এইভাবেই ঘটে তাহার সামাজিকীকরণ (পৃঃ ৮৬ ৯০)। এই সামাজিকীকরণের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হইল পারিবারিক সংস্থা—এই স্থানেই নবজাত শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এইখানে শৈশবে ও কৈশোরে সে যে শিক্ষা লাভ করে, তাহাই অনেকাংশে উত্তর জীবনে চলার পথে তাহাকে সাহায্য করে। আবার একদিকে শিশু যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের নিকট শিক্ষা লাভ করে, সেইরূপ শিশুর লালনপালনের মধ্য দিয়া প্রাপ্তবয়স্করাও শিক্ষালাভ করে।[৫]

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে আমরা পারিবারিক সংস্থার কয়েকটি **প্রধান বৈশিষ্ট্য** নিরূপণ করিতে পারি :

(১) সর্বজনীনত্ব (universality)—পৃথিবীতে যত প্রকার মানবজাতির পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাদের সকলেরই ভিতর কোন-না-কোন প্রকারের পারিবারিক সংস্থা আছে এবং প্রতি ব্যক্তিই কোন-না-কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(২) সীমিত আকার—পরিবার মাত্রেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। দুইজনকে

৫ ডিউই ও টাফ্‌ট্ (Dewey and Tufts) পারিবারিক সংস্থার আদর্শগত মূল্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন : "The family in its moral aspects has one end, the common good of all its members; but this has three aspects—(1) Marriage converts an attachment between man and woman, either of passion or of friendship, into a deliberate, intimate, permanent responsible union for a common end of mutual good. It is this common end, a good of a higher, broader, fuller sort than either could attain in isolation, which lifts passion from the impulsive or selfish to the moral plane, it is this peculiar intimacy and peculiar demands for common sympathy and co-operation, which give it greater depth than ordinary friendship. (2) The family is the great social agency for the care and training of the race. (3) This function reacts upon the character of the parents. . ." (*Ethics*, p. 571).

লইয়া ক্ষুদ্রতম পরিবার গঠিত হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির অন্যতম হইল পরিবার—সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে ইহা গঠিত।[৬]

(৩) অনুভূতি-প্রবণতা—স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবারস্থ সকলের সহিত সকলের অল্পবিস্তর অন্তরঙ্গতা বা অনুভূতির যোগ থাকে। তাহা ছাড়া, পরিবারমধ্যে প্রেম, স্নেহ, মায়া ইত্যাদি সুকোমল অনুভূতি জন্মলাভ করে। (আবার ক্ষেত্রবিশেষে ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, অহমিকা ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয় অনুভূতিও দেখা দিতে পারে)।

(৪) ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব—পারিবারিক পরিবেশই হইল প্রাথমিক পরিবেশ যাহার প্রভাবের অধীন শিশু জন্মের পরমুহূর্ত হইতেই হয়। পরিবারই শিশুর প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র এবং পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শিশু যেভাবে এবং যতদূর প্রতিযোজন করিতে সক্ষম হয়, তাহার উপর তাহার ভাবী জীবনের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে।

(৫) বিধিবদ্ধতা—সমাজমাত্রই কতকগুলি অনুশাসনের বা নিয়মের প্রবর্তন করে এবং সামাজিক সকল গোষ্ঠী ও সংস্থাকে অল্পবিস্তর সেগুলি মানিয়া চলিতে হয়। সুতরাং সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে পরিবার মাত্রকেই কতকগুলি সামাজিক রীতি বা নিয়ম মানিতে হয়; যেমন, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামাজিক অনুশাসন না মানিলে সমাজের স্বীকৃতিলাভের সম্ভাবনা কম। তাহা ছাড়া, প্রতি পরিবারেই আবার কতকগুলি নিজস্ব রীতি-নীতি প্রচলিত থাকে।

৬ পারিবারিক গোষ্ঠী নিম্নলিখিত বিভিন্ন আকারের হইতে পারে:

(১) স্বামী, স্ত্রী এবং অন্ততঃ একটি শিশু সন্তানকে লইয়া গঠিত গোষ্ঠী (ইহা অন্ততঃ তিন ব্যক্তি লইয়া গঠিত);

(২) নিঃসন্তান দম্পতি (ইহা দুই ব্যক্তি লইয়া গঠিত);

(৩) পিতা অথবা মাতা এবং এক বা একাধিক সন্তান লইয়া গঠিত গোষ্ঠী; (পিতা বা মাতার মধ্যে যে অবর্তমান, তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিতে পারে, অথবা সে পরিবার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে অথবা পরিত্যক্ত হইয়াছে);

(৪) যাহাদের একই পিতামাতা ছিল অথবা কেবল পিতা বা কেবল মাতা একই ছিল এইরূপ কয়েকজন মিলিয়া গঠিত গোষ্ঠী;

(৫) এক পতি ও বহু পত্নী অথবা এক পত্নী ও বহু পতি লইয়া গঠিত গোষ্ঠী (ইহাদের সন্তান থাকিতে পারে আবার নাও থাকিতে পারে);

(৬) জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং তাহাদের সন্তানাদি লইয়া বিরাট্ গোষ্ঠী।

(J. T. Zadrozny-সম্পাদিত *Dictionary of Social Sciences* দ্রষ্টব্য)।

(৬) দায়িত্ববোধের সৃষ্টি—পরিবারের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে থাকিতে হইলে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে হয় এবং পারিবারিক বিধিনিষেধগুলি মান্য করিতে হয়। এইজন্য যৌথ ও একক দায়িত্ববোধের উদ্ভব হয়।

(৭) আদর্শানুগতা—পরিবারমাত্রেরই কতকগুলি আদর্শ থাকে এবং এই আদর্শের যাহাতে বিচ্যুতি না ঘটে, সেদিকে পরিবারের কর্তৃস্থানীয় লোকেরা সাধারণতঃ লক্ষ্য রাখেন। এইভাবে অনেক পারিবারিক গোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ কৃষ্টির ধারক ও বাহক রূপে কার্য করে।

(৮) 'একক'-গোষ্ঠী—পরিবার মাত্রই ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'একক' গোষ্ঠী (unit-group) হিসাবে কার্য করে।

(৯) স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব—পরিবার বলিতে সংস্থা (institution)-ও বুঝায়, আবার পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠী (group)-ও বুঝায়। সংস্থা হিসাবে যদিও পরিবারের স্থায়িত্ব আছে, তাহা হইলেও বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির গোষ্ঠী হিসাবে উহা অস্থায়ী, কারণ তাহাদের মৃত্যুর সহিত ঐ গোষ্ঠীর অবসান হয়। তবে সাধারণতঃ একই সঙ্গে সকলের মৃত্যু ঘটে না বলিয়া অধিকাংশ পারিবারিক গোষ্ঠীতে প্রাচীনের সহিত নবীনের মিলন ঘটে।

২। পারিবারিক সংস্থার বিবর্তন (Evolution of Family):

মানবসমাজের আদি যুগে পারিবারিক সংস্থা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। তবে বর্তমান কালের বিবিধ সুসভ্য জাতির মধ্যে পারিবারিক সংস্থার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে এবং এখনও পৃথিবীতে যে সকল আদিম জাতি আছে তাহাদের পারিবারিক সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবার সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করিতে পারি।

বিবিধ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারিবাবিক গোষ্ঠীকেই প্রাচীনতম বা সর্বাপেক্ষা পুবাতন গোষ্ঠী বলিয়া মনে হয়। **আমরা সুদূর অতীত সম্বন্ধে যতদূর ধারণা করিতে পারি, তাহাতে দেখিতে পাই কোন-না-কোন প্রকারের পরিবার আদিম মনুষ্যসমাজে ছিল।** তাহা ছাড়া, বিবর্তনবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যে মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মানুষের বিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই মনুষ্যেতর প্রাণীর (যথা, বানর জাতীয় জীবের) মধ্যে আমরা পরিবারবদ্ধভাবে বাস করিবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাই—ইহা হইতেও আমরা প্রবন্ধ করিতে পারি যে,

বানরজাতীয় জীব হইতে যখন মানুষের বিবর্তন ঘটিল, তখন সে তাহার পূর্বগামী জীবের মধ্যে পরিবারবদ্ধভাবে থাকিবার প্রচলিত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই একেবারে পরিহার করে নাই। তাহা ছাড়া, যে সকল জীব পারিবারিক গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাহারা লুপ্ত ত' হয়ই নাই, বরং পরিরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পারিবারিক গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব প্রকৃতির অভিপ্রেত।[৭]

পারিবারিক সংস্থার বিবর্তনের ধারা ঠিক কোন্ কোন্ পথে চলিয়াছিল তাহা আমরা সঠিকভাবে বলিতে পারি না; তবে উহা যে অন্য সামাজিক সংস্থাগুলির ন্যায়ই কোন সরল পথ ধরিয়া চলে নাই, তাহা আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলিতে পারি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ (pre-historic age)-এ পারিবারিক সংস্থার স্বরূপ কি প্রকারের ছিল তাহা লইয়া বিবিধ মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

(ক) **অবাধ যৌনচারিতা**—কেহ কেহ (যথা, মরগ্যান[৮]) মনে করেন যে, সমাজের প্রাথমিক স্তরে আদিম মানুষের মধ্যে অবাধ যৌনচারিতা (sexual promiscuity) বর্তমান ছিল, অর্থাৎ এই যুগে যৌন-আচরণের ক্ষেত্রে যেন এক প্রকারের সাম্যবাদ (sexual communism) প্রচলিত ছিল। এই মতের সপক্ষে বলা হয় যে, আদিম যুগের সমাজব্যবস্থায় বয়সের তারতম্য অনুসারে জনসমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হইত; যেমন, একদল 'পিতৃ-মাতৃ' শ্রেণী, আর-একদল 'ভ্রাতা-ভগিনী' শ্রেণী, আবার আর-একদল 'পুত্র-কন্যা' শ্রেণী[৯]। সুতরাং পিতৃ-মাতৃ শ্রেণীর সকলেই পুত্র-কন্যা শ্রেণীর সকলের নিকট পিতা বা মাতা রূপে গণ্য হইত; আবার পিতৃ-মাতৃ শ্রেণীর যে কোন নর যে-কোন নারীর

---

৭ তুলনীয়: "It is difficult to determine the beginnings of the family. So far as historical records are concerned it has always existed in some form. Moreover, among the lowest types of human beings and also among the higher apes family relationships exist...In the instinctive stage the survival value of the coöperation of both parents in the rearing of the young insured its establishment and continuance." (Blackmar & Gillin, *Outlines of Sociology*, pp. 112-13).

৮ L. H. Morgan, *Ancient Society* এবং R. Briffault, *The Mothers* দ্রষ্টব্য।

৯ প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্র (Republic)-এ যে যৌন সাম্যবাদ প্রচার করেন, তাহাতে তিনি অনুরূপ শ্রেণীকরণ বাঞ্ছনীয় বলেন। তবে প্লেটো কোনপ্রকার অবাধ যৌনচারিতা সমর্থন করেন নাই।

সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিত। তাহা ছাড়া, উৎসবাদির সময় যৌন সম্ভোগের কোন বাধা ছিল না; প্রয়োজন হইলে পত্নী-বিনিময় করা হইত; অতিথির সম্ভোগের জন্য পত্নী-নিয়োগ ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই মত সকলে সমর্থন করেন না। অনেকে বলেন যে, আদিম সমাজে যে সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল, তাহাতে অবাধ যৌন স্বাধীনতা বুঝায় না; কারণ পিতৃ-মাতৃ শ্রেণীর কেহ পুত্র-কন্যা শ্রেণীর সহিত কোন যৌন সম্পর্ক স্থপন করিতে পারিবে না, অথবা ভ্রাতা-ভগিনী শ্রেণীর লোকেরা পরস্পরের সহিত যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে পারিবে না, এইরূপ নিষেধেরই ইঙ্গিত আমরা শ্রেণীকরণ-ব্যবস্থার মধ্যে পাই। তাহা ছাড়া, উৎসবাদির সময় যদি যৌন স্বাধীনতা প্রচলিত থাকে তাহার অর্থ ইহা নহে যে, বিবাহ বা যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদিম যুগে কোনরূপ বাধা বা নিষেধ ছিল না, এবং উৎসবাদির সময় ঐরূপ স্বাধীনতা দানের অর্থ হইল যে সাধারণ অবস্থায় ঐরূপ স্বাধীনতা মিলিত না। মোট কথা, অবাধ যৌনচারিতার সপক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ আমরা দেখাইতে পারি না[১০], অর্থাৎ পারিবারিক গোষ্ঠীতে ভাঙ্গন ধরিতে পারে এমন কোন যৌনচারিতার উদাহরণ আমরা পাই না, বরং সমাজের তথা পরিবারের সংহতি যাহাতে রক্ষিত হয় প্রকৃতি যেন সেই দিকেই সৃষ্টির আদিযুগ হইতে প্রচেষ্টা করিয়া চলিতেছে[১১]।

(খ) **একগামিতা বনাম বহুগামিতা**—আধুনিককালে আমরা একগামিতা বা এক পুরুষের সহিত এক নারীর বিবাহ (monogamy)-কে আদর্শ বলিয়া মনে করি এবং অধিকাংশ সুসভ্য সমাজে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যসমাজে একগামিতাই ছিল প্রচলিত প্রথা। বানর এবং অন্যান্য

১০ তুলনীয়: "Our available knowledge, whether derived from features of the classificatory system or from other social facts, does not provide one shred of evidence in favour of such a condition as was put forward by Morgan as the earliest stage of human society; nor is there any evidence that such promiscuity has ever been the ruling principle of a people at any late stage of the history of mankind." (W. H. R. Rivers, *Kinship & Social Organization*, p. 85). এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য MacIver, *Society*, p. 244 এবং R. Linton, *The Study of Man*, p. 147.

১১ Lofthouse মনে করেন: "Throughout a cohesive force has been at work...., on its existence has depended the welfare and the progress of the human race." (*Ethics & the Family*, p. 88).

অনেক ইতর জীবের মধ্যে এক এক জোড়ায় বা দ্বয়ী (pair) গঠন করিয়া যৌন জীবন যাপন করিবার প্রথা দেখা যায়। পশুজীবন হইতে মনুষ্যজীবনের বিবর্তন ঘটিবার পর আদিম অবস্থায় মানুষের সমাজে একগামিতাই প্রচলিত ছিল, পরে নানা কারণে এই সমাজব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

এই বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত মত দান করা অসম্ভব এবং বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন[১২]; সুতরাং কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা প্রবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া উহাকে সর্বজনীন বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

(গ) **মাতৃশাসন বনাম পিতৃশাসন**—আদিম সমাজ মাতৃশাসিত (matriarchal) ছিল, না পিতৃশাসিত (patriarchal) ছিল, সে বিষয়েও বিপরীত মতবাদ প্রচলিত আছে।

বাক্‌ওফেন (Bachofen), ম্যাক্‌লেনান্ (McLennan) প্রভৃতি লেখক মনে করেন যে, আদিম পরিবার ছিল মাতৃকেন্দ্রিক বা মাতৃশাসিত (matriarchal)। তাহাদের অভিমত এই যে, মানুষের বিবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাময় (chaotic)। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে নারী তাহার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া কতকাংশে শৃঙ্খলার সূত্রপাত করে, অর্থাৎ একেবারে আদিম সমাজে নারীই ছিল পরিবারের শাসিকা এবং নেত্রী।[১৩] কিন্তু ক্রমশঃ

১২ ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck) মনে করেন যে, pair-marriage-এর ব্যবস্থাই হইল আদিম বিবাহব্যবস্থা। (তাঁহার *History of Human Marriage* দ্রষ্টব্য)। তিনি মনে করেন যে, একগামিতা বা একের প্রতি আসক্তি—the true monogamous sentiment, the absorbing passion for one—আজও অনেক অসভ্য সমাজে দেখা যায়। (তাঁহার *The Origin & Development of Moral Ideas*, Vol. II, p. 389 দ্রষ্টব্য)।

সেইরূপ মনোবিৎ ভুণ্ট্ (Wundt) বলেন: "The phenomena...everywhere point to monogamy." (*Elements of Folk Psychology*, p. 48).

অপরপক্ষে, আদিমযুগে বহুগামিতা (polygamy)-প্রথার সমর্থন করিয়া (অর্থাৎ উপরের মতের বিরোধিতা করিয়া) হব্‌হাউস্ (Hobhouse) বলেন: "Polygamy...is the prevalent type of marriage in uncivilised society" (*Morals in Evolution*, Vol. I, p 143).

সেইরূপ মনোবিৎ ফ্রয়েড মনে করেন যে, বহুগামিতাই হইল নরের স্বাভাবিক ধর্ম (Man is polygamous by nature).

১৩ কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নারী যে কেবল পরিবারের কর্ত্রীস্থানীয়া ছিল তাহা নহে সমগ্র সমাজই নারীর শাসনাধীন ছিল (এইরূপ অবস্থাকে gynæcocracy বলা হয়)। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, এইরূপ অবস্থায় যে মাতারা নিজেরাই সন্তানকে শাসন করিত তাহা নহে, মাতার পরিবর্তে মাতৃকুলের যে কেহ শিশুর উপর কর্তৃত্ব করিত। এইরূপ পরিবারকে বলা হয় মাতৃনামধারী (metronymic) পরিবার। আবার বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর গৃহে যাইয়া পরিবার গঠন করিত বলিয়া এইরূপ পরিবারকে 'মাতৃগৃহবাসিত পরিবার' (matrilocal family) বলা হয়।

এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া নারী অত্যন্ত দাম্ভিক, ক্ষমতালোভী এবং নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল ও কোন প্রকার বিবাহবন্ধন স্বীকার করিল না। পুরুষেরা এই অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং ক্রমশঃ পিতৃশাসিত পরিবারের অভ্যুদয় ঘটিল।

অপরপক্ষে, আর-একদল লেখক মাতৃশাসিত আদিম গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, আদিম মানবগোষ্ঠী যে সর্বত্র মাতৃশাসিত ছিল এমন কোন প্রমাণ নাই—বরং মানব-পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল পিতৃশাসিত।

এই দুই বিরুদ্ধ মতের আলোচনা করিয়া আমরা এই মন্তব্য করিতে পারি যে, এখনও কয়েকটি অসভ্য জাতির মধ্যে মাতৃনামে বংশ পরিচয় দিবার প্রথা থাকিলেও, শিশুর উপর মাতা বা মাতৃকুলের কোন আত্মীয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিলেও বা বিবাহের পর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর পরিবারে যাইয়া বসবাস করিবার রীতি থাকিলেও আদিম অবস্থায় সর্বস্থানে মাতৃশাসন (universal matriarchy) প্রচলিত ছিল এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই না। বরং প্রাপ্ত উপাত্ত (available data)-এর ভিত্তিতে আমরা বলিতে পারি যে, মাতৃশাসন হইল ব্যতিক্রম, উহা সাধারণ নিয়ম নহে।[১৪] সভ্য জাতির মধ্যে সর্বত্রই কোন-না-প্রকারের পিতৃশাসন প্রচলিত আছে। সভ্যতার বিবর্তনের পর প্রাচীন ভারত, রোম, গ্রীস্, চীন সর্বত্রই আমরা পিতৃ নামে বংশপরিচয় এবং পিতৃশাসনেরই পরিচয় পাই। প্রাচীন রোমে পরিবারের অন্য সকলের উপর পরিবারস্থ 'প্রধান পুরুষ'- এর অপরিমেয় প্রতিপত্তি ছিল।

৩। পারিবারিক সংস্থার বিবিধ কার্য ও প্রয়োজনীয়তা (Different functions & uses of Family):

পারিবারিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইলে উহা ব্যক্তি তথা সমাজের জন্য কী করিয়া থাকে তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

---

১৪ এইজন্য শ্রীমতী হেলেন্ বোসাঙ্কে (Helen Bosanquet) মন্তব্য করিয়াছেন: "With a few exceptions like these, the rule appears to be that the man is undisputed master over both wife and children, no matter whether the latter are called by his name or the mother's...... In so far as the authority within the Family rests with the father, the Patriarchal Family may be said to co-exist with a system of kinship through the mother, and at the earliest stages of development...... . Amongst the peoples of the earliest type we know—the 'lower hunters'—her (woman's) lot is worst of all." (*The Family*, pp. 33, 34).

সাধারণতঃ পারিবারিক সংস্থা দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য সাধিত হইয়া থাকে :

(১) **পারিবারিক সংস্থা উহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণকে 'সামাজিক মর্যাদা' বা 'প্রতিষ্ঠা' (status) দান করে।**

এই মর্যাদা-দান নানাভাবে হইতে পারে। ইহা যে সর্বদাই কোন গৌরবজনক মর্যাদা দান করে, তাহা নহে—এই মর্যাদাবোধ হইতে প্রতি ব্যক্তিরই অন্তরে এই ধারণা থাকে যে, আমি 'অমুক' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজেকে কোন বিশেষ একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারে না, যে তাহার পিতৃ-মাতৃ পরিচয় দিতে পারে না, বৃহত্তর সমাজেও সে মর্যাদা পায় না। তাহা ছাড়া, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রতি ব্যক্তিই পরিবার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে। শৈশব হইতেই পরিবার মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া, বিশেষ বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়া, বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় কার্য করিয়া ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি আদর্শ, ঐতিহ্য ও ভাবধারা গ্রহণ করে।[১৫] এইভাবে শৈশব হইতে ব্যক্তিবিশেষ পরিবার মধ্যে বিবিধ বিষয় শিক্ষা করে।

ব্যক্তিবিশেষ পরিবার মধ্যে যে স্থান অধিকার করে তাহার দ্বারা পরিবারের অন্য সকলের সহিত তাহার সম্পর্ক নিরূপিত হয়, আবার পরিবারের বাহিরে সমাজের অন্য সকলের সহিতও তাহার স্থান নিরূপিত হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ব্যক্তি-বিশেষ তাহার পরিবারলব্ধ মর্যাদার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।[১৬]

(২) **পারিবারিক সংস্থা অর্থনৈতিক (economic) কেন্দ্ররূপে কার্য করে।**

পরিবার মাত্রেরই বহুবিধ দৈনন্দিন প্রয়োজন আছে ; তাহা ছাড়া, নানাবিধ ভোগবিলাসের বাসনা থাকে। এইগুলি মিটাইবার জন্য পরিবারস্থ উপযুক্ত বা সক্ষম ব্যক্তিরা কৃষিকার্য, শ্রমশিল্প ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে, অথবা অন্য কোন

১৫ উইন্‌চ্ (Winch)-এর ভাষায় : "By providing the child with position in the status system and then indoctrinating him with attitudes and values appropriate to that status, the family orients the child." (*The Modern Family*, p. 97).

১৬ আধুনিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহের মাধ্যমে নারী নূতন করিয়া সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। অনেকে আবার মনে করেন যে, নারী সাধারণতঃ উন্নততর মর্যাদা পাইবার চেষ্টা করে, যেমন, পোপেনো (Popenoe) বলিয়াছেন, "a man marries a wife, but a woman marries a standard of living."

প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক্ কর্মচারী হয়। আদিমযুগে এবং বর্তমানকালে পল্লী অঞ্চলের পরিবারের লোকেরা সাধারণতঃ কৃষি ও কুটীর শিল্পের কার্যে নিযুক্ত থাকে। এইরূপ পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্কেরা, এমন কি বালক-বালিকারা পর্যন্ত যৌথভাবে শিল্প বা কৃষি উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকে। তবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিক্ষার ফলে বালক-বালিকাকে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যায়, এবং ঐরূপ পরিবারে সক্ষম কয়েকজন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনে রত থাকে ও অক্ষম, অশক্ত ব্যক্তিরা এবং শিশুরা তাহাদের উপর নির্ভর করে।

(৩) **সমাজমাত্রই প্রজননকেন্দ্র** (reproductive unit or centre)-**রূপে কার্য করে।**

পরিবার মধ্যে নরনারীর মিলনের ফলে সন্তানের জন্মলাভ হয় এবং ইহার ফলে পরিবারের বিস্তার সম্ভব হয় ও নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকে। অবশ্য পরিবারের বাহিরেও সন্তান-প্রজনন সম্ভব ; কিন্তু ঐরূপ ঘটিলে তাহা সামাজিক নিয়মবহির্ভূত বলিয়া গণ্য হয় এবং সাধারণতঃ সমাজে উহার স্বীকৃতি মেলে না।

পরিবারমাত্রই বিবাহের মাধ্যমে যৌনবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ দান করে এবং স্ত্রী-পুরুষের যে মিলন দৈহিক আকর্ষণের দ্বারা আরম্ভ হয়, তাহাই দেহাতীত প্রেমে রূপান্তরিত হয়—বিশেষতঃ সন্তানের জন্মের পর কাম, প্রেম, স্নেহ সবগুলি মিলিয়া অনেক সময়ই এক অপূর্ব আকার ধারণ করে। পারিবারিক সংস্থার মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে কাম-বৃত্তি অনেকাংশে চরিতার্থ হওয়ার ফলে নরনারী অন্য কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।[১৭]

(৪) **পারিবারিক সংস্থা সামাজিকীকরণের কেন্দ্র।**

পারিবারিক সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষের সামাজিকীকরণের সূত্রপাত হয়। এই স্থানেই ব্যক্তি-বিশেষ 'সমাজের উপযুক্ত' হইতে শিক্ষালাভ করে—এই স্থানেই সে নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে, তাহার বৌদ্ধিক উৎকর্ষতালাভের প্রথম সুযোগ সে পায়, নানাবিধ ক্রিয়া-কৌশল সে আয়ত্ত করে; মোট কথা, পারিবারিক সংস্থার মধ্যেই আন্তর্ব্যক্তিক আচরণের ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের

১৭ এইজন্য জিন্স্‌বার্গ (Ginsberg) বলেন: "It has provided through the institution of marriage a method for controlling the sexual relationship and lending it stability and continuity....It finds a canalised expression for sex and defines its position in life." (*On the Diversity of Morals*, p. 322).

স্ফুরণ ঘটে। পরিবারের অপর সকলের সহিত সে যেভাবে আচার ব্যবহার করে এবং অন্য সকলে তাহার সহিত যেরূপ আচরণ করে, তাহারই ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে গঠিত হয়।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার ব্যবহারের প্রভাব সম্বন্ধে মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, পিতামাতা (অথবা, তাঁহাদের স্থান অধিকারী অন্য ব্যক্তিরা) শিশুর প্রতি **অতিরিক্ত** যত্নশীল হইলে এবং তাহাকে **সর্বদা** নজরে রাখিলে, সে ক্রমশঃ স্বাধীন-ভাবে চিন্তা ও কার্য করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে পারে না এবং তাহার মধ্যে লাজুকতা, আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি দেখা দেয়। আবার শিশু যদি পিতামাতার নিকট অবাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে ঔদাসীন্য, আক্রমণাত্মক ভাব, সন্দেহপ্রবণতা, ভীরুতা ইত্যাদি প্রলক্ষণ দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। সেইরূপ যেখানে পিতামাতার 'শাসনের অভাব' দেখা যায়, সেখানে সন্তানের ভবিষ্যৎজীবনে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, সহনশীলতার অভাব, রুক্ষতা ইত্যাদি প্রলক্ষণ দেখা দিতে পারে। অপরপক্ষে, অত্যধিক কঠোরশাসনের মধ্যে লালিতপালিত সন্তানেরা উত্তরজীবনে বিদ্রোহি-মনোভাবাপন্ন অথবা একেবারে দুর্বলচিত্ত হইয়া পড়ে।[১৮] তাহা ছাড়া অশিক্ষিত অপপ্রতিযোজনশীল পিতামাতার সন্তানেরাও অনেকক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিযোজনে অক্ষম হয়।[১৯]

(৫) **পারিবারিক সংস্থা নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করে,** অর্থাৎ পরিবারমাত্রই উহার অন্তর্ভুক্ত লোকের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়স্থলরূপে গণ্য হয়।

শৈশবে দেহকে সুস্থ রাখা, বিপদের হাত হইতে রক্ষা করা ইত্যাদি কার্যে পরিবার সহায়তা করে। এই দিক্ হইতে শৈশবে প্রত্যেকেই পরিবার মধ্যে দৈহিক নিরাপত্তা বোধ করে—এই কারণে শিশু স্বভাবতঃই তাহার স্বীয় পরিবারের

---

১৮ গ্রন্থকার-রচিত মনোবিদ্যা, পৃঃ ২৭১

১৯ তুলনীয়: (১) "Problem children are the children of problem parents." (Baldwin &c., 'Patterns of Parent Behavior', *Psychological Monograph*, No. 58).

(২) "...the love of parents is an essential condition of the child's moral and emotional development, and that the lack of it frequently gives rise to a lasting sense of injury, possibly lifelong, bitterness and hostility and a tendency to become self-centred and egoistic." (Ginsberg, *op. cit.*, p. 322).

পবিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিতে চায় এবং অপরিচিতকে অনেকসময় পরিহার করিতে চেষ্টা করে।[২০]

দৈহিক নিরাপত্তা ব্যতীত পরিবারমাত্রই **মানসিক** নিরাপত্তা (psychic secuity)-এর সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির মানসিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যথেষ্ট। মানসিক নিরাপত্তার অভাব ঘটিলে ব্যক্তি-বিশেষের মনে হীনতাবোধ জাগে, সে নিজের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং অনেক সময় একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের ভাব তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—এইরূপ অবস্থায় মানুষেব মনে হয় যে, কেহ তাহাকে চায় না, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, কেহ তাহাকে বোঝে না ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এইরূপ অবস্থা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।[২১] এইজন্য মানুষেব পক্ষে একাকিত্ববোধ নিরাকরণ প্রয়োজন। পাবিবারিক সংস্থার মধ্যে থাকিলে অনেকাংশে ইহা দূর হইতে পারে এবং মানুষের মনে 'অন্তর্ভুক্তিবোধ' (sense of belonginguess) জাগিতে পারে।[২২]

পারিবারিক সংস্থা সমাজ-জীবনে এক অপূর্বস্থান অধিকার করিয়া আছে। ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ইহাই হইল তাহাব শৈশবের শিক্ষাকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল—এইখানেই তাহাব আত্মবিকাশের প্রথম সুযোগ সে পায়; আবার যৌবনে সে বিবাহের মাধ্যমে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কামের চরিতার্থতা করে; এইখানেই সে অন্যের সহিত সহযোগিতা করিবার, অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার, অন্যকে সেবা করিবার ও ভালবাসিবার এবং দায়িত্ববোধের প্রকাশ দেখাইবার প্রাথমিক সুযোগ লাভ করে; আবার সন্তানসন্ততির জন্মের পর তাহাদের মাধ্যমে নিজেকে যেন বিস্তার করিতে পারে, নিজের ভাবধারা ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্ট

---

২০ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও এই ধারণা বর্তমান থাকে; অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কেরা এই আশা করে যে বাহিরের লোকের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ বা মারামারির সময় তাহার স্বীয় পরিবারের লোক তাহাকে সমর্থন করিবে।

২১ এইরূপ অবস্থায় চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia) পর্যন্ত দেখা দিতে পারে ব্যক্তিত্বের উপর পারিবারিক সংস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য Bell & Vogel. 1 *Modern Introduction to The Family*, Part IV দ্রষ্টব্য।

২২ তুলনীয়: "It is [emotional isolation] which provokes, in the normal individual of our time, an intensified need for affection as a remedy. Obtaining affection makes him feel less isolated, less threatened by hostility and less uncertain of himself." (Horney, *The Neurotic Personality of Our Time*, pp. 286-87).

করে, অপরদিকে নবীনের সাহচর্যে তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতা ও আদর্শকে পুনর্বিচার করিয়া দেখে।[২৩] তবে পরিবার মাত্রই অবিমিশ্র মঙ্গল ও সুখের কেন্দ্র নহে ; একদিকে যেমন ইহা কতকগুলি সুকুমারবৃত্তি প্রকাশের সহায়তা করে, সেইরূপ অবস্থান্তরে ইহা মানসিক সঙ্কীর্ণতা ও ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদিরও সৃষ্টি করিতে পারে।

৪। পারিবারিক সংস্থার ত্রুটি (Defects & Shortcomings of the Institution of Family):

কোন মানবীয় সংস্থাই সম্পূর্ণরূপ দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং পারিবারিক সংস্থার মধ্যেও যে কতকগুলি ত্রুটি থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। কোন কোন চিন্তানায়ক পারিবারিক সংস্থার বাস্তব ও সম্ভাব্য ত্রুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—এমন কি, কেহ কেহ বলেন যে, এই সংস্থার আর কোন প্রয়োজন নাই ; সুতরাং এইগুলি আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) কেহ কেহ বলেন যে, পারিবারিক গোষ্ঠীমাত্রই এক একটি বিচ্ছিন্ন জগৎস্বরূপ। প্রতি পরিবারই অন্য পরিবার হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার চেষ্টা করে এবং এইজন্য পারিবারিক গোষ্ঠী সামাজিক ঐক্য ও সংহতির সহায়ক না হইয়া উহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। যে কোন সমাজ পর্যালোচনা করিলেই আমরা দেখি, পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির আদর্শ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষাদীক্ষা পরস্পর হইতে বহুলাংশে পৃথক্ এবং অনেক সময় কেবল পৃথক্ বা বিভিন্ন নহে, পরস্পরের বিপরীতও বটে। এইজন্য অনেকক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, অন্ততঃ "মানসিক দূরত্ব" থাকিয়া যায় এবং তাহাতে সামাজিক ঐক্য ব্যাহত হয়।

২৩ দার্শনিক শান্তায়না (George Santayana) পারিবারিক সংস্থার মঙ্গলের দিকটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "The family is one of nature's masterpieces. It would be hard to conceive a system of instincts more nicely adjusted where the constituents should represent or support one another better The husband has an interest in protecting the wife, she in serving the husband. The weaker gains in authority and safety, the wilder and more unconcerned finds a helpmate at home to take thought for his daily necessities. Parents lend children their experience and a vicarious memory, children endow their parents with a vicarious immortality." (*Life of Reason*, p. 104).

পারিবারিক গোষ্ঠীগুলি যে পরস্পরের মধ্যে কেবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাহা নহে, যে কোন পারিবারিক গোষ্ঠীর ভিতরেও অধিকাংশ সময় ঐক্য ও সংহতির অভাব থাকে এবং ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, বিদ্বেষ তথা বহুবিধ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সৃষ্টি হয়।

(খ) সাধারণতঃ বলা হয়, পারিবারিক সংস্থার মধ্যেই ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, পরিবারের কর্তৃস্থানীয় লোকেরা অন্যের বিশেষতঃ শিশুদের উপর এমন আচরণ করে যে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠু প্রকাশের সুযোগ পায় না। অর্থাৎ পারিবারিক সংস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশু নিজে যাহা তাহা হইতে পারে না, বরং অন্যে যাহা তাহা অন্ধভাবে হইবার চেষ্টা করে বা সেইরূপ করিতে তাহাকে বাধ্য করা হয়।

(গ) পারিবারিক সংস্থার অন্তর্মুখিতা বা আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য উহা রাষ্ট্র তথা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কার্যের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠে। রাষ্ট্রের জন্য বা বৃহত্তর সমাজের জন্য কার্য করিতে হইলে অনেক সময় পারিবারিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায় না, আবার স্বীয় ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হইলে সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা চিন্তা করা যায় না।[২৪] এই প্রসঙ্গে আমরা প্লেটোর অভিমতের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করেন, তাহাতে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ((Guardians of the state)-এর জন্য সাম্যবাদ (communism) প্রচার করেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের কর্ণধার বা শাসকদের ব্যক্তিগত পরিবার ও সম্পত্তি থাকা উচিত নহে—কাহারও নিজের স্ত্রী বা পুত্র বলিয়া কেহ থাকিবে না; কোন্ পুরুষ কোন্ নারীর সহিত মিলিত হইবে, রাষ্ট্র তাহা নির্বাচন করিয়া দিবে; একমাত্র রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা সন্তানের জন্ম দিতে পারিবেন; সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্র স্বীয় তত্ত্বাবধানে তাহাকে লালন পালন করিবে। প্লেটো মনে করিতেন যে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে রাষ্ট্র-শাসকগণের "নিজস্ব" বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না, এবং তাঁহারা পূর্ণভাবে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ

২৪ এইজন্য মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে, স্বদেশের হৃত স্বাধীনতা উদ্ধারের কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি, সমাজসংস্কারক, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি অকৃতদার থাকিয়া (অর্থাৎ পারিবারিক বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া) স্বীয় কর্তব্য করিবার চেষ্টা করেন।

করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে স্বজন-প্রতিপালনের উপায়-স্বরূপ ব্যবহারের কোন ইচ্ছা তাঁহাদের মনে জাগরিত হইবে না।[২৫]

(ঘ) পরিবার মাত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু আজকের দিনে শ্রমশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের ফলে কেবল ঘরে বসিয়া কাহারও পক্ষে উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই পরিবারের সক্ষম ব্যক্তিগণকে দূরস্থ শিল্পসংস্থায় যাইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং উৎপাদন কার্যে রত থাকিতে হয়। কিন্তু পরিবারের বন্ধন যদি দৃঢ় হয়, তাহা হইলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে বৃহৎ শিল্পোৎপাদন সংস্থায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না এবং শেষ পর্যন্ত জাতির শিল্পীয় তথা অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবে।

(ঙ) মার্কসবাদীরা (যথা, এঙ্গেল্‌স্) মনে করেন যে, পারিবারিক সংস্থা হইল অর্থনৈতিক বিবর্তনের একটি স্তর এবং পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার যখন অবসান ঘটিবে, তখন পারিবারিক সংস্থারও অবসান ঘটিবে— সকল শিশুই তখন সমাজ বা রাষ্ট্রের শিশু বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং নারীর পক্ষে বিবাহবন্ধনে থাকা বা না থাকা তাহার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং মার্কসবাদীদের মধ্যে পারিবারিক সংস্থা সমাজের পক্ষে অপরিহার্য নহে— উহা স্বরূপতঃ দুর্বল এবং উহার অবলুপ্তির বীজ উহারই মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

সমালোচনা ও মন্তব্য :

আমরা উপরে পারিবারিক সংস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এই সকল মত পূর্ণভাবে গ্রহণ করা চলে না।

পারিবারিক সংস্থা সম্বন্ধে একটি অভিযোগ হইল যে, উহা কতকগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠী রচনা করে। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে

২৫ তুলনীয় : "If a sound education has made them (Guardians) reasonable men, they will easily see their way through all these matters...such as the possession of wives, marriage, and childbearing, and the principle that here we should follow, as far as possible, the proverb which says that friends have *all things in common*" "They will not send the community asunder by each applying that word 'mine' to different things and dragging off whatever he can get for himself into a private home, where he will have his separate family..." (Plato's *Republic*, Bk. IV, 423 & Bk. V, 464).

পারি যে, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন গোষ্ঠীই অপর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না—বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটিবেই এবং একের প্রভাব অন্যের উপর আসিয়া পড়িবে। সমাজের ধর্মই হইল, পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের সহিত ঐক্যের সৃষ্টি করা (পৃঃ ৪১-৪২)—এক একটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সকল পারিবারিক গোষ্ঠী গঠিত হয়, তাহারা তাহাদের পার্থক্য সত্ত্বেও একই প্রকার রীতি-নীতি, আদর্শ ও কৃষ্টির ধারক এবং বাহকরূপে কায করে। সুতরাং কোন পারিবারিক গোষ্ঠীই সমাজমধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে পারে না।

পারিবারিক সংস্থা সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হইল যে, উহা ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, কলহ প্রভৃতি অযথা সৃষ্টি করিয়া মানুষকে সঙ্কীর্ণমনা করিয়া ফেলে। এই অভিযোগও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পরিবার মধ্যে যেমন ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে পারে, সেইরূপ পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়াই মানুষ আত্মোৎসর্গ করিবার, নিজেকে ভুলিয়া অন্যের সেবা করিবার ও অন্যের সুখবিধান করিবার এবং স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সুকুমার অনুভূতিগুলির উৎকর্ষতা গঠন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। সুতরাং সংসার বা পরিবার কেবলমাত্র ঈর্ষ্যা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তাহা ছাড়া, কেবলমাত্র পারিবারিক গোষ্ঠী মধ্যেই ঈর্ষ্যা ও ঘৃণার ভাব দেখা দেয় বা সঙ্কীর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তাহা নহে—যে কোন গোষ্ঠী, দল বা সঙ্ঘ মধ্যে উহা দেখা যাইতে পারে। কোন গোষ্ঠী মধ্যে কু-বৃত্তির প্রকাশ কতদূর হইবে, তাহা নির্ভর করে গোষ্ঠী-সংগঠনকারী ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা ও সংযমের ক্ষমতার উপর। বাস্তবিক, মানব মনে সামাজিকতাবোধ ও অসামাজিকতা-বোধ, আত্মনিবেদন ও আত্মসাম্মুখ্যের চেষ্টা, সহযোগিতা ও বৈরিতা, এইরূপ বিপরীত গুণের সংযোগ আছে এবং কখনও সু-বৃত্তি, কখনও কু-বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। অতএব, মানুষের সকল প্রকার কু-বৃত্তির জন্য কেবল পারিবারিক সংস্থার উপর দোষারোপ করা চলে না।

সেইরূপ পরিবারকে অত্যাচারী শাসকের 'ক্রীড়াভূমি' বলা ভুল হইবে। এ কথা সত্য যে, কোন পারিবারিক গোষ্ঠীর কর্তা বা কর্ত্রী অপরের উপর—বিশেষতঃ শিশুদের উপর—নানাপ্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ব্যাহত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পারিবারিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই অভিযোগ কতকাংশে সত্য হইলেও, আজকের দিনে উহা সত্য নহে। পরিবারের কোন ব্যক্তি (পিতা বা মাতা, স্বামী বা

স্ত্রী) অতিরিক্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলে জনমত তথা রাষ্ট্র তাহাকে প্রতিহত করিবে। তাহা ছাড়া, সকল গৃহকর্তাকেই অত্যাচারী বলা ভুল হইবে—কোন যুগেই স্নেহশীল লোকের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। যে কোন সমাজের পারিবারিক গোষ্ঠী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, যেমন সমাজ মধ্যে কঠোর পিতা বা মাতা আছে, অত্যাচারী স্বামী বা স্ত্রী আছে, সেইরূপ কোমল স্বভাব পিতা-মাতাও আছে, প্রেমিক স্বামী বা সেবাপরায়ণা স্ত্রীও আছে।

অনেকে রাষ্ট্রের প্রতি বা দেশের প্রতি কর্তব্যের সহিত পারিবারিক কর্তব্যের বিরোধিতার উল্লেখ করেন। এই দুইটির মধ্যে যে মধ্যে মধ্যে বিরোধিতা ঘটিয়া থাকে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেজন্য পারিবারিক সংস্থা পরিহার করার প্রশ্ন উঠে না। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, পারিবারিক জীবনে এমন কিছু করা উচিত নহে যাহা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণকে ব্যাহত করিতে পারে, অপরপক্ষে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা পারিবারিক জীবনের যে গোপনতার দিক্ আছে বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিক্ আছে তাহার উপর অযথা যেন হস্তক্ষেপ না করেন। স্ত্রী-পুত্রের ক্ষেত্রে যে সাম্যবাদের কথা প্লেটো বলিয়াছেন তাহা অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের আদেশমত একমাত্র রাষ্ট্র-নির্বাচিত ব্যক্তির সহিত লোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যৌনকার্যে লিপ্ত হইবে এবং তাহার পর নিবৃত্ত থাকিবে ইহা আশা করা যায় না; দ্বিতীয়তঃ, পিতামাতার স্নেহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া শিশুদের লালনপালন করিলে তাহাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যেমন ব্যাহত হয়, সেইরূপ পিতামাতা যদি সন্তান পালনের দায়িত্ব না পায় এবং সন্তানের জন্মদানেই যদি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা দেখা দেয় না এবং যৌথভাবে কাষ করিবার অভ্যাসও গঠিত হয় না[২৬]; তৃতীয়তঃ,

[২৬] প্লেটোর সমালোচনা করিয়া রুশো (Rousseau) বলেন যে, পারিবারিক স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক ব্যতীত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। তিনি বলেন, 'Can devotion to the State exist apart from the love of those near and dear to us? Can patriotism thrive except in the soil of that miniature fatherland, the home? Is it not the good son, the good husband, the good father who makes the good citizen?" (*Emile*, Everyman's Library Edn. p. 3?6).

সেইরূপ দার্শনিক রাসেল্ (Russell) মন্তব্য করেন: "I do not see much to be said for Plato's proposal...I think that parental affection is *essential*

সমাজের এক অংশ এই অদ্ভুত সাম্যনীতি চলিবে, অথচ অপর অংশে উহা প্রতিপালিত হইবে না, এইরূপ হইতে পারে না : চতুর্থতঃ, পারিবারিক বন্ধন-বিমুক্ত হইলেই যে, শাসকগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এমন নাও হইতে পারে, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের জন্য তাহাদের মধ্যে বৈরিতা দেখা দিতে পারে (যদিও প্লেটো মনে করেন যে, প্রকৃত দার্শনিক রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলে এ সম্ভাবনা থাকিবে না)।

যাঁহারা মনে করেন যে, পারিবারিক সংস্থা পুঁজিবাদী সমাজের প্রকাশ তাঁহাদেরও সমর্থন করা যায় না। মানুষের মনে পুঁজিবাদের ধারণা গড়িয়া উঠিবার বহু পূর্ব হইতেই পারিবারিক সংস্থা আছে এবং মালিকানা সংস্থায় মালিক-শ্রমিকের যে সম্পর্ক পারিবাবিক গোষ্ঠীমধ্যে সেইরূপ কোন শোষণের সম্পর্ক থাকে না। পারিবারিক গোষ্ঠীর ভিত্তির মূলে বহুবিধ মানসিক বৃত্তি কার্য করিতেছে এবং কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রত্যয় দ্বারা উহার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কালের পারিবারিক গোষ্ঠীসমূহের বিবর্তনের ধারা যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে ইহা মনে হয় না যে, কালক্রমে মনুষ্যসমাজ হইতে পারিবারিক সংস্থার অবলুপ্তি ঘটিবে।[২৭]

মানবজীবনে পারিবারিক সংস্থার এমনই এক অবদান যে উহার দোষত্রুটি সত্ত্বেও উহাকে পরিহার করিবার বা বিনষ্ট করিবার কোন

to a child's development, and that while it might suffice to receive this affection only from one parent, it would certainly be regrettable if it were not received from either....Co-operation in the serious business of rearing children, and companionship through the long years involved, bring about a relation more important and more enriching to both parties than any that would exist if men had no responsibility for children." (*Marriage and Morals*, p. 101).

২৭ যদি কখনও পারিবারিক সংস্থার বিলোপ ঘটে, তাহা হইলে কী পরিণতি হইবে তাহার ইঙ্গিত করিয়া বোসাঙ্কে (Mrs. Bosanquet) বলেন : "If such a time should ever come, it will be in no sense a gradual development from the past, there is no justification for it in the history of the human race, and it will be as catastrophic in the moral world as an earthquake in the physical....And if it should ever come to pass that men and woman will be content to abandon their children to the community..., it will mean such a breaking up of the whole moral nature of the race that not the Family alone, but the State itself will be shattered in its foundations." (*The Family*, p. 38).

প্রশ্ন উঠে না।[২৮] এ কথা সত্য যে, পারিবারিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সংস্কার সাধন প্রয়োজনীয় ; কিন্তু সংস্কারের নামে বিনাশ বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা ছাড়া, বৃহত্তর সমাজের সহিত পারিবারিক সংস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয়া এককভাবে কেবল পারিবারিক সংস্থার সংস্কার সম্ভব নহে।

মানুষের মানসিক গঠন এবং সামাজিক পরিবেশ এমনই যে, পারিবারিক সংস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব নহে ; যদিই বা সম্ভব হয়, তাহার বিকল্পে আমরা কি পাইতে পারি ? পারিবারিক সংস্থার স্থান কি রাষ্ট্রকে দেওয়া যায় ? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, **রাষ্ট্র কখনও পরিবারের স্থান পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।** (পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পারিবারিক সংস্থার উন্নতির জন্য জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং ইহার সুষ্ঠু পরিচালনার উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।[৩০]

৫। পারিবারিক সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Institution of Family & State Control) :

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে পারিবারিক গোষ্ঠীর কতকগুলি সম্ভাব্য ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের কতকগুলিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। সুতরাং এখানে প্রশ্ন উঠে : পারিবারিক জীবনকে রাষ্ট্র কিভাবে ও কতদূর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ? পারিবারিক জীবনের কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর রাষ্ট্র তাহার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে ?

পারিবারিক জীবনের একটি দিক্ আছে যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং যাহার এক অংশ নিতান্ত গোপন। আবার অপরপক্ষে, ব্যক্তিমাত্রই সমাজে বিচরণশীল সামাজিক জীব ; সুতরাং তাহার ব্যক্তিগত গোপন জীবনে এমন কিছু ঘটিতে দেওয়া উচিত

২৯ বোসাঙ্কের ভাষায় আবার বলা যায় : "Even if the world could carry on without the Family, it could not afford to lose the qualities which would go with it....To reject the source of so much warmth and beauty because it sometimes fails, would be like banishing the sun from the sky because it is sometimes covered with clouds." (*Ibid*, p. 245).

৩০ MacIver & Page বলেন : "The future of the family does not depend on state coercion, but on human experience of its benefits. In the last resort it depends on the recognition of its superiority, as a means of satisfying certain human needs, over any alternative system." (*Society*, p 276).

নহে, যাহার ফল রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, অর্থাৎ জনস্বার্থের খাতিরে পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। পারিবারিক জীবনের যে আচরণ অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া উঠে, অথবা যাহা ব্যক্তিবিশেষের কর্তব্যকর্মে সম্পূর্ণ শৈথিল্য ইঙ্গিত করে, সেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, তাহা ছাড়া, যেখানে নূতন পারিবারিক বন্ধন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নিয়ম অনুসারে হয় নাই, সেখানে রাষ্ট্র তাহাকে স্বীকৃতি দান না করিতে পারে। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ অথবা পিতামাতার সহিত সন্তান-সন্ততির আচরণ ঠিক কিরূপ হইবে সে বিষয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র কোন নির্দেশ দিতে পারে না, কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহ যদি আর একজনের উপর অত্যাচার করে বা তাহাকে নির্যাতন[৩১] করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র উহাতে বাধা দিবে। সেইরূপ পিতামাতা যদি সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না করে, সেখানে রাষ্ট্র স্বয়ং ঐ ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং সন্তানকে শিক্ষায়তনে পাঠাইবার জন্য রাষ্ট্র পিতামাতাকে বাধ্য করিতে পারে; পিতামাতা যদি অপরিণত বয়সের সন্তানের বিবাহ দেয় বা সন্তানাদিকে শ্রমিকের কার্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করে, রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিতে পারে। আবার স্বামী যদি বিনা অপরাধে স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যয় ভার বহন করিতে বাধ্য করিতে পারে। সেইরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী নির্বাচন ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মধ্যে (যেমন, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে) কোন বিবাহ-সম্বন্ধ রাষ্ট্র স্বীকার করে না; সেইরূপ এক স্বামী বর্তমানে বা এক স্ত্রী বর্তমানে তাহার সহিত আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না করিয়া পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অনেক সভ্য রাষ্ট্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিবাহের অনুষ্ঠানের কতকগুলি রীতিনীতি প্রতি রাষ্ট্রেই অল্পাধিক সুনির্দিষ্ট আছে; অবশ্য ইহাদের যে সামাজিক দিক্ আছে তাহাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু কোন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানকে বিবাহ বন্ধনের সুস্পষ্ট পরিচায়ক হিসাবে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে।

৩১ অবশ্য এই অত্যাচার বা উৎপীড়নের কোন সাধারণ সংজ্ঞা দান সম্ভব নহে। দৈহিক অত্যাচার ব্যতীত আবার 'মানসিক যন্ত্রণা' (mental torture)-এর নামেও কোন কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে—বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার অন্যতম কারণভাবে ইহা অনেক রাষ্ট্রে স্বীকৃত হইয়াছে; তবে 'মানসিক যন্ত্রণা'-র সংজ্ঞাদান আরও দুরূহ।

যদিও সকল সুসভ্য রাষ্ট্রই এই সকল ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ রীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলেও প্রতি রাষ্ট্রের নিয়মের অল্পাধিক পার্থক্য আছে। কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দান করা হয়।

রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট বিধি নিষেধ ব্যতীতও বৃহত্তর সমাজেরও নানাপ্রকার অলিখিত বিধি নিষেধ আছে এবং জনমতের চাপে ব্যক্তি-বিশেষ সাধারণতঃ ইহাদের মান্য করে। এইজন্য পারিবারিক জীবনে স্বাধীনতা থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষ যদৃচ্ছ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতে পাবে না[৩২]।

আমরা এ পর্যন্ত যে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ উল্লেখ করিলাম, তাহার অধিক রাষ্ট্রীয় নিযন্ত্রণ সমর্থনযোগ্য কি না।

(ক) রাষ্ট্রের নির্দেশে কোন ব্যক্তিকে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা অথবা বিবাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা সমর্থনযোগ্য কি না? ইহাব উত্তবে আমরা বলিব যে, বিবাহের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। নরনারীর যে আকর্ষণ তাহা কেবল নিতান্ত দৈহিক বা জৈবিক নহে—ইহার মনোগত দিক্ আছে এবং দাম্পত্য জীবনে ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একজনেব যদি আর একজনের দিকে মানসিক অনুরাগ না থাকে, সেখানে রাষ্ট্রের নির্দেশে সুসঙ্গত দাম্পত্য জীবন বা হৃদয়েব মিল গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাষ্ট্র মধ্যে অসংখ্য লোকের বাস—বিভিন্ন তাহাদের আদর্শ, রুচি ও জীবনদর্শন; সুতরাং কে কাহার উপযুক্ত হইবে, কাহার প্রতি কাহার অনুরাগ অথবা বিরাগ জাগিবে, তাহা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ নির্ধারণ করিতে পারে না[৩৩]।

৩২ প্রচলিত বাংলায় আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি: "আমার নিজের ছাগল আমি ল্যাজের দিকেই কাটি, আর মাথার দিকেই কাটি—অন্য লোকের তাতে কি?"—পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে এরূপ নীতি আজ কোন সভ্য সমাজই স্বীকার করে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ইংরাজি 'family' পদটি *familia* পদ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে এবং *familia* পদের অর্থ হইল 'ক্রীতদাস'। নিশ্চয়ই কোন শিক্ষিত সুসভ্য সমাজের লোক আজ এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে স্বজনবর্গকে দেখে না।

৩৩ বাস্তবিক, অনুরাগ ও বিরাগের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া কোন সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। অনেক সময় মানুষ নিজেই তাহার পছন্দ বা অপছন্দের কারণ জানে না। মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশম্' কাব্যে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরা বর্ণনা কালে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন:

"নাসৌ ন কাম্যঃ, ন চ বেদ সম্যক্।
দ্রষ্টুং ন সা, ভিন্নরুচিহি লোকঃ॥"

প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে বিবাহ নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। (পৃঃ ১৫২-৩)।

(খ) শিশুর লালন পালন কি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়? নবজাত শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য আছে, কারণ আজকের দিনের নবজাত শিশুরাই ভবিষ্যতের নাগরিক হইবে; অতএব রাষ্ট্রকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে যাহাতে তাহারা ইহার উপযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগকে দেখিতে হইবে যে, শিশু যাহাতে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং জন্মাইবার পর যাহাতে সে সুস্থ ও নিরাময় দেহের অধিকারী হইতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা; এবং রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের কর্তব্য হইল শিশুর সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া, সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে যে, দেশের সাধারণ অর্থ-নৈতিক কাঠামো যেন এরূপ হয় যে, অর্থ-নৈতিক অনটনের ভয়ে দেশের লোকে যেন সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয়[৩৪]। কিন্তু রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব থাকার জন্য, ইহা সমর্থন করা যায় না যে, শিশুদের জন্মের পর রাষ্ট্র তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সমবেতভাবে কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তাহাদের লালনপালন করিবে। (পৃঃ ১৫২)। এরূপ করিলে একদিকে পিতামাতা যেমন জীবন বিশুষ্ক বোধ করিবে, অপর দিকে শিশুরও মানসিক গঠন ব্যাহত হইবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে যদি কয়েকজন বেতনভুক্ কর্মচারী দ্বারা সকল শিশু লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে শিশুরা পিতামাতার স্নেহের নিবিড়তা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং তাহাদের সকলকেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ম-পরিষদ দ্বারা নির্ধারিত আদর্শ অনুসারে 'মানুষ' হইতে বাধ্য করা হইবে—ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য ও অনুপমত্ব প্রকাশের সুযোগ পাইবে না, তাহাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা গঠিত হইবে না এবং কঠোর শাসনের মধ্যে পরিবর্ধিত হওয়ার ফলে তাহারা রুক্ষ জীবনযাপন করিবে ও অনেকে ভবিষ্যতে হৃদয়হীন দুর্বৃত্তে পরিণত হইবে।

৩৪ বর্তমান যুগের নূতন সমাজব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বর্ণনা কালে রাসেল্ (Russell) বলিয়াছেন: 'The new system must be based upon the fact that to produce children is a service to the community, and ought not to expose parents to heavy pecuniary penalties." (*Principles of Social Reconstruction*, p. 196).

আমরা পরিশেষে বলিতে পারি যে, **পারিবারিক জীবনের সকলক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অনুপ্রবিষ্ট হইলে পারিবারিক সংস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তাহাতে রাষ্ট্র বা নাগরিক কাহারও মঙ্গল হইবে না।**[৩৫] সুতরাং পারিবারিক জীবন রাষ্ট্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তবে ইহার অর্থ নহে যে, ব্যক্তি-বিশেষকে রাষ্ট্র অত্যাচারী, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সুযোগ দিবে। এস্থলে **যতদূর সম্ভব ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এই দুই-এর সমন্বয় করিতে হইবে।** রাষ্ট্র ব্যক্তিকে সাধারণভাবে স্বাধীনতা দান করিয়া বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখিবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অর্থ নহে পরিবারকে প্রাণহীন, অর্থহীন, বিশুষ্ক প্রতিষ্ঠান করিয়া তোলা।[৩৬] তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এ সকল ক্ষেত্রে লিখিতভাবে আইন প্রণয়ন করিয়াই সুফল পাওয়া যায় না। জনগণের মনে প্রকৃত পরিবর্তন আনিতে হইলে রাষ্ট্রকে **সুশিক্ষা ও সু-উপদেশ** দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাতে যে ফললাভ হইবে তাহা বিলম্বিত হইলেও স্থায়ী হইবে।

৬। বিবাহ (Marriage) :

পারিবারিক সংস্থা সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা বিবাহ-সম্বন্ধীয় আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট।[৩৭] বিবাহ না করিলে পরিবারের বিস্তার ঘটে না, আবার পরিবার না থাকিলে বিবাহের প্রশ্ন উঠে না ; একদিকে বিবাহ হইল পরিবারের ফল, অপরদিকে বিবাহ হইল ইহার প্রস্তুতি। মানুষের পারিবারিক গোষ্ঠীর অনুরূপ গোষ্ঠী মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে দেখা যায় ; কিন্তু অনুষ্ঠান, সংস্কার ও সামাজিক সংস্থা হিসাবে বিবাহ নিতান্তই মানবীয় ব্যাপার। **বিবাহ বলিতে এমনই এক সংস্থা বুঝায় যাহাতে রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ**

---

৩৫ **তুলনীয় :** "Here, as elsewhere, liberty is the basis of political wisdom. And when liberty has been won, what remains to be desired must be left to the conscience and religion of individual men and women." (Russell, *op. cit.*, p. 196).

৩৬ Urwick-**এর উক্তি লক্ষণীয় :** "These considerations suggest that *some* change is needed in the content of parental responsibility and duty ;... But...they do not in the least support...any attempt to socialize the family in the sense of *lessening* the content of the family system." (*A Philosophy of Social Progress*, pp. 160-61).

৩৭ **এইজন্য পূর্বের আলোচনার কিছু পুনরাবৃত্তি বর্তমানে ঘটিবে।**

বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবার এবং সন্তানের জন্ম দিবার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। মনুষ্যেতর প্রাণীর জগতে যৌন সম্পর্কই আছে, কিন্তু মানবীয় বিবাহ কেবল যৌন সম্পর্কই নহে—উহার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান প্রজননের বাসনা সুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে থাকে এবং উহার পশ্চাতে সামাজিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি থাকে। তাহা ছাড়া, সন্তানের জন্মের পরও এবং যৌন ক্ষমতা তিরোহিত বা লুপ্ত হইলেও বিবাহ দ্বারা স্থাপিত সম্পর্ক চলিতে থাকে বা চলিবার সম্ভাবনা থাকে ; এই সম্পর্ককেই কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা হয়। সুতরাং **বিবাহের মাধ্যমে একটি সুনিয়ন্ত্রিত, বিধিসম্মত জীবনযাপনের চেষ্টা করা হয়** এবং ইহার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব ও যৌথভাবে সন্তানের দায়িত্ব বহন করিবে ইহাই আশা করা যায়।[৩৮] আদর্শবাদীরা আরও আশা করেন যে, দেহগত কাম দেহাতীত প্রেমে রূপান্তরিত হইবে এবং ইহার মাধ্যমে আত্মসংযমের ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে শিক্ষা স্বামী-স্ত্রী লাভ করিবে, তাহারই ফলে তাহারা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উঠিবে।

৭। বিবাহ-প্রথার বিবর্তন ও প্রকারভেদ (Evolution of Marriage & the Types of Marriage) :

বলা বাহুল্য, মানুষ বিবাহের উচ্চ আদর্শের ধারণায় ধীরে ধীরে উপনীত হইয়াছে। প্রাচীনতম বা আদিম বিবাহ প্রথা কিরূপ ছিল এবং কবে, কোথায়, কিভাবে ইহার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন যে, আদিম যুগের গোষ্ঠীপতিরা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ কর্তৃক নারীদের যথেচ্ছ সম্ভোগ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিবাহ প্রথার উদ্ভব

৩৮ বিবাহের উচ্চ আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেন : "The sex-impulses are to be accepted by us as the raw matrials for the building up of the higher life, through the institution of marriage,... In a perfect marriage, the sexual act becomes sacramental, the outward sign of an inward grace." (*Kalki*, pp. 58-9).

সেইরূপ : "Marriage is more a social charter for the establisment of a legitimate life than a license for sexual intercourse." (*Religion & Society*, p. 151).

করিয়াছিল ; কেহ বলেন যে, স্বীয় পুত্রকন্যার উপর অধিকার সুনির্দিষ্ট রাখিবার জন্য এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল ; কেহ বলেন যে, নারীর উপর পুরুষের স্বীয় বলদৃপ্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিবাহপ্রথা পুরুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল ; আবার কেহ বলেন যে মানুষের আদিম সমাজে ছিল যথেচ্ছ, উচ্ছৃঙ্খল যৌনচারিতা এবং ইহার ফলে যে সকল অসুবিধা দেখা দিত তাহারই প্রতিকারকল্পে ক্রমশঃ মানুষ বিবাহবদ্ধ পারিবারিক জীবনযাপন আরম্ভ করিল। দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে কেহ কিছুই সুনিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না এবং বলা সম্ভবও নয়।

আবার মানবসমাজের বিবাহসংস্থা সর্বত্র একই প্রকার স্তরেব মধ্য দিযা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে ইহাও বলা যায় না। এখনও পৃথিবীতে যে সকল আদিম জাতি বাস করে, তাহাদের আচার ব্যবহার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদের বিবাহের মধ্যে অনুষ্ঠানের বাহুল্য নাই এবং নরনারীর পরস্পরের মধ্যে অবাধ সংমিশ্রণে বিশেষ বাধা নাই। আবার দু'একটি আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, পিতামাতা সন্তানের দায়িত্ব বহন করে না, ববং তাহাদের গোষ্ঠী যৌথভাবে নবজাত শিশুদের ভার গ্রহণ করে। কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর গৃহে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে যায় এবং এরূপ বিবাহবদ্ধ পরিবারে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের শাসনের প্রাধান্য। আবার অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন, যেমন, সন্তান জন্মান পর্যন্ত অথবা সন্তান আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠা পর্যন্ত। কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামীকে পুবাতন স্ত্রী ত্যাগ করিয়া নূতন সঙ্গিনী নির্বাচনে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, আবার এমন জাতিও আছে যেখানে স্ত্রীর নিজস্ব আত্মীয়দের অনুমতি ব্যতীত স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে না। আবার অনেক জাতির মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা চলিত আছে, যদিও এমন বলা যায় না যে বহুবিবাহ বা বহুগামিতাই সকল আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল বা আছে।

বহু বিবাহ (Polygamy)-র প্রকারভেদ আছে। কোন কোন আদিমজাতির মধ্যে গোষ্ঠী-বিবাহ (Group Marriage) প্রচলিত আছে—যেমন একটি পারিবারিক গোষ্ঠীর সকল ভ্রাতারাই অপর আর এক গোষ্ঠীর সকল ভগ্নীর সহিত বিবাহিত হইতে পারে, ইহার ফলে একটি গোষ্ঠীর সকল পুরুষই অপর গোষ্ঠীর সকল নারীরই

স্বামী বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ এই দুই গোষ্ঠীর প্রতি পুরুষেরই বহু স্ত্রী এবং প্রতি নারীরই বহু পতি স্বীকৃত হয়।

কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে এক নারীর বহু পতি গ্রহণের প্রথা আছে ; এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন জাতির মধ্যে বিভিন্ন স্বামীরা বিভিন্ন পরিবারের নয়, বরং একই পরিবারভুক্ত ভ্রাতারা এক নারীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রথাকে বহুপতিত্ব (Polyandry) বলা হয়। তবে বহু বিবাহপ্রথার সর্বাপেক্ষা প্রচলিত রূপ হইল বহু-পত্নীত্ব (Polygyny), অর্থাৎ এক পুরুষ কর্তৃক বহু নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ ; অবশ্য সকল স্ত্রীর সমান মর্যাদা হয় না। বহুপত্নীত্ব কেবল আদিম বা অসভ্য জাতির মধ্যে আছে তাহা নহে ; বহু সুসভ্য জাতির মধ্যেও ইহা প্রচলিত ছিল বা এখনও আছে। যেখানে ইহা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেখানে গোপনে ইহা চলিতেছে এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।[৩৯]

৩৯ উপরে উল্লিখিত বিবিধ বহুবিবাহ (Polygamy)-প্রথাকে অধ্যাপক গিডিংস্ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :

"The polyandrian family, in which a woman has several husbands, is found in very many parts of the world....Polyandry is of two well-marked types, which are known among ethnologists as Nair polyandry and Tibetan polyandry. In Nair polyandry, as found in south-eastern India, a woman's husbands are not related to one another. In Tibetan polyandry the husbands are brothers.... Polyandry existed until recently in Ceylon ; it has but lately disappeared from New Zealand...it was common in the Canary islands... in Africa it has been found among the Hottentots...

"A form of the family that was common in the Hawaiian Islands, ...called *punaluan*,...is constituted by the marriage of a group of brothers to a group of sisters, each woman being a wife to all the men and each man a husband to all the women. This form still exists among the Todas of India.

"The Polygynous family, constituted by the cohabitation of one man with two or more wives or concubines, is even more general than polyandry...Polygyny is by no means confined to savage and barbarian communities...Illegally and secretly, it exists in every American Commonwealth and in every European state." (*Principles of Sociology*, pp. 156-57).

[ইংরাজি 'Polygamy'-পদটি ব্যাপক অর্থে সকল প্রকার বহুবিবাহ—অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর সকলেরই বহু-বিবাহ—বুঝায়। তবে সঙ্কীর্ণ অর্থে ইহা কেবল বহুপত্নীত্ব অর্থাৎ পুরুষের বহু-বিবাহ বুঝায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক লেখক Polygamy পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন এবং পুরুষের বহুবিবাহ অর্থে Polygyny পদ ব্যবহার করেন।]

মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন বিবাহপদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্নযুগে, বিভিন্ন দেশে,:পত্নী-নির্বাচনের নানা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বা আছে।

(ক) বলপূর্বক হরণ (mariage by capture)—এই প্রথায় পুরুষ বলপূর্বক বা দৈহিক শক্তির জোরে তাহার বাঞ্ছিত বা ঈপ্সিত নারীকে তাহার স্বজনবর্গের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। কালক্রমে কোন কোন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে ইহা বিবাহের অন্যতম প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়—পূর্ব হইতে কন্যাপক্ষীয়দের সহিত স্থির হইয়া থাকিত যে, অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ হইবে ; তাহার পর বরপক্ষীয়রা তথাকথিত কন্যাপহরণের কার্য করিত। দু'একটি আদিম জাতির মধ্যে এই পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও বর্তমানে কোন সমাজ ইহাকে স্বীকার করে না।[৪০]

(খ) পরিবর্ত বিবাহ (marriage by exchange)—এই পদ্ধতিতে একটি চুক্তি দ্বারা দুই ব্যক্তি তাহাদের ভগিনী বা কন্যা পরস্পরের সহিত এইভাবে পরিবর্তন করিয়া লয় যে, একজনের ভগিনী বা কন্যা অপরের বা তাহার ভ্রাতার বা পুত্রের স্ত্রীভাবে গৃহীত হইবে।

(গ) মূল্য বিনিময়ে ক্রয় (marriage by purchase)—এই পদ্ধতিতে কন্যার মূল্য নির্ধারিত করিয়া এবং উহা তাহার পিতা বা অপর কোন অভিভাবককে প্রদান করিয়া ব্যক্তি-বিশেষ তাহাকে স্ত্রীরূপে লাভ করে ; আবার ইহার বিপরীতও হইতে পারে, অর্থাৎ পাত্রের উপযুক্ত মূল্য পাত্রপক্ষীয়দের প্রদান করিয়া নারী তাহার স্বামী লাভ করে।

(ঘ) পারস্পরিক চুক্তি বা সম্মতিক্রমে বিবাহ (marriage by contract or consent)—এই চুক্তি বা সম্মতি পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের অভিভাবকস্থানীয় লোকেদের মধ্যে সাধিত হইতে পারে এবং তাহারা মিলিতভাবে পাত্র-পাত্রীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করে। আবার পাত্র ও পাত্রী নিজেরাই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে।

৪০ বলপূর্বক বিবাহ বা রাক্ষসবিবাহ সম্বন্ধে Dr. Westermarck বলেন: "Among no people is it known to have been the usual or normal mode of contracting a marriage...it is chiefly practised either as an incident of war or as a method of procuring a wife when it is difficult to get one in the ordinary manner." (*A Short History of Marriage*, p. 113).

৮। বিবাহিত জীবনের আদর্শ (Ideals of Married Life) :

বিবাহিত জীবনের স্বরূপ ও মূল্য সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে।

(ক) ইন্দ্রিয় সুখবাদ, জড়বাদ ও স্বভাববাদ—জড়বাদের বা স্বভাববাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পারিবারিক সংস্থা নিতান্ত কৃত্রিম। এই সংস্থা কেবলমাত্র **জৈবিক প্রয়োজনের দাবীতে গঠিত হয়**—অর্থাৎ নরনারী তাহাদের যৌনক্ষুধা তৃপ্ত করিবার জন্যই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সম্বন্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে এবং এই প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইলে সম্বন্ধেরও অবসান ঘটিতে কোন বাধা নাই। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক, অতীন্দ্রিয় বা ঈশ্বরাদিষ্ট সম্বন্ধের কোন কথা উঠিতে পারে না, কারণ ঐরূপ কোন সম্বন্ধের বাস্তব অস্তিত্ব নাই এবং উহা একেবারে কাল্পনিক। প্রাণের প্রকাশ সম্ভোগের মধ্যে এবং যেখানে সম্ভোগের ক্ষমতা নাই, সেখানে বিবাহেরও প্রয়োজন নাই।

অনেকে মনে করেন যে, শিশুই হইল পারিবারিক জীবনের প্রধান ভিত্তি এবং শিশুর জন্মের ফলে দাম্পত্য সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। জড়বাদীরা বিবাহিত জীবনে শিশুর উপর কোন প্রাধান্য অর্পণ করেন না, বরং অনেকে শিশুর জন্মকে একটা অবাঞ্ছিত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে করেন।

অনেকে আবার বলেন যে, সুনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক জীবন যাপন করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। জড়বাদী বা স্বভাববাদীরা ইহা স্বীকার করেন না—তাঁহারা বলেন যে, কামই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং যাহাতে কামবৃত্তি চরিতার্থ হয় তাহাই করণীয়।

সাধারণতঃ বিবাহিত জীবনের কতকগুলি আদর্শ ও কর্তব্যের কথা বলা হয়: যেমন, স্বামীর একনিষ্ঠতা, পত্নীর সতীত্ব, পারস্পরিক প্রেম, সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদি। কিন্তু স্বভাববাদীরা এই সকল তথাকথিত আদর্শের কোন মূল্য স্বীকার করেন না—তাহাদের মতে দৈহিক আলিঙ্গনজনিত সুখই পুরুষার্থ। সমস্ত জীবন ধরিয়াই যে একনিষ্ঠভাবে একজনেরই সাহচর্যে থাকিতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই[৪১];

---

৪১ জড়বাদী, স্বভাববাদী ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেন: "It is senseless to make young people promise that they will cling to each other till death parts them. Love is safe only in the absence of a contract of perpetual obligation....Life is the end of life...There is no need for repression and concealment. Life is an adventure...These advocates of rampant individualism...dismiss moral restraint as antiquated humbug and piety as mere superstition. Adultery is only the outward sign of inner freedom. Established institutions happen to be the most powerful enemies of life..." (*Kalki*, pp. 17-18).

এইজন্য অনেক জড়বাদী বা স্বভাববাদী সাময়িক বা পরীক্ষণমূলক বিবাহ সমর্থন করেন।

(খ) **সন্ন্যাসবাদ**—সন্ন্যাসবাদীরা বিবাহ তথা পারিবারিক জীবনের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের জীবনে **দেহসুখের কোন মূল্য নাই** এবং পারিবারিক জীবনেরও কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উহা আমাদের কেবলমাত্র অসংখ্য বন্ধন মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং আত্মাকে প্রতিনিয়ত নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। সুতরাং মুক্তিকামী পুরুষের পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন উভয়ই সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। **সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রতাসাধন** এবং **বাসনা-কামনার ধ্বংস** আমাদের মুক্তিপথের সন্ধান দেয়।

(গ) **ভাববাদ, আদর্শবাদ ও কল্যাণবাদ**—ভাববাদী দার্শনিকেরা উচ্চ আদর্শের আলোকে জীবনকে পরিচালিত করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন এবং তাঁহারা সাধারণতঃ বলেন যে, **মানুষ যদি তাহার বাসনা-কামনাকে ধ্বংস না করিয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাহাতেই জীবনের প্রকৃত মঙ্গল বা কল্যাণ**। জীবনের অন্যান্য সহজবৃত্তির ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য যৌনবৃত্তির ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য। একদিকে যেমন উচ্ছৃঙ্খল কামাচারী হইয়া যৌনবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করা উচিত নহে, সেইরূপ অপরদিকে কামকে সম্পূর্ণরূপে দমন করাও উচিত নহে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখবিলাসী হইলে মানুষে ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকে না, তাহা ছাড়া, অনেকসময় শেষ পর্যন্ত ভোগের ক্ষমতাও লুপ্ত হইয়া আসে। আবার, যদি কামের প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করা যায়, তাহা হইলে নানাপ্রকার মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে; তাহা ছাড়া, যে মানুষ সংসার হইতে পলাইয়া কেবলমাত্র নিজের মুক্তি সাধনা করে, সে এক হিসাবে স্বার্থানুসন্ধানী রূপরসগন্ধে ভরা পৃথিবীকে উপভোগ করিয়া, সংসারের ভিতরে বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া

---

৪২ পরীক্ষণমূলক বিবাহ (Trial Marriage)-পদ্ধতির সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন যে, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বে নরনারীর ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া দেখা উচিত যে তাহারা পরস্পরের উপযুক্ত কি না এবং এই কারণে তাহারা দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপন করিতে পারিবে। যদি পরস্পর পরস্পরকে অনুপযুক্ত বোধ করে, তাহা হইলে তাহারা 'স্থায়ী' সম্পর্ক স্থাপন করিবে না।

'সহচর'-বিবাহ (companionate marriage)-এ সন্তানের দায়িত্ব বহন করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ নর ও নারী এই চুক্তিতে বদ্ধ হইবে যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য ভোগ করিবে এবং সাধারণতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিবে। তবে শিশুর জন্ম হইলে ঐ বিবাহ স্থায়ী রূপ ধারণ করিবে।

যে সকল প্রলোভন, নীচতা, হীনতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ।[৪৩]

সুতরাং অতিরিক্ত সম্ভোগ ও অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতাসাধন এই দুই-এর মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ **সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া সংযত জীবন বা 'গৌণ ব্রহ্মচারী'র জীবন যাপন করা উচিত।**[৪৪]

পারিবারিক জীবনকে অস্থায়ী চুক্তিবদ্ধ জীবন মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বিবাহের মাধ্যমে একজন কেবলমাত্র অপরের দেহকে ভোগ করিবার আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করে না—বিবাহের মাধ্যমে একজন অপরজনের সহিত সৌহার্দ্য ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপনের দায়িত্ব বহন করিতে স্বীকৃত হয়[৪৫]। বিবাহ বলিতে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্ক বুঝায় না অর্থাৎ কেবলমাত্র কাম চরিতার্থ করিবার জন্যই বিবাহ সংঘটিত হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বিবাহিত জীবন নিতান্ত স্বল্পস্থায়ী হইত। যৌন কামকে অতিক্রম করিয়া বিবাহিত জীবন স্নেহ ও প্রেমের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠে এবং এই বিবাহিত জীবনেই নরনারী নিজেদের পার্থক্য ভুলিয়া যৌথভাবে কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয় এবং এই কার্যেই তাহারা আত্মনিয়োগ করে[৪৬]। এইজন্য বিবাহকে সাধারণ লোকের পক্ষে

৪৩ তুলনীয়:

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।......
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।"

(রবীন্দ্রনাথ)

৪৪ বিবাহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন: 'Marriage is a fence that protects religion. If the fence were to be destroyed religion would go to pieces. The foundation of religion is restraint, and marriage is nothing but restraint." (*Young India*, June, 1926).

৪৫ 'বিবাহ' পদের ব্যুৎপত্তি হইল বি-বহ+ঘঞ্, অর্থাৎ বিশেষরূপে বহন করিবার দায়িত্বের প্রতিই ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইঙ্গিত করিতেছে।

৪৬ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়: 'True love requires for its maintenance the presence of an over-arching end, the pursuit of a common ideal to the realisation of which the lovers dedicate themselves, husband and wife accept each other and evolve out of the given unlikeness a beautiful whole." (*Kalki*, p. 59).

অন্যতম সংস্কার বলিয়া জ্ঞান করা উচিত এবং বিবাহকে একটি ধর্মীয় (sacramental) রূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুখবাদী ও জড়বাদীরা সন্তানের জন্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা অনেকে মনে করেন শিশু হইল নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগের পথে অন্তরায়স্বরূপ কিন্তু আদর্শবাদীরা বলেন যে, দাম্পত্য জীবনে শিশুর জন্মের প্রয়োজন, সন্তানই দাম্পত্য জীবনকে সমুন্নত করিয়া তোলে এবং এক নূতন মাধুরীর সৃষ্টি করে[৪৭]। শিশুর জন্মের পরই দাম্পত্যজীবনে এক পরিবর্তন আসে—উহা তখন স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সুখ ভোগের বাসনার মধ্যে সীমিত থাকে না। শিশুর জন্মের সম্ভাবনা যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিবাহরূপ সামাজিক সংস্কার আবশ্যক হইত না[৪৮]।

মন্তব্য :

আমরা উপরে যে তিনটি মতবাদের আলোচনা করিলাম, তাহাদের মধ্যে আদর্শবাদের মতবাদই সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য। সুখবাদী ও জড়বাদীদের আদর্শ গ্রহণ করিলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল যৌনচারিতায় পরিণত হইবে এবং তাহা সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই পক্ষে অকল্যাণকর হইবে—উহার ফলে একদিকে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়, অপর দিকে ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। অপরপক্ষে সন্ন্যাসধর্মও সমাজের সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে—এই আদর্শ পালন করিবার জন্য যেরূপ মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন সাধারণ লোকের তাহা থাকে না। তাহা ছাড়া, এই মতবাদের

৪৭ দাম্পত্য-জীবনে সন্তানের গৌরবময় স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলিয়াছেন "If we treat the family as a little state the child is its little sovereign" (*Outlines of Social Philosophy*, p. 80).

৪৮ তুলনীয় : (১) "Marriage is something more serious than the pleasure of two people in each other's company, it is an institution which, through the fact that it gives rise to children, forms part of the intimate texture of society, and has an importance extending far beyond the personal feelings of the husband and the wife ...But for children, there would be no need of any institution concerned with sex." (Russell *Marriage & Morals*, p. 42).

(২) 'the *essential* function of marriage is the continuation of the race, its *accidental* function being the gratification of the amoristic sentiment of mankind." (Bernard Shaw, *Man and Superman*).

সমর্থকেরা যেভাবে বাসনা-কামনাকে মানবীয় উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহারা সেইরূপ নহে—উহাদের ধ্বংস না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। আবার সমাজের সকলেই কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া যৌনজীবন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিলে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যসমাজই অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখবাদ ও সন্ন্যাসবাদ এই দুই চরম মতবাদ পরিহার করিয়া উহাদের সমন্বয়কারী মতবাদ হিসাবে আদর্শবাদ গ্রহণযোগ্য। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৬৫, ৬৬) বলিয়াছি যে, সমাজ তথা সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্থাসমূহের আদর্শের দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এক্ষেত্রে আদর্শবাদকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আদর্শবাদকে গ্রহণ করিয়া আমরা ইহার তাৎপর্যকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি :

(ক) বিবাহিত জীবনের প্রকৃত আদর্শ সাধনের জন্য একগামিতা (monogamy)ই বাঞ্ছনীয়। একের সহিত গার্হস্থ্য জীবন যাপনের মধ্যেই সুসংযত, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের সম্ভাবনা অধিক।[৯৯]

(খ) বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেন 'অধিকারের স্বৈরচারিতা' প্রকাশের চেষ্টা না করে, অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী ইহাদের কেহই যেন নিজেকে অন্যের 'মালিক' বলিয়া মনে না করে—স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক হইবে পারস্পরিক সাম্যের সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক, সাহচর্যের সম্পর্ক, যৌথদায়িত্বের সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যদি কোন অধিকারের সম্পর্ক থাকে, তাহা হইল 'হৃদয়ের অধিকার' বা হৃদয় দ্বারা হৃদয় জয়। সহানুভূতিশীল মনোভাব

[৯৯] Urban-এর ভাষায় "The question may well be raised whether sex life without the permanent *monogamous* form could really be a form of the good life in any intelligible sense of the word good" (*Fundamentals of Ethics*, p. 307)

কেহ কেহ বলেন যে, সমাজ মধ্যে বিবাহযোগ্য নর ও নারীর সংখ্যা মোটামুটি সমান না হইলে একগামিতার আদর্শ পালন করা অসুবিধাজনক। আবার কেহ কেহ বলেন যে এই আদর্শ সকল লোকের উপযুক্ত নহে, যেমন, C. E M Joad বলেন, "I cannot assent to the dogma that to live with *a* woman and children is natural to all men in some sense in which other modes of living are not natural" (*Guide to Modern Wickedness*, p. 374).

লইয়া পরস্পরকে জানা, পরস্পরকে বুঝা, পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান লইয়া এই সম্পর্ক গঠিত।[৫০]

(গ) দাম্পত্য জীবনের সীমারেখার মধ্যে সুসংযতভাবে যৌনকামকে পরিতৃপ্ত করা উচিত। স্বভাবজ বৃত্তি হিসাবে কাম দুর্নীতির নির্দেশক নহে—উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, দায়িত্ববিহীন যৌন জীবনের মধ্যে যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, যেখানে প্রেম নাই, অপরের জন্য চিন্তা নাই, সেখানেই দুর্নীতি দেখা দেয়। দাম্পত্য জীবনে যৌনকামের কেবলমাত্র দৈহিক মূল্য নাই—উহা দেহাতীত সম্পর্ক বা মানসিক অন্তরঙ্গতার প্রথম সোপান, সুতরাং দাম্পত্য জীবনে সুসংযত কাম পাপ নহে।

(ঘ) পারিবারিক জীবনই যৌনকামের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া কতকগুলি আদর্শ ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে। সুতরাং এইগুলি সুষ্ঠুভাবে সাধন করিতে সকলেরই প্রয়াসী হওয়া উচিত। কামের অতি-জৈবিক মূল্য (hyper-organic value) স্বীকারের মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের আধ্যাত্মিক দিক্ সম্বন্ধে অবগতি জন্মে।[৫১]

(ঙ) দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শের সহিত স্থায়িত্বের ধারণা বিজড়িত থাকে। বিবাহিত জীবন যাহারা স্থাপন করিতে যাইবে তাহারা যেন আপ্রাণ এই চেষ্টাই করে যে, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই যেন তাহাদের সম্পর্কের অবসান না ঘটায়। যদি স্বামী-স্ত্রীর মনে এই ধারণা থাকে যে, যখন খুসী তাহারা তাহাদের সম্পর্কের অবসান

৫০ এই প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক বার্জেস (Burgess) ও লক্ (Locke-এর পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারি—তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকের নামকরণ করিয়াছেন *The Family: From Institution to Companionship*; তাঁহাদের এই নামকরণের তাৎপর্য হইল যে, পারিবারিক আদর্শের বিবর্তনের ফলে পরিবার বলিতে নিয়মবদ্ধ, কঠোর কোন প্রতিষ্ঠান আজ বুঝায় না, উহা হইল পারস্পরিক সাহচর্যের সম্পর্ক। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন: "In the new emerging form of the companionship family, its unity inheres...more and more in such interpersonal relationships as the mutual affection, the sympathetic understanding, and the comradeship of its members."

৫১ তুলনীয়: '(There should be an) inward development of the consciousness of the meaning and value of the sex relations themselves, and of their relation to the good life of the individual and society. I shall describe this as the gradual *spiritualisation* of the sex relation. By spiritualization we may understand here the gradual development and acknowledgment of hyper-organic values." (W. M. Urban, *Fundamentals of Ethics*, p. 300).

ঘটাইতে পারে, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে গাঢ় প্রেম ও একজনের পক্ষে অপরের জন্য আত্মত্যাগ এবং ক্লেশস্বীকার সম্ভবপর হয় না।

(চ) দাম্পত্যজীবনে সন্তানের জন্ম বাঞ্ছনীয়। এ কথা সত্য যে, অর্থনৈতিক কারণে এবং মাতার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুত্রকন্যার সংখ্যাধিক্য বাঞ্ছনীয় নাও হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক সুখভোগের লালসায় ইচ্ছাপূর্বক বহুদিন সন্তানহীন দাম্পত্যজীবনযাপন করাও বাঞ্ছনীয় নহে। সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া নূতন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়, নূতন করিয়া আত্মত্যাগ ও সহযোগিতার সুযোগ দেখা দেয় এবং সন্তানের মাধ্যমেই পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যেন প্রসারিত হয়। (পৃঃ ১৪৫ ও ১৪৭)।

আমরা উপরে বিবাহিত জীবনের কয়েকটি আদর্শের উল্লেখ করিলাম। ইহা স্বীকার্য যে, বাস্তবক্ষেত্রে সকল সময় আদর্শ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, এই সকল আদর্শ রক্ষা কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। ব্যক্তিমাত্রেরই দোষত্রুটি ও দুর্বলতা আছে—তাই দাম্পত্যজীবনে চলার পথে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের উচিত হইল পরস্পরকে সহানুভূতিশীল ও ক্ষমাসুলভ দৃষ্টি লইয়া বিচার করা, পরস্পরের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করা এবং উভয়ের সংযুক্ত জীবনকে সার্থক করিয়া তোলা।

৯। বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের সমস্যা (Problems of Marriage and Married Life) :

মানুষের জীবনে যেখানেই সংগঠন আছে, সেখানেই ভাঙ্গনের সম্ভাবনা আছে, যেখানেই আদর্শ আছে, সেখানেই বিচ্যুতি আছে। বিবাহিত জীবনের আদর্শের ক্ষেত্রেও এইজন্য নানাপ্রকার আদর্শচ্যুতি ঘটে এবং নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার আলোচনা করিব।

(ক) বিবাহ-বিচ্ছেদ (Divorce) :

আমরা বিবাহের আদর্শ উল্লেখকালে বলিয়াছি যে, বিবাহের সময় সকলেই আশা করে যে, বিবাহ-দ্বারা নরনারীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা মৃত্যু ব্যতীত আর কোন কিছু দ্বারা ছিন্ন হইবে না, ইহাও আশা করা যায় যে, বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে এবং সাধারণভাবে তাহাদের জীবন প্রেম-প্রীতি দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু কার্যকালে অনেক সময় দেখা যায় যে, এই সকল আশা পূরিত হয় না। অর্থাৎ বাস্তবজীবনে এমন ঘটিতে পারে যে, স্বামী

ও স্ত্রী পরস্পরের সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারিতেছে না এবং তাহাদের জীবন বিবাদ-বিসম্বাদ ও তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রতিকার কি? ইহার উত্তরে অনেকে বলেন যে, এরূপ অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদই একমাত্র প্রতিকার, যদি কেহ বিবাহের পূর্বে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনে ভুল করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের যৌক্তিকতা সর্বত্র সমানভাবে স্বীকৃত হয় নাই এবং ইহা লইয়া চিন্তানায়কগণের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে।

(১) যাঁহারা **রক্ষণশীল (conservative)**, তাঁহারা কোন অবস্থাতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করেন না[৫২] তাঁহারা বলেন যে, মানুষের নৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য একগামিতা ও স্থায়িত্বের আদর্শ প্রতিপালন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সুতরাং একদিকে সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের জন্য এবং অপরদিকে ব্যক্তির আত্মিক উন্নতির জন্য স্থায়িত্ব ও একগামিতার এই দুই আদর্শকে কঠোরভাবে সমাজ তথা রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইবে এবং এইজন্য বিবাহবিচ্ছেদের কোন যৌক্তিকতাই স্বীকার করা যায় না। বিবাহ কোন সাধারণ চুক্তি বা সর্ত নহে যে ইচ্ছা করিলেই ইহার অবসান ঘটান যাইবে।

এ কথা সত্য যে, কোন কোন দাম্পত্যজীবনে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ এরূপ অসহনীয় হইয়া উঠে যে, তাহাদের পক্ষে একত্রে বাস করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে, কিন্তু আইনসঙ্গতভাবে তাহাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অসুবিধার কথা ভাবিয়া সমাজের সম্মুখে কোন কু-আদর্শ বা অকল্যাণকর আদর্শ স্থাপন করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। যেমন ইচ্ছা করিলেই কেহ পিতামাতা পরিবর্তন করিতে পারে না, সেইরূপ ইচ্ছা করিলেই স্বামী বা স্ত্রী পরিবর্তন করা যায় না। তাহা ছাড়া, একবার বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দান করিলে কোথায় যে উহার ছেদ টানা যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। যে ব্যক্তি একবার দাম্পত্যজীবনে সহচর পরিবর্তন করিতে পায়, হয়ত' তাহাকে পরিবর্তনের একটা নেশা পাইয়া বসে এবং তাহার মন ক্রমাগতই পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন

৫২ রক্ষণশীল মতবাদের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Felix Adler, *Marriage and Divorce*.

কামনা করে।[৫৩] দুরাত্মার ছলের অভাব নাই; সুতরাং যে কোন অছিলায় কামের পরিতৃপ্তির জন্য এরূপ অবস্থায় নর বা নারী পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের সঙ্গ কামনা করিতে পারে। একসঙ্গে বহুবিবাহ করিতে না পাইয়া বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ লইয়া যে স্বামী একের পর এক স্ত্রীর সহিত বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে বা যে স্ত্রী একের পর এক স্বামী পরিবর্তন করে, সেও কি একহিসাবে বহুগামিতাদোষে দোষী নহে ?

পারিবারিক জীবনের অন্যতম উপকারিতা হইল যে, ইহা নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করে, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের যদি অনুমতি দান করা যায়, তাহা হইলে এই নিরাপত্তাবোধ নষ্ট হইয়া যায়। স্বামী ও স্ত্রী এই দুইজনের মধ্যে যে শান্তিপ্রিয় ও সরল সে সর্বদাই অপরের ভয়ে ভীত থাকিবে—কারণ কখন, কি-ভাবে সে পরিত্যক্ত হইবে তাহা সে জানে না।

বিবাহবিচ্ছেদের ফলে উভয়পক্ষেরই ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়। যে এই বিচ্ছেদের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তাহার ক্রমশঃ নৈতিক অবনতি ঘটে—বিবাহের উচ্চ আদর্শের কথা ভুলিয়া সে বিবাহিত জীবন যাপনের নামে এবং সামাজিক অনুমোদনের অন্তরালে উচ্ছৃঙ্খল কামাচারীরই জীবন যাপন করে। অপরপক্ষে, এই বিচ্ছেদের ব্যাপারে যে নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তাহার মনের উপর ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক সময় তাহাকে নীরবে কষ্ট সহ্য করিতে হয়; 'ভূতপূর্ব' স্বামী বা স্ত্রী হয়ত' প্রকাশ্যে ভাব দেখাইতে পারে যে, তাহার কিছুই হয় নাই বা সে যেন মোটেই বিব্রত বোধ করে নাই, অথচ মনের সঙ্গোপনে সে হীনতা বোধ করে, এবং যেন 'মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য' হইয়া মনের যন্ত্রণা মনেই রাখিয়া দেয়।

যেখানে সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সেখানে সন্তানের উপর বিবাহবিচ্ছেদের তীব্র ফল দেখা দেয়। যে সন্তান এইরূপ বিচ্ছিন্ন পরিবার মধ্যে লালিতপালিত হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে গঠিত হইতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় পরিবার-মধ্যে থাকিয়া শিশু ক্রমশঃ পরোপকার, আত্মোৎসর্গ, সেবা ইত্যাদি মহৎগুণের আদর্শ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়; কিন্তু যেখানে সে দেখে যে, তাহার গৃহ

৫৩ তুলনীয়: "...few people realize how perilously near the surface is the longing for *change*—perhaps the most dangerous quality in human nature. Unless the door is fast bolted against *easy* change, we are lost." (Urwick, *The Social Good*, p. 31).

রণক্ষেত্রেরই নামান্তর, তাহার পিতামাতা কলহপরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী, আত্মসুখের জন্য একজন অপরজনের উপর দোষারোপ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে চলিয়াছে, সেখানে তাহার পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ত' জাগেই না, বরং তাহাদের নিকট হইতে সে মন্দশিক্ষাই পায়।[৫৪] শেষ পর্যন্ত যখন বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে পিতা বা মাতার একজনের নিকটই পালিত হয় এবং অপরের সাহচর্য হয়ত' সে বিশেষ বিশেষ সাময়িক ব্যবধানে পায়। ইহাতে তাহার অন্তরে একটা শূন্যতার ভাব থাকিয়া যায় এবং তাহার মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভাবী জীবনে সে সমাজে অন্য ব্যক্তির সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারে না, নিজের স্বার্থের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং অপরের ব্যক্তিত্বকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে পারে না।

(২) যাঁহারা **চরমপন্থী** বা **বিদ্রোহিমনোভাবাপন্ন** (**radical**), তাহারা রক্ষণশীলদের এই সকল যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, বিবাহ হইল পারস্পরিক সুবিধার জন্য চুক্তিমাত্র। বিবাহের উদ্দেশ্য হইল শান্তিপূর্ণভাবে কামবৃত্তি চরিতার্থ করা, সুতরাং যদি বিবাহের পর দেখা যায় যে, এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না, তখন উহাকে আঁকড়াইয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। এইজন্য চরমপন্থীরা বলেন যে, যেমন পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা দুইজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রয়োজন হইলে যদি পারস্পরিক সম্মতি (mutual consent) দ্বারা উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহাতে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। পারস্পরিক সম্মতিতে যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আইনসম্মত উপায় গ্রহণ করিতে হইবে।

বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা স্বামী স্ত্রীর এবং (সন্তান জন্মাইলে) সন্তানের ব্যক্তিত্বের উপর বিচ্ছেদের কুফল সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন। চরমপন্থীরা এই সম্ভাবনা অস্বীকার করেন না কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, অপ্রতিযোজনশীল স্বামী ও স্ত্রী যদি বাধ্য হইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একত্রে বাস করে, তাহাতেও অবস্থার উন্নতি হয় না। পারস্পরিক কলহে, কটু ভাষণে, সন্দেহে, দোষারোপে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে—নিশ্চয়ই স্বামী ও স্ত্রীর এবং সন্তানের ব্যক্তিত্বের উপর ইহার কোন সুফল হয় না। সুতরাং যে বন্ধন রক্ষা করা সম্ভব নহে,

---

৫৪ C M Rosenquist, *Social Problems*, p ৭৮ দ্রষ্টব্য।

তাহার মোহে দৈহিক সুখ ও মানসিক শান্তি ত্যাগ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

(৩) **উদারনৈতিক** (liberal) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হয় যে, উপরের এই দুই মতের সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। রক্ষণশীলতা ও বিদ্রোহিমনোভাবাপন্নতা দুইটি পরস্পরের বিরুদ্ধ হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত আছে।

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিবাহ বিচ্ছেদ সাধারণতঃ সমর্থন করা যায় না—অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা বিবাহবন্ধনের ন্যায় বিবাহবিচ্ছেদকেও একটি সাধারণ বা স্বাভাবিক সমাজব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। বিবাহবিচ্ছেদ যে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর এবং সন্তানের জন্মের পর ঘটিলে সন্তানের পক্ষে বিশেষ অকল্যাণকর হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, সমাজমধ্যে অপ্রতিহতভাবে বিবাহবিচ্ছেদের প্রথা প্রচলিত হইলে সামাজিক শান্তি ও সংহতি বিঘ্নিত হয় এবং আন্তর্ব্যক্তিক ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের এই সকল অসুবিধাসত্ত্বেও কোন অবস্থাতেই বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন করা যায় না, ইহাও বলা যায় না। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, স্বামী ও স্ত্রী কোন মতেই পরস্পরের সহিত একত্রে শান্তি ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া বসবাস করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে সমাজ তথা রাষ্ট্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদে সম্মতি দান করিতে পারে।[৫৫] সুতরাং **বিবাহবিচ্ছেদকে প্রচলিত নিয়মরূপে না গ্রহণ করিয়া ইহাকে ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করাই উচিত।** যে সামাজিক সংহতির জন্য আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক উদার ও গতিশীল হওয়া প্রয়োজন, সেই সামাজিক সংহতির জন্য পারিবারিক সম্পর্ককে অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় মনে করা উচিত।[৫৬] **বিশেষতঃ সন্তানের**

৫৫ সকল দেশের বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন এক নহে। কোন কোন দেশের আইনে স্বামী যত সহজে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, স্ত্রী তত সহজে স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; আবার অনেক দেশে এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার। সাধারণতঃ স্বামী বা স্ত্রীর যৌন অক্ষমতা, জটিল ব্যাধি (যাহার নিরাময় হয় না), দুশ্চরিত্রতা, শারীরিক অত্যাচার এই সকল কারণে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়।

৫৬ Urwick-এর ভাষায়: "...whereas all other groupings and relationships should be made more elastic and more fluid for the sake of the individual's good, the one group and relationship which is at the base of all the rest, must, in the interests of the very same good,

জন্ম হইলে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দানে রাষ্ট্রকে অত্যন্ত কঠোর হইতে হইবে।[৫৭]

বলা বাহুল্য, সামাজিক জীবন যাপনের সুষ্ঠু নীতিগুলি সকল সময় আইন দ্বারা প্রতিপালন করান সম্ভব নহে। এইজন্য সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন। রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধারগণের ইহা লক্ষ্য রাখা উচিত যেন নাগরিকরা পারিবারিক সংস্থাকে স্থায়ী সংস্থারূপে দেখিতে ও গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। যাহারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **বিবাহিত জীবনে যেমন আনন্দ আছে, সেইরূপ দুঃখকষ্টও আছে—বিবাহিত জীবন হইল দায়িত্বপূর্ণ সুসংযত জীবন।** সুতরাং প্রাক্-বিবাহ কল্পনা যত মধুময়ই হউক, বিবাহিত জীবনে তাহা পূর্ণভাবে পরিপূরিত হয় না, এই বিষয়ে নবদম্পতিকে সচেতন থাকিতে হইবে।[৫৮] স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিবাহিত জীবন কেবলমাত্র দুইজন ব্যক্তির দৈহিক সুখকে লইয়াই চলিতে পারে না—ইহার সহিত নিজেদের মঙ্গল, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মঙ্গল এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মঙ্গল সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং বিবাহিত জীবনে এমন কিছু করা উচিত নহে যাহাতে এই কল্যাণ ব্যাহত হয়।

be regarded as normally unbreakable and fixed, depending as it does for its highest excellence upon the very difficulties which its fixity forces to face and overcome." (*The Social Good*, p. 138)

৫৭ এইজন্য রাসেল (Russell) মন্তব্য করেন: "...where there are children, the ***stability*** of marriage is to my mind of considerable importance (*Marriage & Morals*, p 73). প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে সন্তানের জন্মের পর বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয় না, ইহার উল্লেখ করিয়া Ginsberg বলেন, 'Marriage is stable after the birth of children and sometimes (as among the Veddas) indissoluble" (*Sociology* p 136).

৫৮ রাধাকৃষ্ণনের উপদেশবাণী লক্ষণীয়. 'Marriage as a form of life means joy as much as suffering Divorces are due to a false idea that marriage is but a state of bliss, and when anything interferes with it, it must be ended....If we recognise that the institution of marriage is for the purpose of putting the growth of two individuals ***through obstacles and delays***, we shall take every difficulty as a challenge to further effort." (*Kalki*, p. 59).

(খ) বিবাহিত জীবনে অশান্তির কারণ (Causes of Unhappiness in Married Life):

বিবাহিত জীবনে অশান্তি যখন দুরপনেয় বোধ হয়, স্বামী ও স্ত্রী যখন দেখে যে, একজন অপরের সহিত প্রতিযোজন করিতে অপারগ, তখন সাধারণত বিবাহবিচ্ছেদের দাবী করা হয়। বিবাহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা বোধ করিতে হইলে প্রথমে অশান্তির কারণসমূহ অনুসন্ধান করা কর্তব্য এবং তাহার উপর উহাদের কতদূর ও কিভাবে দূর করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে অশান্তির কারণগুলির একটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনপ্রযোজ্য তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, এই সকল কারণগুলির এত বিবিধ বৈশিষ্ট্য থাকে যে, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহাদের বিচার করা বাঞ্ছনীয় (অবশ্য এই সকল দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে)।

(১) পারিবারিক জীবনের অশান্তির কারণগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের অনেকগুলি **মানসিক**—স্বামী-স্ত্রীর মনের নির্জ্ঞান স্তর হইতে উহারা চেতন স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের জীবনে অনেক অদ্ভুত ও অসঙ্গত আচরণ সৃষ্টি করে। এই মানসিক কারণগুলি নানাভাবে সংঘটিত হইতে পারে। আমাদের জীবনের সকল বাসনা সকল সময় পূরিত হয় না, কিন্তু কোন বাসনা পূর্ণ না হইলে তাহা যে মন হইতে বিদায় নেয় তাহা নহে, বরং উহা মনের অগোচরে থাকিয়া গূঢ়ৈষা (complex) গঠন করিতে পারে এবং নানা অস্বাভাবিক পথে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারকে পরিচালিত করিতে পারে। তাহা ছাড়া, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে এমন হয় যে, কোন কিছুর উপর তাহার বাসনার সংবন্ধন (fixation) ঘটে এবং এই কারণ অন্য কোন ব্যক্তির উপর তাহাদের বাসনা-কামনা ন্যস্ত হইতে পারে না। এই সকল ক্ষেত্রে নানা প্রকার কামবিকৃতি (perversion) ঘটে, যথা, ধর্ষকাম (sadism), মর্ষকাম (masochism), সমরতি (homosexuality), বস্তুকাম (fetishism) ইত্যাদি। এই প্রকার বিকৃতি যাহাদের ঘটে, তাহারা স্বাভাবিক যৌন ব্যবহারে তৃপ্তি পায় না

৫১ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য M. S Everett. *Ideals of Life*. পৃঃ ৪০৭-২৯

এবং তাহাদের দাম্পত্যজীবন অশান্তিতে ভরিয়া উঠে।[৬০] ইহা ছাড়া, অনেক সময় স্বামী বা স্ত্রীর মনে অপরের কার্যকলাপে অকারণ সন্দেহের বাতিক এবং ঈর্ষ্যা থাকার ফলেও গৃহশান্তি ব্যাহত হয়। সেইরূপ স্বামী বা স্ত্রীর মনে যদি অপরের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তারের বাসনা প্রবল হয়, তাহা হইলেও দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। এই সকল গূঢ়ৈষা ও বিকৃতি যে সকল সময় দূর করা যায় না তাহা নহে, উহাদের দূর করিতে হইলে অভিজ্ঞ মনোরোগচিকিৎসকের সহায়তায় মানসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মানুষ যখন এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে নিজেকে বুঝিতে পারে, তখনই সে অস্বাভাবিকতার হাত হইতে মুক্তি পায় এবং তাহার ফলে তাহার পারিবারিক জীবনের শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়।

(২) **সামাজিক** কারণেও অনেক সময় অশান্তি দেখা দেয়। সামাজিক পরিবেশ, তথা সামাজিক আচারব্যবহার ও রীতিনীতি অনেকাংশে ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিপরীত সামাজিক অবস্থা কি ভাবে একই প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার উল্লেখ করিতে পারা যায়। যে সমাজে নর-নারীর মধ্যে অবাধ সংমিশ্রণ চলিবার আপাত কোন বাধা নাই, সেখানে আত্মসংযমের অভাবে নরনারীর মধ্যে অবাঞ্ছিত সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, এই প্রকার

---

৬০ অবদমন, গূঢ়ৈষা, কামবিকৃতি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য McDougall, *Outline of Abnormal Psychology*, Chs. XI & XIX দ্রষ্টব্য। তৎসহ গ্রন্থকার-রচিত 'মনোবিদ্যা', পৃ. ১১১-১৪ দ্রষ্টব্য।

আপাতদৃষ্টিতে কত সামান্য কারণে মানসিক বিকার ঘটিতে পারে, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাওয়া যায়:

'A gentleman of cultivated tastes, happily married, and with two children, consulted the physician on account of his overpowering infatuation for a young peasant woman, which threatened to break up his home, for he seriously contemplated divorce and re-marriage with the peasant woman, who, to an unbiassed observer, seemed less...attractive than the average woman of her class.

Investigation soon revealed, first that the infatuation dated from an occasion on which he had watched this woman bathing his little son; secondly, that coarse red female hands were a 'fetich object' for the patient; thirdly, that in early boyhood he himself had been bathed by a young woman of that kind, and that this experience had excited in him sexual instinct. When the nature and history of the obsession were thus revealed to the patient, it quickly faded." (McDougall, *op. cit.* pp. 319-20).

সম্পর্কের মধ্যে সাময়িকভাবে কাম পরিতৃপ্তির বাসনাই প্রবল থাকে। সুতরাং বিবাহিত ব্যক্তিরা এইরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ হইলে তাহাদের পারিবারিক জীবনের শান্তি হ্রাস পায়, এমন কি উহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে পারে। আবার অবিবাহিত জীবনেও যাহারা ক্রমাগত এইরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহারা ভবিষ্যতে পারিবারিক জীবনের স্থায়ী সম্পর্কের মধ্যে তৃপ্তি না পাইতে পারে। এইরূপ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অবিবাহিতরা অনেক সময় কল্পনাবিলাসী ও 'রোমান্টিক' হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহার ফলে তাহারা যখন বাস্তবজীবনের কঠোরতার সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা সুষ্ঠুভাবে উহার সহিত প্রতিযোজন করিতে পারে না।

অপরপক্ষে, যে সমাজে অত্যন্ত কঠোর সাবধানতা সহকারে নর ও নারীকে পৃথক্ করিয়া রাখা হয় এবং তাহাদের মেলামেশার সুযোগ খর্ব করিয়া রাখা হয়, সেখানে বিবাহিত জীবনেও নরনারী পরস্পরকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, এইরূপ পরিবেশে অহেতুক সন্দেহ ও ঈর্ষ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়।

কোন কোন সমাজব্যবস্থায় নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের প্রথা নাই। এইরূপ সামাজিক আদর্শে যে সকল পুরুষ প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারা বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে নারীর উপযুক্ত মর্যাদা দান ত' করেই না, বরং নানা অসদ্ব্যবহার করে। এইরূপ ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে অকারণ অশান্তির সৃষ্টি হয়। অনেক সমাজ-ব্যবস্থায় আবার পারিবারিক জীবনে নবদম্পতির বিশেষ স্বাধীনতা থাকে না এবং তাহাদেব "তৃতীয় পক্ষের' আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতেও নানা অশান্তি দেখা দেয়।

সুতরাং আদর্শ সমাজব্যবস্থায় নর ও নারী উভয়েরই যোগ্য মর্যাদা দানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৩) **অর্থনৈতিক কারণেও** অনেক সময় গৃহশান্তি নষ্ট হয়। সংসারে যদি নিত্য অভাব-অনটন দেখা দেয়, স্বামী যদি স্ত্রীর সামান্যতম ভরণপোষণেও সক্ষম না হয় এবং সে দিকে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিবার সম্ভাবনা ঘটে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই যদি পরস্পারের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তাহা হইলে মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করিতে পারে না। এই কারণে আজিকের দিনে কিছুপরিমাণ অর্থ-নৈতিক যোগ্যতা অর্জন করিয়াই যুবকের পক্ষে বিবাহে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য আজকাল অনেক নারী স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করে। ইহার ফলে বিবাহিত জীবনে অনেক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়—যেমন, স্বামী ও স্ত্রী স্ব স্ব বৃত্তি লইয়া ব্যস্ত থাকার জন্য কেহই সংসারের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারে না ; আবার এমনও হইতে পারে যে, স্বামী ও স্ত্রীকে স্ব স্ব বৃত্তির জন্য দীর্ঘদিন পৃথক্ অবস্থান করিতে হয়। যেখানে সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সেখানেই অসুবিধা বেশী করিয়া দেখা দেয় ; সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালনের জন্য যে সময়, শক্তি, ধৈর্য ও মনোযোগের প্রয়োজন, তাহার কোনটিই গৃহের বাহিরে স্বাধীন বৃত্তিজীবিনী মাতার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে আশা করা যায় না। শৈশবে মাতা ও পিতা উভয়েরই স্নেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়। সেইজন্য শিশুসন্তানের জননীর পক্ষে যে বৃত্তিতে শিশুর সহিত দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অধিক, সেইরূপ বৃত্তি পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়া, গৃহের বাহিরে কর্মক্ষেত্রে নর-নারীর একত্রে কার্য করার ফলে, মধ্যে মধ্যে পরস্পরের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় অনুরাগও দেখা দিতে পারে এবং তাহাতে নিজ নিজ গৃহশান্তি নষ্ট হইতে পারে।

আমরা বিবাহিত জীবনের অশান্তির কয়েকটি স্থূল কারণের উল্লেখ করিলাম। সকল অশান্তির কারণ এবং উহাদের নিবৃত্তির কোন সর্বজনীন উপায় নির্ধারণ করা যায় না। তবে ইহাও বলা যায় যে, বিবাহিত জীবনের শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সহানুভূতিশীল ও উদার মনোভাবের উপর ; এইরূপ মনোভাব লইয়া যদি তাহারা পরস্পরকে (এবং যতদূর সম্ভব পরস্পরের নিকট-আত্মীয়দের বা পরিবারভুক্ত অন্য ব্যক্তিদের) বুঝিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং যদি তাহারা পরস্পরের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দান করিতে পারে, একজন যদি অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করে বা সর্বদা সন্দেহের চক্ষে না দেখে, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক অশান্তি দূর হইবে, ইহা আশা করা যায়।

(গ) জন্মনিয়ন্ত্রণ (Birth-Control) :

আমরা পূর্বে (পৃঃ ১৬৯) বলিয়াছি যে, বিবাহিত জীবনে সন্তানের জন্ম বাঞ্ছনীয়—সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত

হয়, নূতনভাবে যেন তাহাদের সংসারযাত্রা সুরু হয়। কিন্তু সমস্যা হইল যে, পিতামাতার পক্ষে সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালনপালন করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে; সুতরাং যদি পরিবার মধ্যে অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা সুষ্ঠুভাবে সন্তানদের প্রতি সকল কর্তব্য সাধন করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, স্বল্প ব্যবধানে অনেক সন্তানের জন্মদান করিলে মাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। এই সমস্যা কেবলমাত্র পরিবারগত নহে, ইহা রাষ্ট্রগতও বটে; কারণ জন্মসংখ্যা যদি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা দুরূহ হইয়া পড়ে।[৬১] এইজন্য প্রশ্ন উঠে, সন্তানসংখ্যা সীমিত করিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা কি বাঞ্ছনীয়? এই পন্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করা হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তাঁহাদের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন যে, সন্তানের জন্মদানই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা দ্বারা এই মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত করা উচিত হইবে না। সন্তানের জন্ম প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়; অতএব সন্তানের জন্ম হওয়া বাঞ্ছনীয় কিংবা অবাঞ্ছনীয় তাহা প্রকৃতিই বিচার করিবে, আমাদের ঐ বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নাই। সন্তানসংখ্যা বাড়িলে পিতামাতার বা রাষ্ট্র-নায়কদের চিন্তিত হইবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি, অর্থাৎ ভগবানই এই চিন্তার ভার গ্রহণ করিবেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা যাহারা অবলম্বন করে, তাহারা এক হিসাবে স্বার্থপর—তাহারা

---

৬১ এই বিষয়ে আধুনিককালে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন টমাস্ ম্যালথাস্ (Thomas R. Malthus)। তিনি বলেন যে, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায়, দেশের শস্যোৎপাদন সে হারে বাড়ে না। ইহার ফলে সামাজিক দুর্গতি বৃদ্ধি পায়। এই দুর্গতি হ্রাস পাইতে পারে দুইটি উপায়ে —মৃত্যুর হার বাড়িলে এবং জন্মের হার কমিলে। যে কোন সমাজের পক্ষে শেষোক্ত উপায়টিই বাঞ্ছনীয়।

সমাজের কল্যাণে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি প্লেটো তাঁহার *Republic* গ্রন্থে ইঙ্গিত করেন। তিনি রাষ্ট্র-পরিচালক (Guardian of the State)-দের জন্য যে সাম্যবাদ প্রচার করেন (পৃঃ ১০৯), তাহাতে তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক বিবাহ-নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, যাঁহাদের হস্তে এই বিবাহ-নিয়ন্ত্রণের ভার থাকিবে, তাঁহারা যেন এমনভাবে উহা নিয়ন্ত্রণ করেন যাহাতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা মোটামুটি সমান থাকে। তাঁহার ভাষায়: "The number of marriages we shall leave to the Rulers' discretion. They will aim at keeping the number of citizens as constant as possible, having regard to losses caused by war, epidemics, and so on." (*Republic*, Bk. V, 460).

নিজেরা রূপরসগন্ধে ভরা এই পৃথিবী ভোগ করিতেছে, অথচ আর কেহ ভোগ করুক তাহা চাহে না, অর্থাৎ তাহারা চাহে না যে আর কেহ তাহাদের অসুবিধা করুক। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের দিক্ হইতেও ইহা অকল্যাণকর। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যদি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কমিতে থাকে, তাহা হইলে রাষ্ট্র ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে না এবং ক্ষাত্রবলে বলী হইয়া রাষ্ট্র আত্মবিস্তারও করিতে পারে না।[৬২]

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকেরা মাতার স্বাস্থ্য, ভাবী সন্তানের কল্যাণ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাঁহাদের যুক্তি প্রদর্শন করেন। ইঁহারা বলেন যে, বিবাহিত জীবনে সন্তান যত কাম্যই হউক্, অনিয়ন্ত্রিতভাবে বহু সন্তানের জন্মদান করিতে কোন নারীকে বাধ্য করা উচিত নহে। ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষীণবল জননী কখনও সন্তানের প্রতি তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারে না। সন্তানের কল্যাণের দিক্ হইতে বলা যায় যে, প্রতি সন্তানই দাবী করিতে পারে যে, সে যেন পিতামাতার বাঞ্ছিত হয়, সে যেন দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী পিতামাতার সন্তান হয়, সে যেন এমন পিতামাতার সন্তান হয় যেখানে তাহারা যৌথদায়িত্ব লইয়া এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে পারে—ইহাদের কোন একটির অভাব যেখানে ঘটে, সেখানে নূতন সন্তানের জন্ম বাঞ্ছনীয় নহে। রাষ্ট্রের পক্ষেও অনিয়ন্ত্রিত বৃহৎ জনসংখ্যা কল্যাণকর নহে—ইহার ফলে রাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্য ব্যাহত হয়, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, বৃত্তিহীন লোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী হয়। কোন রাষ্ট্রে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইলে কেবল যে সেই রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হয় তাহা নহে, অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরও শান্তি ব্যাহত হয়, কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ঐ রাষ্ট্রের লোকেরা অনুপ্রবেশ করে এবং রাষ্ট্র তাহার বিপুল জনসংখ্যাকে সংযত করিতে না পারিয়া অনেক সময় পররাজ্যলোলুপ হইয়া উঠে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অপরিমিত সংখ্যক সন্তানের জন্ম পরিবার তথা রাষ্ট্রের

৬২ বর্তমান যুগের কোন কোন যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র (militaristic state) সন্তান প্রজননকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করে এবং বহুসন্তানের জননীকে রাষ্ট্রীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

পক্ষে সকল সময় মঙ্গলজনক নহে। সুতরাং আংশিক জন্মনিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি সার্বিক বা সর্বজনীন আদর্শ হইতে পারে না। ইহার মূল্য বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ইহা একদিকে সাধারণ মানুষের কামবৃত্তিকে পরিতৃপ্তির দাবী এবং অপরদিকে সুষ্ঠুভাবে সন্তান পালনের অক্ষমতার জন্য সন্তানে অনিচ্ছা, এই দুইটি বিপরীতমুখী মানবীয় দুর্বলতার 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করে এবং সেই হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। **আদর্শের দিক্ হইতে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ পন্থা হইল আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযম** (self-control)।[৬৩] বিবাহিত জীবনে আমরা যদি 'গৌণ ব্রহ্মচারীর' আদর্শ গ্রহণ করি (পৃঃ ১৬৫), তাহা হইলে আত্মসংযমকে উচ্চতর মান দান করিতে হয় ; কিন্তু যেহেতু সকল লোকের আত্মসংযমের ক্ষমতা নাই এবং যেহেতু এ ব্যাপারে মানুষ প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করা নিরাপদ মনে করে না, সেইহেতু প্রয়োজন হইলে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে সমর্থন করা যায়।

তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অপব্যবহার যেন না হয়। এই বিষয়ের জ্ঞানের বহুল প্রচার হইলে এমন হইতে পারে যে, কামাতুর ব্যক্তিরা সন্তান-সম্ভাবনা রোধ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এইরূপ হইলে সামাজিক তথা ব্যক্তিগত নীতির অধোগতি ঘটিবে। বিবাহিত জীবনেও আর এক প্রকারে ইহার অপব্যবহার ঘটিতে পারে ; কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রী কোনদিনই (অন্ততঃ যৌবনে সামর্থ্য থাকা কালে) সন্তানের দায়িত্ব বহন করিতে চাহিবে না, অর্থাৎ সন্তানের জন্ম অশান্তিকর মনে করিয়া উহা পরিহার করিয়া চলিবে এবং ব্যক্তিগত বিলাস বা দেহসুখের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিবে।[৬৪] দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র এ

৬৩ গান্ধিজী এই প্রকার আদর্শকে বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য' (married brahmacharya) বলেন। এ বিষয়ে 'হরিজন'-পত্রিকার এক প্রবন্ধে তিনি বলেন: "When a man has completely conquered his animality. involuntry incontinence becomes impossible and the desire for sexual gratification for its own sake ceases altogether. Sexual union then takes place only when there is a desire for offspring."

৬৪ কেহ কেহ মনে করেন যে, সন্তানহীন দম্পতির মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ অধিক সংখ্যায় ঘটিয়া থাকে। তবে এই মতবাদ সকল সময় সত্য নহে। কারণ ইহাও দেখা যায় যে, নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক অনুরক্তি খুবই প্রগাঢ় এবং তাহারা শান্তিপূর্ণ জীবনই যাপন করে। (Winch, *The Modern Family*, p. 205 দ্রষ্টব্য)।

বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। জনকল্যাণের জন্য যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের উচিত সেইভাবে সুষ্ঠু প্রচারকার্য দ্বারা জনমনকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

(ঘ) অবাঞ্ছিতদের বিবাহ (Marriage of the undesirables) :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাই যে, সকল সময় সকল বিবাহ বাঞ্ছিতজনের মধ্যে হয় নাই। কিন্তু বিবাহের পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না কোন্ বিবাহ প্রতিযোজনক্ষম উপযুক্ত নর-নারীর মধ্যে ঘটিয়াছে। তবে সাধারণভাবে দুইটি ক্ষেত্রে বলা যায় যে, দুই প্রকারের বিবাহ জনকল্যাণের দিক্ হইতে অবাঞ্ছনীয়—একটি হইল বাল্যবিবাহ, আর একটি হইল মানসিক বিকার-সম্পন্ন বা বাতুলদের বিবাহ।[৬৫]

বাল্যবিবাহ হইলেই যে সকল সময় কুফল হয়, তাহার কোন অর্থ নাই—বাল্য-বিবাহের ফলে দম্পতির মধ্যে প্রগাঢ় অনুরক্তি ঘটিয়াছে ইহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে। তবে নিম্নলিখিত কুফলের সম্ভাবনা অধিক :

(১) এরূপ বিবাহে যে দুইটি শিশুকে বা যে বালক ও বালিকাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা হয়, তাহাদের স্বার্থ অপেক্ষা তাহাদের অভিভাবক অভিভাবিকার নিজেদের স্বার্থের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারে।

(২) অল্পবয়সে অর্থাৎ যৌবনে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই সন্তানের জননী হওয়ার জন্য বালিকা-স্ত্রীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা অধিক।

(৩) কেবল যে মাতার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় তাহা নহে, অনেক সময় শিশুও দুর্বল হয়।

(৪) এরূপ পিতামাতার আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকে না এবং এই কারণ সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তাহাদের পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

(৫) পূর্বে যেখানে যৌথপরিবারের প্রথা প্রচলিত ছিল, সেখানে সন্তান পরিপালনের সুব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে হইতে পারিত। বর্তমান যুগে অধিকাংশস্থলে যৌথপরিবার প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে বা বিলুপ্ত হইতেছে এবং সেই কারণ অপরিণতবুদ্ধি, অপক্ক পিতামাতার দ্বারা সন্তানের লালনপালনের সুব্যবস্থা হয় না।

---

৬৫ এই প্রসঙ্গে Richmond & Hall, *Child Marriages*, East, *Heredity & Human Affairs* এবং Burlingame, *Heredity & Social Problems* দ্রষ্টব্য।

(৬) অল্পবয়সেই সংসারে আবদ্ধ হওয়ার ফলে বিবাহিত ব্যক্তিদের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হয়।

বাল্যবিবাহ যেমন অবাঞ্ছিত, সেইরূপ উনমানস (feebleminded) ব্যক্তিদের বিবাহ বা বাতুল (insane)-দের বিবাহও অকল্যাণকর এবং অবাঞ্ছিত। বিশেষতঃ যেখানে উনমানসতা বা বাতুলতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, সেখানে বংশগতির মাধ্যমে নূতন বংশধরগণের মধ্যে উহার বিস্তারের সম্ভাবনা অধিক। অর্থাৎ, যদি জড়ধী (idiot) নরের সহিত জড়ধী নারীর বিবাহ হয় বা বাতুলের সহিত বাতুল নারীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে সমাজে এইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা অধিক।[৬৬] বলা বাহুল্য, সমাজমধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হইল সমাজে আত্মনির্ভরশীল এবং স্বীয় বৃত্তি উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা কমিয়া যাইবে, সমাজে অর্থনৈতিক দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইবে, সাধারণভাবে বুদ্ধির অবনতি ঘটিবে, এবং অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্য অনেক চিন্তানায়ক মনে করেন যে, যদিও জড়ধী ও বাতুল মানবিকতার দিক্ হইতে আমাদের সহানুভূতি দাবী করিতে পারে, তাহা হইলেও সমাজের কল্যাণের কথা ভাবিয়া তাহাদের বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি সমর্থন করা যায় না। তবে এ বিষয়ে প্রধান অসুবিধা হইল যে, এইরূপ মানসিক অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ের কোন সুস্পষ্ট ও সার্বিক মান নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের পক্ষে এ ব্যাপারে জনমনকে শিক্ষিত করিয়া তোলা উচিত; কারণ কেবল আইন-প্রণয়ন করিয়া সুফল পাওয়া সম্ভব নহে।

১০। প্রাচীন ভারতের পারিবারিক আদর্শ (The Ideal of Family Life in ancient India) —বর্ণাশ্রম ধর্ম :

প্রাচীন ভারতীয় জীবনে অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য ছিল এবং প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনের আদর্শ ইহা দ্বারাই বিশেষভাবে

৬৬ যেখানে প্রজনন কোষ (germ cell)-এ বা উৎপাদন অণু (gene)-দোষ থাকার জন্য বংশানুক্রমিকভাবে উনমানসতা বা বাতুলতা ঘটে, সেখানেই নূতন বংশধরগণের মধ্যে উহা পরিব্যাপ্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। (এইরূপ দোষযুক্ত বিবাহকে Dysgenic Marriage বলা হয়)। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার-রচিত 'মনোবিদ্যা', পৃঃ ২১৭, ২১৮, ২২৩, ২৪৭, ২৫৮ দ্রষ্টব্য।

অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই আদর্শের আলোকেই হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের আদর্শ গঠিত হইয়াছিল।[৬৭]

বর্ণাশ্রমধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই **চারিটি পৃথক্ বর্ণ** বা জাতির স্বীকৃতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই **চারিটি আশ্রমের** প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ। তাহা ছাড়া, হিন্দুর জীবনদর্শনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভোগ ও ত্যাগ, উভয়কেই স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং এই কারণে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই **চারিটি পুরুষার্থ** স্বীকার করা হইয়াছে।

গুণ ও কর্মের পার্থক্য অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল।[৬৮] ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলা হয়। ব্রাহ্মণের গুণ হইল মনের শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও বেদবাক্যে বিশ্বাস। ক্ষত্রিয়ের গুণ হইল শারীরিক ও মানসিক তেজ, ধৈর্য, কার্যে দক্ষতা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভীরুতাবশতঃ পলায়ন না করা, দান ও লোকনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কৃষিকার্য, পশুপালন এবং বাণিজ্য, এইগুলি হইল বৈশ্যের ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা হইল শূদ্রের ধর্ম।[৬৯] প্রতি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষ যদি তাহার নির্দিষ্ট কর্ম নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া সম্পাদন করে, তাহাতেই সে সিদ্ধিলাভ করে। **স্বধর্মসাধন অপেক্ষা উচ্চতর কর্তব্য কিছু হইতে পারে না।** ত্রুটিযুক্ত ভাবেও যদি স্বধর্ম

৬৭ প্রাচীন ভারতে কেবলমাত্র অধ্যাত্মবাদই সর্বত্র প্রচলিত ছিল এমন নহে। চার্বাক-লোকায়তদর্শন বা বার্হস্পত্য-দর্শনে আমরা জড়বাদ ও স্বভাববাদের পরিচয় পাই। চার্বাকদের মতে বর্ণাশ্রমধর্ম সিদ্ধ নহে। তবে ভারতীয় জীবনে অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য ছিল ইহা বলা যায়। আবার, বৌদ্ধধর্মে অধ্যাত্মবাদ স্বীকৃত হইলেও বর্ণাশ্রম ধর্ম সমর্থিত হয় নাই।

৬৮ "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" (গীতা, ৪।১৩)।

৬৯ তুলনীয়: "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ (গীতা, ১৮।৪২-৪৪)।

ইহার সহিত প্লেটোর শ্রেণীকরণ তুলনীয়। তিনি তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণীবিভাগের কথা বলিয়াছেন—শাসক শ্রেণী (Guardians)—ইঁহারা জ্ঞানে, গুণে, শৌর্যে শ্রেষ্ঠ; সহায়ক (Auxiliaries) এবং উৎপাদক শ্রেণী বা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী (Artisans)।

সাধিত হয়, তাহা হইলেও উহা উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত পরধর্ম বা অন্যজাতির করণীয় কার্য হইতে শ্রেয়ঃ।[৭০]

হিন্দুরা ইহাও মনে করে যে, সকলে সকল কর্মের উপযুক্ত নহে; সুতরাং যে যাহার উপযুক্ত নহে, তাহার উপর তাহার ভার ন্যস্ত করা উচিত নহে—এইজন্য হিন্দুধর্মে **অধিকারিভেদে ধর্ম-নির্দেশের ব্যবস্থা** করা হইয়াছে। সকল মানুষকে এক ছাঁচে ঢালা যায় না বলিয়া ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুসারে কর্তব্যেরও পার্থক্য ঘটে।[৭১]

হিন্দুরা আরও বিশ্বাস করে যে, **পূর্বজন্মের কর্মফল** বর্তমান জন্মের সুখদুঃখ নির্ধারণ করে—এমন-কি, কে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাও নির্ধারিত হয়। অবশ্য ইহজন্মে যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা যায়, তাহা হইলে আর পুনরায় কর্মের বন্ধনের সৃষ্টি হয় না। এইরূপ ভাবে কর্ম

৭০ স্বধর্মের সমর্থনে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
... ...
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥" (গীতা, ১৮।৪৫, ৪৭)।

[প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, গীতায় স্বধর্মের আদর্শের সহিত ব্র্যাডলে (Bradley)-বর্ণিত 'My Station and its Duties'-এর আদর্শ কতকাংশে তুলনীয়। তাঁহার ভাষায় : "What is it then that I am to realize? We have said it in 'my station and its duties'. To know what a man is you must not take him in isolation. He is one of a people, he was born in a family, he lives in a certain society, in a certain state. What he has to do depends upon what his place is, what his function is, and that all comes from his station in the organism." (*Ethical Studies*, p. 173).]

৭১ তুলনীয় : "The dharma or moral ideal is not the same for all persons. It should be as many as there are types of personality or classes of moral beings. Herein lies the rationale of the Hindu code of varnā s'rama dharma. This code takes into consideration the realities of man's life, the apparent variations of man's nature and the obvious necessity of prescribing the right thing for the right man..." (Dr. S. C. Chatterjee, *Fundamentals of Hinduism*, p. 121).

করিলে যদিও প্রারব্ধ কর্মের ফলসমূহ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে, তাহা হইলেও সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং যদিও অতীতের উপর ব্যক্তি-বিশেষের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাহা হইলেও বর্তমান তথা ভবিষ্যৎ তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন—উপযুক্ত প্রচেষ্টা দ্বারা সে ভবিষ্যৎ বন্ধনের সম্ভাবনাকে রোধ করিতে পারে। কর্মফলে বিশ্বাস যেমন একদিকে হিন্দুকে শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেককেই সহাস্য মুখে বর্তমানকে সহ্য করিতে হইবে এবং বর্তমানের দুঃখের জন্য নিজের অতীতকেই দায়ী মনে করিতে হইবে, সেইরূপ আর একদিকে উহা শিক্ষা দেয় বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে কার্য করিয়া কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য উন্নতি করা যাইতে পারে। কর্মফলে বিশ্বাস করিয়া স্বীয় জীবনের বর্তমান জন্মকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে হিন্দু শিক্ষালাভ করে।[১২]

কালক্রমে হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা বা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবনের অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানে সুবিধা করিয়াছিল, যদিও সামাজিক জীবনে ইহা সংহতি ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইলেও যখন কেবলমাত্র জন্মগত অধিকারের দাবীতে জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের বিভেদ টানা হইল, তখন অনেক সময় অসুবিধা ও অবিচারও দেখা দিতে লাগিল।[১৩] এমন-কি, কোন কোন স্থলে অস্পৃশ্যতার প্রচলনও ঘটিল। বলা বাহুল্য, এগুলি বর্ণাশ্রমধর্মের মূল আদর্শ বিরোধী, কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম মানুষকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয় না। বর্ণাশ্রমধর্ম প্রধানতঃ বর্ণ ও কর্মের

১২ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ কর্মবাদের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "There is no doctrine that is so valuable in life and conduct as the karma theory. Whatever happens to us in this life we have to submit in meek resignation, for it is the result of our past doings. Yet the future is in our power, and we can work with hope and confidence. Karma inspires hope for the future and resignation to the past. It makes men feel that things of the world, its fortunes and failures do not touch the dignity of the soul. Virtue alone is good, not rank or riches, not race or nationality. Nothing but goodness is good." (*Indian Philosophy*, Vol. I, p. 249).

১৩ কর্ণের উক্তি "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্" এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য।

[বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে ডঃ ভগবান্ দাশ বলেন যে, উহার মূল আদর্শ বুঝিয়া বর্তমান জগতের উপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিলে মানবসমাজের কল্যাণ হইবে। তাঁহার *Principles of Social Re-organisation* দ্রষ্টব্য।]

উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবনে আমরা ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি আবার ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উদাহরণ দেখিতে পাই। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা হিন্দুর জাতীয় জীবনকে যে পরিমাণে অচলায়তনে রূপান্তরিত করিয়াছে, সে পরিমাণে উহার সংস্কার অত্যাবশ্যক।

সামাজিক জীবনে যেমন চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিগত জীবনে চারিটি পৃথক্ আশ্রমের কথা বলা হইয়াছে।

(১) প্রথম আশ্রম হইল **ব্রহ্মচর্য**। বাল্য ও কৈশোর হইল এই আশ্রম যাপনের সময়। সদাচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গুরুগৃহে বাস করিয়া এবং গুরুর সেবা করিয়া গুরুর সকাশে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করাই হইল এই আশ্রমের ধর্ম। আশ্রমবাসী শিষ্য নিজের এবং গুরুর জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবে এবং আশ্রম যাপনকালে শিষ্য সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিহার করিয়া অধ্যয়ন কার্যে নিযুক্ত থাকিবে। নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, কৃচ্ছ্রসাধন, ঈশ্বরপ্রণিধান এইগুলি হইল তাহার অপর কর্তব্য। এইভাবে সে নিজেকে পরবর্তী আশ্রমের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে।

(২) **গার্হস্থ্য আশ্রম** হইল দ্বিতীয় আশ্রম। শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করাই হইল সাধারণের পক্ষে করণীয় কর্তব্য। যাহারা সাধারণের উর্ধ্বে তাহারা সংসারে প্রবেশ না করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অনুকরণীয় নহে। বিবাহ হইল ব্যক্তির পক্ষে অন্যতম সংস্কার। বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ লাভ করে এবং ইহারই মাধ্যমে পরিবারের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা যায়। বিবাহের মাধ্যমে যৌনকামনার সুসংযত পরিতৃপ্তি ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক পারস্পরিক অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল দৈহিক ভোগ বা অধিকারের সম্পর্ক নহে—স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েই পারস্পরিক সহযোগিতায় উচ্চতর আদর্শ অনুসরণ করিবে, ইহাই হিন্দুধর্মে আশা করা হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে স্বামী স্বাধিকার-প্রমত্ত প্রভু নহে, আবার স্ত্রীও কেবল ভোগযোগ্যা দাসী নহে—হিন্দুর আদর্শে স্ত্রী হইল সহধর্মিণী, অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর সহিত একত্রে ধর্ম আচরণ করিবে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামী ও স্ত্রী কোন সাংসারিক ধর্ম সাধন করিতে পারিবে না। হিন্দুরমণী বিবাহিত জীবনে স্বামীর এই ঐকান্তিক সহযোগিতায় বিশ্বাস করে বলিয়াই তাহার স্বামী তাহার নিকট 'বরপুরুষ', তাহার

শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাহার বরেণ্য পুরুষ।[৭৪] বিবাহিত জীবনে স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন দেহ ধারণ করিলেও তাহাদের দুইটি হৃদয় মিলিয়া যেন একটি হৃদয়ে রূপান্তরিত হয়।[৭৫] হিন্দুর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি কল্পনায় স্ত্রী-পুরুষের অভেদ-তত্ত্বই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

বিবাহপদ্ধতি হিসাবে ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিরূপে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে কন্যার পিতা একটি সদাচার, কৃতবিদ্য পাত্রকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে বিধিপূর্বক অর্চনা করিয়া সালঙ্কারা কন্যা দান করিবে।[৭৬] বিবাহিত জীবনের আদর্শ হিসাবে একগামিতাকেই উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে; তবে প্রয়োজন হইলে পুরুষের পক্ষে বহুগামিতাকে অনুমোদন করা হইয়া থাকে। ক্রমশঃ হিন্দুসমাজে একগামিতা ও বহুগামিতা উভয় আদর্শই চলিতে

৭৪ তাই হিন্দুনারী তাহার প্রিয়তম বরকে আহ্বানকালে নিঃশঙ্কচিত্তে অন্তরাত্মা সমর্পণ করিয়া বলে :

"ওঁ বরেণ্যাত্ত্বং, বৃণে ত্বাহন্ত্ব
বৃণে চিত্তং, বৃণে মনঃ।
বৃণে সৌমনসং হার্দিং
আত্মানং হ্যাত্মনা বৃণে ॥"

৭৫ সেইজন্য বিবাহের সময় চিত্ত-বিনিময়ের মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় :

"ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব ॥"

আবার অভেদ মিলনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হয় :

"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্
সন্দধাম্যস্থিভিরস্থিনী
মাংসৈর্মাংসানি
ত্বচা ত্বচম্ ॥"

৭৬ প্রাচীন হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। উপরে বর্ণিত ব্রাহ্ম বিবাহ ব্যতীত আরও সাতটি বিবাহ প্রথা হইল: দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। (মনুস্মৃতি, ৩য় অধ্যায়)।

থাকে।[৭৭] তবে নারীকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই—এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পরও নারীর পুনর্বিবাহ সমাজ কর্তৃক সাধারণতঃ অনুমোদিত হয় না।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য এক জাতির কোন ব্যক্তি অপর জাতির কাহারও সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পায় না। স্বজাতির মধ্যে ভিন্নগোত্রীয়দের ভিতর বিবাহকেই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া জ্ঞান করা হয়। প্রাচীন কালে ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে বিবাহের মধ্যে অনুলোম বিবাহকে সহ্য করা হইলেও প্রতিলোম বিবাহকে সমাজ মোটেই সমর্থন করিত না। কালক্রমে জাতিভেদ দৃঢ়তর হওয়ার ফলে ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়।

জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাসী হিন্দু বিবাহবন্ধনকে কেবলমাত্র এই জন্মের আকস্মিক মিলন বলিয়া মনে করে না, উহা হইল জন্মজন্মান্তরের মিলন। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব নহে।[৭৮]

পারিবারিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে সন্তানের—বিশেষতঃ পুত্রসন্তানের—জন্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।[৭৯] বিবাহের

৭৭ হিন্দুর দৃষ্টিতে একগামিতা ও বহুগামিতার আপেক্ষিক মূল্য ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন: "The perfectly ethical marriage is the monogamous one. The relation of Rāma and Sitā, or Sāvitri and Satyavāna, when the two stand by each other against the whole world, is idealised in the Hindu Scriptures. In the absence of absolute perfection we have to be content with approximations.......While the monogamous ideal is held up as the best, polygamy was also tolerated....The story of the Rāmāyana has for one of its chief lessons the evils of polygamy. The palace of Dasaratha was a centre of intrigue, and Rāma, the hero of the story, stands up for the monogamous ideal." (*The Hindu View of Life*, pp. 85, 86).

৭৮ যদিও হিন্দুশাস্ত্র বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থন করে না, তাহা হইলেও পরাশর স্মৃতিতে পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর পক্ষে পূর্ব বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য পতি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

৭৯ 'পুত্র'-পদের বুৎপত্তিতে বলা হইয়াছে "পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ"—অর্থাৎ যে 'পুৎ'-নামক নরক হইতে ত্রাণ করে সেই পুত্র। সেইজন্য ভার্যাগ্রহণের অন্যতম প্রয়োজন হিসাবে বলা হইয়াছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।" শ্রাদ্ধাদি কার্যের পর শ্রাদ্ধকর্তা বীরকে সন্তানরূপে কামনা করিয়া পূর্বপুরুষগণের নিকট বলে, "বীরং মে দত্ত পিতরঃ।"

অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সন্তানের জন্মদান—সন্তান না জন্মগ্রহণ করিলে পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে কে জলদান করিবে, শ্রাদ্ধাদি কার্য কে সম্পন্ন করিবে? প্রতি পরিবারেই পূর্বপুরুষগণের পূজা ও স্মরণের ভার অর্পিত হয় অধস্তন পুরুষের উপর; সুতরাং সন্তানসূত্র কর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। নিঃসন্তান দম্পতির পক্ষে দত্তক-গ্রহণ প্রয়োজন। অতএব, সনাতন হিন্দুধর্মে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। যেখানে কোন কারণে নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ অবশ্য প্রয়োজনীয় হইবে, হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সেখানে আত্মসংযমেরই উপদেশ দান করিবেন।

গার্হস্থ্য আশ্রমকারীর পক্ষে **পাঁচটি যজ্ঞ** কর্তব্য—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ; অর্থাৎ গৃহী নিত্য দেবতার আরাধনা করিবে, পিতৃপুরুষগণেব তর্পণ করিবে, বেদ-উপনিষদ্ ইত্যাদি পাঠ করিবে, সমাজের অন্য মানুষেব সেবাযত্ন করিবে এবং মনুষ্যেতর জীবেরও প্রয়োজনমত পরিচর্যা করিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ অনুযায়ী গৃহীর জীবন ভোগবিলাসের বা উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন নহে, উহা পরিমিত সুখভোগের এবং কর্তব্যানুষ্ঠানের জীবন। সাম্প্রতিক কালে হিন্দুসমাজে যে এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নহে। যুগের পরিবর্তনে সমাজে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে এবং কতকগুলি পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

(৩) তৃতীয় আশ্রম হইল **বানপ্রস্থ**। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১৮৪) বলিয়াছি, সনাতন হিন্দু ধর্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করা হয়। প্রবৃত্তির সমাপ্তি ঘটে গার্হস্থ্য আশ্রমের মাধ্যমে। গার্হস্থ্য জীবনের পর আসে বানপ্রস্থ আশ্রম। ভোগের পর আসে ত্যাগের বাসনা বা বিরাগ। সুতরাং বানপ্রস্থ আশ্রমে ব্যক্তিবিশেষ সংসারের ভার পুত্রাদির উপর অর্পণ করিয়া দৈনন্দিন জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিবে এবং পূজার্চনায় দিনযাপন করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই অবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়া বনগমন করা উচিত এবং স্বামীর সহিত তাহার সহধর্মিণী হিসাবে স্ত্রীও সহগমন করিবে। এই অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ পূর্ববর্ণিত পঞ্চযজ্ঞ ত' পালন করিবেই; তাহার উপর সে কৃচ্ছ্রসাধন, অপরিগ্রহ, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সদ্গুণের উৎকর্ষতার প্রচেষ্টা করিবে।

(৪) চতুর্থ আশ্রম হইল **সন্ন্যাস**। মানুষ সামাজিক জীব হইলেও সমাজের মধ্যেই তাহার সকল কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। তাহার সমাজাতিরিক্ত একটি নিজস্ব সত্তা

আছে—ইহা হইল তাহার আত্মা (পৃঃ ১০৩)। এই আত্মার মুক্তির জন্য সকল প্রকার বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিষয়বিনিবৃত্তি ঘটে এবং মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিলে মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হয়।

সমাজ তথা ব্যক্তির যুগপৎ কল্যাণ-সাধনের এক অপূর্ব প্রচেষ্টা ঘটিয়াছে হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মে। কালক্রমে ইহার সহিত অনেক দোষত্রুটিযুক্ত হইলেও এবং ইহার বিধিনিষেধের অনেক অপব্যাখ্যা ঘটিলেও, ইহার মূল আদর্শ যে ব্যক্তি-বিশেষকে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ের সুযোগ দান করিয়া তাহার আত্মিক উন্নতির সহায্য করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করিয়া ইহার দোষত্রুটি দূর করিয়া ইহাকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া তোলাই হইল হিন্দুসমাজ সংস্কারকের কর্তব্য।[৮০]

১১। প্রতিবেশ (Neighbourhood):

আমরা পূর্বে (পৃঃ ১৫০-৫১) বলিয়াছি যে, কোন পারিবারিক গোষ্ঠী সমাজের অন্য গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মবৃত গোষ্ঠীরূপে থাকিতে পারে না। যে কোন পারিবারিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতি ব্যক্তিকেই গোষ্ঠীর গণ্ডীর বাহিরে প্রতিবেশীর সংস্পর্শে আসিতে হয়—এইরূপ সংস্পর্শের ফলে সে প্রতিবেশীকে প্রভাবিত করে আবার প্রতিবেশী দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রতিবেশ বলিতে যদিও স্থানগত নৈকট্য (spatial contiguity) বুঝায়, তাহা হইলেও ইহা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা নহে। পরিবারের ক্ষুদ্র পরিধি হইতে বাহিরে আসিয়া প্রথমেই প্রতিবেশীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্প্রদায়গত জীবনে প্রতিবেশীর সহিত ব্যক্তি-বিশেষের সংযোগের যে নিবিড়তা থাকে, বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সহিত বা বৃহত্তর মানবসমাজের সহিত সংযোগের

---

৮০ রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়: "We feel that our society is in a condition of unstable equilibrium. There is much wood that is dead and diseased and that has to be cleared away. Leaders of Hindu thought and practice are convinced that the times require, not a surrender of the basic principles of Hinduism, but a restatement of them with special reference to the needs of a more complex and mobile social order." (*The Hindu View of Life*, p. 130).

সেই নিবিড়তা থাকে না। সুতরাং প্রতিবেশীর সহিত পরিচয় ঘটে সামাজিক তথা সাম্প্রদায়িক জীবনের সমতা, সাদৃশ্য ও নৈকট্যের মাধ্যমে। এই কারণে প্রতিবেশী যত নিবিড়ভাবে ব্যক্তি-বিশেষকে জানে এবং ব্যক্তি-বিশেষও প্রতিবেশীর যে পরিচয় জানে, বৃহত্তর সমাজজীবনের বোধ হয় আর কেহ সেইভাবে জানে না। পারিবারিক সীমার অব্যবহিত পরেই প্রতিবেশীর সহিতই ব্যক্তি-বিশেষের সাহচর্য ও সহযোগিতার সুযোগ সর্বাপেক্ষা অধিক (অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সকল সময় ইহা না ঘটিতে পারে)। এইজন্য প্রতিবেশীর সহিত ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্ক ও আচরণের মান বা আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, প্রতিবেশীর সহিত ব্যক্তি-বিশেষের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহারই মাধ্যমে পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ব্যক্তি ক্রমশঃ বৃহত্তর জগতে আত্মবিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

প্রতিবেশীর সহিত আচরণের আদর্শ বা মান সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে এই আচরণ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ব্যক্তি-বিশেষ ও প্রতিবেশীর সমবেত প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক জীবন অধিকতর সংহতিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ঐক্যপূর্ণ হয়। এইজন্য নিজের পক্ষে যাহা প্রতিকূল, দুঃখদায়ক বা ক্ষতিকর, অপরের প্রতি সেইরূপ আচরণ না করাই হইল বাঞ্ছনীয়।[৮১] এই আদর্শ-সাধনের জন্য একদিকে প্রয়োজন স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা এবং অপরদিকে প্রয়োজন যতদূর সম্ভব অপরের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিয়া তাহাকে বিচার করা।

প্রতিবেশীদের লইয়া সাম্প্রদায়িক জীবনে যে সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, সেইগুলি অনেকাংশে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। সুতরাং এইরূপ প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সংহতি ও শৃঙ্খলা গঠনের প্রথম সোপান। প্রতিবেশীর সহিত যে সুষ্ঠু প্রতিযোজন করিতে সক্ষম হয়, বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও সে অনেকাংশে সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারিবে—ইহা আশা করা যায়। এই হিসাবে বলা যায় যে, পারিবারিক সংস্থা যেমন ব্যক্তির পক্ষে সামাজিকীকরণের কেন্দ্র, প্রতিবেশও সেইরূপ আর একটি কিন্তু ব্যাপকতর কেন্দ্র।

---

৮১ তুলনীয়—"আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ" (দেবলস্মৃতি)।

সপ্তম অধ্যায়

সম্পত্তি

মানুষ যদি সম্পূর্ণ একাকী থাকিতে পারিত, যদি সে কোন পারিবারিক গোষ্ঠী মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত' তাহার মনে সঞ্চয়, সংগ্রহ, আহরণ ও অধিকারের ইচ্ছা জাগরিত হইত না। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বাস করিতে চায় বলিয়া তাহার মনে সহযোগিতা ও বিরোধিতা এই দুই বিপরীত ইচ্ছা জাগরিত হয়, এইজন্য সে কতকগুলি বস্তু নিজে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে চায় এবং সেগুলি অপরকে ভোগ করিতে না দিয়া সে নিজে অথবা তাহার পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সহিত ভোগ করিতে চায়। সংগ্রহের ও অধিকারিত্বের এই যুক্ত বৃত্তি হইতে সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছে। ইহাই হইল প্রধান অর্থনৈতিক সংস্থা (economic institution)। মানুষের ইতিহাসে সম্পত্তির অধিকারিত্ব নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।[১] বর্তমান অধ্যায়ে সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

১। সম্পত্তি ও অধিকারিত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Property & Ownership):

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল 'বিত্ত' বা 'সম্পদ' (wealth)। ব্যাপক অর্থে 'সম্পদ' বলিতে কেবল 'মুদ্রা' বুঝায় না—যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, তাহাকেই 'সম্পদ' বলা যায়। তবে অর্থনীতিশাস্ত্রে সম্পদ বলিতে সেই সকল দ্রব্য বুঝায় যেগুলি প্রকৃতিদত্ত বস্তু, যেমন, জল, বাতাস ইত্যাদির ন্যায় স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায় না এবং যেগুলির অধিকারিত্ব পরিবর্তন করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সম্পদ

১ **তুলনীয়:** "Amongst mankind it has been the great factor in history; before it religion has bent submissive, around it societies have been organised; by it the greater part of codes has been dictated; by it empires have been built up and destroyed." (C. Letonrneau, ***Property: Its Origin & Development,*** p. 2).

ভোগ করিতে হইলে অন্যের বিরুদ্ধে নিজের অধিকারিত্ব স্থাপন করিয়া উহা রক্ষা করিতে হইবে। 'সম্পত্তি' পদের ভিতর অধিকারিত্ব, স্বামিত্ব বা মালিকানার দিক্‌টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ব্যবহারশাস্ত্র (science of law)-এ অধিকারিত্বের দাবীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[২]

সুতরাং দেখা দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তির দুইটি দিক্ আছে—

(ক) **মনোবিদ্যার দিক্ হইতে বলা যায় যে, সম্পত্তি সংগ্রহ ও রক্ষার ইচ্ছা হইল সংগ্রহশীলতারূপ সহজাত বৃত্তির প্রকাশ;** (খ) **সমাজ তথা রাষ্ট্রের দিক্ হইতে ইহা হইল সমাজের অন্য সকল হইতে পৃথক্‌ভাবে সংগ্রাহককে সংগৃহীত বস্তু নানাভাবে ভোগ করিবার (যেমন, নিজে ভোগ করা, বিক্রয় করা, দান করা ইত্যাদির) অধিকার দান।**[৩] অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ সম্পদ ভোগ করিবে কি না, উহা রক্ষা করিবে কি না, তাহা নির্ভর করে তাহার মানসিক ইচ্ছার উপর এবং এক্ষেত্রে সমাজ যদি তাহার অধিকারিত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে সে যাহাতে নির্বিবাদে বা শান্তিপূর্ণভাবে উহা ভোগ করিতে পারে সেদিকে সমাজ চেষ্টা করিবে।

বহু যুগ ধরিয়া মানব সমাজ এইরূপভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের আহৃত বা সংগৃহীত সম্পত্তিকে ভোগ করিবার অধিকার দান করিয়া আসিতেছে ; এইজন্য 'সম্পত্তির অধিকারিত্ব' সংস্থা (institution)-এর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা যে আলোচনা করিব তাহা প্রধানতঃ সম্পত্তির অধিকারিত্বকে কেন্দ্র করিয়া চলিবে ; অর্থাৎ আমাদের বিবেচ্য বিষয় হইবে যে, সম্পত্তি যে সংগ্রহ করে বা উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনভাবে লাভ করে, সম্পত্তিতে তাহার এই **অধিকারের নৈতিক যৌক্তিকতা** কতদূর

---

২ হল্যাণ্ড (Holland)-এর ভাষায় : "(The essence of this legal right) lies not so much in the enjoyment of the thing as in the legal power of excluding others from interfering with such enjoyment." (*Jurisprudence*, p. 61)

৩ মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন করিয়া আর্বান্ (Urban) সম্পত্তি property)-পদের সংজ্ঞা দিয়াছেন : "It is the instinct of acquisition, functioning in a social individual, in a social medium, with social consent." (*Fundamentals of Ethics*, p. 265).

আছে—ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের এবং সমষ্টিগতভাবে সমাজের কল্যাণ কতদূর সাধিত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের বিচার করিতে হইবে অধিকারের বা স্বামিত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কতদূর স্বীকার করা যায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কতদূর সমর্থনযোগ্য। অধিকারিত্ব লইয়া অনেক সময়ই বিরোধ দেখা দেয় বলিয়াই অধিকারিত্বের যৌক্তিকতা লইয়া বিচারের প্রয়োজন হয়। (১) সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া যে সাধারণতঃ পরিচিত, (২) যে অধিকারীর অধিকারিত্ব লইয়া প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করে, (৩) অধিকারের বিষয়বস্তু এবং (৪) সমাজ—এই চারিটিকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণতঃ বিরোধ দেখা দেয়[৪]; সুতরাং বিরোধের নিষ্পত্তির সময় ইহাদের দাবীর পারস্পরিক মূল্য বিচার করিতে হইবে।

২। সম্পত্তিরূপ সংস্থার বিবর্তন (Evolution of the Institution of Property):

কবে, কোথায় ও কিভাবে সম্পত্তির উদ্ভব ঘটিয়াছিল এবং আদিম যুগে মানুষের প্রাথমিক সম্পত্তি কিরূপ ছিল, তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আদিম যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) বলিয়া কিছু ছিল না—আদিম যুগ ছিল একপ্রকার সাম্যবাদের যুগ। আদিম যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। এ যুগে সম্পত্তি বলিয়া যাহা স্বীকৃত হইত, তাহা হইল সমগ্র গোষ্ঠীর বা দলের সম্পত্তি। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যাহা সংগ্রহ করিত, তাহা গোষ্ঠীর সম্পত্তিরূপেই বিবেচিত হইত।

তবে অধিকাংশ লেখক মনে করেন যে, আদিম যুগে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া একেবারেই কিছু ছিল না তাহা মনে হয় না। আদিম যুগে হয়ত' ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি (private, landed property) না থাকিতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্যক্তিবিশেষের গাত্রাবরণ, গাত্রালঙ্কার, শিকারের দ্রব্য ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইত। এই কারণে মনে হয় যে অধিকারিত্বের ধারণা হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই। স্বীয় গাত্রাবরণ ইত্যাদিতে যে

৪ অতএব, বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমাজের দাবী স্বীকৃত হওয়ার জন্য সম্পত্তিজনিত বিরোধ ত্রিদলীয় (triangular) না হইয়া চতুর্দলীয় (quadrangular) হইয়া দাঁড়ায়।

অধিকারিত্ব স্বীকৃত হইল, তাহাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভূমি ও স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

প্রাচীন কালে সাধারণতঃ কৃষিই ছিল প্রধান উপজীব্য। এইজন্য কৃষির বিস্তারের ফলে ক্রমশঃ ভূমির উপর মানুষের আকর্ষণ বাড়িতে লাগিল। কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে মানুষ ক্রমশঃ তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করিতে লাগিল এবং তাহার শ্রমের দ্বারা যাহা সে উৎপাদন করিতে লাগিল, তাহারই একাংশ সে সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহা সে উৎপাদন করিল এবং উৎপাদনের উদ্বৃত্তভাবে যাহা সঞ্চয় করিতে লাগিল তাহা সে যে-ভাবে ইচ্ছা ভোগ করিতে পাবে এই ধারণা তাহার জন্মিল এবং সমাজও তাহাকে এই স্বীকৃতি দান করিল। সে তাহার সঞ্চিত শস্যাদির পরিবর্তে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য অপরের নিকট হইতে ক্রয় করিতে লাগিল। তাহার পর যখন মুদ্রা (money)-র প্রচলন হইল, তখন হইতেই তাহার শ্রমলব্ধ বা স্বোপার্জিত বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য দান করার সুবিধা হইল এবং মূলধন বা পুঁজি (capital) গঠিত হইল। সুতরাং সম্পত্তি ও অধিকারের বিষয়বস্তু নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতে লাগিল। অধিকারিত্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় কেবল যে, ভূমি, শস্য, গবাদি পশু, মুদ্রা ইত্যাদি উহার অন্তর্ভুক্ত হইল তাহা নহে—মানুষও উহার অন্তর্ভুক্ত হইল। পারিবারিক জীবনে পিতৃশাসন যত প্রসার লাভ করিতে লাগিল, তত নারীর দেহের উপর তাহার স্বামীর অধিকার স্বীকৃত হইল এবং অনেক স্থলে নারী অন্যতম সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইতে লাগিল। এই প্রকার যৌনসম্পত্তি (sexual property) রক্ষা ও অধিকারের ক্ষেত্রে কামের সহিত সন্দিগ্ধভাব বা ঈর্ষ্যা (jealousy) প্রধান প্রেষণা (motivating force) রূপে কার্য করিতে লাগিল।[৫] তাহা ছাড়া, মুদ্রা বা অন্য কিছুর বিনিময়ে মানুষকে দাসরূপে ক্রয় করিবার প্রথাও প্রচলিত হইল এবং ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীও সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইতে লাগিল।

বিভিন্ন যুগের সম্পত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সম্পত্তির অর্থ বা ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়াছে—প্রথম উহা ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব 'অংশ' বা একান্ত ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত

---

৫ K Davis, *Human Society*, Ch. VII দ্রষ্টব্য।

হইত ; তাহার পর পারিবারিক জীবন সুগঠিত হইলে পরিবারের সকলের সহিত যৌথভাবে সম্পত্তি অধিকার এবং রক্ষা করার ব্যবস্থা প্রচলিত হইল ; তাহারও পরে আবার ভূ-সম্পত্তি, গবাদি পশু, ক্রীতদাস ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ও মালিকানা স্বীকৃত হইল। আবার, ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুর পর তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহার নিকট আত্মীয় পাইবে, এই ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল।

তাহা ছাড়া, কোন্ কোন্ বস্তু সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে, সে বিষয়েও বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ধারণার প্রচলন হইয়াছে। শিক্ষার ফলে ব্যক্তিগত রুচিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আদিম যুগে হয়ত' পশুশিকারের উপযুক্ত বল্লম মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত ; অপরপক্ষে, আধুনিক যুগের একজন সুসভ্য কলাশিল্পানুরাগী ব্যক্তির নিকট একটি বাদ্যযন্ত্র বা একটি সুন্দর তৈলচিত্র মূল্যবান্ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। আবার অধিকারিত্বের সীমার ধারণাও পরিবর্তিত হইয়াছে—প্রাচীনকালে যেখানে 'অধিকার' বলিতে নিরঙ্কুশ, একচ্ছত্র অধিকার বুঝাইত, বর্তমানের সভ্যসমাজে সেখানে 'অধিকার' বলিতে নিয়ন্ত্রিত, সুসংযত অধিকার বুঝায়।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে একজন মানুষ আর একজনকে সম্পত্তিরূপে গণ্য করিতে পারে না—সম্পত্তিরূপ সংস্থার বিবর্তনের ফলে এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন যুগে যখন সম্পত্তির উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তখন প্রয়োজনের জন্যই সম্পত্তি অর্জিত ও রক্ষিত হইত, কিন্তু ক্রমশঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহিত ক্ষমতা বা শক্তি (power)-এর ধারণা সংশ্লিষ্ট হইল। যে যত বেশী সম্পত্তির অধিকারী হইতে লাগিল, অন্যের উপর তাহার প্রভাব তত বেশী বাড়িতে লাগিল। এইভাবে সম্পত্তির সহিত শক্তির ধারণা আসিয়া পড়িল। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, সম্পত্তিরূপ সংস্থা আদিতে ছিল প্রয়োজনসম্ভূত (property for *use*) এবং কালক্রমে উহা হইয়া পড়িল শক্তির পরিচায়ক (propety for *power*)—অর্থাৎ প্রয়োজন-কেন্দ্রিকতা হইতে শক্তি-কেন্দ্রিকতা হইল সম্পত্তিরূপ সংস্থার বিবর্তনের অন্যতম গতিপথ। এই বিবর্তন সমাজের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর তাহা দর্শনের পক্ষে বিশেষভাবে আলোচ্য। সম্পত্তির অধিকারিত্বের যে তাৎপর্য, তাহার এইরূপ পরিবর্তন ঘটার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রে বহু নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

সম্পত্তির অধিকার বলিতে আদিমযুগে প্রধানতঃ বুঝাইত প্রকৃতির সহিত 'সংগ্রাম' করিয়া বা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কতকগুলি ব্যক্তিগত সুখসুবিধা সংগ্রহ অথবা কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটান ; আজ সেখানে অনেকক্ষেত্রে বুঝায় অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার। সুতরাং সম্পত্তির সৃষ্টি হওয়ায় সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।[৬]

৩। সম্পত্তির প্রকারভেদ (Types of Property):

সম্পত্তির আদিম উৎপত্তি ও বিবর্তনের ধারা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না বলিয়া সর্বকালে ও সর্বদেশে প্রযোজ্য হইতে পারে এমন কোন শ্রেণীকরণ সম্ভব নহে। তবে যে কোন শ্রেণীকরণ করিতে হইলেই তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—সম্পত্তির স্বত্ব কাহার উপর ন্যস্ত? কি কি তাহার অধিকার? এবং কিসের উপর তাহার স্বত্ব বা স্বামিত্ব?

'সম্পত্তির স্বত্ব কাহার উপর ন্যস্ত?'—এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যদি সম্পত্তির শ্রেণীকরণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, সম্পত্তি তিন প্রকারের—সাধারণ (common), যৌথ (collective) এবং ব্যক্তিগত (private)।

সাধারণ সম্পত্তি বলিতে এমন সম্পত্তি বুঝায় যাহাতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর সকলেরই মোটামুটি সমান অধিকার থাকে। আদিমযুগে ব্যক্তি-বিশেষের বেশভূষা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল সম্পত্তি (যেমন, ভূসম্পত্তি ইত্যাদি) স্বীকৃত হইত তাহাতে গোষ্ঠীর সকলেরই সমান অধিকার থাকিত। কয়েকটি আদিম অধিবাসীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হইলেও, উহাতে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলেরই ভোগের অধিকার অল্পবিস্তর থাকিত।[৭]

---

৬ এই সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দার্শনিক মণ্টেগু (Montague) বলিয়াছেন: "Property...confers upon its owners not only a primary power over nature but a secondary power over other men....Thus to the natural inequalities to be expected from the unequal abilities of men, there are added artificial inequalities due to the power of creditors and landlords to live upon the labour of their debtors and tenants" (Ogburn ও Goldenweiser-সম্পাদিত *The Social Sciences & their Interrelations* গ্রন্থে মণ্টেগুর প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৭২)।

৭ তুলনীয়: "Among primitive peoples, private property is recognised in such things as clothing, implements, and in huts.... Generally land is common to the group or tribe or both, that is to say, the members occupy or wander over a definite area, which they will defend as against outsiders." (Ginsberg, *Sociology*, pp. 183, 184).

যৌথ সম্পত্তি বলিতে এমন সম্পত্তি বুঝায় যেখানে কতকগুলি ব্যক্তি সমবেতভাবে সম্পত্তি সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে। এস্থলে সাধারণতঃ সম্পত্তির স্বত্ব যৌথভাবে একটি সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত থাকে এবং ঐ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উহাতে আংশিক অধিকার থাকে। আদিমযুগে কতকগুলি জাতির ভিতর যৌথভাবে ভূমিসম্পত্তি অধিকারের এবং কৃষিকার্য করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোন একটি বিশেষ গ্রামের অধিবাসীরা বা কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সকলে মিলিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইত। তবে আদিমযুগের বা প্রাচীনকালে যৌথ পরিবারের কোন সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল না। কোথাও সমগ্রজাতি আবার কোথাও জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উপর সম্পত্তির অধিকারিত্ব ন্যস্ত থাকিত। আবার ব্যক্তি-বিশেষের অধিকার সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোন কোন আদিম জাতির (যেমন, সিংহলের ভেদ্দাদের) মধ্যে এই ব্যবস্থা আছে যে, কোন ব্যক্তিই যৌথসম্পত্তিতে তাহার যে অধিকার তাহা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্য ব্যক্তিদের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিত না।[৮] বর্তমান যুগে যৌথ-অধিকার প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ঘটিয়াছে। যেমন, বিরাট শিল্পসংস্থার মালিকানা উহার অংশীদারদের হস্তে ন্যস্ত থাকে; সেইরূপ অনেকস্থলে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালিত হয়।

যখন কোন সম্পত্তির স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তাহার অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে উহাকে সে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে, তখন উহাকে **ব্যক্তিগত সম্পত্তি** বলে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে কোন সার্বভৌম বা নিরঙ্কুশ অধিকার বুঝায় না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই শ্রেণীকরণ আপেক্ষিক। কারণ যাহা ব্যক্তিগত বা যৌথ সম্পত্তি, তাহা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কয়েকটি ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপে হস্তগত নহে—কোন-না-কোন ভাবে তাহাদের অধিকারকে সঙ্কুচিত করা হয়। ঐরূপ সম্পত্তির অধিকারীরা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে বা সমাজের অকল্যাণ হইতে পারে এইভাবে তাহাদের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারে না।

৮ আদিমযুগে সম্পত্তির বৈচিত্র্য আলোচনার জন্য Lowie, *Primitive Society*, Ch XI দ্রষ্টব্য।

৪। সম্পত্তির অধিকারিত্বের তাৎপর্য (Significance of the Ownership of Property) :

সম্পত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাকালে আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১৯৪) বলিয়াছি যে, 'সম্পত্তি' প্রত্যয়ের সহিত অধিকারিত্বের ধারণা সংশ্লিষ্ট আছে, সুতরাং সম্পত্তির স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সম্পত্তির অধিকারিত্বের স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পত্তি বলিতে সকল সময়ই যে বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য বুঝায় তাহা নহে। সম্পত্তি মাত্রই উহার অধিকারিত্বকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি দাবী ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে। সম্পত্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে এইগুলি অনুধাবন করা উচিত।

সম্পত্তির অধিকারী দাবী করে যে, সমাজের অপর সকলে তাহার এই 'অধিকারিত্ব' বা 'স্বত্ব' স্বীকার করিবে, অর্থাৎ তাহাকে শান্তিপূর্ণভাবে তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে দিবে। সে মনে করে যে, ইহাই হইল তাহার ন্যায্য দাবী। শান্তিপূর্ণভাবে সম্পত্তিভোগ করার সহিত নিম্নলিখিত অধিকার সংযুক্ত থাকে—

(ক) হস্তান্তরিত করিবার অধিকার— যে সম্পত্তির অধিকারী বা মালিক, সে ইচ্ছামত তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে, যেমন, সে তাহার সম্পত্তি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে, দান করিতে পারে ইত্যাদি।

(খ) স্বেচ্ছায় অন্যকে ভোগের অধিকার দান— সম্পত্তির অধিকারী যে সকল ক্ষেত্রেই নিজে সম্পত্তি ভোগ করিবে তাহা নাও হইতে পারে। সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা কিছু না পাইয়াও অপরকে তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে দিতে পারে। সুতরাং সম্পত্তির অধিকারিত্ব ও সম্পত্তির ভোগ সকল ক্ষেত্রে সমব্যাপক না হইতে পারে।

(গ) সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির সৃষ্টি— সম্পত্তির মূল্য ও ব্যাপকতা যত বৃদ্ধি পায়, উহার অধিকারীও সেই অনুপাতে সামাজিক 'শক্তি', অর্থাৎ প্রভাব-প্রতিপত্তি আয়ত্ত করে, কারণ সে সেই অনুপাতে সমাজের অন্য ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। তবে অন্যকে সে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করিবে, তাহা কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্যের উপর নির্ভর করে না, ঐ বস্তুর প্রতি অন্য ব্যক্তিরা প্রয়োজনের তীব্রতা যত বেশী করিয়া বোধ করিবে, ততই তাহারা উহার অধিকারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সম্পত্তির স্বত্ব যাহার উপর ন্যস্ত, সে যেমন কতকগুলি অধিকার (rights) দাবী করে, সেইরূপ তাহার উপর কতকগুলি কর্তব্যও (duties) ন্যস্ত হয়। সে তাহার সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারে না যাহাতে উহা জনস্বার্থবিরোধী হয়। যেমন, সভ্যসমাজে কেহ তাহার অধিকৃত গৃহে দুর্নীতিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারে না, অথবা তাহার সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারে না যাহাতে অন্যের ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কেহ তাহার জমির উপর এমনভাবে গৃহনির্মাণ করিতে পারে না যাহাতে তাহার প্রতিবেশীর আলোবাতাস ভোগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, গাড়ীর মালিক পথচারীকে আহত করিয়া বা অন্যের সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি করিয়া গাড়ী চালাইতে পারে না। এই কর্তব্য যে সকল ক্ষেত্রেই নঞর্থক (negative) হইবে তাহা নহে; অনেক সদর্থক (positive) কর্তব্যও সম্পত্তির অধিকারীর উপর আরোপিত হয়—যেমন, যেখানে কোন জমির বা বাড়ীর মালিক অপরকে উহা ভোগ করিবার অধিকার দিয়াছে, সেখানে সে উহাকে সাধারণভাবে ভোগের উপযুক্ত রাখিতে বাধ্য। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিকারীর কর্তব্য হইল ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল রাখা।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানযুগে সভ্যসমাজে **সম্পত্তি বলিতে কেবলমাত্র কতকগুলি অধিকারই বুঝায় না; উহার সহিত বহুবিধ দায়িত্বও সংযুক্ত থাকে।**

৫। অধিকারিত্বের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Psychological analysis of ownership):

মানুষ কেন সম্পত্তি অধিকার করিতে চাহে? সম্পত্তির অধিকারের বাসনা তাহার ভিতর এত তীব্র কেন? সম্পত্তির ক্ষতি হইলে বা সম্পত্তি নষ্ট হইলে তাহার মনে এত কষ্ট হয় কেন? সম্পত্তির অধিকারের জন্য মানুষে মানুষে এত বিরোধ কেন?—এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে মানুষের অধিকারিত্বের বাসনার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ফ্রয়েড্ (Freud) বলেন যে, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন কাম (libido)-এর প্রাধান্য, অধিকারিত্বের ক্ষেত্রেও তাহাই। মানব-জীবনে কামের বহুবিধ প্রকাশের মধ্যে একটি হইল প্রেম ও আক্রমণাত্মক মনোভাব

(love and aggression) এই দুই-এর বৈপরীত্যের মাধ্যমে উহার আত্মপ্রকাশ (পৃঃ ৮২)। সম্পত্তির যে অধিকারী, সে উহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়ে— ইহাতে তাহার প্রেম বা অনুরাগের তৃপ্তি হয় ; আবার সম্পত্তি অধিকার করার ফলে মানুষ সামাজিক ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি লাভ করে—ইহাতে তাহার অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক বৃত্তি বিকল্পভাবে হইলেও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। এইজন্য মানুষের মনে কোন-না-কোনভাবে কিছু অধিকার করিবার বাসনা দেখা দেয়। সম্পত্তিরূপ সংস্কার বিবর্তনের পর যে মানবের মনে অধিকারিত্বের বাসনা দেখা দিয়াছে তাহা নহে, বরং সংরক্ষণ ও অধিকারের বাসনা মানবের কামের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়াই মানুষের মনে সম্পত্তি অর্জনের বাসনা দেখা দেয়। ইহা ছাড়া, ফ্রয়েডীয়েরা মনে করেন যে, শৈশবে কামের প্রকাশের সময় উহা যদি পায়ুকামের স্তর (anal erotic stage)-এর উপর সংবদ্ধ (fixated) হয়, তাহা হইলে ভাবীকালে ব্যক্তি-বিশেষের মনে কৃপণতা তথা সম্পত্তির প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ দেখা দেয়।[৯]

ম্যাক্‌ডুগাল মনে করেন যে, মানুষের মন যে চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদের অন্যতম হইল সঞ্চয় প্রবৃত্তি (instinct of hoarding or acquisition) এবং ইহার সহিত যুক্ত আছে অধিকারিত্বের গৌরববোধ (feeling of ownership)। এই প্রবৃত্তি মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও আছে বলিয়া সে তাহার আহার্য বাসস্থান ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করে। মানুষের মনে ইহা বর্তমান থাকিয়া মানুষকে ইহা নানা কার্যে নিযুক্ত করে।[১০]

আমরা উপরে দুইজন প্রধান মনোবিদের মতের উল্লেখ করিলাম। এই দুই মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। সম্পত্তিলাভের বাসনা যে সকলক্ষেত্রে কামেরই রূপান্তর অথবা মানুষের মনে যে একটি পৃথক্ ও সুনির্দিষ্ট আহরণ ও সঞ্চয়ের বৃত্তি আছে,

৯ Freud, *Lectures on Psychoanalysis*, pp 265-66, দ্রষ্টব্য। তৎসহ গ্রন্থকার-রচিত মনোবিদ্যা পৃ ২৯১-৯২ দ্রষ্টব্য।

১০ McDougall-এর ভাষায়: "This possessive behaviour seems to be instinctive It is certainly closely allied with hoarding....It is so difficult to distinguish their influences in human behaviour and experience that for the present we may with advantage content ourselves with the recognition of an *acquisitive instinct*; and we may attribute to it both hoarding and the defensive possessive behaviour." (*An Outline of Psychology*, pp 161-62)

এরূপ কথা সকল সময় বলা যায় না। মানুষের মনে সম্পত্তির যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা একটি জটিল বাসনা এবং ইহাকে একটি নির্দিষ্ট সহজাত বৃত্তিতে রূপান্তর করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বিবিধ কারণে মানুষ সম্পত্তিলাভের চেষ্টা করে এবং উহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। কতকগুলি বস্তু মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে বলিয়া মানুষ তাহাদের কামনা করে; এই সকল বস্তু তাহাকে তৃপ্তিদান করার ফলে ক্রমশঃ উহাদের উপর যেন 'নূতন অর্থ' আরোপিত হয় এবং উহাদের সাপেক্ষীকরণ (conditioning) ঘটে। যে সকল প্রয়োজনের তাগিদে বা প্রভাবে আমরা বিবিধ বস্তু কামনা করি, সেগুলি আমাদের যৌন প্রয়োজন হইতে পারে, ক্ষুধা-নিবৃত্তির প্রয়োজন হইতে পারে, জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হইতে পারে, সৌন্দর্যবোধের তুষ্টির প্রয়োজন হইতে পারে, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়োজন হইতে পারে—মানুষের বাসনা যত বাড়িবে, মানুষের কাম্যবস্তুর সংখ্যাও তত বাড়িবে। আবার মানুষ যে বস্তু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রতি আকর্ষণ থাকার আর একটি বিশেষ কারণ হইল যে, উহা সংগ্রহে তাহার শক্তি কোন-না-কোন প্রকারে ব্যয়িত হইয়াছে এবং উহা তাহার যোগ্যতা তথা পৌরুষের পরিচায়ক। আবার যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়, তাহার প্রতি ব্যক্তি-বিশেষের অনুরক্তির অন্যতম একটি কারণ হইল যে, উহা তাহার বংশমর্যাদার এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতির পরিচায়ক; এইজন্য উহার সহিত নানারূপ অনুভূতি সংযুক্ত হইয়া পড়ে। মানুষের মনে ক্ষমতার ইচ্ছা (will for power) থাকে এবং সম্পত্তির বিস্তার ও প্রাচুর্য তাহাকে অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার এবং অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দান করে। এইজন্যও সম্পত্তির প্রতি মানুষের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং সম্পত্তির অধিকার মানুষের আত্মসাম্মুখ্য-বোধ ও অহমিকার তৃপ্তি সাধন করে বলিয়াও মানুষ সম্পত্তি কামনা করে। অতএব, বলা যাইতে পারে যে, অধিকারিত্ব-বোধ একটি **জটিল মানসিক অবস্থা এবং উহার পশ্চাতে বিবিধ প্রয়োজন ও বৃত্তি কার্য করিতেছে।**[১১]

---

১১ **অধ্যাপক জিন্সবার্গ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:** "Psychologically property arises not from a direct need to acquire and possess, but from the interweaving of other root interests with self-regard and self-assertion." (*On the Diversity of Morals*, p. 318).

এই প্রসঙ্গে Ernest Beaglehole-**রচিত** ***Property: A Study in Social Psychology*** **দ্রষ্টব্য।**

৬। সম্পত্তির নৈতিক ও সামাজিক মূল্য বিচার (Ethico-social value of property) ঃ

সম্পত্তির অধিকারিত্বের নৈতিক যৌক্তিকতা কী হইতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তানায়কগণের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তিরই নামান্তর, আর একদল বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটি নিজস্ব 'পবিত্রতা' আছে এবং উহাতে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, এই দুইটি মতবাদই চরম মতবাদ এবং ইহাদের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না।

ব্যক্তিগত অধিকার সমর্থন করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মতবাদ গঠিত হইয়াছে—

(ক) **শ্রমবাদ** (Labour Theory)—

এই মতবাদ অনুসারে সম্পত্তিতে অধিকার হইল পরিশ্রমের পুরস্কার। কোন ব্যক্তি নিজের পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জন করে, তাহাতে তাহার ন্যায্য অধিকার থাকে। প্রকৃতি আমাদের এমন কতকগুলি উপাদান দান করিয়াছে যাহা প্রথম হইতেই সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারযোগ্য থাকে না—মানুষ স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা উহাদের ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলে। সুতরাং যে পরিশ্রম দ্বারা উহাদের ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলে, তাহারই উহাতে অধিকার জন্মে। সম্পত্তির অধিকারিত্বের এই দাবী কিন্তু নূতন নহে—প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ কোন-না-কোন প্রকারে ইহা সমর্থন করিয়া আসিতেছে। আদিমযুগে মানুষ যখন আহার্য হিসাবে ফলমূল সংগ্রহ করিত অথবা পশুপক্ষী শিকার করিত, তখন সে তাহার সংগৃহীত দ্রব্য নিজস্ব বলিয়া দাবী করিত। সভ্যতা বিস্তারের পরও সংগৃহীত বস্তুতে সংগ্রাহকের অধিকার মানুষ অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

মানুষের এই প্রাচীন 'যুক্তি'কে সুস্পষ্ট মতবাদের রূপ দেন দার্শনিক জন্ লক্ (John Locke)। তিনি বলেন যে, আদিমযুগে মানুষ প্রয়োজনের জন্যই বিবিধ বস্তু আহরণ করিত এবং সেগুলিকে সংরক্ষণের চেষ্টা করিত, সুতরাং তাহাতে তাহার অধিকার জন্মিত। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুতে তাহার কোন অধিকার স্বীকৃত হইত না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, মানুষ স্বোপার্জন বা পরিশ্রমলব্ধ বস্তুকে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়া আসিতেছে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, কেহ কোন বস্তু পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিলেই তাহাতে তাহার অধিকারিত্ব জন্মে না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে দস্যু, তস্কর ইত্যাদি যাহা সংগ্রহ করে, তাহাতে তাহাদের অধিকার বা স্বত্ব স্বীকার করিতে হয়।

তাহা ছাড়া, সম্পত্তির অধিকারিত্বের এই যৌক্তিকতাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থক ও বিরোধী উভয় পক্ষই নিজ-নিজ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমর্থন করেন, তাহারা বলেন যে, ব্যক্তি নিজে অথবা তাহার পূর্বপুরুষেরা যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের পরিশ্রমেরই ফল, সুতরাং তাহাতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার থাকিবে না কেন? অপরপক্ষে, যাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধিতা করেন ও সমাজবাদ সমর্থন করেন, তাহারা বলেন যে, কৃষি ও শিল্প কার্যে যাহারা পরিশ্রম সহকারে কোন কিছু উৎপাদন করে, উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদেরই অধিকার, সুতরাং কৃষি ও শিল্পসংস্থায় যাহারা কেবলমাত্র মূলধন বিনিয়োগ করে, অথচ উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে না তাহাদের উহাতে অধিকার নাই।[১২]

(খ) **উদ্দেশ্য-সাধনবাদ** (Teleological Theory)—

উদ্দেশ্য-সাধনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে এবং এইজন্য ইহার অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয়। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটি 'পবিত্রতা'র সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাকে রক্ষা করাই কর্তব্য।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক। ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ স্বত্ব থাকার ফলে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে অধিকতর উৎপাদনের ইচ্ছা জাগরিত হয়। ইহার ফলে সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীনতা না থাকিলে, তাহার 'নিজস্ব' সম্পত্তি বলিয়া কিছু না থাকিলে, সে উৎপাদনকার্যে কোন প্রেরণা লাভ করে না (পৃঃ ২২)। এইজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়।

---

১২ সমাজবাদের বা সাম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাঁহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধিতা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ধ্বনি তুলিয়া থাকেন: "লাঙ্গল যার, জমি তা'র," "কল চালায় যারা, কলের মালিক তা'রা।"

অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য সম্পত্তিরূপ সংস্থা দ্বারা সাধিত হয়। ইহা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক। প্রথমতঃ, ইহা ব্যক্তির মনে নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি করে—ব্যক্তি-বিশেষ যদি কিছু সম্পত্তি সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে সে নিশ্চিন্ত থাকে যে, শারীরিক অক্ষমতা ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে তাহার অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে, সে উহার উপর নির্ভর করিতে পারিবে। মানুষ যদি এই নিরাপত্তাবোধ হারাইয়া ফেলে, যদি সে আত্মনির্ভরশীল না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়—অন্যের সহিত আচরণে সে ভীরুতা ও দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিবে, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে তীব্র ব্যর্থতাবোধ জাগরিত হওয়ার জন্য সে অপরের প্রতি আক্রমণাত্মক ভাব গ্রহণ করিবে।

তাহা ছাড়া, সম্পত্তির অধিকারিত্ব ব্যক্তি-বিশেষের মনে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করে এবং তাহার বুদ্ধিকে প্রখর করিয়া তোলে। যে সম্পত্তির অধিকারী হয়, সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবার জন্য এবং উহার উন্নতিবিধানের জন্য তাহাকে বুদ্ধির চর্চা করিতে হয় এবং অন্যের সহিত আচরণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আবার, যে সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহার মনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রচেষ্টা থাকে। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পরিণামে তাহার সম্পত্তি ভোগও ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং সম্পত্তির যে অধিকারী, সমাজে তথা রাষ্ট্রে তাহার একটা 'স্বার্থ' থাকে—উহার প্রতি একটা 'আকর্ষণ' সে বোধ করে এবং এইজন্য সে সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করে না।

অতএব বলিতে পারা যায় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি **অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক, ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংহতির সংরক্ষক।**[১৩]

১৩ Urban **এই অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন:** "The ethical value of security, in freeing the self from the hand to mouth existence so inimical to its higher development, and the moralizing character of ownership in developing responsibility, through giving the individual a stake in the community, need no special emphasis." (*Fundamentals of Ethics*, p. 272).

উদ্দেশ্য-সাধনবাদীদের এই অভিমত সকলে গ্রহণ করেন না। সমাজবাদী ও সাম্যবাদীরা এ মতের **বিরোধিতা** করেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন মূল্য স্বীকার করেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কল্যাণের সহায়ক এ কথা তাঁহারা সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে, অধিকাংশ সময়ই সম্পত্তির অধিকারী বা মালিকেরা স্বার্থদ্বারা পরিচালিত হয়—রাষ্ট্রীয় কল্যাণ বা জনকল্যাণের কথা চিন্তা করিবার উদারতা তাহাদের থাকে না। প্রত্যেক মালিকই নিজের সম্পত্তির কিসে বিস্তার ঘটিবে, নিজের সুখসমৃদ্ধি কি করিয়া বৃদ্ধি পাইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া থাকে। বরং রাষ্ট্র যদি সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের সামান্যতম অধিকার খর্ব করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা বাধা দান করে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের প্রাপ্য শুল্ক বা কর হইতে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া তাহারা রাষ্ট্রের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া উঠে। সম্পত্তির অধিকারীরা যদি রাষ্ট্রের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করে, তাহা নিতান্ত স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত। ইহারা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া কোন কিছু করে না—এইজন্য রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী কোন কার্য করে, তাহা হইলে তাহারা উহার সমালোচনা করিবে না; কিন্তু যদি তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে অথচ জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় এরূপ কোন কার্য রাষ্ট্র অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহারা বিরোধিতা করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহারা উহার কল্যাণের কথা চিন্তা করে না; যদি তাহারা উহার কথা চিন্তা করে, তাহা স্বীয় স্বার্থের জন্যই চিন্তা করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থনে আরও বলা হয় যে, ইহা নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি করে। আদিম যুগে যখন কেবলমাত্র প্রয়োজনের জন্যই সম্পত্তি সংরক্ষিত হইত, তখন ইহা কতক পরিমাণে সত্য ছিল বলা যায়। বর্তমান যুগে ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। একদল ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত করে এবং তাহাতে তাহাদের আর এক দিকে নিরাপত্তা বোধ ব্যাহত হয়, কারণ এই সম্পত্তি রক্ষায় তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত থাকে। আর এক দল লোক এমন কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না যাহাতে প্রকৃত নিরাপত্তার সৃষ্টি হয়। বর্তমান কালে উচ্চহারে বেতন বা পারিশ্রমিক, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, জীবনবীমা ও অন্যান্য প্রকার বীমা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে এই নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সুতরাং নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজন নাই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে এ কথা সমর্থনীয় নহে। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, সম্পত্তির অধিকারীর মনে অর্থের মাদকতা জাগে এবং সে অর্থের অযথা অপচয় ঘটাইয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ নিজেকে ও স্বজনকে বঞ্চনা করিয়া কৃপণ হইয়া যায়। তাহা ছাড়, নিম্নবিত্তশালী ও দরিদ্রদের সে অনেক সময় উৎপীড়ন করে এবং নিজে শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে। ইহাতে নিশ্চয়ই তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না

এই সকল কারণে সমাজবাদীরা —বিশেষতঃ সাম্যবাদীরা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা মালিকানার অবসান ঘটাইতে চান। তাঁহাদের মূল বক্তব্য হইল যে, **ইহা অযথা সমাজ মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে এবং যাহাদের হস্তে সম্পত্তি বা বিত্তের সঞ্চয় ঘটে, তাহারা দরিদ্র বিত্তহীনদের অযথা শোষণ করে।**[১৪]

ব্যক্তিগত সম্পত্তির সপক্ষে ও বিপক্ষে এই সকল যুক্তিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার নিজস্ব কোন অলঙ্ঘনীয় 'পবিত্রতা' নাই। বর্তমান যুগের সমাজে সম্পত্তি কেবল প্রয়োজনের জন্যই আহৃত হয় না, বরং ইহা অধিকাংশ সময়ই অন্যকে নিয়ন্ত্রণের কাযে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ই সম্পত্তির অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, এমন কোন যুক্তি দেখান যাইতে পারে না যাহাকে বলা যায় যে, ইহার কোন নিজস্ব নৈতিক মূল্য আছে, অথবা সম্পত্তির অধিকারিত্ব ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হইতে পারে না।[১৫] যদি বলা যায় যে, সম্পত্তি ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না তাহা হইলে যাহারা সম্পত্তির অধিকারী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহারা প্রশ্ন করিতে পারে, 'কেন আমাদের কি ব্যক্তিত্ব নাই?' যদি বলা যায় যে, যাহারা সম্পত্তি অর্জন ও সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের উহার উপর নিশ্চয় অধিকার থাকিবে, তাহা

১৪ তুলনীয়: "Modern bourgeois private property is the final and most complete expression of the system of producing and appropriating products that is based on class antagonisms, on the exploitation of the many by the few" (*The Communist Manifesto*).

১৫ Urban বলেন: "There is no inherent reason why acquisition of property should remain a necessary condition of the moral life (*op cit*, p 273)

হইলে বলা যাইতে পারে, "সম্পত্তির মালিকেরা সম্পত্তি সৃষ্টি করিলেও যাহাদের তাহারা নিয়ন্ত্রণ করে, নিশ্চয়ই তাহাদের সৃষ্টি করে নাই।" যদি বলা যায় যে, সম্পত্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত করিলে মালিকের ক্ষমতাকে অকারণ সঙ্কুচিত করা হয়, তাহা হইলে উত্তরে বলা যায়, "ইহা দ্বারা কি দরিদ্র, অসহায়, বিত্তহীন ব্যক্তিদের ক্ষমতাহীনতাও কিছু পরিমাণে কমিল না?"[১৬]

আবার সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে করিতে মানুষের একটা মোহের সৃষ্টি হয় যাহার জন্য কেবল অর্থের জন্যই সে অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে এবং সে নিজের আত্মিক উন্নতির কথাও চিন্তা করে না, সমাজের কল্যাণের কথাও চিন্তা করে না।[১৭]

ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই সকল অসুবিধা ও দোষ থাকা সত্ত্বেও ইহাকে কি একেবারে বর্জন করা উচিত? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জন না করিয়া ইহার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা উচিত। **ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কিছু পরিমাণ স্বীকার করিয়া উহার উপর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত।** আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সম্পত্তি প্রয়োজনের জন্য হইতে পারে, আবার সম্পত্তি সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতালাভের

১৬ ম্যাকআইভার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "Control over property is control over men. If then a few defend a socially unlimited control on the ground that property is necessary for personality, shall not the many reply, 'Are we too not persons?' If on the ground that they have created this property, shall not the many reply, 'Have you then also created us?' If on the ground that to limit property is to limit power, shall they not say, 'It is also to limit our powerlessness'?" (*Community*, p. 355).

১৭ ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই অপব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উরুউইক (Urwick) বলেন: "...the property system was more clearly connected with the requirements of the social system in early days than it is now. The connexion seems almost to have been lost now-a-days; private property is completely individualised, although lip-homage is still paid to the 'duties' which are supposed to belong to it...." (*A Philosophy of Social Progress*, p. 163).

সেইরূপ Laveleye মন্তব্য করিয়াছেন: "Today property has been deprived of social character; completely different from that which it was at its origin, it has nothing collective about it. A privilege without obligations, it seems to have no other end than to assume the well-being of the individual." (Quoted by Letourneau, *op. cit.*, p. 380).

জন্যও হইতে পারে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণ সমর্থন করা যাইতে পারে; কিন্তু যেখানে সম্পত্তি প্রয়োজনের এই সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, সেখানেই জনস্বার্থ বা জনকল্যাণের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সম্পত্তি যতদূর ব্যক্তিকে 'রক্ষা' করে, ততদূর ইহা সমর্থনযোগ্য; আর যখন ইহা তমোগুণের সৃষ্টি এবং অপরের উৎপীড়নে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।[১৮] সুতরাং এরূপক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজকল্যাণের সমন্বয় বাঞ্ছনীয় (পৃঃ ৯২-৯৯)। স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে ব্যক্তির সীমিত অধিকার স্বীকার্য—কিন্তু তাই বলিয়া সম্পত্তির অধিকারে মদমত্ত হইয়া এক ব্যক্তি অপরের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা সমর্থন করা যায় না; অপরপক্ষে, ব্যক্তি-বিশেষকে সমাজের কল্যাণের জন্য কার্য করিতে হইবে বলিয়া তাহার নিজের ভরণপোষণ এবং সীমিত ও সাধারণ ভোগবিলাসের জন্য কিছুই থাকিবে না, ইহাও বলা যায় না; কারণ এইটুকুও যদি না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাইয়া সামাজিক যন্ত্রে রূপান্তরিত হইবে।[১৯] অবশ্য ব্যক্তিকে সম্পত্তিভোগের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার নিজের ও সমাজের কল্যাণের সমন্বয় করিতে হইলে তাহাকে কতকগুলি আদর্শ অনুধাবন করিতে হইবে। (পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৮ এইজন্য মণ্টেগু (Montague) বলেন: "The institution of private property creates two sorts of power upon its possessors: first, the power over nature; second, the power over other men. The one power is beneficient and the other sinister. And the major problem in the philosophy of property is the preservation of its power to protect and the destruction of its power to oppress." (*op. cit.*, p. 477).

১৯ ব্যক্তিগত সম্পত্তির যৌক্তিকতা বিশেষ স্বীকার না করিলেও, উরউইক (Urwick) বলেন: "there must be the right to possess *some* of the necessary stuff of a satisfactory life, if we are to determine our own lives ourselves at all. And there is no conflict here of individual with social purposes, provided the right of ownership is kept within limits." (*op. cit*,. p. 164).

[জীবনধারণের জন্য কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে প্রয়োজন তাহা প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। হেসিওড (Hesiod)-এর নিম্নলিখিত উপদেশের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক্ দৃষ্টিভঙ্গীর আমরা পরিচয় পাই: "সকল কর্ম ফেলিয়া আগে একটি ঘর, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি হাল গরু করিবে।...যাহা কিছু যন্ত্রাদির আবশ্যক, তাহা ঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিও।...গৃহ যেন আহার্য বস্তুতে পূর্ণ থাকে।"]

৭। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নৈতিক আদর্শ (Private Ownership and Ethical Ideal or Norm):

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অবসান না ঘটাইয়া ইহার সীমিত অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাকে সীমিত করিতে হইলে কতকগুলি আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে; দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা নিম্নলিখিত আদর্শের উল্লেখ করিতে পারি:

(১) সম্পত্তির লোভের নিকট স্বীয় ব্যক্তিত্বকে কখনও ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে। মানুষ কখনও সম্পত্তির দাস হইতে পারে না, সম্পত্তিই মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইবে।[২০]

(২) সম্পত্তি বা বিত্তের নিজস্ব নিরপেক্ষ মূল্য নাই—ইহার মূল্য হইল আপেক্ষিক। সম্পত্তি-সংগ্রহ এবং সম্পত্তির ব্যবহার ও ব্যয়, এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সম্পত্তি কেবল সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নহে—উহা কোন্ কার্যে কি ভাবে ব্যয়িত হইল, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই আদর্শের বিচ্যুতি ঘটার ফলে কেহ কেহ অত্যন্ত কৃপণ হইয়া পড়ে, আবার কেহ কেহ উচ্ছৃঙ্খল জননিপীড়ক হইয়া পড়ে।

(৩) সম্পত্তি চিরস্থায়ী নহে—সম্পত্তি মাত্রেরই বিনাশ আছে এবং সম্পত্তি ভোগের ক্ষমতাও সীমিত। সুতরাং উহা দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের স্থায়ী আত্মিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না এবং এইরূপ সম্পত্তি বা বিত্ত কখনও পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না।[২১]

---

২০ তুলনীয়: "Personality shall always be put above property—the values of the person above the values of property." (Urban *op. cit.*, p. 278).

এই প্রসঙ্গে গ্রীক্ পুরাণে বর্ণিত রাজার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। রাজা দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই যেন স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়। দেবতা বর দান করিলেন। ফল হইল যে, শেষ পর্যন্ত রাজার স্পর্শে তাঁহার অন্ন এবং পানীয় স্বর্ণে পরিণত হইল; এমন কি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা পর্যন্ত স্বর্ণে রূপান্তরিত হইল! স্বর্ণের মোহ তাঁহার কাটিয়া গেল এবং দেবতার নিকট এই তথাকথিত বর ফিরাইয়া লইবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। মানুষের নিকট মনুষ্যত্বই কাম্য বস্তু—অর্থ বা বিত্ত নহে।

২১ এইজন্য যমরাজ কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণবালক নচিকেতা বলিয়াছিলেন:

"শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।"

সেইরূপ মৈত্রেয়ীর উক্তি "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" এ স্থলে স্মরণযোগ্য।

(৪) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি সঞ্চয় বাঞ্ছনীয় নহে। সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ সম্পত্তির প্রয়োজন, ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় সম্পত্তি হিসাবে তাহা সংগ্রহ ও রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি সঞ্চিত হইতে থাকিলেই তাহা একদিকে মাদকতা, দম্ভ ইত্যাদির সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে তাহা মানুষকে ক্ষমতালোভী ও অত্যাচারী করিয়া তুলিতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যকে বঞ্চিত করিয়া তাহার শ্রমলব্ধ অর্থ ভোগ করা উচিত নহে।[২২]

(৫) ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমর্থন করা যায় বলিয়া প্রয়োজন বা বাসনার সংখ্যাকে অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি করা উচিত নহে। বাসনাকে সংযত করা কর্তব্য, কারণ বাসনা দ্বারা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।[২৩]

(৬) ব্যক্তিগত প্রয়োজন প্রশমিত করার পরই সম্পত্তির অধিকারীর চিন্তা করা উচিত জনকল্যাণ কিসে হইবে। জনকল্যাণের কার্যেই সম্পত্তির উদ্বৃত্ত অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত।

(৭) সম্পত্তির অধিকারিগণের ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যেন অর্থকৌলীন্যের ভিত্তিতে সমাজে নূতন করিয়া শ্রেণীর সৃষ্টি না হয়, কারণ ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল সমাজমধ্যে কৃত্রিম বিভেদ তথা বিরোধের সৃষ্টি।

---

২২ এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় দর্শনে উল্লিখিত পঞ্চ মহাব্রতের কথা বলিতে পারি; যথা, অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। সম্পত্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই দুই আদর্শের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন বলেন: "Property is a mandate held by its possessors for the common use and benefit of the commonwealth. The Bhāgavata tells us that we have a claim only to so much as would satisfy our hunger. If anyone desires more, he is a thief deserving punishment." (*Eastern Religions & Western Thought*, p. 364).

২৩ তুলনীয়. "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষা ও শিক্ষায়তন

ব্যক্তি-বিশেষ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও সে পুরাপুরি সামাজিক জীব হয় না, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাহার সামাজিকীকরণের প্রয়োজন হয় (পৃঃ ৮৬-৯০)। এই জন্য তাহাকে কতকগুলি সামাজিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। তাহা ছাড়া, সজীব, সক্রিয়, সচেতন জীব হিসাবে সে প্রতিনিয়তই তাহার পরিবেশের সংস্পর্শে আসিতে থাকে এবং সে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এইভাবে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে শৈশব হইতেই ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে শিক্ষা আরম্ভ হয়। ব্যক্তি-বিশেষ যখন শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত হইয়া জীবনের উচ্চতর আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করে, তখনই তাহাতে তাহার ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ। সুতরাং শিক্ষা মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষার বলেই মানুষ মনুষ্যেতর জীব অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করিতে পারে। সুতরাং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষার আদর্শ ও মান নির্ণয় এবং শিক্ষায়তনের কার্যসূচী নির্ধারণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১। শিক্ষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Education):

(ক) শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of education):

শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল উপযুক্ত জ্ঞানলাভ দ্বারা মানুষের উন্নতিমূলক বিভিন্ন ক্ষমতার উৎকর্ষসাধন। মানুষের লক্ষ্য বহুমুখী, সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে তাহার এই উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা বিবিধ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতে পারে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মানবজীবনে শিক্ষা দুইভাবে ঘটিতে পারে—কোন পূর্বপরিকল্পিত পন্থা অনুসারে অথবা বিশেষ কোন পন্থা নির্দিষ্ট না করিয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিদিনই নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে এবং এই সকল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে কোন-না-কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতেছে অথবা কিছু-না-কিছু শিখিতেছে বলা যায়। এই সকল অভিজ্ঞতার ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয় এবং সে তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করে। **ব্যাপক অর্থে 'শিক্ষা' বলিতে সমগ্র জীবনেরই বহুমুখী অভিজ্ঞতা বুঝায়।** এই শিক্ষা কোন পূর্ব পরিকল্পিত পন্থা অনুসারে চলে না—ইহা মনের অগোচরেই ঘটিয়া থাকে।

'শিক্ষা' পদটি সকল সময় এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সভ্যজগতের সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার পদ্ধতি ও আদর্শকে এক সুনির্দিষ্ট রূপদানের চেষ্টা করা হয় এবং ইহার মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষকে এক নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত করিয়া সমাজের উপযোগী করিয়া তোলা হয়। ইহাই হইল শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থ। **সঙ্কীর্ণ অর্থে 'শিক্ষা' বলিতে বুঝায় এমন এক সুনির্দিষ্ট, সচেতন প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের সুপ্ত বৃত্তি বা ক্ষমতাগুলিকে প্রকাশিত ও পরিমার্জিত করার চেষ্টা করা হয়।**[১] সুনির্দিষ্ট পন্থায় শিক্ষাদানের জন্যই সভ্যসমাজে বিবিধ বিদ্যালয় বা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাহাকে ব্যাপক, সুসঙ্গত, সুনির্দিষ্ট এবং মার্জিত আকার দিবার জন্যই শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিশুর বয়স যত বাড়িতে থাকে, সাধারণ অবস্থায় তাহার মানসিক ক্ষমতাও তত অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং বিবিধ বিষয়ে তাহার জ্ঞান আহরণের ক্ষমতাও বাড়িতে থাকে। সুতরাং তাহার মানসিক ক্ষমতার উপযোগী করিয়া বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে করা হয়।

১ 'শিক্ষা'-পদের ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন: 'In the wider sense it (education) is a process that goes on throughout life, and that is promoted by almost every experience......Understanding education in this large sense, we have to recognise that a considerable part of it—sometimes even the most important part—comes to us *unconsciously*...In a narrower sense it may be taken to mean any *consciously* directed effort to develop and cultivate our power" (*Outline of Social Philosophy*, p. 94.)

(খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য (The aims of eductaion):

শিক্ষার স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদের বিচার করিতে হইবে শিক্ষার দ্বারা কী উদ্দেশ্য সাধিত হয় ? শিক্ষার ফল কি কি ?

শিক্ষার দ্বারা প্রধানতঃ মানসিক পরিবর্তন তথা উৎকর্ষতা সাধিত হয়। এই পরিবর্তন কোন এক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করিতে হয় অর্থাৎ কোন এক বিশেষ লক্ষ্যকে আদর্শ-ভাবে গ্রহণ করিয়া উহা পাইবার জন্য মানসিক পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা করা হয়।

এই পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য সম্পূর্ণ নূতনরূপে কোন কিছুর সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। মানুষ মাত্রই কতকগুলি প্রবৃত্তি বা শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষা দ্বারা এই সকল সুপ্ত শক্তিকে প্রকাশিত বা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ সুপ্ত মানসিক শক্তিকে বিকশিত করাই হইল শিক্ষার কায।[২] যদি কেহ জন্মান্ধ হয়, তাহাকে যেমন আলোক সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা যায় না, সেইরূপ যদি কোন বৃত্তি কাহারও ভিতর না থাকে, তাহা হইলে উহা সৃষ্টি করা যায় না।[৩]

তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা বলিতে যখন সুপ্ত শক্তির জাগরণ বা উন্মেষ বুঝায়, তখন উহার এই অর্থ নহে যে, 'সু-প্রবৃত্তি' ও 'কু-প্রবৃত্তি' নির্বিশেষে বা ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া সকল প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে যে সকল সু-প্রবৃত্তি আছে সেগুলির উন্মেষ সাধন এবং যে সকল কু-প্রবৃত্তি আছে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ (এমন-কি প্রয়োজন

---

২ 'শিক্ষা' পদের ইংরাজি প্রতিশব্দ হইল 'education'; এই পদটি লাতিন *e* (অর্থাৎ out বা ভিতর হইতে বাহির) এবং *duco* (অর্থাৎ lead বা পরিচালিত করা. এই দুই-এর সংযোগে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'যাহা অন্তর্নিহিত গুণাবলী বাহিরে প্রকাশ করে'।

৩. প্লেটো এই মতের অন্যতম প্রবর্তক, তিনি বলেন: "Education is not what it is said to be by some, who profess to put knowledge into a soul which does not possess it, as if they could put sight into blind eyes.... the soul of every man does posssess the power of learning the truth and the organ to see it with, and just as one might have to turn the whole body round in order that the eye should see light instead of darkness, so the entire soul must he turned away..." (*Republic*, Bk.VII, 518)

হইলে, বিনাশ সাধন) হইল শিক্ষার উদ্দেশ্য।[৪] সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে সকল বৃত্তি ব্যক্তি-বিশেষের নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে, সেইগুলি হইল সু-প্রবৃত্তি।[৫]

শিক্ষার দ্বারা শিক্ষক কেবল যে, প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করেন তাহা নহে, ছাত্রের সম্মুখে কতকগুলি সুষ্ঠু আদর্শ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহা দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে নূতন আদর্শকে মনোমধ্যে গ্রথিত করান হইল শিক্ষকের অন্যতম কার্য।[৬] তবে শিক্ষককে ইহা দেখিতে হইবে যে, শিষ্য যেন বিনা বিচারে কোন আদর্শকে গ্রহণ না করে—বিচার ও যুক্তির মাধ্যমে যে আদর্শ গ্রহণ করা যায় তাহাতেই মানসিক উৎকর্ষতা ঘটে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার কতকগুলি লক্ষ্য হয় **আসন্ন বা প্রত্যক্ষ** (proximate), যথা, ছাত্র কর্তৃক কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা, কতকগুলি মানসিক কৌশল আয়ত্ত করা, নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করা, নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করা ইত্যাদি। শিক্ষার **চরম** (ultimate) লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-বিশেষের সর্বাঙ্গীণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি বিশেষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন বা কল্যাণবিধান। সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বলিতে দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতি

৪ শিক্ষামাত্রই প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন', এই মতের বিরোধিতা করিয়া Urwick বলেন: 'I may not be a very good gardener, but if I knew that a plant was likely to send up poison shoots as well as flowers, I should hold myself ready to restrict its growth very fiercely. ...Can these educators not see that the self is an uneasy combination of possible god, actual man, and very real beast? If the beast is left unchained, what environment will save the man or give the god a chance of emerging? (*The Social Good* p 202)

৫ শিক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র সুপ্রবৃত্তির বিকাশ সাধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলেন: 'Education is the manifestation of *perfection* already in man'', সেইরূপ গান্ধীজী বলেন: 'By education I mean an all round *drawing out the best* in child and man''

৬ এইজন্য Adams মনে করেন যে, ইংরাজি 'education' পদটি ল্যাটিন *educere*-পদ (যাহার অর্থ হইল ভিতরের বস্তুকে বাহির করা) হইতে ব্যুৎপন্ন হয় নাই, উহা *educare* পদ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—উহার অর্থ হইল উন্নত করা, পরিবর্ধিত করা।

বুঝায়। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইতে পারাই হইল শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং শিক্ষা বলিতে কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞান আহরণই বুঝায় না। জ্ঞানের আলোকে স্বীয় সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত করিয়া সমাজের অন্য সকলের সহিত সুষ্ঠু আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক জীবনধারণ করাই হইল শিক্ষার চরম আদর্শ।

প্রয়োগ বা ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের দুইটি লক্ষ্য আছে—একটি হইল প্রয়োজনের জন্য জ্ঞান সংগ্রহ, আর একটি হইল জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানের বিকাশ সাধন। অর্থাৎ জ্ঞানের মূল্য প্রায়োগিক (instrumental) এবং স্বকীয় বা অন্তর্নিহিত (intrinsic)।

মোট কথা, **শিক্ষার বহুমুখী লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল শিক্ষিত ব্যক্তির সহজাত সুপ্রবৃত্তিগুলিকে বিকশিত করা, তাহাকে স্বাধীন বৃত্তির উপযোগী করিয়া তোলা, তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ, নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক করিয়া তোলা।**[৭]

২। শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য (Social significance of education):

মানুষ সামাজিক জীব; সুতরাং যদিও ব্যক্তিগতভাবে প্রতি মানুষকে শিক্ষিত হইতে হয়, তাহা::হইলেও শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়; এবং শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ হয়। সুতরাং শিক্ষামাত্রেরই যেমন একদিকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইরূপ সামাজিক তাৎপর্যও আছে এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা সমাজবিদ্যা তথা সমাজদর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

যে কোন শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি আদর্শগত দিক্ আছে। শিক্ষাদানের সময় ইহাই আশা করা যায় যে, শিক্ষিত ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঐ আদর্শ

৭ অধ্যাপক Joad-এর ভাষায়: "I suggest that education has a number of ends of which three are outstanding: (i) To equip a boy or girl to earn his or her living. (ii) To equip him to play his part as the citizen of a democracy. (iii) To enable him to develop all the latent powers and faculties of his nature and so to enjoy a good life." (*About Education*, p. 23).

অনুযায়ী আচরণ করিবে। কিন্তু এই সকল আচরণের যে আদর্শ স্থিরীকৃত হয়, তাহা অনেকাংশে বিশেষ বিশেষ সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিরূপিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে যে সমস্ত আদর্শ শিখিবে সেগুলি এক হিসাবে তাহার সমাজেরই সমষ্টিগত আদর্শ ও কৃষ্টি। সমষ্টিগতভাবে সমাজ যেভাবে আচরণ করে, ব্যক্তিগতভাবে প্রতি ব্যক্তিকে সেইভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হয়। মানবীয় আচরণ বহুল পরিমাণে সামাজিক আচরণ। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা মানবীয় আচরণে যে পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করা হয়, তাহা একদিকে মানুষকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তোলে, আবার অপর দিকে সমাজ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়, কারণ ব্যক্তি-বিশেষের আচরণ যখন অল্পবিস্তর নির্দিষ্টরূপ ধারণ করে, তখন উহা সমাজকে প্রভাবিত করে। সুতরাং ব্যাপক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, শিক্ষণ হইল সামাজিকীকরণ।[৮] শিশুর জন্মের পর হইতেই সামাজিকীকরণ আরম্ভ হয় এবং ইহার প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোন সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষাদানকারী এবং শিক্ষাগ্রহণকারীর মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে না, কারণ সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই এই শিক্ষা আরম্ভ হয়।

সমাজের দিক্ হইতে শিক্ষার আর একটি প্রয়োজনীয়তা হইল যে, শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমেই কতকগুলি সামাজিক আদর্শ, ভাবধারা, কৃষ্টি স্থায়ী রূপ লাভ করে। মৃত্যুর ফলে সমাজ হইতে কিছু লোক চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছে, আবার জন্মের ফলে নূতনের আগমন ঘটিতেছে। যাহারা প্রাচীন, যাহারা ধীরে ধীরে সমাজ হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহারা নবীনদের শিক্ষিত করিয়া নবীনদের মনোমধ্যে তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের ধারণা রাখিয়া যাইতেছে। সুতরাং এক যুগের কৃষ্টিধারাকে অন্যযুগে পরিচালিত বা পরিবাহিত করিতেছে শিক্ষা। যে কোন স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা নবীন ও প্রবীণের সঙ্গমস্থল এবং

---

৮ এই ব্যাপক দৃষ্টি হইতে শ্রীমতী মীড (Mrgaret Mead) বলিয়াছেন: "(Education is) the cultural process, the way in which new-born human infant is transformed into a full member of a specific human society." ('Our Educational Emphasis in Primitive Perspective', *American Journal of Sociology*, Vol. 48).

ঐ গোষ্ঠীর আদর্শ ও কৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়াছে শিক্ষাপদ্ধতি।[৯] অর্থাৎ **সমাজের কৃষ্টিগত ও আদর্শগত নিরবচ্ছিন্নতা সম্ভবপর করিয়া রাখে শিক্ষাব্যবস্থা।**

শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তিবর্গের আচরণকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায় বলিয়া শিক্ষা ব্যক্তি-মনকে নিয়ন্ত্রণ করে; আবার উহা ব্যক্তি-মনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরিশেষে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে শিক্ষা মাত্রেরই যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব আছে। এইজন্য সমাজ তথা রাষ্ট্র যদি কোন একটি বিশেষ ধারণা বা আদর্শকে নাগরিকগণের মনে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে চাহে, তাহা হইলে উহা শৈশব হইতে শিক্ষার মাধ্যমে করা প্রয়োজন (যেমন, কোন কোন রাষ্ট্রে যুদ্ধবাদের আদর্শ বহুবিধ শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের মনে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করা হয়)।

তাহা ছাড়া, শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় এবং ব্যক্তির মনে মানবিকতা বোধ জাগরিত হইতে পারে। সুতরাং সমাজ মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসে সহায়তা করিতে পারে বলিয়া শিক্ষাকে সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের অন্যতম ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়।[১০]

অতএব বলা যাইতে পারে যে, সমাজ-জীবনে শিক্ষার অবদান অপরিসীম।[১১]

৯ তুলনীয় "Death removes, birth adds, the group remains. And the group that remains is thus, paradoxically enough, always the same and yet always different. It is less often considered that while the same things are analogously true of the cultured life of the group, it is education, not mere birth, that must add. That is, it is to education that we must look for the maintenance through renewal of the cultural continuity." (W. H. Kilpatrick, 'The Social Sciences and Education' in *The Social Sciences & their Inter-relations*, Ed. by Ogburn & Goldenweiser, p. 419).

১০ অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, যেখানে পূর্ব হইতে সমাজস্থ লোকেরা বন্ধুতাপূর্ণভাবে বাস করিতেছে, সেখানে ভাবের আদানপ্রদান দ্বারা শিক্ষা উন্নততর হয়।

১১ প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আধুনিককালে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচনায় 'শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্ব' (Educational Sociology বা Sociology of Education) নামে এক পৃথক্ শাখা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক প্রগতিসাধন, শিক্ষার আদর্শ-বিচার, সামাজিকীকরণের উপায় হিসাবে শিক্ষার মূল্য, শিক্ষকদের শিক্ষা, বিদ্যালয় এবং বৃহত্তর সামাজিক সম্প্রদায় এই দুই-এর পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব—এইগুলিই শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্বের সাধারণ আলোচ্য বিষয়।

শিক্ষা হইল একদিকে সমাজ-জীবনের ভিত্তি (basis of social life)—যে সমাজের ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত ও কৃষ্টিহীন, সে সমাজের কল্যাণ নাই ; আবার শিক্ষাই হইল সমাজের চরম লক্ষ্য (end of social life)—আদর্শ সমাজের বা রাষ্ট্রের লক্ষ্য যদি নৈতিকতা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই উহা সম্ভব হয়, সুতরাং নাগরিকগণের নৈতিক শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর কাম্য আর কিছু হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে : শিক্ষার লক্ষ্য কি ব্যক্তিগত কল্যাণ অথবা সামাজিক কল্যাণ ? কোন কোন লেখক ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন আবার কোন কোন লেখক সমাজকল্যাণের কথা বলিয়াছেন।[১২]

আমরা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তিগত কল্যাণের মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। (পৃঃ ৯৯)। বাস্তবিকপক্ষে, ব্যক্তি-বিশেষ যদি তাহার আত্মিক কল্যাণের চেষ্টা করে, তাহাতে পরিণামে সমাজেরই মঙ্গল সাধিত হইবে। ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, মানুষের ব্যক্তিত্বের একদিকে যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, অপর দিকে সেইরূপ উহার একটি সামাজিক দিক্ আছে।[১৩] সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটি আদর্শ অনুসরণ করা উচিত যাহাতে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। শিক্ষার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ব্যক্তি-বিশেষের আত্ম-সংগঠন, কিন্তু যেহেতু সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তি-বিশেষের 'আত্মা' বা 'অহং' গড়িয়া উঠে, সেইজন্য সামাজিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে কোন প্রকার শিক্ষার্জন সম্ভব নহে। প্রকৃত আত্মসংগঠনের জন্য এমন এক স্বাধীন সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন যাহাতে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে

---

১২ প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টার আদর্শ ছিল যে, ব্যক্তিমাত্রই সমাজের দাস। এইজন্য স্পার্টার নাগরিকদের রাষ্ট্র এই শিক্ষাই দিত যে, তাহারা যেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আজ্ঞাবহ সৈন্যে রূপান্তরিত হয় এবং বিনা দ্বিধায় রাষ্ট্রের জন্য প্রাণদান করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এইরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত কল্যাণের কোন স্থান ছিল না।

১৩ এইজন্য Baldwin বলেন : "the 'ego' and the 'alter' are born together" (*Social & Ethical Interpretations in Mental Development*, p. 15) ; সেইরূপ Nunn বলেন : "The individual life can develop only in terms of its own nature, and that is social as truly as it is self regarding." (*Education : Its Data & First Principles*, p. 4).

ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে।[১৪] আবার ইহার এই অর্থ নহে যে, ব্যক্তি-বিশেষ সম্পূর্ণরূপে সমাজ তথা রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে (পৃঃ ১০১)। ব্যক্তির বৌদ্ধিক স্বাধীনতা (intellectual freedom) থাকিবে—সে স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বিবিধ সামাজিক আদর্শগুলির তুলনামূলক বিচার করিয়া যখন উহাদের কোন একটি বা কয়েকটিকে গ্রহণ করিবে, তখনই তাহার শিক্ষার সার্থকতা।

৩। শিক্ষামূলক সংস্থা (Educational Institutions):

যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের শিক্ষামূলক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বলে। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষ নানাবিধ শিক্ষা অর্জন করিয়া থাকে, সুতরাং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বহু প্রকারের হইতে পারে।

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২১৮) বলিয়াছি যে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলিতে সামাজিকীকরণ বুঝায়। শিশুর পক্ষে এই সামাজিকীকরণ আরম্ভ হয় যে পরিবার মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবারে। সেই হিসাবে প্রতি শিশুর পক্ষেই তাহার পারিবারিক গোষ্ঠীই হইল তাহার প্রথম ও প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র (পৃঃ ১৪৫)। কিন্তু যদি একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে পারিবারিক গোষ্ঠী ঐ কার্যের জন্য পর্যাপ্ত নহে ; সুতরাং শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের দাবী মিটাইবার জন্য বিভিন্ন বয়ঃক্রমের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন। বালক-বালিকারা যদি এইরূপ সুশৃঙ্খল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে না পায়, তাহা হইলে তাহারা মনের দিক্ হইতে একটা 'শূন্যতা' বোধ করিবে—বলা বাহুল্য, এইরূপ মানসিক শূন্যতা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। বিদ্যালয় (school), মহাবিদ্যালয় (college), বিশ্ববিদ্যালয় (university), এইগুলিই হইল প্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এইগুলি ব্যতীত বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক সংস্থা হইতেও মানুষ নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

১৪ তুলনীয়: "Proper self-building demands then, a social enrvironment in which the agent-learner can and must meet the progressively unfolding demands of the total life-situation". (Kilpatrick, *op. cit.*, p. 424).

বিদ্যালয়—শৈশবে ও বাল্যে সুনির্দিষ্ট পন্থায় বিশেষরূপ শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষরপরিচয়, সরলগণিত ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে বয়ঃপর্যায় অনুযায়ী কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে করা হয়। এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দান ব্যতীত দেহচর্চা বা ব্যায়াম ও ক্রীড়া সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। শৈশবে ও বাল্যে ক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুরা দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। আবার পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা করিতে শিখে। তাহা ছাড়া, সাধারণ নীতি সম্বন্ধেও সে শিক্ষা লাভ করে। সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে বিচরণ করিতে হইলে ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞানার্জন প্রয়োজন, সুন্দর স্বাস্থ্যের প্রয়োজন এবং নৈতিক আদর্শানুরাগী হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শৈশব হইতে ধীরে ধীরে শিশুকে ইহার উপযুক্ত করিয়া তোলা হয়। সম্প্রদায় মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু কল্যাণকর, যাহা কিছু আদর্শমূলক তাহাতে শিশুকে দীক্ষিত করাই হইল বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কায।[১৫]

বিদ্যালয়ে যেহেতু বিশেষ বিশেষ সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারায় ছাত্র-ছাত্রীকে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সেইজন্য সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, বিদ্যালয় হইল ব্যাপকতর সামাজিক কৃষ্টির সীমিত অথচ সুষ্ঠু প্রকাশের কেন্দ্র। বিদ্যালয় যে আদর্শকে রূপদানের চেষ্টা করে তাহা বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিস্থিতির সহিত বৃহত্তর সামাজিক কৃষ্টির মিথস্ক্রিয়ার ফলে জন্মলাভ করে। বিদ্যালয়ে যে সকল আদর্শ অনুধাবন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে আদর্শের আলোকে ছাত্রছাত্রীর আচরণ পরিমার্জিত করার প্রচেষ্টা করা হয়, সেই সকল আদর্শ সমাজমধ্যে (অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বাহিরে প্রাপ্তবয়স্কদের যে সমাজ সেই সমাজ) সাধারণ স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে বলিয়া বিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে উহারা অনুসৃত হয়। শিক্ষক তাঁহার ছাত্রসমক্ষে বিবিধ কৃষ্টিমূলক আদর্শের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা ; শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা যদি পরিণতবয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা বুঝিতে না পারে, অথবা শিক্ষকের ব্যক্তিগত আদর্শের সহিত

১৫ তুলনীয় : "...the earliest initiation of the child should be into what is simplest and best in the traditions of his community. Golden apples on vessels of silver should be first set before him." (Mackenzie, *op. cit.*, p. 97.)

সমাজগত সাধারণ আদর্শের মিল যদি না থাকে, তাহা হইলে বিদ্যালয়মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

মনোবিদ্যা ও শিক্ষাতত্ত্বের প্রগতির ফলে বর্তমান যুগের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বের সনাতন আদর্শ অনুসারে ছাত্রকে করা হইত বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রবণতা বা প্রবৃত্তি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে বিদ্যালয়ের কতকগুলি আদর্শ মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হইত। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষা-পদ্ধতি হওয়া উচিত ছাত্র-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ প্রতি ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে সে যাহা শিখিতে পারে সেই ভাবে তাহাকে সাহায্য করা। সনাতন প্রথায় ছাত্রের কেবলমাত্র বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত, বর্তমান আদর্শ অনুসারে শিক্ষাকেন্দ্রে কেবল বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা নহে ছাত্রের অনুভূতিশীলতা ও সামাজিকতাবোধের উৎকর্ষতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে একটি ব্যবধান রক্ষার চেষ্টা সযত্নে করা হইত এবং শিক্ষকের পক্ষে কঠোরভাবে ছাত্রশাসন করাই ছিল রীতি, বর্তমানের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান যতদূরসম্ভব কম করা উচিত—শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে প্রাণের নিবিড়তা থাকিবে, ঐ সম্পর্ক হইবে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক, সহযোগিতার সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। সনাতন পদ্ধতিতে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেওয়া হইত এবং ঐরূপ উৎসাহ দ্বারাই প্রতিভাশালী ছাত্র 'আবিষ্কার'-এর চেষ্টা করা হইত, বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ছাত্রদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা থাকবে তাহা যেন তীব্র বা বিদ্বেষমূলক আকার না ধারণ করে এবং প্রতিযোগিতার সহিত যেন সহযোগিতা সমান স্থান অধিকার করে।[১৬]

১৬ প্রতিযোগিতা মানব মনে তীব্র প্রেরণা (motivational force)-রূপে কাজ করে। প্রতিযোগিতার ভাব যেরূপ ব্যক্তি-বিশেষকে সুপ্ত শক্তি বিকশিত করিতে বাধ্য করে, সেইরূপ উহা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, শিশুকে যদি স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কিছু করিতে বাধ্য করা হয় এবং সে যদি উহা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মনে ব্যর্থতার ভাব দেখা দেয়। এইজন্য শিক্ষকের কর্তব্য হইল যে, তিনি যেন প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগরিত করিবার সময় সতর্ক থাকেন এবং সহযোগিতার মনোভাবের সহিত উহার সমন্বয় করেন।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার সুরু হয়, তাহাকে একদিকে ব্যাপকতর আর একদিকে বিশেষজ্ঞসুলভ আকার দিবার সহায়তা করে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নহে।

সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে উচ্চতর শিক্ষায়তনে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতর ও অধিকতর উদারনৈতিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির ন্যায় উচ্চতর শিক্ষায়তনে শিক্ষাব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা যে জ্ঞানলাভ করিবে তাহা যেমন একদিকে তাহাদের কোন একটি বা কয়েকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করিয়া তোলে, অপর দিকে ঐ জ্ঞানের সহিত জীবনের বৃহত্তর সমস্যার যেন অধিকতর সংযোগ থাকে এবং ঐ জ্ঞান যেন আন্তর্মানবীয় সম্পর্কের যোগসূত্রে দৃঢ়তর করিয়া তোলে। তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের সহিত গঠনমূলক কল্পনার সংযোগ থাকা উচিত—এ কল্পনা স্বপ্নবিলাসীর কল্পনা নহে, এ কল্পনা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের কল্পনা।[১৭] এইরূপ জ্ঞানের অধিকারী যাহারা হইবে তাহারাই নূতন নূতন ক্ষেত্রে গবেষণার কার্য করিতে পারিবে, নূতন নূতন আবিষ্কারের কাযে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। এইরূপ শিক্ষার মধ্যে জ্ঞান, নীতি ও কল্যাণের সমন্বয় সাধিত হইবে।

৪। কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Technical or Vocational Education):

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল শিশুকে ধীরে ধীরে স্বাধীন নাগরিকের উপযুক্ত করিয়া তোলা। কিন্তু স্বাধীন নাগরিকের আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন; এইকারণ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল যে, ছাত্রছাত্রীরা যেন এরূপ শিক্ষা পায় যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে। এইজন্য বলা হয়

১৭ অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেডের ভাষায়: "The justificatian for a university is that it preserves the connection between knowledge and the rest of life, by uniting the young and the old in the imaginative consideration of learning...This atmosphere of excitement arising from imaginative consideration, transforms knowledge...Imagination is not to be divorced from the facts: it is a way of illuminating the facts." (*The Aims of Education & other Essays*, Mentor Book Edn., p. 97)

যে, সাধারণ শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষালাভের জন্য যেরূপ মানসিক উৎকর্ষতার প্রয়োজন, সকলের সেইরূপ উৎকর্ষতা থাকে না। এইজন্য যদি প্রত্যেককেই বাল্যে ও কৈশোরে কোন বিশেষ প্রকারের বৃত্তির উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের জন্য চিন্তা করিতে হয় না।[১৮]

অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যদি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষ নিজেকে বিশেষ বৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে সমাজের উপর 'ভার'-স্বরূপ হইয়া থাকিবে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সমাজ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহায়তা করিয়া থাকে। অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিল্প-উৎপাদন শিক্ষা দিয়া ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে যে সুপ্ত সৃজনী শক্তি থাকে, তাহাকে বিকশিত করিবার সহায়তা করে। মানুষ কেবল জ্ঞানার্জন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলে জ্ঞানের সার্থকতা বোধ করে। শিক্ষা দ্বারা কেবল উপযুক্ত নাগরিক হওয়াই যথেষ্ট নহে, শিক্ষা দ্বারা এক বিশেষ দিকে উৎকর্ষতা লাভ করা এবং বিশেষভাবে নিজের সৃজনী শক্তিকে বিকশিত করাও বাঞ্ছনীয়।[১৯] এইজন্য সাধারণ শিক্ষার সহিত ছাত্রছাত্রীর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ প্রকারের শিল্পীয় তথা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রয়োজন।

---

১৮ ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ১৯৩৭ সালে যে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যসূচী রচিত হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ প্রকারের 'হাতের কাজ' ও শিল্পশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়ে এমন বিষয় শিক্ষাদান করা উচিত যাহা ছাত্রছাত্রীর সৃজনী শক্তি বিকশিত করিতে পারে এবং যাহা সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর হয়। শৈশব হইতে এইরূপ শিক্ষা পাইলে ব্যক্তি-বিশেষের মনে শ্রমের মর্যাদা বাড়িবে। এই প্রকার শিক্ষার আদর্শকে চারিটি 'H'-অক্ষর দ্বারা বর্ণনা করা হয়; যথা—Head (মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির উন্নতি), Heart (হৃদয় অর্থাৎ অনুভূতিশীলতা), Hand (হস্ত অর্থাৎ কলাকৌশল শিক্ষা) এবং Health (স্বাস্থ্য)।

১৯ তুলনীয়: "...the good citizen must not only be good in general, but good in some special way. Hence his general education has to be followed by some special training of a more technical kind, preparing him for the particular function for which he is found to be fitted by natural ability and circumstances." (Mackenzie, *op. cit.*, p. 99).

এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রয়োজনীয় হইলেও সাধারণ শিক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে। যদি শৈশব হইতে কেবলমাত্র কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীর মন যন্ত্রবিশেষে রূপান্তরিত হইবে এবং তাহার সুকুমারবৃত্তিগুলির সুষ্ঠু প্রকাশের পথ ব্যাহত হইবে। প্রকৃত বৃত্তিমূলক শিক্ষার সহিত সাধারণ শিক্ষার কোন বিরোধ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য যেখানেই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, সেখানেই উহা সাধারণ এবং উদার শিক্ষাব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, কারিগরী শিক্ষায় যাহাতে ছাত্রের উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শুদ্ধজ্ঞান (pure or theoretical knowledge) এবং প্রায়োগিক জ্ঞান (applied knowledge), এই দুই-এর মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। এইজন্য যখন প্রয়োগবিদ্যা কাহাকেও শিক্ষা দিতে হইবে, তখন দেখা উচিত সে যেন কেবলমাত্র কতকগুলি কৌশল আয়ত্ত না করে—বিশেষ বিশেষ কৌশল বা কায-ভঙ্গিমার পশ্চাতে কি কি কারণ রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে।[20] প্রায়োগিক জ্ঞানের ভিত্তি হইল শুদ্ধজ্ঞান, সুতরাং যতদূর সম্ভব শুদ্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োগবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রয়োগবিদ্যা শিক্ষাদানের সময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে জীবনের সুকুমারবৃত্তিগুলি যেন লুপ্ত হইয়া না যায়, কারণ বৃত্তির সংস্থান বা জীবিকার্জনই মানবমনের একমাত্র পরিচায়ক নহে।[21]

২০ এইজন্য উলিশ (Ulich) বলিয়াছেন: there is always the danger that vocational education may degenerate into ... teaching of tricks and fabrication of gadgets without any explanation *why* they work ... (*Philosophy of Education*, p 180).

২১ Hetherington ও Muirhead-এর ভাষায় "...we should remember that vocation is not the whole of life, and that if our material wealth is to be an instrument of spiritual life and not of spiritual death we must provide for the education of our citizens in all activities wherein man has sought the deepest expression of his creative spirit" (*Social Purpose*, pp. 218-19)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক স্থলে কারিগরী শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে আত্মিক উন্নতি হইতেছে না বলিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেন 'Unfortunately, in our educational institutions we feed the animal, train the mind but *do not attend to the spirit* in man" (*Occasional Speeches & Writings* II, p. 136)

৫। রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা (State & Education):

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি-বিশেষকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত দায়িত্বশীল নাগরিক করিয়া তোলা।[২২] সুতরাং রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্র একেবারে উদাসীন থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র এ বিষয় কতদূর হস্তক্ষেপ করিবে তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে।

শিক্ষিত জনসমাজ বা নাগরিক ব্যতীত কোন রাষ্ট্র উন্নতি ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে না—এমন কি বর্তমান যুগে সম্ভবতঃ উহার অস্তিত্বও রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র কখনও একেবারে উদাসীন থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ শিক্ষা-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কতকগুলি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বা করা উচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যদিও অধিকাংশ পিতামাতাই তাহাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে চান, তাহা হইলেও সকল পিতামাতা (বা অভিভাবক) সমান দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন বা তাঁহাদের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে এমন বলা যায় না। সুতরাং অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া রাষ্ট্র কর্তৃক ভাবী নাগরিকগণের শিক্ষার ভিত্তি গঠনে সহায়তা করা উচিত। এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করিয়া যদি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত করা সম্ভব হয়, তাহাতে রাষ্ট্রের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইবে। এইরূপ শিক্ষাদানে কেবল কারিগরী বা প্রায়োগিক বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে—বুদ্ধি বা জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার সংযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত রাষ্ট্রের পক্ষে সাধারণভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করা বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য। জনসাধারণের বা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বদান্যতার উপর নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে সমাজ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারে না; সুতরাং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে অগ্রণী হইয়া কার্য করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি (যথা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়) যাহাতে অর্থনৈতিক

---

২২ তুলনীয়: "Education is the citizen's passport to a useful share in the work of the community, and to an intelligent part in its direction." (Hetherington & Muirhead, *op. cit.*, p. 209).

স্বচ্ছন্দতা ভোগ করে, তাহাও রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে এবং [illegible] করিতে হইবে।)

মানবজীবনে শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়া শিক্ষা সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এইজন্য শিক্ষাব্যবস্থামাত্রই সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার কে বা কাহারা গ্রহণ করিবে? বিবিধ সামাজিক সংস্থাসমূহের মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্রই কোন পরিকল্পনা অনুসারে জনগণকে কার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে; সুতরাং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী চলা যেখানে জনসাধারণের পক্ষে এত বেশী প্রয়োজন, সেখানে যদি কোন নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারাই ঐরূপ নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন হইল : রাষ্ট্র শিক্ষার প্রসারকার্যে সহায়তা করা ব্যতীত শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য কোন ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে কি? রাষ্ট্রের পক্ষে দুইভাবে শিক্ষাব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব—(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ এবং (খ) শিক্ষিতব্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ (যেমন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করিয়া সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উহা গ্রহণ করিতে এবং প্রচার করিতে বাধ্য করা)।) এই দুইটি বিষয়েই বিভিন্ন লেখক বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন; একদল কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন এবং আর একদল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাতন্ত্র্য সমর্থন করেন।

(একনায়কত্ববিশিষ্ট (totalitarian) রাষ্ট্রের সমর্থকেরা বলেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি-বিশেষকে শৈশব হইতে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, যাহাতে সে যেন ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ নাগরিকে পরিণত হইতে পারে)(পৃঃ ২২০, পাদটীকা ১২ দ্রষ্টব্য); শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রের কল্যাণ অর্থাৎ রাষ্ট্রের সংহতি, শক্তি, ঐক্য ও দৃঢ়তা। সুতরাং এই উদ্দেশ্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়, রাষ্ট্রকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইজন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করিতে হইবে এবং ঐ মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অন্য মতবাদের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ জনমনকে বিশেষ মতবাদে দীক্ষিত (indoctrinate) করিতে হইবে।

(অপরপক্ষে, যাঁহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তাঁহারা মনে করেন যে, শিক্ষা-

ব্যাপারে ব্যক্তি-বিশেষ তাহার ইচ্ছামত আদর্শ অনুধাবন করিতে পারে।) (ইহাকে laissez-faire মতবাদ বলা যায়)। প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি নিজের রুচি অনুযায়ী চলিতে পায়, তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজের মঙ্গল পাইবার চেষ্টা করিবে এবং ব্যক্তিগত মঙ্গলের যোগফলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে। যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রকে একান্তই হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সামঞ্জস্য করিবার জন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

(এই দুইটি চরম মতের কোনটিই পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে—ইহাদের সমন্বয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আংশিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করা যাইতে পারে।/ যেমন পারিবারিক সংস্থার ক্ষেত্রে, শিল্পীয় সংস্থার ক্ষেত্রে বা অন্য কোন সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা সমর্থন করা যায় না, সেইরূপ শিক্ষামূলক সংস্থার ক্ষেত্রেও জনসাধারণের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা সমর্থন করা যায় না। এই প্রকার 'অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা'-কে যদি রাষ্ট্র খর্ব করিতে চাহে, তাহা শিক্ষামূলক সংস্থার সুষ্ঠু কার্যসাধনে সহায়তা করিবার জন্যই করিয়া থাকে।[২৩] (কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যদিও আংশিক রাষ্ট্রীয়নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করা যায়, তাহা হইলেও রাষ্ট্রকে অত্যন্ত সংযত আচরণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের শিক্ষায়তন-গুলিকে যদিও রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থসাহায্য করা উচিত এবং অন্যপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করা উচিত, তাহা হইলেও উহাদের পরিচালন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিজের আয়ত্তাধীন রাখা উচিত নহে।) (শিক্ষায়তনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থায় উহাদের যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দান করা উচিত)—ঐগুলি রাষ্ট্রের বেতনভুক্ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হইলে উহারা সম্যক্‌ভাবে স্ফূরিত বা বিকশিত হইতে পারে না; শিক্ষাব্যাপারে যাঁহারা অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, ব্যাপক ও নিরপেক্ষ তাঁহাদেরই উপর শিক্ষায়তনের শাসনভার বা পরিচালনার কার্য অর্পিত হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলিকে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ কোন প্রকার স্বাধীন শিক্ষা-সংসদের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় রাখা যাইতে পারে। (দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষায়তনগুলির মাধ্যমে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারকার্য রাষ্ট্রের পক্ষে করা উচিত

২৩ তুলনীয়: "...the state has increasingly interfered in other institutions such as the family and industry, not in order itself to discharge their functions but to prepare the conditions under which they can give their best service. So it should be with education." (Hetherington & Muirhead, *op. cit*, p. 222).

নহে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রের মানসিক চিন্তার স্বাধীনতা নাই, তাহা 'শিক্ষা' নামের যোগ্য নহে। মোট কথা, **শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা বা একচেটিয়া অধিকার বাঞ্ছনীয় নহে।**[২৪]

শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্র কতদূর হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্রের স্বরূপের উপর।[২৫] আমরা বলিতে পারি যে, জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (democratic welfare state)-কে আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ রাষ্ট্র নিম্নলিখিত নীতি সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারে—(১) শিক্ষায়তনগুলির যতদূর সম্ভব স্বাধীন পরিচালনা বাঞ্ছনীয় ; (২) শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি বিকশিত হওয়া প্রয়োজন ; (৩) উপযুক্ত নাগরিক গঠন করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে—ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব যাহাতে প্রকাশিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত ; (৪) রাষ্ট্র যেমন নিজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে, সেইরূপ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সঙ্ঘ কর্তৃক ঐরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্বাধীনতা থাকিবে এবং রাষ্ট্রের উচিত সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই সমান সুযোগ সুবিধা দান করা ; (৫) কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমূলক বা জনস্বার্থবিরোধী কোন কার্য করিলে রাষ্ট্র উহার পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে।

৬। শিক্ষার দার্শনিক বিচার (Philosophical Evaluation of Education):

শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন আদর্শ অনুধাবন করার চেষ্টা হয় ; কিন্তু এই সকল

২৪ অধ্যাপক ব্রুবাকের (Brubacher)-এর ভাষায়: "The state must guard itself against a monopoly in the education of children...In this way too, the pupil will be assured of being educated as an individual and not exclusively as a citizen. He will be educated as an end and not just as a mouthpiece or instrument of the state." (*Modern Philosophies of Education*, p. 149).

২৫ আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট *Pierce VS. Society of Sisters* (268 U.S. 510) নামক মামলায় বিচারকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকার গণতন্ত্রের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন: "The fundamental theory of liberty upon which all governments in this Union repose excludes any general power of the state to standardize its children by forcing them to accept instruction from public teachers only. The child is not the mere creature of the state ; those who nurture him and direct his destiny have the right, coupled with the high duty, to recognize and prepare him for additional obligation." এই মন্তব্যে উল্লিখিত আদর্শ সকল রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত।

আদর্শের চরম মূল্য কী হইতে পারে, তাহা বিবেচনার জন্য দার্শনিক বিচার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দার্শনিক আলোচনার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকল্প ও প্রত্যয়গুলির স্বরূপ নিরূপণের প্রচেষ্টা হয়, এবং সমগ্র বিশ্বসংসারের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কী করণীয় তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করা হয়। দার্শনিকজ্ঞানের এমন এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে যাহা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সমুন্নত করিবার চেষ্টা করে এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন আদর্শগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও তাহাদের সমন্বয় সাধন করিতে পারে।[২৬]

বাস্তবিক দর্শন ও শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র বিশ্বসম্বন্ধে দার্শনিকের যে মতবাদ তাহা শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ ও পথপরিক্রমা নির্দেশে সহায়তা করে। আবার শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌রা যে সকল আদর্শ ও পদ্ধতি অনুধাবন করেন, তাহা দার্শনিক মতবাদ—বিশেষতঃ জীবনদর্শন—গঠনে সহায়তা করে। মোট কথা, শিক্ষার ক্ষেত্রে দার্শনিক চিন্তার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে—দার্শনিক চিন্তা আমাদের পথনির্দেশ করে, যদি কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি না যায় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমাদের বিচারবুদ্ধি মার্জিত করে, শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ঐক্য সাধন করে, ব্যাখ্যা করে, অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধান করে এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন আদর্শের মূল্য নিরূপণ করে।[২৭]

২

---

২৬ দর্শনের যে শাখা শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা করে, তাহাকে শিক্ষামূলক দর্শন (Educational Philosophy বা Philosophy of Education) বলে। তবে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে: (ক) কেহ কেহ বলেন যে, আগে শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা, পরে দার্শনিক বিচার—শিক্ষা হইল মূল, দার্শনিক চিন্তা হইল উহার ফলস্বরূপ; (খ) কেহ কেহ বলেন যে, পৃথক্ দার্শনিক বিচার সম্ভব বলিয়াই স্বাধীন শিক্ষামূলক দর্শন সম্ভব; (গ) আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা-পদটি গ্রহণ করিলে শিক্ষা ও দর্শন সমার্থবোধক হইয়া দাঁড়ায়।

[শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক মতবাদের আলোচনার জন্য William Van Til-সম্পাদিত *Great Human Issues of Our Time* গ্রন্থে C. L. Hall রচিত প্রবন্ধ 'Conflicting Philosophies of Education' দ্রষ্টব্য]।

২৭ তুলনীয়: "......philosophical thinking serves to guide action, to call attention to features that might be overlooked, to enrich and unify vision and thus to strengthen the professional sentiment. Attachment to such thinking is its own reward." (Bereday & Lauwerys-সম্পাদিত *Education and Philosophy*—Year.-Book of 1957., issued by University of London Institute of Education, p. 13).

দার্শনিক মতবাদগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষা ও শিক্ষার তাৎপর্য বিচারের প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

(১) স্বভাববাদ (Naturalism):

দর্শনে 'স্বভাববাদ' পদটি সাধারণতঃ অধ্যাত্মবাদের বৈপরীত্য সূচনা করে এবং জড়বাদ, যান্ত্রিকতাবাদ, অজ্ঞাবাদ ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। শিক্ষামূলক দর্শনে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সাধারণতঃ 'স্বভাববাদ'-পদটি ব্যবহৃত হয়। 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' (Nature) বলিতে বুঝায় মানুষের সহজাত বৃত্তিসমূহ এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আবেগ এবং সরল কূটযুক্তিবিহীন বিচার-বিবেচনা। মধ্যযুগীয় দর্শনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইহা প্রসারলাভ করে। এই মত অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এমন এক আদর্শ গ্রহণ করা উচিত যাহাতে শিক্ষাগ্রহণকারী সহজ, সাবলীল ভঙ্গিমায় যেন নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে, অর্থাৎ শিশু-মনে **প্রকৃতির প্রকাশের পথ যেন কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করার ফলে ব্যাহত না হয়।** শিক্ষার পক্ষে যে আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত শিশুমনের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রকাশের মধ্যেই পাওয়া যায়। 'প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাও' (Back to Nature) হইবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল নীতি এবং এইজন্য ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী। এক একটি বয়ঃপর্যায়ের উপযুক্ত মানসিক বিবর্তনের এক একটি স্তর আছে এবং এক একটি স্তরে প্রকৃতি যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে সেই স্তরের উপযুক্ত শিক্ষা শিশুকে দিতে হইবে। অকারণ কতকগুলি বই-এর বোঝা বাড়াইলেই বা স্বভাবজ বৃত্তির বিরোধী কতকগুলি অভ্যাস গঠন করিলেই শিক্ষা হয় না। এই মতের প্রধান প্রবর্তক হইলেন রুসো।[২৯]

২৯ তুলনীয়: "We know nothing of childhood; and with our mistaken notions the further we advance the further we go astray. The wisest writers devote themselves to what a man ought to know, without asking what a child is capable of learning. They are always looking for the man in the child, without considering what he is before he becomes a man." (Rousseau, *Emile*, Everyman Edn., Author's preface). "Forced to combat either nature or society, you must make your choice between the man and the citizen; you cannot train both." (*Ibid.*, p. 7). "The first impulses of nature are always right." (p. 56). "The only habit that the child should be allowed to contract is that of having no habits." (p. 30). "No doubt he must submit to rules; but the chief rule is—be able to break the rule if necessary." (p. 94).

রুসো যে মতের **প্রবর্তন** করিয়াছিলেন, রুসোর পরবর্তী কালে অনেকেই—যথা, পেস্টালোৎসি, হার্বার্ট, ফ্রোয়েবেল, মন্টেসরি[৩০]—সেই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতকে আরও সুস্পষ্ট রূপ দান করেন। **এই মত নব্য শিক্ষাতত্ত্ব** (**New Education**) নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

স্বভাববাদের মূল বক্তব্য হইল যে, **শিশুর স্বাভাবিকবৃত্তি সমূহকে প্রকাশের সুযোগ দান করিতে হইবে**; সেই কারণে সকল শিক্ষাব্যবস্থায় (বিশেষতঃ শিশুশিক্ষায়) শিশুকে প্রধান স্থান দিতে হইবে—শিশু কী চাহে তাহা জানিয়া সেই মত তাহাকে শিক্ষাদানে সহায়তা করিতে হইবে।[৩১] শিক্ষক বলিতে শিশুর সহায়ক বা পরিচালক বুঝিতে হইবে। শিশুশিক্ষায় ক্রীড়ার প্রাধান্য থাকিবে—ক্রীড়ার মাধ্যমে, শিশুকে আনন্দদানের মাধ্যমে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার দ্বারা শিশুমনে যেন বাধ্যবাধকতাবোধের সৃষ্টি না হয়—শিক্ষার মাধ্যমে তাহার মন যেন স্বাধীনভাবে স্ফূর্তিলাভ করে। শিক্ষায়তন যেন শিশুর পক্ষে

৩০ **তুলনীয়**: (১) "The aim of all instruction is, and can be, nothing but the development of human nature, by the harmonious cultivation of its powers and talents, and the promotion of manliness of life." (Pestalozzi, *How Gertrude Teaches Her Children*, pp. 156-57).

(২) "It may be doubted whether the treatment of discipline in the sense of constraint belongs to pedagogy or should not more appropriately be apprehended to those parts of practical philosophy which treat of government in general." (Herbart, *The Science of Education*, p. 94).

(৩) "All the child is ever to be and become, lies, however slightly indicated, in the child, and can be attained only through development from within outward." (Froebel, *The Education of Man*, p. 68).

(৪) "By education must be understood the active help given to the normal expansion of the child." (*The Montessori Method*, p. 104).

৩১ **আদর্শ শিক্ষক বা শিক্ষিকার বর্ণনা দান করিয়া মন্টেসরী বলেন**: "Instead of facility of speech she (the teacher) has to acquire the power of silence, instead of teaching she has to observe, instead of the proud dignity of one who claims to be infallible, she assumes the vesture of humility." (*The Advanced Montessori Method*, Vol. II p. 128). [**মন্টেসরি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনার জন্য** *Around the Child*-**পত্রিকায়** (Vols. IV, V ও VII **গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য**)]

আনন্দ-উদ্যান স্বরূপ হয় — শিক্ষায়তনকে যেন শিশু নিজস্ব নিকেতন মনে করে।[৩২]

সমালোচনা :

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাববাদ যে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক, শিশুমনের উপর জোর করিয়া কতকগুলি আদর্শ চাপাইয়া দিলে এবং তাহাকে ঐগুলি অনুসরণ করিতে বাধ্য করিলেই শিক্ষাদান কার্য সমাপ্ত হয় না। তাহা ছাড়া, শিশুমন উহাতে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া করে এবং শিক্ষার প্রতি তাহার বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। এইজন্য ক্রীড়াচ্ছলে এবং অন্যপ্রকারে তাহার আনন্দবিধান করিয়া যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিক্ষার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে। শিশুকে আত্মবিকাশের সুযোগদান করিয়া শিশুর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে এই পদ্ধতি সহায়তা করে।

শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে স্বভাববাদীদের যথেষ্ট অবদান থাকিলেও তাঁহারা কোন একটি উপযুক্ত আদর্শ স্থাপনা করিয়া উহার কোন যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন নাই। শিশুর মধ্যে যাহা আছে, তাহাই ভাল ; সুতরাং শিশুর প্রকৃতিই শিশুশিক্ষার আদর্শ —এই মত সম্পূর্ণভাবে সর্বত্র স্বীকার করা যায় না। শিশুমনে যে সকল কুপ্রবৃত্তি আছে সেগুলিকে সর্বাগ্রে সংযত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিমা ; সুতরাং প্রতি শিশুমনের প্রকাশভঙ্গিমাকেই যদি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষার কোন সার্বিক আদর্শ গঠিত হইতে পারে না।[৩৩] যদি প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিগুলির অপ্রতিহত প্রকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া শিক্ষা দিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? স্বভাববাদীরা অবশ্য বলিবেন যে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য এবং তাহাদের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করিবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই পরিচালনা বা সাহায্যদান নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হইতে পারে না ; অতএব দেখা যাইতেছে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বভাববাদীদের কোন-না-কোন উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক, স্বভাব বা প্রকৃতি পদটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নহে ; 'প্রকৃতি' বলিতে কোথাও

৩২ Froebel তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত বিদ্যালয়ের নাম দেন *Kindergarten*, এটি একটি জার্মান পদ—'kinder' পদের অর্থ শিশু (child) এবং 'garten'-পদের অর্থ উদ্যান (garden)। সেইরূপ মণ্টেসরি-স্থাপিত বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'The House of Childhood' (শৈশবনিকেতন)

৩৩ এইজন্য স্বভাববাদ (naturalism) সম্বন্ধে Eucken মন্তব্য করিয়াছেন : "Every-

জড়প্রকৃতি বুঝায়, কোথাও পশুপ্রকৃতি বুঝায়, কোথাও কুপ্রবৃত্তি বুঝায়, আবার প্রকৃতিদত্ত সু-প্রবৃত্তিও বুঝায়। নিশ্চয়ই স্বভাববাদীরা কেবল সু-প্রবৃত্তির উৎকর্ষতা-সাধনই বাঞ্ছনীয় মনে করেন—সুতরাং তাঁহারা নিজেরাই প্রবৃত্তিসমূহের অন্তর্নিহিত মূল্য বিচারে বিশ্বাস করেন এবং সকল প্রবৃত্তিকে সমান স্থান দেন না।

(২) প্রয়োগবাদ (Pragmatism) :

প্রয়োগবাদের সমর্থকেরা মনে করেন যে, কোন কিছুর সত্যাসত্যের বিচার করিতে হইলে উহাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে উহা কতদূর কার্যকরী বা উহা কতদূর সাফল্য অর্জন করে। যদি উহা সফল বা সার্থক হয়, তাহা হইলে উহা সত্য ; আর যদি উহা সফল না হয়, তাহা হইলে উহা মিথ্যা। সুতরাং শাশ্বত সত্য বলিয়া কোন কিছু নাই—সত্য সদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োজনের পরিবর্তনের সহিত সত্যেরও পরিবর্তন ঘটে—এককালে বা একজনের নিকট যাহা সত্য, অন্যকালে বা অপরের নিকট তাহা সত্য না হইতে পারে। এই মতের সমর্থক হইলেন পার্স (Peirce), জেম্‌স্ (James), ডিউই (Dewey) এবং শিলার (Schiller)। প্রয়োগবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন ডিউই।

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে শাশ্বত মূল্য বা আদর্শ বলিয়া কিছু নাই ; সুতরাং শিক্ষা বলিতে জ্ঞানের অহৈতুকী চর্চা বুঝায় না। চরম মূল্য বলিয়া অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ চিরন্তন মূল্য কিছু নাই—**অভিজ্ঞতার ফলে, সাফল্যের মাধ্যমে, যাহা পাওয়া যায় তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে**। সুতরাং শিক্ষকের কার্য হইল শিক্ষাগ্রহণকারীকে এমন এক অবস্থা মধ্যে রাখা যাহাতে সে নিজেই কোন কিছুর 'মূল্য' নিরূপণ করিতে পারে। বাস্তবজীবনের সংঘাতে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, তাহাদের সমাধানেই কোন কিছুর মূল্য স্বীকৃত হয়। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ না করিলে কোন ধারণা বা আদর্শ বা পদ্ধতির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না—বাস্তবজীবনই মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি ;

---

thing intrinsically valuable disappears from the world ;...the useful, that which promotes the interests of living beings, each after its kind, in the struggle for existence, becomes the all-dominating value." (*Life's Basis and Life's Ideal*, p. 27).

শিক্ষা হইল অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞতারই পুনর্গঠন।[৩৪] প্রয়োগবাদীদের মতে শিশু এবং তাহার পরিবেশ এই দুই-এর মিথস্ক্রিয়ার ফলেই শিশুর অভিজ্ঞতা গঠিত হয়। শিশুর স্বভাবই হইল তাহার পরিবেশ লইয়া পরীক্ষণ (experiment) করা ; সুতরাং পূর্ব হইতে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যকে গ্রহণ করিয়া সেই পথে যাওয়া সম্ভব নহে। শিক্ষকের কর্তব্য হইল শিশুর আবেগ, প্রবণতা, মানসিক ক্ষমতা ও বৃত্তি ইত্যাদিকে এমনভাবে চালিত করা যাহাতে সে তাহার পরিবেশের সংঘাতে যে সকল অভাব দেখা দেয় সেগুলিকে যেন পূরণ করিতে পারে—এক্ষেত্রে পূর্ব হইতে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে কোন একটি আদর্শ গ্রহণ করিয়া সেই পথে শিশুকে চালিত করা সম্ভব নহে। শিশুকে কার্যের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে হইবে—অর্থাৎ শিশুর কী জানা উচিত তাহা কল্পনা করিয়া তাহাকে শিক্ষা দান করা সম্ভব নহে ; সে কী করিতে চাহে অর্থাৎ কিভাবে সে তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিক্রিয়া করে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে উৎসাহ দান করিতে হইবে। অতএব, কোন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতিকে সর্বকালীন সত্য বলা সম্ভব নয়—কোন কিছু পূর্ব হইতে সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত থাকে না। প্রয়োগের তথা সাফল্যের মাধ্যমে উহার কার্যকারিতা অর্থাৎ সত্যতা নিরূপিত হয়। পরিবর্তনশীল জগতে সনাতন বা চিরন্তন পদ্ধতিভাবে কিছু স্বীকৃত হইতে পারে না।

সমালোচনা :

স্বভাববাদের ন্যায় প্রয়োগবাদেরও গুণ হইল যে, পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই মতবাদের মূল্য আছে। প্রত্যেক বিষয়কে অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করিতে হইবে বলিয়া প্রয়োগবাদীরা কোন পদ্ধতিরই চরম মূল্য স্বীকার করেন না ; সুতরাং বিনা বিচারে কোন পদ্ধতিই তাঁহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। অতএব, আশা করা যায় যে, তাঁহারা অবাস্তব কোন পরিকল্পনা প্রচার করিবেন না।

৩৪ তুলনীয় : (১) "It is futile to attempt to arrange them (values) in an order beginning with one having least worth and going on to that of maximum value...The only ultimate value which can be set up is just the process of living itself." (Dewey, *Democracy and Education*, p. 281).

(২) "It is that reconstruction or reorganization of experience which adds to the meaning of experience, and which increases ability to direct the course of subsequent experience." (*Ibid.*, p. 89).

প্রয়োগবাদকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না। এই মতবাদের সমর্থকেরা বলেন যে, কোন ধারণা বা পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিলেই উহা সত্য। কিন্তু কোন কিছু সাফল্য লাভ করার ফলে উহা সত্য হয়, অথবা উহা সত্য ছিল বলিয়াই উহা সাফল্য লাভ করে? অর্থাৎ সাফল্য সত্যের নির্ধারক, না সত্য সাফল্যের নির্ধারক?

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে, প্রয়োগবাদ গ্রহণ না করার অর্থ হইল কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা; কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে, কারণ যুক্তিদ্বারা বা বিচার-বিবেচনার দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৩৫]

তাহা ছাড়া, কোন পদ্ধতিকে উহার উদ্দেশ্য হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নহে। পদ্ধতি হইল উপায় এবং উপায়মাত্রই উদ্দেশ্যের সহিত সংযুক্ত থাকে। সুতরাং পদ্ধতির মূল্য কেবলমাত্র সাফল্যের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয় না—উহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের কতদূর সহায়ক তাহা বিচার করিতে হইবে।

পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে, স্থায়ী সত্য বলিয়া কিছু না থাকিলে প্রয়োগবাদের সত্যতা যে স্থায়ী বা চিরন্তন হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

(৩) বাস্তববাদ (Realism):

বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষামাত্রই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে হওয়া উচিত —জীবনে কর্মক্ষেত্রে যা কাজে লাগিবে, সেইরূপ শিক্ষাদানই কর্তব্য। শিক্ষা বলিতে পুঁথিগত বিদ্যা বুঝায় না—মানুষ আর তার পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা পদ্ধতি রচিত হওয়া উচিত। ব্যাকরণ, ছন্দ, সাহিত্য ইত্যাদি অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নহে—বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষা। হার্বার্ট্ স্পেন্সার, হাক্সলি ইত্যাদি এই মতের সমর্থক।

স্পেন্সার বলেন যে, যদি প্রশ্ন করা যায়: 'কোন্ প্রকার জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্?', তাহা হইলে বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধর্মীয় যে কোন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই উহার উত্তর হইবে: প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের উপর যে

৩৫ তুলনীয়: "(The pragmatists hold) that the only alternative to employing the pragmatic method is to follow a rule blindly...there is also the possibility of applying a rule intelligently." (Rusk, *The Philosophical Bases of Education*, p 84).

শিক্ষাপদ্ধতি স্থাপিত, তাহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।[৩৬] (যুগের পরিবর্তনের সহিত শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তনশীল।) শিক্ষা বলিতে বুঝায় যাহা মানুষকে ক্রমশঃ উচ্চতর কার্যের জন্য উপযুক্ত ও প্রতিযোজনক্ষম করিয়া তোলে।[৩৭] সেইরূপ হাক্সলি বলেন যে, বুদ্ধির উন্মেষের প্রারম্ভ হইতেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন।

(বাস্তববাদীরা দাবী করেন যে, শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান না থাকিলে উহা কুসংস্কারমূলক হইয়া পড়ে।) ইহা ধর্মকে অস্বীকার করে না, কিন্তু ইহা অকারণ মুক্তির কোন আশা দেয় না। ইহা কেবলমাত্র এই কথাই বলে যে, বুদ্ধিশক্তির উন্নতি সাধন করিয়া উহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রয়োগ করা উচিত।[৩৮]

(বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্রব থাকার জন্য যে শিক্ষা ভাবী জীবনে বৃত্তি সংগ্রহে সুবিধা করে তাহাই বাঞ্ছনীয়—এইজন্য শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক করিয়া তোলা প্রয়োজন।[৩৯])

প্রয়োগবাদের সহিত বাস্তববাদের পার্থক্য হইল যে, বাস্তববাদ জ্ঞানসম্পদ সংরক্ষণের কথা বলে, কিন্তু প্রয়োগবাদ ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সহিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের কথা বলে। বাস্তববাদে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এবং বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু

৩৬ "What knowledge is of most worth ?" এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া স্পেন্সার (Herbert Spencer) উত্তর দেন : "whether for intellectual, moral or religious training, the *study of surrounding phenomena* is immensely superior to the study of grammars and lexicons." (*Essays on Education*, Everyman Edn., p. 42.)

৩৭ স্পেন্সারের ভাষায় : "education, properly so called, is closely associated with change—is its pioneer—is the never-sleeping agent of revolution—is always fitting men for higher things, and *unfitting* them for things as they are." (*Social Statics*, p. 341).

৩৮ তুলনীয় : "Realism absorbs with conflict the constructions of modern scientific thought......It is, however, a foe of superstition in every form, and of idealistic complacency." (F. S. Breed, *Education & the New Realism*, p. 89).

৩৯ তুলনীয় : "Preparation for a vocation is an important part of education." (*Spens Report*)

প্রয়োগবাদে মানসিক ক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্তির উপর এবং মানসিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৪০]

মোট কথা, শিক্ষার পরিধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সীমিত থাকাই বাঞ্ছনীয়; এইজন্য ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তা অথবা অসার কল্পনা লইয়া আলোচনা না করিয়া শিক্ষাকে বিজ্ঞানমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। (এক মাত্র এই প্রকার শিক্ষাই মানুষকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত হইতে এবং অন্নসংস্থান করিতে সক্ষম করিয়া তোলে।) অবশ্য সামাজিক সংহতির জন্য যে পরিমাণ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন সে পরিমাণে উহা সমর্থনযোগ্য।[৪১]

সমালোচনা:

বাস্তববাদীরা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে আংশিক সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এ কথা সত্য যে, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতে হইবে এবং ঐ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে যদি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষা একদেশদর্শী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত বাস্তববাদী হইলে শিক্ষার কার্যসূচী হইতে সাহিত্য, কলা, দর্শন, নীতি ইত্যাদি বাদ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তি-বিশেষকে যদি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দান করিতে হয়, তাহা হইলে উহা যেন 'সমগ্র মানব'-এর উপযুক্ত শিক্ষা হয় এবং সেইজন্য কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে। (পৃঃ ২২৬)। তাহা ছাড়া, বাস্তববাদীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার

৪০ Park, *Selected Readings in The Philosophy of Education*, pp. 247-48 দ্রষ্টব্য।

৪১ তুলনীয়: "By confining educational aims within the bounds of the here and the now, one but fits his educational philosophy to the dimensions of nature. He omits the eternal, the timeless, from his space-time frame of reference...If religion enters his philosophy of education, it is only deified nature...Morals originate in the folkways or mores... Conscience becomes an echo of social custom rather than divine command." (Brubacher, *op. cit.*, p. 316).

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও উহাদের উৎপত্তির এবং প্রয়োজনীয়তার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহা পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে ; সকল দার্শনিক ইহা স্বীকার করেন না যে, উহাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা অথবা উহারা কেবলমাত্র সামাজিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষার সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

(৪) ভাববাদ (Idealism) :

দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ভাববাদ একটি সুপ্রাচীন মতবাদ। ভাববাদীরা সাধারণতঃ অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (spiritualistic outlook) হইতে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ভাববাদী মনে করেন যে, সমগ্র বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া এক চিচ্ছক্তি বিরাজমান এবং মানব ও বহির্জগৎ ঐ চিচ্ছক্তির প্রকাশ। তাঁহাদের এই সাধারণ দার্শনিক মতবাদ শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মানুষই শিক্ষালাভের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই মানুষ বা জীবাত্মা ভগবান্ বা পরমাত্মা হইতে সম্ভূত ; উহা স্বরূপতঃ স্বাধীন এবং অমরত্বই হইল উহার স্বাভাবিক পরিণতি।[৪২] শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল মানুষের স্বরূপের বিকাশ সাধন। মানুষের উন্নততর জীবন হইল আধ্যাত্মিক জীবন—সামাজিক জীবনের মধ্যেই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান বিকাশ ঘটে। এইজন্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন ঘটাইতে পারে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া উচ্চতর সামাজিক কর্তব্যপালন করিয়াই মানুষ প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। **মানুষের মধ্যে দেবত্ব সুপ্ত আছে ; এই দেবত্বকে বিকশিত করিয়া সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করাই হইল শিক্ষার লক্ষ্য।**

---

৪২ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া H. H. Horne বলেন : "Reviewing now the philosophical implications of education as a world process in time, it would appear that education means that the origin of man is God, the nature of man is freedom, and the destiny of man is immortality." (Quoted by Park, *op. cit*, p. 175).

অবশ্য এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভাববাদের প্রকারভেদ আছে এবং সকল ভাববাদী ব্রহ্মের ন্যায় জীব ও জগতের উপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করেন না।

সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটার অর্থ এই নহে যে, সে সমাজবিচ্যুত হইয়া নিজের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে।[৪৩]

সমাজ সম্বন্ধে ভাববাদীরা একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং এইজন্য অনেকে সামাজিক মন (social mind)-এর কল্পনা করেন। ব্যক্তি-মন হইল সামাজিক মনেরই অংশবিশেষ। আবার ব্যক্তি-মন তথা সামাজিক মন পরম সত্তার অন্তর্গত। সুতরাং যে সত্তা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছে, যাহা সমগ্র জগতের মধ্যে প্রকাশমান, শিক্ষার মাধ্যমে তাহাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে পাওয়া যায়—শিক্ষা বলিতে নূতন কিছু পাওয়া বা নূতন কিছু সৃষ্টি করা নহে; ইহা হইল আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি।[৪৪] অর্থাৎ **পূর্ণ শিক্ষা হইল আত্মবিদ্যা।**

বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সৌন্দর্যবোধক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ রূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ আমাদের অন্তরাত্মা হইল সত্যের সাধক, নীতির সেবক এবং সৌন্দর্যের পূজারী। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্—এই তিনই হইল জীবনের চরম ও পরম কাম্য।[৪৫]

বলা বাহুল্য, ভাববাদীদের শিক্ষার কার্যসূচীতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার ফলেই ব্যক্তি-বিশেষ সামাজিক সংহতি রক্ষা করিতে পারে ও পরমাত্মার সহিত একত্ববোধ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার এই মরজীবন অসম্পূর্ণ; কিন্তু এই জীবনের মধ্যেই তাহার শেষ পরিণতি ঘটে না—সে অমরত্বের অধিকারী। সুতরাং যতক্ষণ তাহার ঈশ্বরোপলব্ধি তথা আত্মোপলব্ধি না ঘটিতেছে, ততক্ষণ তাহার অশান্ত চিত্ত শান্ত হইবে

৪৩ তুলনায়: "The development and the experiences of the spiritual life...unite individuals inwardly, the destinies of individuals receive their particular nature from such a common life." (Eucken, *Life's Basis & Life's Ideal* p. 245).

৪৪ এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, শিক্ষা অর্থে কেবল ভিতরের সুপ্ত শক্তিকে বাহিরে আনা বোঝায় না, উহা আবার বাহির হইতে ভিতরে ফিরিয়া যাওয়াও বুঝায়।

৪৫ Clutton-Brock-এর ভাষায়: "The philosophy of the spirit tells us that the spirit desires three things and desires these *for their own sake* ...It desires to do what is right for the sake of doing what is right; to know the truth for the sake of knowing the truth; and it has a third desire...the desire for beauty." (*The Ultimate Belief*, pp. 20, 21).

না। এইজন্য কেবল নৈতিক শিক্ষাই পর্যাপ্ত নহে—ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে উহার পরিণতি বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষা বলিতে কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় শিক্ষা বুঝায় না। এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের মহিমা ও ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা বলা হয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভাববাদের উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষা হইল এমনই এক প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা স্বরূপতঃ নিত্য ও মুক্ত জীবাত্মার সহিত বিশ্বমধ্যে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের সহিত সুনিবিড় সংযোগ ঘটে।[৪৬]

স্বভাববাদ ও প্রয়োগবাদ (বা উপযোগবাদ)-এর সহিত ভাববাদকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, স্বভাববাদী ও প্রয়োগবাদীদের মতে মানুষ হইল প্রতিক্রিয়াশীল জীব—সুতরাং বাহ্য পরিবেশের সহিত শিশু কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিতেছে তাহা লক্ষ্য করা এবং সেইভাবে শিশুকে পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনশীল করাই হইল শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভাববাদীদের মতে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিযোজনই শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় কথা নহে; মানুষ হিসাবে ছাত্রের প্রধান পরিচয় হইল তাহার 'ব্যক্তিত্ব' এবং তাহার 'অহং'। সুতরাং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও অহং বা আত্মার উপলব্ধিই হইল শিক্ষার উদ্দেশ্য।[৪৭] শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাববাদী ও প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষকের উচিত হইল যতদূর সম্ভব শিশুর অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে পর্যবেক্ষণ করা। ভাববাদীদের মতে শিক্ষার সকল পর্যায়েই শিক্ষক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়—শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব যাহাতে ছাত্রের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। অন্যান্য মতবাদে (বিশেষতঃ প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদে) বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভাববাদীদের বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা বলেন

৪৬ তুলনীয়: "Education is the eternal process of superior adjustment of the physically and the mentally developed, free, conscious, human being to God, as manifested in the intellectual, emotional and volitional environment of man." (H. H. Horne, *Philosophy of Education*, p. 285).

৪৭ এইজন্য ভাববাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষা হইল উপায় (means), উহা চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (goal) নহে; কিন্তু প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষাই শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য—ডিউই (Dewey)-র ভাষায়: "There is nothing to which education is subordinate save more education." (*Democracy and Education*, p. 60).

যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যেন প্রধান স্থান দান না করা হয়, কারণ বৃত্তি উপার্জনের মাধ্যমেই মানুষের পরিচয় নহে, তাহার পরিচয় তাহার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এবং এইজন্য ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই হইল শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রয়োগবাদীদের এবং বিশেষতঃ স্বভাববাদীদের কার্যসূচীতে শিশুকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দানের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার শাসন ব্যবস্থার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ভাববাদীরা যদিও কঠোর অনুশাসনের কথা বলেন না, তাহা হইলেও তাঁহারা ইহা বলিয়া থাকেন যে, ছাত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা সম্ভব নহে—তাহাকে প্রথম হইতেই বিবিধ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়া তোলা প্রয়োজন; অর্থাৎ স্বাধীনতাদানের ফলে তাহার ঔচিত্যবোধ যেন ব্যাহত না হয়।

সমালোচনা :

ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শনের বিশেষ গুণ হইল যে, ইহা মনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মন যে কেবল জৈবিক সত্তা-বিশেষ নহে, উহার যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, উহার যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে, সে বিষয়ে ইঁহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষা দ্বারা যাহাতে মনের উৎকর্ষতা সাধিত হয়, যাহাতে সমগ্র ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়, তাহার উপর ভাববাদীরা যে গুরুত্ব আরোপ করেন, তাহা সুচিন্তারই পরিচায়ক। যে শিক্ষাতত্ত্বে মনের প্রাধান্য থাকে না, তাহা স্বতঃই ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়ে। মানুষ যে কেবল পরীক্ষণযোগ্য প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্রবিশেষ নহে, তাহার যে সামগ্রিক সত্তা আছে, সে কথা ভাববাদীরা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেন। তাহা ছাড়া, সত্যের যে একটি শাশ্বত রূপ আছে, সে বিষয়েও ভাববাদীরা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে, সত্য সদা পরিবর্তনশীল; কিন্তু সত্য যদি সর্বদা পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে কোন মতবাদ বা কোন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না এবং শিক্ষার কোন সার্বিক মানদণ্ডও থাকে না।

তবে ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শের অসুবিধা এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চ আদর্শের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; এবং এই কারণ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই উচ্চ আদর্শ অনুধাবন করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ইহা এক বিশেষ প্রকারের তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics)-এর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল লেখক এই বিশেষ প্রকারের তাত্ত্বিক মতবাদ গ্রহণ করেন না।

সাধারণ মন্তব্য :

আমরা উপরে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটি দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করিলাম।[৪৮] বলা বাহুল্য, এই সকল মতবাদগুলির কোন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে এবং এইজন্য ইহাদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহার সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। তবে সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি যে, **ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহার সহিত যথাসম্ভব স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংযুক্ত করা উচিত।**[৪৯] শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল মানুষের ব্যক্তিত্বের সুসঙ্গত, পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন—এই দিক্ হইতে ভাববাদের সার্থকতা। এই বিকাশ-সাধনের সহায়ক হিসাবে প্রয়োজন স্ব-প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ, পরিবর্তিত অবস্থার সহিত উহাদের প্রতিযোজন, এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার সহিত পরিচয়। তাহা ছাড়া, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহাও দেখিতে হইবে যে, শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন পারস্পরিক বিভেদ দূর করিয়া যতদূরসম্ভব ঐক্যবদ্ধ ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন যাপন করিবার প্রচেষ্টা করে ; অর্থাৎ আন্তর্ব্যক্তিক সৌহার্দ্য শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।[৫০]

---

৪৮ আমরা উপরে যে কয়েকটি দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করিলাম, সেইগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি দার্শনিক মতবাদ আছে। একটি হইল 'যুক্তিবাদী মানবিকতাবাদ (Rational Humanism)—এই মতের সমর্থকেরা আরিষ্টটলীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলেন যে মানুষ স্বরূপত: যুক্তিশীল বা বুদ্ধিশীল জীব এবং এইজন্য বুদ্ধির বিকাশ ও উৎকর্ষতা সাধনই হইল শিক্ষা তথা শিক্ষায়তনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইরূপ আর একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হইল ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদ (Catholic Supernaturalism)—ইহার সমর্থকেরা খৃষ্টীয় ধর্মের রোমান ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষার আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। ইঁহারা বলেন যে, সত্য ও নীতি অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত এবং ঈশ্বরাদিষ্ট। সাম্প্রতিক কালের কোন কোন লেখক বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ; যথা—প্রগতিবাদ (progressivism) বা পুনর্গঠনবাদ (reconstructionism) এবং সনাতনবাদ (traditionalism) বা শাশ্বতবাদ (perennialism)। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল ভাববাদ, যুক্তিবাদ ইত্যাদি।

৪৯ অধ্যাপক রস্ (J. S. Ross) নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বলেন : 'He regards idealism as fundamental, naturalism and pragmatism as merely contributory, in the theory and practice of education." (*Groundwork of Educational Theory*, p. 83).

৫০ তুলনীয় : "...we regard education as the drawing out, nourishment, and development of the potentialities of every individual for being a loving human being who co-operatively realizes himself *in relation to the welfare of his fellows* and thus of his own best self." (Ashley Montagu, *Education & Human Relations*, p. 162).

৭। গণতন্ত্র ও শিক্ষা (Democracy and Education):

(১) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার বিশেষ তাৎপর্য:

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা জনকল্যাণের জন্য পরিচালিত হয়; সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এক বিশেষ রূপ ধারণ করে। শিক্ষা দ্বারা নাগরিকগণের মন যে পরিমাণে উন্নততর হয়, রাষ্ট্রও সেই পরিমাণে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ বহুমুখী কার্যে একত্রে অংশ গ্রহণ করে এবং পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত নূতন করিয়া নিজেদের প্রতিযোজনের চেষ্টা করে। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহাদের মধ্যে আন্তর্মানবিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, যাহাতে তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্তভাবে সামাজিক কার্য করিতে পারে। বাস্তবিক গণতন্ত্র বলিতে কেবলমাত্র শাসনপদ্ধতিই বুঝায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র বলিতে পরস্পরের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একত্রে যৌথভাবে বাস করার নৈতিক দায়িত্ব তথা অভ্যাসও বুঝায়।[৫১] অতএব বলা যায় যে, শিক্ষার ভিতর ঐক্য ও সংহতির যে আদর্শ আছে তাহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে; আবার নাগরিকেরা সুশিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলে গণতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করে।[৫২]

ইহা ছাড়া, এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন পরিচালনা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকে না—রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সকলেরই সমান অধিকার; রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বে সকলেই সমান অংশ গ্রহণ করে। এই আদর্শ যদি প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় নাগরিকেরা যত বেশী শিক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের পক্ষে ততই মঙ্গল। এইজন্য নানাদিকে নানাভাবে জনশিক্ষার প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সকল নাগরিককেই শিক্ষার সমান সুযোগ দান করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র নাগরিকের মনে জোর করিয়া

---

৫১ Dewey বলেন: "A democracy is more than a government, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience." (*Democracy & Education*, p. 101).

৫২ তুলনীয়: "Democracy and education mutually imply and demand each other. Each as it increases mutually brings the other into existence. Each is essential to the other." (Kilpatrick, *op. cit.*, 426).

বিশেষ কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ আরোপ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ নাগরিককে বৌদ্ধিক স্বাধীনতা দান করিতে হইবে।

যদিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ দান করা হয়, তাহা হইলে সকলের পক্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় না। এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরও প্রাপ্ত-বয়স্কেরা যাহাতে তাহাদের সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের সহিত বিবিধ বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেইজন্য একটি সুপরিকল্পনা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) সামাজিক শিক্ষা :

সামাজিক শিক্ষা (Social education) বলিতে কী বুঝায়? সামাজিক শিক্ষা কেবলমাত্র অক্ষরপরিচয় নহে। **সামাজিক শিক্ষা প্রধানতঃ উচ্চতর সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধীয় শিক্ষা।** সামাজিকশিক্ষা বলিতে এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি বুঝায় যাহা জনমনে সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের ভাব সৃষ্টি করিতে পারে এবং যাহার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে নাগরিক কতকগুলি কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়।[৫৩]

সামাজিক শিক্ষার পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজনীয় :

(ক) সামাজিক শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা নহে—উহা প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক উন্নতিবিধানকল্পে এমন এক সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত মঙ্গল সাধিত হয়।

৫৩ অধ্যাপক কবীর (Humayun Kabir) বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : "Social education may be defined as a course of study directed towards the production of consciousness of citizenship among the people and production of social solidarity among them...As a natural corollary, it seeks to inculcate in them a lively sense of rights and duties of citizenship both as individuals and as members of the community" (*Education in New India* p. 82).

সেইরূপ MacIver মন্তব্য করেন : "As society develops, it seems driven more and more to the final source of social security, ethical control.......Here is revealed the immense importance of social education which, becoming now of necessity an education for ethical autonomy, becomes the very basis of communal strength ..." (*Community*, p. 156).

(খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের 'ভোট'-এর অধিকার থাকে। এই অধিকার যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিপালিত হয়, সেজন্য তাহাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়ে নাগরিকদের অবহিত করা প্রয়োজন।

(গ) যে কোন নাগরিককে সুষ্ঠুভাবে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে হইলে তাহার স্বীয় দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব এই প্রকার জ্ঞানের উন্মেষ সাধন প্রয়োজন।

ঘ) কেবল নাগরিক হওয়াই কোন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নহে—তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য নীতি ও ধর্মের সর্বজনীন আদর্শগুলি সবলভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া এবং অনুসৃত হওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(ঙ) সামাজিক আদর্শের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের (বিশেষতঃ গ্রাম-বাসীদের) কুটীরশিল্প, কৃষিশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে, উচ্চতর জ্ঞান সহজ ও বোধগম্য উপায়ে দান করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, নারীদের ক্ষেত্রে শিশুপালন, গৃহাভ্যন্তরের সৌষ্ঠববৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(চ) দেহচর্চা, ব্যায়াম, ক্রীড়া, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নানা উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষার সরল নিয়মগুলি শিখাইতে হইবে।

(ছ) মানুষের পক্ষে যেমন শ্রমের প্রয়োজন, সেইরূপ অবসরেরও প্রয়োজন।[৫৪] কিন্তু অবসর থাকাই যথেষ্ট নহে—উহা সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং মনের প্রসারের পক্ষে সহায়ক হিসাবে কিভাবে অবসর বিনোদন করা যায়, সে বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন।

৫৪ জনসাধারণ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে অবসরবিনোদনের শিক্ষা (education for leisure) পায়, সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। অবসর বিনোদনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা শুনিলে, কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে উহা আলস্যে উৎসাহ দানেরই নামান্তর। কিন্তু দৈনন্দিন কর্মজীবন হইতে যদি মধ্যে মধ্যে একটু ব্যতিক্রম ঘটান না যায়, তাহা হইলে কর্মে আনন্দ পাওয়া যায় না। এইজন্য যিনি বুদ্ধিজীবী, তাঁহার পক্ষে অবসর সময় উদ্যান রচনা, ছবি আঁকা, হস্তকার্য, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চা করিলে ভাল হয়। সেইরূপ যিনি শ্রমজীবী, তাঁহার পক্ষে অবসর সময় লঘু সাহিত্য পাঠ, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চা করা ভাল। অবসর-বিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকিলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়ে, আবার অনেক সময় দৈনিক কর্মের পর, ছুটির সময় এবং বার্ধক্যে অবসর গ্রহণের পর জীবন 'শূন্য' বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ শূন্যতা-বোধ মনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতি ঘটায়।

(ঝ) শিক্ষা বলিতে কেবল জ্ঞানলাভই বুঝায় না—আবেগসমূহ মার্জিত হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, কলা, নাটক, সাহিত্য এইগুলির সহিত জনসাধারণের পরিচিতি ঘটাইতে হইবে।

সামাজিক শিক্ষার এই ব্যাপক কার্যসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ইহার জন্য বিশিষ্ট সমাজকর্মী আবশ্যক এবং প্রচারের সহায়ক হিসাবে চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, রেডিও, প্রাচীরপত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদির প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজশিক্ষার কোন পরিকল্পনা রাষ্ট্রের সাধারণ শিক্ষার পরিকল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনার আদর্শ হওয়া উচিত। এইজন্য যে সকল বিষয় বিদ্যালয়সমূহ তাহাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অন্তর্গত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে না বা বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা থাকিলেও সকলে (বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কেরা) তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না, সেইগুলির সুযোগদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত।

(৩) শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ সমস্যা :

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে কতকগুলি বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।[৫৫] শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হইলেও সকলের পক্ষে একই প্রকার শিক্ষা একইভাবে পাইবার যোগ্যতা থাকে না। এইজন্য যে সকল সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির সমাধানকল্পে জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিবিধ পদ্ধতি ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

(ক) একটি সমস্যা হইল : শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান আহরণ (scholarship) অথবা উহা আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান (general education through entertainment)? উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান সকল সময় আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে আহরণ করা যায় না এবং এজন্য যে বিশেষ প্রকারের মননশীলতার প্রয়োজন, সকলের তাহা থাকে না। সুতরাং ইহা আশা করা যায় না যে, প্রত্যেকেই কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান আহরণ করিবে; এই কারণে জনশিক্ষার বা

৫৫ Smith & Associates, *Social Problems*, Ch. 12 দ্রষ্টব্য।

সামাজিক শিক্ষা যতদূর সম্ভব সহজ, সরল এবং আনন্দদায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হইল যে, বিদ্যায়তনে প্রবেশাধিকার দানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা বিচার করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে, অথবা বিনা নির্বাচনে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ দানের ব্যবস্থা থাকার অর্থ ইহা নহে যে, ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। 'শিক্ষার সমান সুযোগদান' এবং 'সকলেই একই প্রকার শিক্ষার উপযুক্ত'—এ দুইটি সমার্থক নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার সমান সুযোগদানের তাৎপর্য হইল যে, কোন বিদ্যায়তনে প্রবেশের দ্বার কেবলমাত্র রাজনৈতিক অথবা সামাজিক অথবা ধর্মীয় কারণে কাহারও নিকট রুদ্ধ হইবে না; কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যে নিজস্ব মান আছে, তাহা কোন কারণে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না।

(গ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেহেতু সকলেরই সমান মর্যাদা থাকা উচিত, সেই হেতু কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন: শিক্ষার ক্ষেত্রেও কি মানসিক উৎকর্ষতা-নির্বিশেষে সকলেরই সমান স্থান? শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ প্রতিভার নিদর্শন দেখাইয়াছে, তাহার স্থান অন্য সকলের সহিত কি এক হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেরই সমান মর্যাদা থাকিলেও শিক্ষার যে একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, সেখানে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে, বা জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে পার্থক্য আসিয়া পড়ে। তবে এ বিষয়ে যিনি উচ্চ শিক্ষার অধিকারী, যিনি বিদ্বান, তিনি যেন বিদ্যাদর্পে দর্পিত হইয়া না পড়েন—তিনি যেন অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতদের অবহেলা বা ঘৃণার চক্ষে না দেখেন। অর্থাৎ বাস্তব সত্যতা হিসাবে মানসিক কৃষ্টির তথা শিক্ষার উৎকৃষ্টতা, অপকৃষ্টতা থাকিলেও, উহা যেন বৌদ্ধিক আভিজাত্যের সৃষ্টি না করে।

মোট কথা, এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমান নাগরিকত্বের অধিকারের অর্থের এইরূপ অপব্যাখ্যা করা যেন না হয় যাহার ফলে শিক্ষার উৎকর্ষতা-অপকর্ষতা, বুদ্ধির প্রাখর্য-অপ্রাখর্যের প্রভেদ অস্বীকৃত হয়। বৌদ্ধিক উৎকর্ষতাকে উচ্চতর মান দান করিলে জনসাধারণের মনেও আত্মোন্নতির বাসনা জাগিবে।

৮। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা (Educational System of Ancient India) :

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (পৃঃ ১৮৩) প্রাচীন ভারতে হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম ছিল হিন্দুর সামাজিক জীবনের আদর্শ —সমাজমধ্যে চারিটি বর্ণ এবং চারিটি আশ্রম স্বীকৃত হইত। ব্যক্তি-বিশেষ বয়ঃক্রম অনুসারে এক একটি আশ্রমে জীবন অতিবাহিত করিত। চারিটি আশ্রমের প্রথম আশ্রম হইল ব্রহ্মচর্যাশ্রম—প্রাচীন হিন্দু ভারতের শিক্ষার আদর্শ বুঝিতে হইলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

বর্তমান কালে আমরা যে প্রকার বিভিন্ন শিক্ষায়তন দেখিতে পাই বৈদিক যুগের ভারতে সেরূপ শিক্ষায়তন ছিল না। গুরুর গৃহে বাস করিয়া, গুরুর পরিচর্যা করিয়া, গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করাই ছিল তদানীন্তন রীতি। ব্রাহ্মণ গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া আবার অন্যকে শিক্ষা দিতেন। প্রতি গুরুর গৃহই এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং ইহার নাম ছিল গুরুকুল। লোকালয় হইতে দূরে অরণ্যের নিকটবর্তী স্থানে শান্ত পরিবেশের মধ্যে গুরুর গৃহ বা আশ্রমই ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎস।[৫৬]

সাধারণতঃ সমিধ্ বা যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া শিষ্য গুরু সকাশ গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিত। গুরু তাহার বংশপরিচয় লইয়া তাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে শিষ্যরূপে তাহাকে গ্রহণ করিতেন। অনেক সময় বিশেষ গুরুর নিকট শিক্ষালাভের বাসনায় শিষ্য বহু দূরদেশে গমন করিত। সাধারণতঃ দ্বিজরাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার লাভ করিত।

(১) গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য :

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিষ্যকে অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করিতে হইত। শিষ্যকে গুরুর আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার গৃহকর্ম করিতে হইত, যেমন, গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইত, তাঁহার গোধন রক্ষা করিতে হইত, যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ আনয়ন করিতে

৫৬ প্রকৃতির ক্রোড়ে অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষার বিকাশকে বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "In these forests though there was human society, there was no jostling. Still this aloofness did not produce inertia in the Indian mind, rather it rendered it all the brighter...The current of civilisation that flowed from its forests innundated the whole of India."

হইত, তাঁহার জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে হইত। ভিক্ষান্ন গুরুকে অর্পণ করিবার পর নীরবে, সন্তুষ্টচিত্তে এবং নির্লোভ হইয়া ভোজন করিবার নির্দেশ ছিল।

তাহা ছাড়া, শিষ্যকে সর্বতোভাবে গুরুর আজ্ঞাবহ থাকিতে হইত। গুরুকে প্রতিবাদ করিবার অধিকার শিষ্যের ছিল না। গুরু অপেক্ষা শিষ্যকে নিম্ন আসনে উপবেশন করিতে হইত। গুরুর সমক্ষে শিষ্যের পক্ষে পদযুগল সম্প্রসারিত করিয়া বসিবার বা অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকিবার অধিকার ছিল না। গুরুর পূর্বে শিষ্যকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত এবং গুরুর পর তাহাকে শয়ন করিতে হইত। গুরুর প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত, আবার গুরুকে দণ্ডায়মান দেখিলেও আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। গুরু যদি ভ্রমণ করিতেন, তাহা হইলে শিষ্য তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে তাঁহার অনুবর্তী বা পশ্চাদ্বর্তী থাকিত। শিষ্য গুরুর নাম উচ্চারণ করিত না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুরুর পদযুগল শিষ্যকে বন্দনা করিতে হইত। গুরুপত্নী ও গুরুগৃহের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য ছিল।[৫৭]

(২) শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্তব্য :

শিষ্যের যেমন গুরুর প্রতি কর্তব্য ছিল, গুরুরও সেইরূপ শিষ্যের প্রতি কর্তব্য ছিল। গুরু শিষ্যের নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না; তবে শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুগৃহ ত্যাগকালে শিষ্য তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিতে পারিত। গুরু শিষ্যকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। গুরু কখনও শিষ্যকে কোন স্বার্থসিদ্ধির কার্যে নিয়োগ করিতেন না। গুরু শিষ্যকে সর্ববিষয়ে যথাসাধ্য জ্ঞান দানের প্রচেষ্টা করিতেন এবং শিক্ষাতথ্যের কোন বিষয় গোপন করিতেন না। শিক্ষক ছাত্রের প্রতি কর্কশ আচরণ করিতেন না এবং অন্যায়ের জন্যও শিষ্যকে কোন কঠোর দৈহিক শাস্তি দান করিতেন না।[৫৮]

---

৫৭ গোতমস্মৃতি, ২য় অধ্যায়, ২৩-২৭, ৩৫-৪১ দ্রষ্টব্য।

৫৮ প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক ছিল মধুর; ইহার মধ্যে রুক্ষতা বা কর্কশতার কোন স্থান ছিল না। Dr. F. E. Keay মন্তব্য করিয়াছেন: "The pupil was under a somewhat vigorous discipline, but there was nothing harsh or brutal about it and a high ideal of moral life and character was held before both pupil and teacher. The latter had no mercenary motive to impel him to teach, but was to perform his office solely as a duty... ; and the pupil on the other hand, was trained to a simple life, whether he was rich or poor, and habits of discipline, reverence and self-respect were inculcated." (*Indian Education in Ancient & Later Times*, pp. 24. 25)

(৩) শিষ্যের সাধারণ কর্তব্য :

শিষ্যের সর্বপ্রধান কর্তব্য হইল অধ্যয়ন। কিন্তু শিক্ষাকে যদি সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে দেহ ও মনকে তাহার উপযুক্ত করিতে হয় এইজন্য শিষ্যের পক্ষে দৈহিক, নৈতিক ও ধর্মীয় কতকগুলি কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিষ্যের নিত্য প্রাতঃকালে হস্তমুখপ্রক্ষালন করা এবং শীতল জলে স্নান করা, অতিভোজন বা গুরুভোজন পরিহার করা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইত। সেইরূপ ছাত্রদের সর্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইত—যেমন, মধুপান, মাংসভোজন, মাদকদ্রব্য সেবন, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার, হিংসামূলক আচরণ, নৃত্যগীতে কালযাপন, দিবানিদ্রা, উচ্চৈঃস্বরে হাস্যকরা, হাই তোলা, আঙুল মটকান, ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া, সদা সত্যভাষণ এবং কর্কশ বচন পরিহারও শিষ্যের কর্তব্য ছিল। ইন্দ্রিয়-সংযম (বিশেষতঃ কঠোর ভাবে কামকে নিয়ন্ত্রিত করা) শিষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। পোষাক পরিচ্ছদও নিতান্ত সরল থাকিত—কয়েক প্রকারের সাধারণ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানের অধিকার ছিল। কেশবিন্যাসেও কোন বিলাসিতা থাকিত না—কেহ কেহ চূড়া বাঁধিত আবার কেহ কেহ সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডিতমস্তক থাকিত। যদিও অধ্যয়নই শিষ্যের প্রধান কর্তব্য ছিল, তাহা হইলেও কতকগুলি কারণে অনধ্যায়ের অনুমতি দেওয়া হইত (যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়)। ইহা ছাড়া, শবদাহক্ষেত্রে, গ্রামের উপকণ্ঠে, পথিমধ্যে পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। সেইরূপ শিষ্যের শারীরিক অসুস্থতা ঘটিলে, এমন-কি কোন কোন স্থলে একই বিষয় অধ্যয়নকারী সতীর্থের পীড়াতেও পাঠ বন্ধ থাকিত।

(৪) অধ্যয়নকালের স্থায়িত্ব :

সাধারণতঃ দ্বাদশবর্ষকাল অধ্যয়নই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পক্ষে পর্যাপ্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হইত।[৫৯]

৫৯ কোন কোন মতে প্রতি বেদ অধ্যয়নের জন্যই দ্বাদশবর্ষ প্রয়োজন; তাহা হইলে চারিটি বেদ অধ্যয়নের কাল দাঁড়ায় আটচল্লিশ বৎসর। এমন কি যদি অথর্ববেদকে বাদ দেওয়াও যায়, তাহা হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদ অধ্যয়নের জন ছত্রিশ বর্ষ প্রয়োজন। সম্ভবতঃ এত দীর্ঘকাল ধরিয়া খুব কম ছাত্রই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিত; সাধারণের জন্য দ্বাদশবর্ষই সকল বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপনান্তে শিষ্যের স্নাতক অনুষ্ঠান হইত। এই অনুষ্ঠানের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে তাহার প্রবেশাধিকার হইত। কাহারও যদি সংসারে বৈরাগ্য ঘটিত, তাহার পক্ষে একেবারে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দেওয়া হইত।

(৫) **অধীতব্য বিষয় :**

প্রাচীন ভারতে বেদাধ্যয়নের উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত; কিন্তু কেবল বেদাধ্যয়নই যথেষ্ট জ্ঞান করা হইত না। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পরাবিদ্যাতেই পরমতত্ত্ব আলোচিত হয়—পরাবিদ্যাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। অপরাবিদ্যাতে অন্য সকল বিষয় আলোচিত হয়। সুতরাং পরাবিদ্যা অধ্যয়নই জ্ঞানের শেষ সোপান বা চরম লক্ষ্য; কিন্তু পরাজ্ঞানলাভের পূর্বে অপরাবিদ্যা সমুদয় প্রথমে ব্যাপকভাবে আলোচিত হইত।[৬০]

সে যুগে যে সকল বিষয় পঠনপাঠন চলিত, তাহার একটা আভাষ আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথন হইতে পাই; যথা—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, যুক্তিশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র, একায়ন (বা নীতিবিদ্যা), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এবং দেবজনবিদ্যা।[৬১]

শিক্ষার চরম লক্ষ্য হইল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা। যে ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে পরমার্থস্বরূপ অক্ষরপুরুষকে জানা যায় সেই সম্বন্ধে শিষ্যকে যথাযথ জ্ঞানদান করাই

৬০ তুলনীয় : "There was no real antagonism between the sacrificial cult, the scheme of practical life and the *Upanishadic* quest of the *Brahman* or *Atman*. On the other hand, since one is a preliminary to the other, the supreme importance of Parāvidyā is revealed." (Bereday & Lauwerys, *op. cit.*, p. 318).

৬১ সেইরূপ মুণ্ডকোপনিষদে আমরা বর্ণনা পাই যে, গৃহস্থশ্রেষ্ঠ শৌনক অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ বস্তু সুবিদিত হইলে সকল বস্তু জানা যায়?" তখন অঙ্গিরা উত্তর দিলেন, "দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে—একটি পরা, অপরটি অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ—এইগুলি হইল অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা হইল সেই বিদ্যা যাহার দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়।" (মুণ্ডক; ১।১।৩-৫)। [এস্থলে 'শিক্ষা' বলিতে বর্ণোচ্চারণ বিষয়ক গ্রন্থ, 'কল্প' বলিতে শ্রুতি অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠানজ্ঞাপক সূত্র গ্রন্থ, 'নিরুক্ত' বলিতে বৈদিক পদের অর্থজ্ঞাপক গ্রন্থ এবং 'ছন্দ' বলিতে গায়ত্র্যাদি ছন্দের গ্রন্থ বুঝায়।]

ছিল গুরুর কর্তব্য।[৬২] বলা বাহুল্য, এরূপ গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ গুরু-শিষ্যের হৃদয়ের সংযোগের ফলেই সম্ভবপর হইতে পারিত।

(৬) শিক্ষণ-পদ্ধতি :

প্রাচীন ভারতের শিক্ষণ-পদ্ধতি বর্তমান যুগের শিক্ষণ-পদ্ধতি হইতে ভিন্ন ছিল। প্রাচীনযুগে সাধারণতঃ মৌখিক পদ্ধতিই অনুসৃত হইত। এই কারণে নির্ভুল উচ্চারণ পূর্বক আবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। অধীতব্য বিষয়বস্তু এইভাবে স্মৃতির মধ্যে গ্রথিত করিয়া রাখা হইত।[৬৩] গুরুর সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের নিগূঢ় বিষয়বস্তু তিনি যেরূপ তাঁহার গুরুর নিকট শিখিয়াছিলেন, সেইরূপ জ্ঞান তাঁহার শিষ্যকে দান করা। এইভাবে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হইত।[৬৩]

আবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও ইহাই একমাত্র পদ্ধতি ছিল না। শিষ্যের মধ্যে যাহাতে মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা বর্ধিত হয়, সেইজন্য প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসৃত হইত, অর্থাৎ কথোপকথনচ্ছলে গুরু ও শিষ্য পরস্পরকে প্রশ্ন করা এবং সেই প্রশ্নগুলির আলোচনা দ্বারা কঠিন বিষয়গুলি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইত।[৬৪] কিন্তু

---

৬২ তুলনীয় : "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১৩)

৬৩ প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে আবৃত্তি ও স্মৃতি শক্তির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইত, সেই বিষয় মন্তব্য করিয়া অধ্যাপিকা বসু বলেন : "The spread of the sacred text was completely controlled by those who committed them to memory... Oral learning thus raised the authority of the teacher...Secondly, since Indian culture was not stored in books or libraries, it suffered neither material injury nor destruction...Thirdly, the teacher redeemed his obligation to his *Rishi* by finding proper students and by teaching. It was his solemn duty—a supremely religious one—to take a number of students and pass on to them all he knew." (Bereday & Lauwerys, *op. cit.*, Dr. S. Basu's Art. on 'Forest Universities of Ancient India', pp. 323-24).

৬৪ তুলনীয় : "At the beginning of each lecture the pupils embrace the feet of their teacher and say, Read, Sir. The teacher answers, *Om*, Yes, and then pronounces two words, or if it is a compound one. When the teacher has pronounced one word, or two, the first pupil repeats the first word; but if there is anything that requires

পরাবিদ্যার আলোচনা কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়া সম্পূর্ণ হয় না—ইহার জন্য প্রয়োজন শিষ্য কর্তৃক আত্মোপলব্ধি; এইজন্য তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। সুতরাং না বুঝিয়া মুখস্থ করাকে কোন উৎসাহ দান করা হইত না; বরং বলা হইত যে, ভস্মের উপর শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড দান করিলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায় না, সেইরূপ যেখানে বৌদ্ধিক বিচার নাই সেখানে কেবল আবৃত্তি দ্বারা জ্ঞান জন্মে না।

(৭) **স্ত্রী-শিক্ষা:**

বৈদিক যুগে স্ত্রী-শিক্ষার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত। শিক্ষার ক্ষেত্রে নর ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার ছিল। নারীও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিত। সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া অনেক নারী ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর নারী গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিবাহের পরও অনেক নারী উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে নারীর অধিকার খর্ব করা হয় নাই।

(৮) **শিক্ষার উদ্দেশ্য:**

সমাজ ও সংসারের প্রতি উদাসীন বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত সৃষ্টি করা প্রাচীন বৈদিক যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না—শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ। আচারের দ্বারা, সংযমের দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যত্বকে বিকশিত করা এবং মনুষ্য মধ্যে সুপ্ত দেবত্বকে জাগ্রত করাই ছিল সে যুগের শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষা সমাপনান্তে ভাবী জীবনে শিষ্য যাহাতে সমাজের উপযুক্ত হইয়া নিস্পৃহভাবে স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে পারে, সেই দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হইত। বেদাধ্যাপনের পর শিষ্যকে গুরু যে উপদেশ দিতেন তাহা হইতেই ঐ প্রকার শিক্ষার তাৎপর্য তথা উদ্দেশ্য বুঝা যায়; গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন[৬৫]—"সত্য বলিবে,

explanation, the pupil says, Sir; and after it has been explained to him, (the teacher says) *Om*, Yes. In this way they go on till they have finished a *pras'na* (question)......" (Max Müller, *Lectures on the Origin of Religion*, p. 159).

৬৫ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ১।১১।১-৪

ধর্মানুষ্ঠান করিবে, অধ্যয়নে প্রমাদ করিও না। গার্হস্থ্যাশ্রমে যাইয়া সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। আত্মরক্ষা সম্বন্ধে অনবহিত হইবে না। মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, অতিথিদেব হও। ব্রাহ্মণকে পরিচর্যা করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে, বিনম্রভাবে, সামর্থ্যানুসারে, সভয়ে, মিত্রব্যবহার সহকারে দান করিবে। কোন বিষয় সংশয় উপস্থিত হইলে কর্মনিষ্ঠ, অক্রূরমতি, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ যেরূপ করেন, সেইরূপ করিবে—ইহাই হইল বেদের রহস্য এবং ঈশ্বরাজ্ঞা।" সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক এবং আত্মিক এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে করা হইত।[৬৬]

বর্তমান যুগে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন পদ্ধতি গ্রহণ না করিতে পারিলেও ইহার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, চারিত্রিক উন্নতি, গুরুভক্তি, সামাজিক কল্যাণ, আধ্যাত্মিক বিকাশ ইত্যাদি যে সকল আদর্শ পরিপালিত হইত, সেইগুলি আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

---

৬৬ আমরা এস্থলে প্রধানতঃ প্রাচীন হিন্দুদের শিক্ষার আদর্শের উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পর উহার অনুশাসন অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহা নিয়মানুবর্তিতা, কৃচ্ছ্রতাসাধন, গুরুর অনুগামিতা ইত্যাদি বিষয় হিন্দুদের আদর্শের সমতুল্য ছিল। তবে বৌদ্ধধর্ম বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না বলিয়া বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেদাধ্যয়নের স্থান ছিল না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে দ্বিজরাই শিক্ষার অধিকারী ছিল, বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ প্রথা না থাকায় উহা সকলেরই জন্য প্রযোজ্য ছিল। বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষুগণ আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। বেশভূষা, আচারনিষ্ঠা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কঠোরতা পালন করিতে হইত এবং ঐকান্তিকভাবে গুরু সেবা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহা ছাড়া, সর্বতোভাবে সঙ্ঘের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলে শিক্ষার প্রাথমিক অধিকার মিলিত।

নবম অধ্যায়

কৃষ্টি ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা

যে কোন যুগের, যে কোন স্থানের মানব-সমাজ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রতি মানব-সমাজেরই নিজস্ব একটি কৃষ্টি বা সংস্কৃতি আছে এবং উহাই তাহার অন্যতম পরিচায়ক। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে সমাজবদ্ধতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহার কৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। মানুষ যখন সমাজ মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তখন হইতেই তাহার সামাজিকীকরণ আরম্ভ হয় (পৃঃ ৮৬) এবং এই সামাজিকীকরণের ফলে সে সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি-বিশেষ সমাজ মধ্যে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহার ফলে তাহার মনোমধ্যে সামাজিক কৃষ্টির আত্তীকরণ (assimilation) ঘটে। সুতরাং ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার ও তাহার সমাজের কৃষ্টির সহিত পরিচয় ঘটে। এইজন্য সমাজদর্শনের আলোচনায় কৃষ্টি ও কৃষ্টিমূলক সংস্থার অবদান এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

১। কৃষ্টি বা সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of culture):

আমাদের দৈনন্দিন আলাপ আলোচনায় আমরা 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি' পদটি প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি, অথচ ইহার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দান করা কঠিন।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক্ হইতে 'কৃষ্টি' বলিতে এমন এক অবস্থা নির্দেশ করে যাহা কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত।[১] সেইরূপ 'সংস্কৃতি'-পদটির অর্থ হইল যাহা 'সংস্কার' বা 'মার্জনা'-র ফলে প্রাপ্ত। সুতরাং 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কার' হইল শিক্ষা বা চর্চার ফলে বুদ্ধি, রুচি, নীতি ইত্যাদির মার্জিত ও উন্নততর অবস্থা; অর্থাৎ কৃষ্টি হইল সুরুচি ও সুশিক্ষার পরিচায়ক—ইহা সকল প্রকার অশিক্ষা, রুক্ষতা, অভদ্রতা, রূঢ়তা ইত্যাদির বিপরীত অবস্থা।[২]

১ 'কৃষ্টি'-পদের ইংরাজি প্রতিশব্দ হইল 'culture'; উহা লাতিন *colo*-পদ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—উহার অর্থ হইল 'to cultivate' বা কর্ষণ করা।

২ তুলনীয়: "Culture means at least something cultivated, something ripened; it is *opposed to the raw and crude.*" (*Democracy & Education*, p. 142).

কৃষ্টি-পদটির প্রচলিত অর্থ এইরূপ হইলেও নৃতত্ত্ব (anthropology) এবং সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিদ্যা (sociology)-তে ইহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়; ব্যাপক অর্থে **'কৃষ্টি' বলিতে যে কোন সমাজের প্রচলিত ব্যবহার বুঝায়—যে কোন সমাজের কার্যাবলী, ভাবধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ সব কিছুই কৃষ্টির পরিচায়ক**; কোন সমাজের সমষ্টিগত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নিয়ম, প্রথা, বা যে কোন বিষয় দক্ষতা উহার কৃষ্টির অন্তর্গত। কৃষ্টির ধারা সমাজমধ্যে বংশপরম্পরায় এক যুগ হইতে অপর যুগে চলিতে থাকে। কৃষ্টির ফলে মানুষের মনে বিশেষ প্রকারের আদর্শ ও মূল্যবোধের ধারণা জাগরিত হয়।[৩] ব্যাপক অর্থে কৃষ্টিপদের প্রয়োগের এই যৌক্তিকতা হইল যে, মানুষ যাহা কিছু করে, এক হিসাবে তাহাই সে কোন-না-কোন ভাবে মানসিক বৃত্তির চর্চার ফলে লাভ করে—এমন কি প্রস্তর যুগের মানুষও যাহা করিত, তাহাও সে তাহার মানসিক বৃত্তির চর্চার ফলে লাভ করিয়াছিল।

৩ নিম্নলিখিত বিভিন্ন সংজ্ঞায় কৃষ্টি পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :

(ক) "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." (E. B. Tylor, *Primitive Culture*, p. 1).

(খ) "Cultures may be described in terms of historically derived patterns and socially valued habits for which data may be found in all human activities and functions including political institutions and rules of law, constructions and influences of the fine arts, religious rites and dogmas and all forms of intellectual enquiry and speculation." (*Interrelation of Cultures*, UNESCO Publication, p. 11).

(গ) "The culture of a society is the way of life of its members, the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from generation to generation. Culture provides the members of each generation with effective, readymade answers to most of the problems with which they are likely to be confronted. These problems, in turn, stem from the needs of individuals living as members of organized groups." (*The Science of Man in the World of Crisis*, Ed. by Linton, p. 203).

(ঘ) "Culture embraces *all the manifestations* of social habits of a community, the reactions of the individual as affected by the habits of the group in which he lives, the products of human activities as determined by these habits." (Art. on Anthropology, *Encyclopaedia of Social Sciences*.)

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যাপক অর্থে কৃষ্টি বলিতে কেবল শিক্ষা বুঝায় না—শিক্ষা উচ্চতর কৃষ্টির পরিচায়ক। প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা আদিম জাতির মধ্যে ঘটে নাই, কিন্তু তাহাদেরও উপরে বর্ণিত অর্থে কৃষ্টি আছে। আবার কৃষ্টি বলিতে কেবলমাত্র সভ্যতা বুঝায় না—কৃষ্টি সভ্যতা অপেক্ষা ব্যাপকতর। সমাজমধ্যে যখন সংহতি, ঐক্য, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তখন উহাকে সভ্য বলে। সুতরাং সভ্যতা উন্নততর কৃষ্টির প্রকাশক। সেইরূপ কৃষ্টি বলিতে কেহ কেহ নৃত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদি কলা সমূহ বুঝেন; কিন্তু যদিও এইগুলি কৃষ্টির পরিচায়ক, তাহা হইলেও এইগুলিই কৃষ্টির একমাত্র পরিচায়ক নহে—কারণ ব্যাপক অর্থে সকল প্রতিযোজনমূলক আচরণকেই কৃষ্টি আখ্যা দেওয়া হয়।

অতএব, বলা যাইতে পারে যে, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'কৃষ্টি'-র ব্যাপক তাৎপর্য নিম্নলিখিতরূপ :

(ক) সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ যাহা কিছু শিখিয়াছে, যাহা কিছু আয়ত্ত করিয়াছে, যে ভাবে সামাজিক সংহতি ও সংগঠন সাধন করিয়াছে, তাহাই তাহার কৃষ্টির পরিচায়ক।

(খ) সামাজিক গোষ্ঠী মধ্যে যাহা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাপ্রণালী বলিয়া প্রচলিত, তাহাই ঐ গোষ্ঠীর কৃষ্টির পরিচায়ক। সুতরাং কোন গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা যেভাবে কৃষিকার্য করে, যে সকল শিল্প উৎপাদন করে, যে সকল কারুশিল্প রচনা করে, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, যে ভাবে বাসস্থান নির্মাণ করে, যে ভাবে আহার্য সংগ্রহ করে, যে সকল প্রথা, আচার-ব্যবহার পালন করে, সেগুলি সবই তাহাদের কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এইগুলিকে বলা যায়, তাহাদের কৃষ্টির বাহ্যরূপ।

(গ) আবার, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ যে সকল বিভিন্ন আদর্শ—যথা, রাষ্ট্রের আদর্শ, নীতির আদর্শ, সৌন্দর্যের আদর্শ, ধর্মের আদর্শ—অনুসরণ করে এবং ঐ সংক্রান্ত যে সকল নিয়ম পালন করে, সেগুলি সবই তাহার কৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে।

(ঘ) কৃষ্টির অন্যতম বাহক হইল ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা পরস্পরের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারে, এক যুগের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ অন্যযুগে বাহিত হইতে পারে, অতীতের সহিত বর্তমানের এবং বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের যোগসূত্র স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভাষা হইল কৃষ্টির একটি প্রধান পরিচায়ক। যে সকল মনুষ্যেতর প্রাণী সমাজবদ্ধভাবে

বাস করে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃষ্টি গঠিত না হইবার একটি প্রধান কারণ হইল ভাষার অভাব।

(ঙ) কৃষ্টির আর একটি বাহক হইল সামাজিক প্রথা (social customs)। এইজন্য বলা যায় যে, সামাজিক প্রথাগুলি হইল কৃষ্টির বাহকস্বরূপ কতকগুলি আচরণ।[৪] পারস্পরিক ভাবের আদান ও সামাজিক প্রথার মাধ্যমে কৃষ্টি পরিবাহিত হয় বলিয়া কৃষ্টিমাত্রই সামাজিক সম্প্রদায় মধ্যে মোটামুটি একটি সর্বজনীন রূপ ধারণ করে।

(চ) কৃষ্টি কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সহজাত নহে। ব্যক্তি-বিশেষ যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবেশের সহিত মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সে উহা গ্রহণ করে। অর্থাৎ যে অর্থে শিশু জন্মের সময় তাহার পিতামাতার মাধ্যমে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, অথবা যে অর্থে সে কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে অর্থে কৃষ্টি জন্মগত নহে।

(ছ) কৃষ্টির প্রভাব ব্যক্তি-মনের উপর থাকিলেও উহা ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ নহে। প্রতি সামাজিক গোষ্ঠীতেই এক একটি কৃষ্টির ধারা অতীত হইতে বর্তমান এবং বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলিয়াছে। প্রতি যুগেই পুরাতনের কিছু পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং উহার সহিত নূতন কিছু সংযুক্ত হইতেছে। যে কোন গোষ্ঠীর বর্তমান কৃষ্টি হইল নূতন ও পুরাতনের সঙ্গমস্থল।

(জ) কৃষ্টির পরিচয় যদিও বাহ্য আচরণের মাধ্যমে, তাহা হইলেও উহা প্রধানতঃ মানসিক। এক এক প্রকার কৃষ্টির প্রভাবে এক এক প্রকার মূল্যবোধ (value sense)-এর সৃষ্টি হয় ; অর্থাৎ এক এক প্রকার পরিবেশের প্রভাবে মানুষ যে কৃষ্টির সৃষ্টি করে, তাহাই তাহার মূল্যায়নের ক্ষমতা নির্ধারণ করে। এইজন্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারবাদ (behaviorism)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন দেশের কৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না।[৫] কৃষ্টিমাত্রই একটি ঐতিহ্য (tradition)-এর সৃষ্টি করে এবং মনই এই ঐতিহ্যের বাহক।

---

৪ Kroeber-এর ভাষায়: "Custom is a psycho-biological habit on a social scale carrying cultural values." ('The Concept of Culture in Science,' *The Journal of General Education*—1949—p. 185).

৫ তুলনীয়: "The purely behavioristic definition of culture is inadequate. Complete definition must include both the subjective and objective aspects of culture......Tradition, as the subjective side of culture, is its essential core." (Fairchild, *Dictionary of Sociology*, Art. on Culture.)

(ঝ) কৃষ্টির দুইটি দিক্ আছে—একটি বাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সংক্রান্ত (material) এবং অপরটি মানস (internal, non-material বা mental)। মানুষ স্বীয় কার্যকুশলতা দ্বারা যে সকল বস্তু উৎপন্ন করে এবং যেগুলির উপর সে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন মূল্য আরোপ করে, সেগুলি হইল বাহ্যবস্তুর মাধ্যমে কৃষ্টির পরিচায়ক। কৃষ্টির যে অংশ মূল্য, বিশ্বাস, ধারণা ইত্যাদি নির্দেশ করে, তাহা হইল কৃষ্টির মানস দিক্। অবশ্য কৃষ্টির যাহা বাহ্য প্রকাশ, তাহা হইল মানসিক ধারণা ও মূল্যবোধের প্রকাশক; সুতরাং কোন বিশেষ প্রকারের কৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে উহার মানস পটভূমি আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ঞ) আদিম এবং বর্তমান বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কৃষ্টি পর্যালোচনা করিলে আমরা বহু বিচিত্র আচারব্যবহার, শিল্প, কলা, দক্ষতা, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির পরিচয় পাই। প্রতি কৃষ্টির এক নিজস্ব রূপ (বা প্যাটার্ণ) আছে। এই সকল বৈচিত্র্য অনুধাবন করিলে আমরা বৈচিত্র্যের পশ্চাতে ঐক্যও আবিষ্কার করি। আবার কোন কৃষ্টিই সম্পূর্ণরূপে কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। গোষ্ঠী মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন ভাবের আদানপ্রদান ঘটিতে থাকে, সেইরূপ এক গোষ্ঠীব সহিত অপর গোষ্ঠীর, এক সম্প্রদায়ের সহিত আর এক সম্প্রদায়ের মিথক্রিয়ার ফলে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়বিশেষের কৃষ্টি বিস্তার লাভ করে এবং পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হইতে থাকে।

২। কৃষ্টিমূলক উপাদান ও প্রলক্ষণের শ্রেণীকরণ (Classification of Cultural Facts & Traits):

কৃষ্টির পরিচায়ক প্রলক্ষণগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—কৃষ্টির বাহ্য বা বস্তুকেন্দ্রিক প্রলক্ষণ (material traits) ও মানস প্রলক্ষণ (mental or non-material traits)। কোন কোন লেখক এইগুলিকে বিস্তারিতভাবে তালিকাবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক উইস্লার্ (Wissler) ইহাদের নিম্নলিখিত-ভাবে তালিকাবদ্ধ করিয়াছেন[১]:

(ক) বাচনভঙ্গিমা (Speech)—ভাষা ও লিপি,

(খ) জড়বস্তুর আহরণ ও ব্যবহারপদ্ধতি (Material Traits)—খাদ্য, বাসস্থান, পরিবহন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘট, পট ইত্যাদি পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, কৃষিশিল্প ইত্যাদি।

• Wissler, *Man and Culture*, p. 74.

(গ) কলা (Art)—খোদাই, কারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি।

(ঘ) উপকথা, গাথা, কাহিনী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

(ঙ) ধর্মীয় আচার।

(চ) পরিবার ও পারিবারিক প্রথা—বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

(ছ) সম্পত্তি—ভূসম্পত্তি, মুদ্রা, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি।

(ঝ) রাষ্ট্র—শাসনব্যবস্থা, আইন, বিচার পদ্ধতি।

(ঞ) যুদ্ধপদ্ধতি।

অপর একদল লেখক নিম্নলিখিত শ্রেণীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন—

(ক) অভিজ্ঞতামূলক (Inductive) উপাদান—মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগের ফলে যাহা কিছু উদ্ভাবন করে (শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি), সেগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) সৌন্দর্যবোধক (Aesthetic) উপাদান—নৃত্য, গীত, অভিনয় এবং অন্যান্য আমোদপ্রমোদ এই শ্রেণীভুক্ত।

(গ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) সূচক উপাদান—রাষ্ট্র ও শাসন পদ্ধতি, নীতি, ধর্ম ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩। কৃষ্টি, সভ্যতা, শিক্ষা, প্রথা ও কলা (Culture, Civilisation, Education, Custom & Art) :

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে কৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'কৃষ্টি' পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদিও আমরা আমাদের প্রচলিত কথাবার্তায় কৃষ্টি, সভ্যতা, শিক্ষা ইত্যাদি পদগুলি সমার্থক ভাবে ব্যবহার করি, তাহা হইলেও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কৃষ্টি-পদটি সভ্যতা, শিক্ষা প্রভৃতি হইতে পৃথক।

(ক) কৃষ্টি ও সভ্যতা :

'সভ্যতা'-পদটি সাধারণতঃ কোন কৃষ্টির উন্নততর অবস্থা নির্দেশ করে। যেখানে কৃষ্টির প্রগতির ফলে উচ্চতর জ্ঞানের, নীতিবোধের, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আবির্ভাব ঘটে, যেখানে উচ্চতর জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, মানুষের প্রয়োজনে তাহার উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে বলা যায়। কৃষ্টির যে পর্যায়ে জ্ঞানের

উৎকর্ষতা ও প্রসারের সহিত অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেই পর্যায় হইতেই সভ্যতার প্রারম্ভ বলা যায়।[৭]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে কোন পূর্ণ বৈপরীত্য নাই; উহাদের পার্থক্য আপেক্ষিক।** তবে কৃষ্টি সভ্যতা অপেক্ষা ব্যাপকতর। কৃষ্টি আছে, অথচ সভ্যতার বিকাশ ঘটে নাই—ইহা সম্ভব; আদিম যুগের মানুষের মধ্যে আমরা এরূপ সম্ভাবনা দেখি। অপর পক্ষে, সভ্যতা আছে, অথচ কোন কৃষ্টি নাই, এরূপ হইতে পারে না; কারণ সভ্যতা হইল কৃষ্টির পরবর্তী স্তর বা অগ্রগতির ফল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্টির ব্যাপক পটভূমিতেই সভ্যতার বিকাশ সাধন ঘটে।[৮]

এখন প্রশ্ন হইতে পারে: কৃষ্টি ঠিক কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হইলে উহাকে সভ্যতার নির্দেশক বলা যাইতে পারে?[৯] ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নহে। তবে সাধারণভাবে আমরা কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি যেগুলির প্রকাশ ঘটিলে বলা যায় যে, কৃষ্টি-বিশেষ সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে[১০]:

---

৭ উইল্ ডুরাণ্ট (Will Durant)-এর ভাষায়: "It (civilization) is a complex of security and culture, of order and liberty; political security through morals and law, economic security through the continuity of production and exchange, culture through facilities for the growth and transmission of knowledge, manners and arts." (*The Pleasures of Philosophy*, p. 262).

৮ সভ্যতাকে কৃষ্টির উন্নততর পর্যায়রূপে ব্যাখ্যা করিয়া ম্যালিনোস্কি (B. Malinowski) বলেন: "The word culture is at times used synonymously with civilization, but it is better to use the two terms distinctively, reserving civilization for a special aspect of *more advanced* cultures." (Art. on Culture, *Encyclopaedia of Social Sciences*).

'সভ্যতা'-পদের ইংরাজি প্রতিশব্দ হইল civilization; ইহা লাতিন 'civilis'-পদ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। civilis-পদের অর্থ হইল 'নাগরিক'; সুতরাং দেখা যাইতেছে, কৃষ্টির বিবর্তনের ফলে যে পর্যায়ে অনবিস্তর সংহতিপূর্ণ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, সে পর্যায়কে সভ্যতার অন্যতম নির্দেশক বলা যায়।

৯ L. H. Morgan মনে করেন যে কৃষ্টির বিবর্তন সাতটি স্তরের মধ্য দিয়া ঘটিয়াছে এবং সর্বশেষ স্তর হইল সভ্যতা।

১০ তুলনীয়: "...Civilization refers to an advanced stage of human society......Man is civilized when he ceases to be a hunter and a food-gatherer; when he gives up a nomadic existence for life in a settled

(১) নিছক যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ এবং গ্রাম ও নগর পত্তন করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস ;

(২) রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা স্থাপন ;

(৩) ভাষার প্রসারের সহিত লিপির উদ্ভাবন[১১] ;

(৪) বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার এবং উহাদের ব্যবহার ;

(৫) বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং যন্ত্র দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ;

(৬) সমাজ মধ্যে বিবিধ বৃত্তি তথা বৃত্তিজীবীর আবির্ভাব ;

(৭) কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি এবং উহার ফলে বিবিধ অভাবমোচন এবং সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি ;

(৮) জ্ঞানের প্রসার—অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ও প্রয়োগ ;

(৯) উন্নততর নীতিবোধ, সামাজিকতাবোধ ও ধর্মের বিস্তার ;

(১০) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা।

অবশ্য, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সভ্যতার প্রলক্ষণের এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, এবং কোন সম্পূর্ণ তালিকা রচনা করা সম্ভবও নহে। তাহা ছাড়া, কোন জাতি বা গোষ্ঠী মধ্যে উপরে উল্লিখিত কোন একটি প্রলক্ষণের অভাব ঘটিলেও আমরা উহাকে হয়ত' সভ্য বলিতে পারি।

আমরা এ স্থলে কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে যে আপেক্ষিক পার্থক্যের উল্লেখ করিলাম, তাহা নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গৃহীত হইলেও সকল

country or city......If urban life is the very foundation of civilized existence, at the same time there are other additional elements which must accompany city life, such as the existence of writing, a unified and well-organised governmental system, knowledge of metallurgy, the use of an adequate body of science and mathematics and the operation of an advanced system of production guaranteeing people with some degree of physical comfort, leisure, and freedom from famine and want." (*Encyclopaedia Americana*, Art on Civilization).

১১ V G. Childe-প্রমুখ লেখকগণ লিপি (art of writing)-এর উদ্ভাবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইঁহারা লিপির উদ্ভাবনকে 'বৌদ্ধিক যন্ত্রের উদ্ভাবন' বলিয়া বর্ণনা করেন।

করেন নাই। সুতরাং আমরা এখানে কয়েকটি বিভিন্ন মতের
পারি।

। কোন লেখক মনে করেন যে, কৃষ্টি ও সভ্যতা সমার্থক (sy[illegible]ous)। তাঁহারা বলেন যে, যে গোষ্ঠী মধ্যে সামান্যতমভাবেও কৃষ্টির [illegible]টিয়াছে, সেই গোষ্ঠী সেই পরিমাণে সভ্য।

[illegible] ও সভ্যতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নাই, তাহা হইলেও স্তর বা পর্যায়ভেদ [illegible]ং এই মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এ কথা সত্য যে, কৃষ্টির উচ্চতর পর্যায়ে উহা সভ্যতার সহিত সমব্যাপক হইয়া পড়ে; কিন্তু নিম্ন পর্যায়ে কৃষ্টির মধ্যে সভ্যতা বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝায়, তাহার অভাব দেখা যায়। যদি যেখানে মানবগোষ্ঠী সেখানেই সভ্যতা থাকিত, তাহা হইলে 'অসভ্য'-পদের বিশেষ তাৎপর্য থাকিত না। তাহা ছাড়া, এরূপ ক্ষেত্রে যাহাদের আমরা অসভ্য বলিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন-না-কোন আচরণপদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং তাহাই তাহাদের কৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সাধারণ অর্থে সভ্যতার অভাব ঘটিলেও তাহারা একেবারে কৃষ্টিবিহীন নহে। এই কারণে কৃষ্টি ও সভ্যতাকে সমার্থক করা যুক্তিযুক্ত নহে।

(খ) আমরা উপরে বলিয়াছি যে, কৃষ্টি সভ্যতা হইতে ব্যাপকতর, কারণ যেখানে সভ্যতা সেখানে কৃষ্টি, কিন্তু যেখানে কৃষ্টি সেখানে সভ্যতা নাও থাকিতে পারে। কেহ কেহ ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, সভ্যতা কৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপকতর, কারণ এমন অনেক জাতি আছে যাহারা সভ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের কোন প্রকৃত কৃষ্টি হয় নাই। অর্থাৎ এই সকল জাতি যন্ত্রবিজ্ঞানে তথা জড়সভ্যতায় উন্নতি করিলেও ইহাদের মনের প্রসারতা ঘটে নাই—ইহারা পররাজ্যলোলুপ, হিংসাপরায়ণ, সুবিধাবাদী রহিয়া গিয়াছে। এইজন্য বলা যায় যে, ইহাদের উল্লেখযোগ্য কৃষ্টিলাভ ঘটে নাই।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এরূপক্ষেত্রে 'কৃষ্টি'-পদটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে; 'কৃষ্টি' বলিতে এখানে 'মার্জিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী' (refined moral outlook) বুঝাইতেছে। 'কৃষ্টি'-পদটি এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সভ্যতা লাভ করিলেই কোন জাতি যে উচ্চ নৈতিক কৃষ্টির অধিকারী হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তাহা ছাড়া, এরূপ স্থলে 'সভ্যতা' পদটিও সঙ্কীর্ণ অর্থে গৃহীত হইয়াছে, কারণ সভ্যতা বলিতে

এস্থলে কেবল জড়সভ্যতা বা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বুঝাইতেছে।
বিস্তার যেখানে ঘটিয়াছে, সেখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ইহা
আশা করা যায়।

(গ) 'কৃষ্টি'-পদটি মার্জিত রুচি তথা উচ্চ পর্যায়ের নীতিবো গ্রহণ
করিয়া এবং 'সভ্যতা'-পদটি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা অর্থে গ্রহণ কান
লেখক বলেন যে 'কৃষ্টি' ও 'সভ্যতা' বিপরীতধর্মী। সামাজিক
আমরা আত্মরক্ষা ও আত্মসুখের জন্য বাহ্যতঃ যাহা করিতে
তাহা হইল আমাদের সভ্যতার পরিচায়ক। অপর পক্ষে, আমাদের ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি অর্থাৎ যাহা আমাদের মানস সুরুচি ও উৎকর্ষতার পরিচায়ক, তাহা হইল কৃষ্টি। সুতরাং সভ্যতা হইল বাহ্য উন্নতি, আর কৃষ্টি হইল আন্তর বা মানস প্রসার বা অগ্রগতি।[১২]

আমরা দ্বিতীয় মতবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহাই প্রযোজ্য। এস্থলে 'কৃষ্টি' ও 'সভ্যতা' উভয় পদই সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার জন্য উহাদের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিয়াছে। কৃষ্টি ও সভ্যতা উভয়েরই আন্তর ও বাহ্য দুইটি দিক্ আছে—একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ পার্থক্যও সম্পূর্ণরূপে সমর্থনীয় নহে।

(ঘ) কোন কোন লেখক সভ্যতার প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, সভ্যতার ফলে যাহা বিস্তার লাভ করে বা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা মানুষের কতকগুলি বাহ্য প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং ঐ প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর নিজস্ব কোন মূল্য (intrinsic value) নাই, অর্থাৎ উহাদের মূল্য আপেক্ষিক। অপরপক্ষে, কৃষ্টি-সঞ্জাত 'বস্তু' হইল ক্রীড়া ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, ধর্ম, দর্শন, কলা ইত্যাদি—ইহাদের নিজস্ব মূল্য আছে, ইহারা

১২ তুলনীয়: "By civilization we understand all that we have externally achieved by way of self-protection and self-satisfaction as men, as members of a society and of a nation." "Culture as refinement of tastes and manners shows itself in the spontaneous observance of good manners and etiquette in society which are all ultimately based upon a due consideration for the feelings of others and may therefore be regarded as being ethical in nature......It means the entire spiritual asset of an individual or a nation." (Dr. S. N. Das Gupta, *Philosophical Essays*, pp. 350, 355).

নিছক বাহ্য প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য উদ্ভাবিত হয় নাই, ইহারা আমাদের আবেগের তৃপ্তিসাধন করে। কোন কিছু 'বস্তু' সভ্যতার ফলে উৎপন্ন অথবা উহা কৃষ্টির পরিচায়ক, ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে: কেন আমরা উহা কামনা করি? উহা কি অন্য কোন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমরা কামনা করি, অথবা উহা আমাদের ভাল লাগে বলিয়াই আমরা উহা পছন্দ করি?

সভ্যতার প্রায়োগিক ও বাহ্যপ্রয়োজনীয়তা-কেন্দ্রিক মূল্য থাকার জন্য সভ্যতার অগ্রগতি পারিমাণিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব; কিন্তু কৃষ্টির ক্ষেত্রে উহা সম্ভব নহে। সভ্যতার অগ্রগতি যেরূপ দ্রুততার সহিত নিষ্পন্ন হয়, কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহা হয় না (যেমন, পাশ্চাত্য সভ্যজগতে কৃষ্টিব ক্ষেত্রে আজও গ্রীক্ আদর্শ অনুধাবিত হইতেছে)। সভ্যতার বিস্তার এক দেশ হইতে অন্য দেশে সহজেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রতি জাতিই যেন কৃষ্টির ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব দেখাইয়া থাকে—এক জাতি অপরেব কৃষ্টি সহজে গ্রহণ করিতে চায় না।[১৩]

এই মতবাদও পূর্বের মতবাদের ন্যায় কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, সকল ক্ষেত্রে সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) এবং বাহ্য মূল্য (extrinsic value) এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য টানা সম্ভব নহে, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে যে, দুই প্রকার মূল্যই উহার মধ্যে বিদ্যমান। যেমন, বিজ্ঞান চর্চার নিজস্ব মূল্যও আছে, আবার উহার বাহ্য ও পরোক্ষ মূল্য আছে।

---

১৩ তুলনীয়: "Take, for example, a typewriter. We observe at once that it belongs to the same order as a printing press, a lathe, a factory, a locomotive, a bank, a currency system. These things are all *utilitarian*. They are conceived, devised and operated as *means* to ends......They all belong to the realm of civilization By civilization, then, we mean the whole mechanism and organization which man has devised in his endeavour to control the conditions of his life.......Just as the typewriter belongs to one great order, so the novel which may be written by its aid falls into another. It is in an important aspect akin to a picture, a poem, a drama, a motion picture film, a game, a philosophy, a creed, a cathedral.... They respond to a necessity within us, not to an outer necessity. They belong to the realm of culture. This is the realm of values......Culture, then, is the antithesis of civilization." (MacIver & Page, *Society*, pp. 498, 499).

বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্রেও অনেক সময় দুই প্রকার বৈশিষ্ট্যই দেখ যায়। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে উপায় ও উদ্দেশ্য মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টান সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, কৃষ্টির গতি ধীরে ধীরে সাধিত হয় বা উহা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, এমন কথাও সকল সময় বলা যায় না। যেখানে সভ্যতা অগ্রগতি ঘটে, সেখানে মূল্যবোধের ধারণা অপরিবর্তিত থাকিতে পারে না যেমন, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি ঘটিলে কৃষ্টির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। এক দেশ যখন অপরের সভ্যতা গ্রহণ করে, তখন গ্রহণকারী দেশের কৃষ্টি অপরিবর্তিত থাকিতে পারে না।[১৪] এইজন্য কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে পূর্ণ বৈপরীত্য সমর্থন করা যায় না।

মোট কথা, সভ্যতা ও কৃষ্টি যেরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, তাহাতে ঐ দুই-এর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। আবার উহাদের সমব্যাপকও করা যায় না। এইজন্য ঐ দুই-এর মধ্যে আপেক্ষিক পার্থক্য রক্ষা করা এবং সভ্যতাকে কৃষ্টির উন্নততর পর্যায়ভাবে বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) কৃষ্টি ও শিক্ষা (Culture & Education) :

'কৃষ্টি' ও 'শিক্ষা' এই দুইটি পদই ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এইজন্য উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট মত দান করা কঠিন।

শিক্ষার সহিত কৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সামাজিক কৃষ্টির মাধ্যমেই ব্যক্তিবিশেষ তাহার শিক্ষালাভ করে। 'শিক্ষা'-পদটি ব্যাপক অর্থে সমগ্র জীবনেরই বহুমুখী অভিজ্ঞতা বুঝায়। যে পরিবেশ সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষ ধীরে ধীরে নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেই পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের দ্বারা তাহার সমাজের কৃষ্টির প্রকাশ। এই পরিবেশের সহিত মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সে তাহার শিক্ষালাভ করে।

আবার 'শিক্ষা'-পদটি যদি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং শিক্ষা বলিতে যদি নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা বুঝায়, তাহা হইলেও

---

১৪ এইজন্য Ginsberg বলিয়াছেন : "...It has to be remembered that there are many social activities which serve both kinds of ends. Thus men pursue science not only because it is useful in controlling the condition of life, but also because of their interest in discovery or for the pleasure of construction. Similarly, in social institutions it is often difficult to draw the line between means and ends. How much, for instance, is the life of the family is to be regarded as means and how much as end ?" (*Sociology*, p. 47).

জাতীয় কৃষ্টির সহিত উহার গভীর সংযোগ দেখা যায়। কারণ সাধারণতঃ শিক্ষা-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুকে তাহার সমাজের কৃষ্টির সহিত পরিচিত করাইবার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাঁহারা এ ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় নির্বাচন করিয়া এবং উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সেইগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

শিশু যে দেহ-মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাই তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে—তাহার মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষার উপাদান অনেকাংশে তাহার সামাজিক কৃষ্টি হইতে সংগৃহীত হয়—সে ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস করিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকিবে, অথবা বৈজ্ঞানিক-সুলভ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিবে, তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে তাহার পারিপার্শ্বিক কৃষ্টির উপর। সমাজমধ্যে শিশুর জন্মগ্রহণ করার অর্থ হইল একটি বিশেষ কৃষ্টিমূলক সংস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করা এবং তাহার বৌদ্ধিক ও নৈতিক আদর্শ, প্রতিন্যাস (attitude) এবং দৃষ্টিভঙ্গী তাহার সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শিক্ষামাত্রই ব্যাপক অর্থে নৈতিক শিক্ষাদান—শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মনের সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য পথে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। এই সকল লক্ষ্য সুনির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। এই নির্বাচন সম্ভব হয় কতকগুলি লক্ষ্যের বা আদর্শের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে। প্রাপ্তবয়স্কেরা যখন এই তুলনামূলক বিচার কার্যে নিযুক্ত হয়, তখন তাহাদের এই বিচারকার্য স্বতঃই তাহাদের সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আবার শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল শিশুকে ভাবী জীবনের দায়িত্বগ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তোলা। সুতরাং সে যাহাতে সমাজ মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সে বিষয় তাহাকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণ শৈশব হইতেই তাহাকে সামাজিক পরিবেশের তথা কৃষ্টির সহিত পরিচিত হইতে হইবে, কারণ যে পরিবেশের মধ্যে তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই পরিবেশকে পূর্ব হইতে কিছু পরিমাণ না জানিলে, সে কি করিয়া তাহার ভবিষ্যতের কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হইবে? এইজন্য তাহার নিজের দেশের অতীত ইতিহাস জানিতে হইবে; কিন্তু ইতিহাস বলিতে কতকগুলি প্রাণহীন অতীত ঘটনার সমাবেশ বুঝায় না—ইতিহাস সুব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন। মোট কথা, প্রকৃত শিক্ষার জন্য স্বীয় দেশের ও অন্যান্য দেশের কৃষ্টির সহিত পরিচয় বাঞ্ছনীয়।

সমাজজীবনে এক একটি সময়ের বা যুগের ব্যবধানে পরিবর্তনের বিরাট আলোড়ন আসিয়া পড়ে; এই সামাজিক আলোড়নের সময় কৃষ্টির মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় এবং এই সময় শিক্ষার গুরুভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে কৃষ্টির বিচার করা প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বতঃই কৃষ্টির প্রভাব আসিয়া পড়ে—শিক্ষার মাধ্যমে কৃষ্টির সহিত পরিচয় ঘটে, উহার সহিত প্রতি-যোজনের ক্ষমতা আয়ত্ত হয়, আবার উচ্চতর শিক্ষার ফলে জাতীয় কৃষ্টির সমালোচনা ও মূল্য বিচার করিবার মানসিক উৎকর্ষতাও জন্মে।

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২৫৭) বলিয়াছি যে, সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কৃষ্টি' বলিতে মার্জিত রুচি এবং বুদ্ধি ও নীতির উৎকর্ষতা বুঝায়। সুতরাং এই দিক হইতে বলা যায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল মানসিক কৃষ্টি। প্রকৃত শিক্ষার ফলেই ব্যক্তি-বিশেষের রুচি মার্জিত হয়, নীতিবোধ উন্নততর হয়, ধীশক্তি ও বিচার-বুদ্ধি প্রখরতর হয়, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষাই কৃষ্টির সৃষ্টি করে।[১৫]

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কৃষ্টি বলিতে ব্যাপক অর্থে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে শিক্ষার উপাদান সংগৃহীত হয় এবং তাহা শিক্ষার আদর্শকে প্রভাবিত করে; আবার উচ্চ মানের এবং উদার শিক্ষা যথাযথভাবে সমাপ্ত হইলে তাহার ফলে সঙ্কীর্ণ অর্থে কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ মানসিক উৎকর্ষতা, ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়। অতএব, সমগ্র পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়: কৃষ্টি (ব্যাপক অর্থে)→শিক্ষা→মানসিক উন্নতি→কৃষ্টি (সঙ্কীর্ণ অর্থে)।

(গ) কৃষ্টি ও প্রথা (Culture & Custom):

সামাজিক প্রথা (social custom) বলিতে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি কর্তৃক অনুসৃত কতকগুলি সাধারণ কর্মপন্থা বা কর্ম অনুষ্ঠানের অভ্যাস বুঝায়—এইগুলির সহিত একটা বাধ্যবাধকতার ভাব (sense of obligatoriness)

১৫ তুলনীয়: "It is precisely in the cultivation of the individual personality that we escape from the region of conflicting ends, and find a happiness in which all may share. Now, it is this kind of achievement that is best expressed by the term 'Culture', which is taken to denote education in its larger sense—the sense in which it is the end of life, rather than the preparation for life." (Mackenzie, *Outline of Social Philosophy*, p. 228).

সংশ্লিষ্ট থাকে। আদিম জাতির মধ্যে সামাজিক প্রথা ও নীতির অনুশাসনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না—আদিম জাতির দৃষ্টিতে যাহা সামাজিক প্রথা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই নৈতিক অনুশাসনরূপে গণ্য হয়।[১৬]

বিবিধ সামাজিক গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথাসমূহের কবে, কোথায়, কিভাবে উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার ইতিহাস জানা নাই। সম্ভবতঃ কোন কারণে এক বিশেষ কর্মপন্থা কতকগুলি লোকের নিকট সুবিধাজনক বা কল্যাণকর বোধ হইয়াছিল এবং তাহাদের পরে আরও অনেকে ঐ একই কারণে হয়ত' তাহা অনুসরণ করিয়াছিল এবং এইভাবে ধীরে ধীরে উহা সামাজিক প্রথাতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

'কৃষ্টি'-পদটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে উহার সহিত সামাজিক প্রথার ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখা যায়। কৃষ্টি বলিতে যদি সামাজিক আচরণ-পদ্ধতি বুঝায়, তাহা হইলে সামাজিক প্রথাসমূহকে কৃষ্টির ধারক ও বাহক বলা যায়। সামাজিক প্রথাসমূহ কৃষ্টির অন্যতম পরিচায়ক। এইজন্য সামাজিক প্রথার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর কৃষ্টিকে অপর গোষ্ঠীর কৃষ্টি হইতে পৃথক্ করা যায়। তবে সামাজিক কৃষ্টি হইল সনাতন সামাজিক প্রথা হইতে ব্যাপকতর। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ সময় বিবিধ কলাকৌশলের মাধ্যমে কৃষ্টি যে অর্থে একটি বাহ্য বস্তুকেন্দ্রিকরূপ ধারণ করে, ঠিক সেই অর্থে সামাজিক প্রথার বাহ্য বস্তুকেন্দ্রিকরূপ থাকে না—সামাজিক প্রথাসমূহের মধ্যে মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য তথা আনুগত্যবোধ থাকে। আবার ইহাও বলা যায় যে, সুদূর অতীত হইতে অনুসৃত সামাজিক প্রথাসমূহের ভিত্তিতেই সামাজিক কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ অনেকস্থলে সামাজিক প্রথাসমূহ কৃষ্টির সংগঠনের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) কৃষ্টি ও কলা (Culture and Art) :

কৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে যে কেবল কতকগুলি ধারণা, বিশ্বাস, নীতিবোধ আছে তাহা নহে, উহার মধ্যে সৌন্দর্যবোধও আছে।

১৬ Westermarck-এর ভাষায়: "A custom in the strict sense of the word, is not merely the habit of a certain circle of men, but at the same time involves a moral rule. There is a close connection between these two characteristics of custom : its habitualness and its obligatoriness...... The unreflecting mind has a tendency to disapprove of any deviation from it......Children show respect for the customary, and so do the savages." (*Origin & Development of Moral Ideas*, Vol. I, p. 59).

সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের এই সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির বাসনা বিকশিত হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতাদি বিবিধ কলা হইল কৃষ্টির পরিচায়ক।

কৃষ্টির সহিত কলার নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। বিবিধ কলার মাধ্যমে যে সকল ভাবাবেগ ও অনুভূতি বোধকে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়, সেই সকল অনুভূতির উদ্রেক ঘটে কৃষ্টির সহিত ব্যক্তিবিশেষের মিথস্ক্রিয়ার ফলে। সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষের কলানুরাগ তথা কলা-সৃষ্টি তাহার কৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৭] তাহা ছাড়া, বিভিন্ন কলাশিল্পের আপেক্ষিক মূল্য বিচারও বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বা জাতির কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আবার উচ্চতর কলাশিল্পের সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ তথা মার্জিত রুচি জন্মে। সুতরাং এই দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তি-বিশেষের কৃষ্টি—অর্থাৎ মার্জিত ও অনুভূতিপ্রবণ রুচি—গঠনে সহায়ক।

বিভিন্ন জাতির কৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে উহাদের শিল্পসৃষ্টির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প মাত্রেরই একটা সর্বজনীন আবেদন আছে। আমরা কোন জাতির ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদির সহিত বিশেষ পরিচিত না থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের জাতীয় কলাশিল্পের রসগ্রহণে সক্ষম হইতে পারি। কলাশিল্পের বাহক হইল রসানুভূতি এবং এইজন্য ইহা সহজেই দেশ ও কালের সীমানা অতিক্রম করিতে পারে।

১৭ কেহ কেহ মনে করেন যে, শিল্পসৃষ্টি শিল্পীর নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—প্রকৃত শিল্পীর মন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং উহা কোন বন্ধন স্বীকার করে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই মতবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। কোন শিল্পীই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সমাজের ও তাঁহার যুগের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে না। শিল্পীমাত্রই তাঁহার শিল্পের উপাদান তাঁহার পরিবেশের মধ্যে অনেকাংশে আবিষ্কার করেন—তবে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক পরিবেশ ও কৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সাধারণলোকের সেই দৃষ্টিভঙ্গী নাই। এইজন্য Malinowski বলেন, "Like many other artifacts or human productions the work of art becomes part of an institution, and its whole growth as well as its functions can only be understood if it is studied within its institutional context." (Art. on Culture, *Encyclopaedia of Social Sciences*).

৪। ব্যক্তি-মনের উপর কৃষ্টির প্রভাব (Influence of Culture on Individual Mind):

শিশু যখন পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তখন হইতেই সে বিশেষ প্রকার কৃষ্টির প্রভাবে আসে এবং ধীরে ধীরে সমাজ মধ্যে প্রতিযোজনক্ষম ব্যক্তি-বিশেষে রূপান্তরিত হয়। পারিবারিক তথা সামাজিক কৃষ্টির প্রভাবকে কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সমাজমধ্যে কৃষ্টি ধারা অব্যাহত গতিতে চলার ফলে প্রাচীনদের আদর্শ নবীনদের মনে রেখাপাত করে এবং তাহারা আবার উহার কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে উহা সংক্রামিত করে—এই ভাবেই এক যুগ হইতে অন্য যুগে ব্যক্তি-মনের মাধ্যমে কৃষ্টির ধারা চলিতে থাকে। ব্যক্তি-মনের দিক্ হইতে কৃষ্টিকে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, উহা হইল শিক্ষণলব্ধ সাধারণ আচরণ।[১৮] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিবিশেষের যে কোন আচরণকেই কৃষ্টিমূলক আচরণ বলা যায় না ; ঐ আচরণের একটা সর্বজনীনরূপ থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ আচরণ তাহার ন্যায় যেন অন্য অনেকে পালন করে ; আবার ঐ আচরণ বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত নহে, উহা প্রকৃতিদত্ত কোন স্বাভাবিক বা সহজবৃত্তি নহে—উহা শিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে আয়ত্ত করিতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ তাহার কৃষ্টিমূলক আচরণ সামাজিক পরিবেশের সহিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষা করে। কৃষ্টির প্রকাশ দুইপ্রকার—কৃষ্টিসঞ্জাত বিবিধ বস্তুর মাধ্যমে এবং মানস আচরণের মাধ্যমে। বস্তুতঃ সমাজ মধ্যে জন-মন একই প্রকার কৃষ্টি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়াই কৃষ্টির ধারা চলিতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্টির মানস দিক্‌টিই হইল উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১৯]

ব্যক্তি-মাত্রেরই কতকগুলি মূল জৈব প্রয়োজন এবং নোদনা (drives) আছে এবং এইগুলিকে পরিতৃপ্ত করিবার পদ্ধতি এবং উপায় তাহাকে সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই আবিষ্কার করিতে হয় ; শুধু তাহাই নহে, এইগুলি সামাজিক আদর্শসম্মত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সামাজিক অনুমোদন পাইতে

১৮ তুলনীয় : "Culture may be defined simply as shared learned behavior." (Young & Mack, *Sociology & Social Life*, p. 35).

১৯ এইজন্য Young বলেন : "The essence of culture is, of course, psychological : its persistence and functioning depend on human thought and action, and not on the mere existence of a tool, machine or material gadget." (*Handbook of Social Psychology*, p. 8).

হইলে সামাজিক কৃষ্টির ধারার সহিত সমতা রক্ষা করা প্রয়োজন। সেইজন্য ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষুধা, কাম, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ইত্যাদি পরিতৃপ্ত করার পদ্ধতি এবং উপায় নির্বাচন তাহার সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ক্ষুধারূপ প্রবৃত্তির কথা ধরিতে পারি। ক্ষুধা একটি সাহজিক প্রবৃত্তি; কিন্তু খাদ্যনির্বাচন, ভোজনের স্থান, ভোজন-পদ্ধতি এইগুলি সামাজিক কৃষ্টির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

আবার, ব্যক্তি-বিশেষের ধারণা (ideas), বিশ্বাস (beliefs), প্রতিন্যাস (attitude), মূল্যবোধ, অভ্যাস, সহযোগিতা-বিরোধিতার মনোভাব ইত্যাদিও অনেকাংশে সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা রূপায়িত তথা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—(ক) বিবিধ সামাজিক সংস্থাগুলি (যথা, পরিবার ইত্যাদি) সকল সময় প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি-বিশেষের উপর কতকগুলি ধারণা, বিশ্বাস বা প্রতিন্যাস আরোপ করে না; পরিবার, প্রতিবেশ, বিদ্যায়তন, ধর্মীয় ও কৃষ্টিমূলক সংঘ ইত্যাদি ব্যক্তি-বিশেষের মনে এমন কতকগুলি ভাবাবেগ ও প্রয়োজনের সৃষ্টি করে যেগুলি সুসংহত হইয়া তাহার মনে কতকগুলি স্থায়ী ধারণা, বিশ্বাস ও প্রতিন্যাসের সৃষ্টি করে।[২০] (খ) কৃষ্টির বাহক হইল বিবিধ সংস্থা—এইগুলির প্রভাব যে সকল সময়ই একই প্রকারের বা সমজাতীয় হয় তাহা নহে; অনেক সময়ই বিবিধ সংস্থার বিবিধ প্রভাব ব্যক্তি-বিশেষের মনে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া তোলে।

কৃষ্টির ধারকভাবে বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পারস্পরিক প্রতিযোগিতা অথবা সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ আচরণ পদ্ধতিও ব্যক্তি-মনের উপর রেখাপাত করে।[২১] যে সমাজে সামাজিক কৃষ্টি অনুযায়ী প্রতিযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেখানে শৈশব হইতেই শিশুকে সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ক্রমাগত তাহাকে

---

২০ আবার এমনও হইতে পারে যে, ব্যক্তিবিশেষ যাহার মাধ্যমে কৃষ্টিসম্বন্ধীয় কোনকিছু শিক্ষা করে, তাহার প্রতি কোন কারণে বিরাগ জন্মিলে সে উহা গ্রহণ করে না, বরং উহার প্রতি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাইতে পারে। কাহারও পিতা হয়ত' তাহার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করে; সুতরাং পিতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব থাকার জন্য পিতা যাহা শিক্ষা দেয়, তাহার প্রতি সে বিরুদ্ধ মনোভাব দেখাইতে পারে।

২১ Margaret Mead, *Cooperation & Competition among Primitive Peoples*, p. 511 দ্রষ্টব্য।

'উৎসাহ' দেওয়া হয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে 'পরিণতবুদ্ধি' করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। অপরপক্ষে, যে সমাজে সহযোগিতার ভাব বেশী, সেখানে এই ব্যস্ততার ভাব থাকে না। এই দুই প্রকার আদর্শের ফলেই শিশুর ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হইতে পারে। অবশ্য কোন্ সমাজের দৃষ্টিতে কোন্ বয়সকে পরিণত বয়স বলা যাইবে, সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই।

কোন কোন সমাজের কৃষ্টিগত আদর্শে আক্রমণাত্মক বৃত্তিকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করা হয় এবং এইরূপ আদর্শের প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ অনেক সময় আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়। আবার বর্তমানের অধিকাংশ সুসভ্যসমাজে আক্রমণাত্মক বৃত্তিকে অবদমিত করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। তবে আক্রমণাত্মক বৃত্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দান করা হউক বা না হউক, প্রতি সমাজেই কৃষ্টিগত আদর্শের সহিত কোন কোন ব্যক্তির ইচ্ছা, প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষার বিরোধ দেখা দেয়; ব্যক্তি-বিশেষ যদি নতি স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহার মনে আক্রমণাত্মক ভাব দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে। তবে উচ্চতর কৃষ্টিগত আদর্শের প্রভাবে যে আক্রমণাত্মক বৃত্তির অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্গতি (sublimation) ঘটে, তাহা আমরা অনেক স্থলেই দেখিয়া থাকি।[২২]

ব্যক্তিমনের দিক্ হইতে কৃষ্টির একটি বিশেষ উপকারিতা আছে। কৃষ্টির বিস্তারের ফলে ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, নৃত্যগীত ইত্যাদির যে প্রচলন ঘটে, তাহার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিরক্তিকর একঘেঁয়েমির হাত হইতে সাময়িক মুক্তি পায়।

প্রতি সমাজমধ্যে যে কৃষ্টি অনুসৃত হয়, তাহাতে কতকগুলি আদর্শ অনুধাবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—ইহা আশা করা হয় যে, সমাজের সকলেই সেই

২২ ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার সমর্থকেরা মনে করেন যে, প্রতি ব্যক্তির মনেই আক্রমণাত্মক বৃত্তি থাকে এবং উহার সুষ্ঠু প্রতিযোজন না ঘটিলে ব্যক্তিত্বের বিকার ঘটে। তবে অন্য অনেক মনোবিদ্ই মনে করেন যে, শৈশবে যে আক্রমণাত্মক বৃত্তি দেখা দেয়, পরবর্তীকালে শিক্ষার ফলে তাহা সংযত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইয়ং (Young) মন্তব্য করেন, "Aggression as a drive is not purely instinctive and is not incapable of modification by learning. Rather it is a by-product developed at first in attempts to satisfy hunger, sexual desire, and other needs. Later it is modified by direct encouragement or by the substitution of other forms of interaction." (*op. cit.*, p. 72).

আদর্শ অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিবে।[২৩] সুতরাং যাহারা কৃষ্টিগত আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রা পরিচালনা করে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহারা স্বাভাবিক (normal), আব যাহারা আদর্শ অনুসবণে অপাবগ বা অনিচ্ছুক, তাহাবা অস্বভাবী (abnormal)। সমাজদ্রোহী ব্যক্তি ব্যতীত সাধাবণ লোকে সামাজিক আদর্শের অনুরূপ হইবাব প্রচেষ্টা করে।[২৪] কিন্তু সকলের ক্ষমতা একরূপ থাকে না, অথচ সকলেই উচ্চ মান অনুধাবনেব চেষ্টা করে। ফলে অক্ষম বা অপারগ ব্যক্তিব মনে উৎকণ্ঠা (anxiety)-র ভাব আসে। ইহা তীব্র আকার ধারণ করিলে নানাপ্রকার মনোবিকার দেখা দিতে পাবে। তাহা ছাড়া, যেখানে ব্যর্থতাব ভাব দেখা দেয়, সেখানেও ব্যর্থতাব বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।[২৫] অনেক সময় আশার আদর্শেব বহুমুখিতা বা সংখ্যাধিক্যও মানুষকে বিভ্রান্ত কবিয়া তোলে, বর্তমান সভ্যজগতে মনোবিকাবেব ইহা অন্যতম কাবণ।[২৬]

২৩ কোন গোষ্ঠীর বা সমাজের কৃষ্টির সকল আদর্শের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। (ক) কতকগুলি আদর্শ হইল সার্বিক (universals)—সকলের পক্ষে এইগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য। (খ) কতকগুলি হইল বিকল্প (alternatives)—একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং এইগুলি সবই সমাজকর্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে। (গ) বাকীগুলি হইল বিশেষজন-সুলভ (specialities)—এই আদর্শ বা কর্মপদ্ধতিগুলি হইল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে করণীয় বা অনুসরণযোগ্য। যেমন, অনেক সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে একমাত্র একগামিতা (monogamy)-ই সামাজিক অনুমোদন লাভ করিয়াছে—ইহা হইল সার্বিক আদর্শ, কিন্তু বিবাহের উপায় বহুবিধ আছে (যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহকারে অথবা রেজেষ্ট্রারী করিয়া)—সুতরাং ইহারা হইল বিকল্প আদর্শ। আবার পুরোহিতের পক্ষে যেরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান অথবা আচারাদি পালন করা উচিত, সেইগুলি হইল 'বিশেষ জন-সুলভ আদর্শ' অর্থাৎ বিশেষ লোকের পক্ষে করণীয়।

২৪ অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যখন কোন সমাজের কৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করি, তখন আমরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করি। এই কারণ অনেক সময় আমরা যাহাকে অবাস্তব আদর্শ বা অসম্ভব পরিকল্পনা বলিয়া মনে করি, হয়ত' সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট উহা সেইরূপ প্রতিভাত হয় না।

২৫ গ্রন্থকার রচিত 'মনোবিদ্যা' পৃঃ ৩৮১-৮৪ দ্রষ্টব্য।

২৬ বর্তমান যুগের সভ্যসমাজে আদর্শ-বিরোধের উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ম্যাকডুগাল্ (McDougall) মন্তব্য করেন: "In this modern age we no longer grow up under the influence of some *one* well-defined moral system supported by the authority of unquestioned religion... ... The child finds himself surrounded by odds and ends of moral and religious systems, Christian piety and pagan hedonism, fundamentalism and Modernism, Christian Science and Mechanistic Neo-Darwinism, monogamy and polygamy, free love and birth control, the popular misrepresentations of Freud's teaching, and the cult of self-

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলা যায় যে, সমাজমধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংগঠন এবং উহার প্রচয় (development)-এর গতি নির্ধারণ সমাজগত কৃষ্টি দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র ব্যক্তিত্বই সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, ইহা বলা চলে না। ব্যক্তিত্বের মূলে আছে দৈহিক উপাদান ও সামাজিক পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়া। প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তথা অনুপমত্ব (uniqueness) আছে (পৃঃ ৯৪)। সুতরাং ব্যক্তিত্ব সামাজিক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হইলেও কেবলমাত্র উহা দ্বারাই সংগঠিত নহে। প্রকৃত ব্যক্তিত্বের স্থান সামাজিক কৃষ্টির ঊর্ধ্বে; কারণ উহা যেমন একদিকে কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেইরূপ উহা কৃষ্টিকে প্রভাবিতও করে। মানুষ যেমন একদিকে সামাজিক কৃষ্টি ও পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন করে, সেইরূপ অপরদিকে কৃষ্টি ও পরিবেশকে স্বীয় প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করে। একদিকে যেমন সে কৃষ্টির ধারক ও বাহক, অপরদিকে সেইরূপ সে কৃষ্টির স্রষ্টা। পরিবেশের উপর মানুষের এই প্রভাব আছে বলিয়াই সমাজ পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল এবং যুগের দাবীর সহিত সমাজও উহার কৃষ্টি সমতা রাখিতে সক্ষম হয়।[২৭]

expression and of the Overman; winds of doctrine come to him from Emerson and Walt Whitman, Buddha and Confucius, Bernard Shaw and Omar Khayyam." (*Outline of Abnormal Psychology*, p. 216)। বলা বাহুল্য, এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ সহজে তাহার আদর্শ নির্ধারণ করিতে পারে না বা করিলেও একনিষ্ঠভাবে উহা অনুধাবন করিতে পারে না। ফলে তাহার মনোমধ্যে হতাশা, ব্যর্থতা ও বিরোধের মনোভাব দেখা দেয়।

২৭ তুলনীয়: (১) "Above the impress of culture and society, there is the person who is never simply a reflection of the influnces of these conditioning factors. To deny this is to deny the dynamic nature of *Homo Sapiens*, who stands above all his animal ancestors and relatives, not only by adjusting himself to his environment, but by adapting the environment to himself and thus by modifying, extending and creating his environment." (K. Young, *op. cit.*, p 76).

(২) "Inspite of thorough aculturation of the individual, he still retains the capacity to think and to devise new forms of behavior in response to situation for which his patterns of culture are inadequate." (Linton, *Tree of Culture*, p. 40).

৫। কৃষ্টির বা সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (Social significance of Culture):

কৃষ্টির উদ্ভব সমাজের মধ্যে। প্রতি সমাজেরই কোন-না-কোন প্রকার কৃষ্টি আছে।[২৮] সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বাস করার জন্য মানুষ নানাপ্রকার প্রয়োজন ও অভাব বোধ করে এবং এইগুলি পূর্ণ করার সমবেত প্রচেষ্টা হইতে কৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়াছে। কৃষ্টির সহিত সমাজের যে সম্পর্ক, তাহা একজন ব্যক্তির সহিত তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য গঠিত অভ্যাসসমূহের সম্পর্কের সহিত তুলনীয়। কৃষ্টির কার্য হইল সমগ্রভাবে সমাজকে রক্ষা করা ও উহার কল্যাণসাধন করা। অবশ্য সমাজকে রক্ষা করা ও বাঁচিয়া থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, কৃষ্টির বিস্তার প্রতি সমাজে সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা বেশীই হইয়া থাকে।

সুতরাং যদিও ব্যক্তি হইল কৃষ্টির ধারক ও বাহক, তাহা হইলেও কৃষ্টি হইল সামাজিক সম্পদ। সমাজের অধিকাংশ লোকই ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। কৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে ইহা প্রধানতঃ গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত থাকে। যেমন, নৃত্য, গীত, অভিনয় ইত্যাদি কৃষ্টিমূলক আচরণে সমাজের সকলেই অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করে এবং ইহা প্রধানতঃ সামাজিক আচরণরূপেই বিস্তার লাভ করে। আদিম সমাজে কৃষ্টির যে সামাজিক রূপ থাকে, সভ্যসমাজে ঠিক সেইরূপ থাকে না।

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৃষ্টির উন্নতির ফলে উহা ক্রমশঃ ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; যেমন, উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, দর্শন এইগুলি ক্রমশঃ ব্যক্তিগত অনুশীলন ও সাধনার বিষয় হয়। অবশ্য সঙ্গীতশিল্পী বা সাহিত্যিক বা দার্শনিক যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা আবার সামাজিক সম্পদ হইয়া দাঁড়ায় এবং সমাজের সকলেই সম্ভব হইলে তাহার রসগ্রহণ ও মর্মার্থগ্রহণের চেষ্টা করিতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্টির গতিপথ হইল এইরূপ: উহা সামাজিক পরিবেশ হইতে উদ্ভূত, ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও বাহিত, সামাজিক সম্পদরূপে সংরক্ষিত।[২৯]

---

২৮ তুলনীয়: "As something shared and supra-individul, culture can exist only when society exists; and conversely every human society is accompanied by a culture." (Kroeber, *op. cit.*, p. 183).

২৯ তুলনীয়: "The first beginnings of the study of natural objects and of the chronicling of the doings of men and peoples are also, in general, made by groups, rather than by individuals, and are valued as studies that give dignity to the group. Later however, culture, tends, in some degree, to become more definitely confined to the few." (Mackenzie, *op. cit.*, p. 238).

উচ্চতর পর্যায়ের কৃষ্টির দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের রুচি মার্জিত হয় এবং এইজন্য সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কৃষ্টি' বলিতে 'মার্জিত রুচি' বুঝায়। উচ্চ পর্যায়ের কৃষ্টির ক্ষেত্রে এইরূপ আশা করা যায় যে, এরূপ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা মতবিভেদ থাকিলেও উহা কোন দ্বন্দ্ব, কলহ বা রক্তক্ষয়ী বিরোধের সৃষ্টি করিবে না। যেমন, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের সহিত অপরের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মার্জিতরুচির অধিকারী হইলে তাঁহাদের এই বিরোধ তিক্ততাশূন্য হয়। অপর পক্ষে, কৃষ্টির নিম্নপর্যায়ে—বিশেষতঃ বস্তুকেন্দ্রিক কৃষ্টি (material culture)-এর ক্ষেত্রে এবং আদিম জাতির মধ্যে—বিরোধ তীব্র আকার গ্রহণ করিতে পারে।

তাহা ছাড়া, উচ্চপর্যায়ের কৃষ্টির একটা সর্বজনীন আবেদন আছে; সেইজন্য এক দেশের দর্শন বা সংগীত বা সাহিত্য অপর দেশে সমাদৃত হইতে পারে এবং উহা রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধ দ্বারা ব্যাহত হয় না। এইজন্য উচ্চতর কৃষ্টির প্রসার কেবল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করিয়া আন্তর্মানবিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হয়।

সুতরাং কৃষ্টির সামাজিক তাৎপর্য নিম্নলিখিতরূপ:

(ক) সকল সামাজিক আচরণই ব্যাপক অর্থে কৃষ্টির পরিচায়ক; সুতরাং এই অর্থে কৃষ্টিবিহীন কোন সামাজিক গোষ্ঠী কল্পনা করা যায় না।

(খ) কৃষ্টি ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ব্যক্তিত্বকে রূপদান করে; ব্যক্তিকে লইয়া সমাজ সুতরাং সমাজের সংগঠনে ইহা প্রভাব বিস্তার করে বলা যায়।

(গ) কৃষ্টি ব্যক্তি-মনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস, ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করিয়া সমাজমধ্যে ব্যক্তির বাহ্য আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত করে এবং উহাকে নির্দিষ্ট রূপদান করে। যে কৃষ্টির মধ্যে আদর্শের যত অভাব থাকিবে, সেই কৃষ্টির লোকের আচরণ তত বিশৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত বা অনির্দিষ্ট হইবে।

(ঘ) উচ্চতর কৃষ্টি মানুষের রুচিকে মার্জিত করে, নীতিবোধকে উন্নত করে এবং আন্তর্ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব বা ভুল বুঝার সম্ভাবনা কম করে।

(ঙ) উচ্চতর কৃষ্টির আন্তর্জাতিক প্রসার ঘটিলে উহা মানুষে মানুষে হৃদয়ের মিল স্থাপন করিবার সহায়তা করে।

৬। কৃষ্টির পরিবর্তন ও বিবর্তন (Cultural change and evolution) :

যদিও কৃষ্টির মধ্যে রক্ষণশীলতার ভাব আছে, তাহা হইলেও কৃষ্টিমাত্রই পরিবর্তনশীল ; এমন কোন অবস্থায় কোন জাতির কৃষ্টিকে পাওয়া যায় না যাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই বা যাহা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল হইয়া গিয়াছে।[৩০] তবে পরিবর্তনের গতি কোথাও অত্যন্ত মন্থর, আবার কোথাও অপেক্ষাকৃত দ্রুত। অর্থাৎ কৃষ্টিগত পরিবর্তন কোন নির্দিষ্ট সার্বিক নীতি অনুসারে চলে না।

কৃষ্টির মধ্যে যে পরিবর্তন আসে, তাহা সাধারণতঃ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া সাধিত হয়। প্রথমতঃ, কোন একটি সম্ভাব্য পরিবর্তনের ধারণা সমাজ মধ্যে প্রচলিত হয়। এই ধারণা কতকগুলি ব্যক্তি বা কোন এক বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে, অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট উদ্ভাবক না থাকিতে পারে, অথবা উহা পারিপার্শ্বিক কৃষ্টি হইতে গৃহীত হইতে পারে। আবার উহা সমাজের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হইতে পারে, অথবা সমাজের বর্তমান প্রয়োজনের সহিত উহার প্রত্যক্ষ সংস্রব নাও থাকিতে পাবে। বাস্তবিক, কৃষ্টিগত পরিবর্তনের সকল কারণ আমরা উদঘাটন করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, যদি এই পরিবর্তনের কল্পনা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে সমাজ মধ্যে ধীরে ধীরে সেই দিকে পরিবর্তন দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, সমাজ মধ্যে নূতন মত ধীরে ধীরে যত প্রসার লাভ করে, পুরাতন ততই সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করে অথবা নূতনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তবে নূতনের যদি পুরাতনের সহিত সমতা বা সাদৃশ্য থাকে, অথবা উহা যদি পুরাতনের অনুকূল বা পরিপূরক হয়, তাহা হইলে উহার বিস্তারের সুবিধা হয় ; কারণ অভ্যস্ত জীবনযাত্রা প্রণালী সহজে কেহ পরিবর্তন করিতে চাহে না। অপরপক্ষে, নূতন উপাদান যদি সমাজের পুরাতন ও প্রচলিত

৩০ কেহ কেহ মনে করেন যে, আদিম বা প্রাথমিক কৃষ্টির মধ্যে সহজে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু এ বিষয় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে, অথবা এখনও যে সকল আদিম জাতি পৃথিবীতে আছে তাহাদের যাঁহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও অভিমত অনুসারে, আদিম জাতির কৃষ্টির মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে।

আদর্শের বিরোধী হয়, তাহা হইলে উহার প্রসার ব্যাহত হয় বা নিতান্ত মন্থর হয়।[৩১] আবার কোন যন্ত্র বা কলাকৌশলের ক্ষেত্রে এক সমাজ যত শীঘ্র অপর সমাজের কৃষ্টিকে গ্রহণ করে, আদর্শ, ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তত শীঘ্র এক সমাজ অপর সমাজের কৃষ্টিকে গ্রহণ করে না। তাহা ছাড়া, কোন বিষয়ের উপকারিতা কার্যতঃ প্রমাণিত হইলেও উহা যে সকল সমাজ গ্রহণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। যেমন, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইলেও আদিম সমাজভুক্ত লোকেরা রোগ সারাইবার জন্য মন্ত্র-তন্ত্রে তাহাদের পুরাতন বিশ্বাস পরিহার করে না; অথচ তাহারা সহজেই বর্তমান যন্ত্রযুগের অনেক অবদান (যথা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি) গ্রহণ করে।[৩২]

যেখানে কোন প্রতিবেশী সমাজের কৃষ্টি অনুকরণ করা হয়, সেখানে অনুকরণকারী কোন কোন বিষয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে ও অপর কতকগুলি বিষয়ে নিজেদের হীন (বা অন্ততঃ পশ্চাদ্বর্তী) মনে করে এবং সেইজন্য বর্তমান কৃষ্টির আংশিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা বোধ করে। প্রতিবেশী সমাজের কৃষ্টির আদর্শ বা অন্য কোন উপাদান গ্রহণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, গ্রহণকারী সমাজ গৃহীত উপাদানের আদি বা মূল অর্থ হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাকে দেখে; অর্থাৎ গ্রহণকারী সমাজ গৃহীত উপাদানের আদি উৎপত্তি যাহাই হউক্ উহাকে নিজেদের সমাজের উপযোগী করিয়া লয়। পুরাতনের সহিত নূতনের এই সমন্বয়ের ফলে পুরাতন একেবারে লুপ্ত হয় না—মধ্যে মধ্যে পুরাতনের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাব বা ধারণাসমূহ আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, বর্তমান সভ্যজগতে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে

৩১ তুলনীয়: "Again and again one finds that the acceptance of institutions or devices which would seem superior on a purely utilitarian level are blocked because the new thing controverts some existing values ...During the post-war period when most European nations suffer from a marked shortage of males, a simple and effective answer would seem to be to legalize the institution of polygyny,......yet certain values of our own culture preclude its acceptance." (R. Linton, *The Tree of Culture*, p.44).

৩২ তুলনীয়: "Modern medicine based on the germ theory of disease, displaces folk practices, based on alternative theories, very slowly as compared with the prompt folk acceptance and use of automobiles." (A. M. Lee, *Principles of Sociology*, p. 150).

তরবারির বিশেষ প্রচলন নাই ; তবে কোন সমারোহপূর্ণ রাজকীয় অনুষ্ঠানের সময় কোন কোন ব্যক্তি কটিবদ্ধ হইতে তরবারি ঝুলাইয়া রাখে।

কৃষ্টিগত এই সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে যে, জীবজগতে যেভাবে বিবর্তনের ধারা চলে, সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট পন্থায় কৃষ্টির পরিবর্তন চলে কি না, এবং কৃষ্টিগত পরিবর্তন জৈবিক বিবর্তনের সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনীয় কি না। এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে হয় যে, কৃষ্টিগত পরিবর্তনের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য জৈবিক বিবর্তনের সহিত উহাকে পূর্ণভাবে তুলনা করা যায় না।[৩৩]

জৈবিক বিবর্তনবাদে সাধারণতঃ বলা হয় যে, সকল জীবেরই বিবর্তন ঘটিয়াছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষ-বিশিষ্ট জীব (protozoa বা zoophyte) হইতে। কিন্তু সকল কৃষ্টির বিবর্তন কোন একটি বা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উপাদান হইতে ঘটিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, জৈবিক বিবর্তনের ধারা যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি (যথা, প্রাকৃতিক নির্বাচন, যোগ্যতমের বিবর্তন ইত্যাদি) অনুসারে বর্ণনা করা হয়, তাহাদের সমতুল্য নীতি আমরা সকল সময় কৃষ্টির বিবর্তনের মধ্যে পাই না। আবার জৈবিক বিবর্তনের ধারা কেবলমাত্র পূর্ব পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে পরিচালিত হয় ; অপর পক্ষে, কৃষ্টির ধারা কেবল পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে যায়, তাহা নহে—উহা এক সমাজ হইতে অপর সমাজেও প্রসারিত হইতে পারে।

তবে জৈবিক বিবর্তনের সহিত কৃষ্টিগত বিবর্তনের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। জৈবিক বিবর্তন যেমন সরল হইতে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, কৃষ্টিও সেইরূপ সরল হইতে জটিল আকার ধারণ করে। তাহা ছাড়া, জীবের বিবর্তনের ক্ষেত্রে যেরূপ দেখা যায় যে, পরিবেশের সহিত নূতন জীবের অধিকতর সুষ্ঠু প্রতিযোজন ঘটে, সেইরূপ কৃষ্টির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, পরিবেশের সহিত অধিকতর সুষ্ঠু প্রয়োজনের উপলব্ধি হইতে কৃষ্টির বিবর্তন ঘটে এবং নূতন উপাদানের যদি অধিকতর প্রতিযোজনশীলতা থাকে, তাহা হইলে উহা সমাজমধ্যে স্থায়িভাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, জৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন বিবর্তন সকল সময় উন্নতির দিকে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর

---

৩৩ পূর্বে অনেক নৃতত্ত্ববিৎ (anthropologist) বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীর সকল সামাজিক কৃষ্টিরই এক নির্দিষ্ট ধারায় বিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, অনেকে ইহাও বিশ্বাস করেন যে, প্রথম মানবীয় কৃষ্টি সর্বত্র একই প্রকার ছিল এবং তথাকথিত আদিম কৃষ্টিগুলি সবই কৃষ্টির অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার ফল। বর্তমানের অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিৎ ও সমাজতত্ত্ববিৎ এই মত পরিহার করিয়াছেন।

হয় না এবং মধ্যে মধ্যে অধোগতি হয়, কৃষ্টির ক্ষেত্রেও সেইরূপ ইহা বলা যায় না যে, সকল কৃষ্টিগত পরিবর্তনই সকল সময় উন্নতির পথে যায়। আবার, জৈবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে কখনও কখনও অতি-পুষ্টি (hypertrophy) দেখা দেয় এবং সেই কারণ কোন কোন জীবদেহে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের সংখ্যাধিক্য (proliferation) ঘটে। কৃষ্টির বিবর্তনের সময়ও মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটে যে, কোন একটি বিশেষ কৃষ্টিমূলক উপাদানের অতিবিস্তার ঘটে (যাহা জীবদেহের অতি-পুষ্টি বা hypertrophy-এর সহিত তুলনীয়) এবং তাহার ফলে কৃষ্টিমধ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় বা অনাবশ্যক কার্য দেখা দেয়। যেমন, বর্তমানযুগে অনেক সমাজে যান্ত্রিক প্রগতির ফলে উৎপাদনের হার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ তাহার সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা নাই।[৩৪]

বিভিন্ন সমাজের বস্তুগত (material) কৃষ্টির বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিলে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কৃষিশিল্পের উদ্ভাবনের পূর্বে মনুষ্যসমাজে বন্য-পশু শিকার ও বনজাত ফলমূলাদি খাদ্য হিসাবে সংগ্রহের রীতি ছিল। ধাতবযন্ত্র ব্যবহারের পূর্বে প্রস্তর ব্যবহারের পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। সেইরূপ নগর পত্তনের পূর্বে গ্রাম্যজীবন ও কৃষিশিল্পের প্রাধান্য ছিল এবং তাহারও পূর্বে যাযাবরবৃত্তি বা অর্ধ-যাযাবর বৃত্তিই প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আবার কৃষির উন্নতির পর যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রচলন ঘটিতে থাকে। প্রয়োগশিল্প (technology)-এর উন্নতির ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহারের যত বিস্তার ঘটিতে থাকে, ততই একই বস্তুর বা উপাদানের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ বা ব্যবহার সঙ্কুচিত হইয়া আসে, কারণ নূতন উপাদানের উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন কার্যে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অবশ্য এমন কথা বলা যায় না যে, উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্যই মানবসমাজের সর্বত্র একই পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল; বরং মধ্যে মধ্যে উহার কোন-না-কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

---

৩৪ কৃষ্টির কোন এক বিশেষ 'উপাদান'-এর অতিপুষ্টি (hypertrophy)-র ফলে অন্য উপাদানের বর্ধন কিরূপ ব্যাহত হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ লিণ্টন্ (Linton) বলেন: "The Southwestern Indians had developed ritualism and ceremonial observances to the point where they actually took up most of the time and energy not employed in the business of food-getting. Among the Indians of the Northwest Coast the struggle for wealth to be used for purposes of ostentatious waste and prestige enhancement overshadowed all other considerations..." (*op. cit.*, p. 52).

মোট কথা, জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে কৃষ্টির ধারা একই দিকে বা একই পর্যায়-পরম্পরায় চলিয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। ইহার ফলে মানবসমাজে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে কৃষ্টির ধারাগুলি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নহে; এইজন্য বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের সহিত সাদৃশ্যও বহুল পরিমাণে আছে।

৭। কৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংস্কৃতি-সঙ্ঘ (Cultural Associations):

কৃষ্টিগত ভাবধারা, বিশ্বাস ও আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করিয়া থাকে সমাজস্থ বিভিন্ন সংস্থা, সঙ্ঘ, বা প্রতিষ্ঠান। কৃষ্টি-পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে সকল সামাজিক গোষ্ঠী বা দলই এক হিসাবে কৃষ্টির বাহক ও প্রকাশক এবং সেই অর্থে কৃষ্টিমূলক। যেমন, শৈশবে পারিবারিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণ আরম্ভ হয় এবং সামাজিক কৃষ্টির সহিত তাহার পরিচিতি ঘটে। এইরূপ ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে, পারিবারিক গোষ্ঠীও একটি সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ।

তবে যখন আমরা 'কৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠান' বা 'সংস্কৃতি-সঙ্ঘ' বা অনুরূপ পদ ব্যবহার করি, তখন 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি'-পদটি সঙ্কীর্ণ অর্থ সূচনা করে। সুতরাং কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ বলিতে আমরা এমন সঙ্ঘ বা কৃত্রিম সংগঠন বুঝি যাহার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষতা সাধিত হয়, সুকুমার বৃত্তি ও কোমল অনুভূতি সমূহের তৃপ্তি হয় বা উচ্চ আদর্শের অনুশীলন হয়। সঙ্ঘ মাত্রই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয় (পৃঃ ১২৬); সুতরাং **সংস্কৃতিমূলক সংঘ হইল সঙ্কীর্ণ অর্থে কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রসারের জন্য গঠিত কৃত্রিম দল বা গোষ্ঠী।** এইরূপ অর্থে কৃষ্টিমূলক সংস্থাকে বর্ণনা করিতে হইলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারি:

(ক) কৃষ্টিমূলক সংস্থাসমূহ **বস্তুকেন্দ্রিক নহে।** কোন বিশেষ বা কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আহরণের জন্য ইহারা গঠিত নহে। যেমন, কোন দেশের খনিজ তৈল সংগ্রহ ও শোধনের জন্য যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাহা কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ নহে; কিন্তু কোন্ উন্নততর প্রণালীতে খনিজ তৈল সংশোধন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞানের আদানপ্রদানের জন্য যদি বৈজ্ঞানিকেরা একটি সংঘ গঠন করেন, তাহা হইবে কৃষ্টিমূলক সংঘ। সঙ্গীত চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র

বিক্রয়ের জন্য যে সংঘ গঠিত হয়, তাহা কৃষ্টিমূলক নহে ; অপরপক্ষে সঙ্গীতসাধনার জন্য সঙ্গীতশিল্পীরা যখন কোন সংঘ গঠন করেন, তাহা হইবে কৃষ্টিমূলক। সেইরূপ সেবা-প্রতিষ্ঠান, দর্শন-পরিষদ ইত্যাদি হইল কৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠান।

(খ) কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘসমূহ **আদর্শমূলক** এবং **সৃজন-প্রয়াসী**। সাধারণতঃ এইরূপ সঙ্ঘ কোন আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়—জ্ঞানের আদর্শ, সত্যের আদর্শ, নীতির আদর্শ, সৌন্দর্যের আদর্শ, সেবার আদর্শ বা অনুরূপ কোন কিছু অনুশীলনের ইচ্ছা দ্বারা সঙ্ঘগঠনকারীরা অনুপ্রাণিত হ'ন ; তাহা ছাড়া, শিল্পিসঙ্ঘগুলি কোন কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদের আদর্শকে রূপদানের চেষ্টা করে।

(গ) কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে **ঘনিষ্ঠ সংস্রব** বা **পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা** থাকা প্রয়োজন। একথা সত্য যে, যে কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই বিভেদ দেখা দিলে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় ; তবে কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রাথমিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যেরূপ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও অন্তরঙ্গতা থাকে (পৃঃ ১০৭-১১০), এখানেও সেইরূপ অন্তরঙ্গতা বাঞ্ছনীয়। কোন একটি বিরাট্ যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের মধ্যে দৈনন্দিন কার্যের জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ঘটে না, কিন্তু তাহাতেও প্রতিষ্ঠানটি কার্য করিতে পারে ; কিন্তু কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে—কারণ পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান ব্যতীত যে আদর্শ অনুশীলনের জন্য ইহারা গঠিত, তাহা সাধিত হইতে পারে না। মনের প্রসার, আদর্শের অনুধাবন, সৃষ্টির আনন্দ হইল কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘের লক্ষ্য—সঙ্ঘের সদস্যেরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে সঙ্ঘের পক্ষে উহার লক্ষ্যকে পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।[৩৫]

(ঘ) কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘসমূহের **বহুত্ব** উহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রগতিশীল সমাজমাত্রেই এরূপ সঙ্ঘের বহুল প্রসার ঘটে। সমাজের জনগণের যত মানসিক প্রসার ঘটে, ততই তাহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য বহুমুখী হইয়া উঠে এবং এই

---

৩৫ MacIver & Page-এর ভাষায় : "Unless the members meet as primary groups, the objectives of the cultural association cannot be realized. What, for example, would a church be if its members did not come together for worship and for sustenance in their faith ?" (*Society*, p. 485).

সকল আদর্শ অনুধাবনকল্পে সমাজমধ্যে বহু কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। একই ব্যক্তি একই সময় বহুবিধ কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারে। কোন রাষ্ট্রে একাধিক শাসনব্যবস্থা (government) থাকিতে পারে না, কিন্তু একই সমাজে তথা রাষ্ট্রে নানা উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী নানা কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ থাকিতে পারে। বস্তুতঃ বৈচিত্র্যই হইল কৃষ্টির অন্যতম ধর্ম এবং কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘের বহুলত্ব হইল কৃষ্টির বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

(ঙ) কৃষ্টিমূলক সংস্থাসমূহ সাধারণতঃ যতদূর সম্ভব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিভেদ, দ্বন্দ্ব, কলহ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে থাকিয়া **শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে** নিজেদের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, কৃষ্টিমূলক সংস্থার সদস্যেরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোন আন্দোলন সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ থাকিবেন বা সকল সময় তাঁহাদের সঙ্ঘকে আন্দোলনের সংঘাত হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইবেন। ইহার অর্থ হইল যে, তাঁহারা সঙ্ঘের আদর্শ অনুসরণ কালে দলীয় মনোভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবেন। আজকের দিনে সভ্যজগতে নানাপ্রকার আন্তর্জাতিক কৃষ্টিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে—বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা উহাতে যোগদান করেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রগত বিভেদ যতই সুগভীর হউক্ না কেন কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পারের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তভাবে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করেন (বা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়)।

এইজন্য প্রতি রাষ্ট্রেরই কর্তব্য হইল যে, কৃষ্টিমূলক সংস্থাসমূহের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করা। **রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বা রাষ্ট্রীয় নির্দেশে কোন কৃষ্টিরই সুষ্ঠু বিকাশ ঘটিতে পারে না।** কোন কৃষ্টিমূলক সংস্থাকে অকারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতে বাধ্য করিলে উহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতবাদের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া পড়িবে (যেমন, রাষ্ট্র যদি দর্শন-পরিষদ বা ইতিহাস-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে পরিষদসদস্যেরা যাহা যুক্তি ও নীতিসম্মত তাহা প্রচার করিতে পারিবেন না, হয়ত' রাষ্ট্রের শাসকবর্গের অনুকূলে ইতিহাসকে বিকৃত করিবেন ইত্যাদি)। এইজন্য শিক্ষায়তনসমূহের ক্ষেত্রে যেমন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমর্থনীয় নহে (পৃঃ ২৩০), সেইরূপ কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘসমূহের ক্ষেত্রেও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমর্থনীয় নহে। তবে যেখানে কোন সঙ্ঘ কৃষ্টির নামে অপকৃষ্টি বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় বা স্বাধীন চিন্তার নামে সুকৌশলে রাষ্ট্রের নামে অপপ্রচার করে, সেইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক উহার নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

৮। কৃষ্টিমূলক আলোচনায় দর্শনের স্থান (The role of Philosophy in cultural discussions) :

যে সকল শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা ধীশক্তি উন্নততর হয়, সুষ্ঠু সৌন্দর্যবোধ ও মার্জিত রুচি জন্মে, নৈতিকবোধের বিকাশ ঘটে, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়, তাহাদের কৃষ্টিমূলক শাস্ত্র বলে।[৩৬]

বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ কৃষ্টিমূলক শাস্ত্রের মধ্যে দর্শনের স্থান সর্বোচ্চ বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য করা হয়, অর্থাৎ ইহা আশা করা যায় যে, দর্শন আলোচনার দ্বারা কৃষ্টির সর্বাপেক্ষা উন্নতি সাধিত হয়।

আমরা পূর্বে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৩-৫), তাহার আলোকে বলিতে পারি যে, দর্শন বিবিধ কৃষ্টির মধ্যে যে আদর্শ আছে তাহার বিচার করিতে পারে, কৃষ্টিসংক্রান্ত বিবিধ প্রত্যয়গুলির বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ করিতে পারে এবং পরিশেষে বিবিধ কৃষ্টির তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক বিচার করিয়া উহাদের ঐক্য কোথায়, উহাদের পার্থক্যের তাৎপর্য কী ও উহাদের সমন্বয় ও মিলন কিভাবে ঘটাইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানদান করে।[৩৭] মোটকথা, কৃষ্টির মধ্যে সুসংগতি সম্ভব হয়, যদি আমরা বাহ্যজগৎ, জীব ও মন বা অহং সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া উচ্চ আদর্শের অনুধাবন করিতে পারি।

সকল কৃষ্টির মধ্যেই এক হিসাবে কোন-না-কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। কোন দেশের কৃষ্টিকে বুঝিতে পারার অর্থ হইল উহার দর্শনকে বুঝা। তবে সমাজ যত প্রগতিশালী হইবে, ততই তাহার দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও ব্যাপক হইবে

৩৬ ব্যাপক অর্থে সকল শাস্ত্রই কৃষ্টির পরিচায়ক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি (Natural sciences)-ও কৃষ্টিমূলক শাস্ত্র। তবে সাধারণতঃ 'কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞান'-শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞানের পার্থক্য করিয়া F. Znaniecki বলিয়াছেন: "Nowadays, the data which social scientists and humanists are studying and which natural scientists—astronomers, physicists, chemists, biologists, geologists—ignore are designated by the general term 'culture'." (*Cultural Sciences*, p. 9).

৩৭ ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ডিল্‌টাই (Wilhelm Dilthey)-এর ভাষায়: "Everywhere the philosophical mind is characterized by universal introspection and the character-building and reforming power rooted in it, and by the strong tendency to logical foundation and coherence." (*The Essence of Philosophy*, pp. 67-68).

ইহা আশা করা যায়। এই আশা কতদূর সফল হইবে তাহা নির্ভর করে দর্শনের উপর। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দর্শনের অবদান হইল যে, ইহা পরস্পরকে জানিতে, পরস্পরকে বুঝিতে, পরস্পরের মূল্যবোধের যথোচিত উপলব্ধি করিতে সহায়তা করে এবং বিবিধ আদর্শ নির্ধারণে সহায়তা করে। রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে ইহা শাসনব্যবস্থার আদর্শ নির্ধারণ করে এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা-মূলক মনোবৃত্তি লইয়া কার্য করিতে শিক্ষা দেয়। দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রপরিচালকগণ নাগরিকগণের বিভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস ও কর্মপন্থাকে সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া বিচার করিতে ও উহাদের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন এবং সেইভাবেই রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থা করিতে পারেন। দর্শনের সর্বাধিক অবদান হইল যে ইহা নীতি, ধর্ম, কলা ও অন্যান্য সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে সমালোচনা-মূলক দৃষ্টি হইতে মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকে।[৩৮] সুতরাং মানুষ যখন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবহিত হয়, তখনই কৃষ্টিমূলক শাস্ত্র হিসাবে দর্শনের সার্থকতা।

কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞান হিসাবে দর্শনের কার্য পর্যালোচনা করিয়া আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি :

(ক) দর্শনের কার্য সমাজের গঠনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দার্শনিক বিচার দ্বারাই মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে নিজের সম্বন্ধে এবং সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম হয়।

৩৮ তুলনীয় : "Philosophic enquiry is implicit in each of the aspects of cultures, and the contribution of philosophy to cultural community and communication is found in a form adapted to each of the aspects. With respect to the social aspects of cultures, the contribution of philosophy is to the understanding and appreciation of the values and aspirations of peoples............With respect to the political aspects of cultures, the contribution of philosophy is to the motivation of peoples in their cooperative activities......With respect to the humanistic aspects of cultures, contribution of philosophy is in the critical clarification of values and of means employed for their achievement in arts, sciences, social stuctures and religious observances." (McKeon's Article on 'Philosophy and the Diversity of Cultures' in *Interrelations of Cultures*, UNESCO Publication, pp. 41,42).

(খ) বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে যেগুলি অদ্ভুত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্ধবিশ্বাসের উপর স্থাপিত, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দর্শন সেগুলির বিচার ও তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে পারে। যে কোন আদর্শ, ধারণা ও বিশ্বাস আলোচনাকালে দর্শন ইহার যৌক্তিক মূল্য বিচারের চেষ্টা করে।

(গ) দার্শনিক চিন্তা সকল প্রকার অভিজ্ঞতা ও সকল মূল্যবোধ বিচার করিয়া সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে একটি ঐক্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা গঠনের চেষ্টা করে।

(ঘ) যাহা সসীম, যাহা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীন, যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহাকে অতিক্রম করিয়া দার্শনিকের মন, যাহা অসীম, যাহা স্বাধীন, যাহা চিরন্তন তাহার প্রতি ধাবিত হয়।

(ঙ) স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার মধ্যে যে ঐক্য ও সর্বজনীনতা থাকে, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে; এইজন্য চিন্তার ক্ষেত্রে দর্শন বহু মনের সমন্বয় সাধন করিতে পারে। মোটকথা, আদর্শ ও ঐক্যের সাধক হিসাবে দার্শনিক বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন, বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে ঐক্যসাধন করিতে পারেন, এবং ব্যক্তি-বিশেষের রুচিকে মার্জিত করিতে পারেন। এইজন্য দার্শনিক আলোচনা পরস্পরের সহিত মানসিক যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে। কৃষ্টিমূলক শাস্ত্র হিসাবে দর্শনের এইখানেই বিশেষ সার্থকতা।[৩৯]

৯। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কৃষ্টির বিচার (Philosophical Examination of Culture in Western Thought):

দর্শন সাধারণতঃ বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কৃষ্টির সমালোচনা করে। একদল দার্শনিক কোন বিশেষ প্রকার কৃষ্টিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উহার আলোকে অন্য কৃষ্টির বিচার করেন। আর একদল দার্শনিক বিভিন্ন কৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যে যে সত্য আছে তাহার সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। আবার, আর একদল দার্শনিক কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিচারের সময়

---

৩৯ তুলনীয়: "Philosophy is a function which occurs uniformly in many persons and unites them in a social and historical continuum. In this latter sense it is a cultural system." (Dilthey, *op. cit.*, p. 74).

একটি অতি-সাংস্কৃতিক (trans-cultural) তথা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন।[৪০]

প্লেটো প্রমুখ গ্রীক্ দার্শনিক মনে করিতেন যে, একমাত্র ইন্দ্রিয়াতীত জগতেরই বাস্তব সত্তা আছে; এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই অসার ও মিথ্যা। সুতরাং তাঁহারা মানবীয় কার্য ও আদর্শের মূল্য বিচারকালে উহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। অর্থাৎ অতি-সাংস্কৃতিক অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কৃষ্টির বিচার করাই ছিল তাঁহাদের দর্শনের রীতি।

মধ্যযুগের দর্শনে খৃষ্টীয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানবীয় সংস্থাসমূহের বিচার করা হইত এবং ধর্মীয় অনুশাসনগুলি ঈশ্বরের আদেশরূপে গণ্য করা হইত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগীয় দর্শনেও অতীন্দ্রিয় আদর্শের আলোকেই মানবীয় কৃষ্টির মূল্যায়ন হইত।

আধুনিক যুগের দর্শন ধর্মীয় অনুশাসন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। এইযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতে লাগিল।[৪১] ইহার ফলে আধুনিক যুগের অনেক দার্শনিক কৃষ্টিমূলক সংস্থাসমূহের বিচার কালে উহাদের প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। সাধারণতঃ ইঁহারা বিভিন্ন কৃষ্টির তুলনামূলক বিচার করেন এবং সামাজিক তথা ব্যক্তিগত কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় পর্যালোচনা করেন। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসুবিধা এই যে, প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে যেরূপ ঐক্য ও একরূপতা দেখা যায়, সামাজিক সংস্থাসমূহে ঠিক সেইরূপ দেখা যায় না। এইজন্য বর্তমান যুগের দার্শনিকেরা প্রশ্ন করিতে

৪০ তুলনীয়: "Intellectual attitudes towards culture can be grouped into three very general kinds. The first kind is characterised by acceptance of some given culture as normative. The second attempts a general critique of culture and of all cultures from some universal base assumed to transcend all cultural conditions. The third kind of attitude is concerned with comparative and immanent criticism of cultures...These three different attitudes can be found operating to some degree in every historic period of philosophy." (Friess, Art. on 'Philosophies of Culture' in A *History of Philosophical Systems*, Ed. by V. Ferm).

৪১ তুলনীয়: "Nature establishes unity and everywhere settles a few invariable principles; the soil is still the same, but culture produces various fruits." (Voltaire, *Works*, IX, p. 152).

লাগিলেন : মানবীয় কৃষ্টি ও কৃষ্টিমূলক সংস্থার মধ্যে এত পার্থক্য ও বিভেদ দেখা যায় কেন ? কেহ কেহ বলিলেন যে, বৈচিত্র্যই মানবসমাজের ধর্ম ; আবার কেহ কেহ বলিলেন যে, মানবসমাজে বিরোধ ও পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি আমাদের সকল মানসিক শক্তিকে পূর্ণভাবে সমাজের সহিত প্রতিযোজনের কার্যে নিয়োগ করিতে বাধ্য করে।

হেগেলীয় দর্শনে আমরা তিনপ্রকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় দেখিতে পাই। হেগেল ও তাঁহার অনুগামিগণের মতে বাহ্য জগৎ ও উহার বিবর্তন যে ধারা অনুসারে চলে তাহা পরব্রহ্মেরই চিন্তার অনুলিপিস্বরূপ ; সুতরাং মানবীয় কৃষ্টির সহিত পরমসত্তার এক অতীন্দ্রিয় যোগসূত্র আছে। আবার, হেগেল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানবীয় কৃষ্টি ও প্রগতির তুলনামূলক বিচার করেন। তাহা ছাড়া, হেগেলীয় দর্শনে কৃষ্টির মূল্য বিচারের মান ও আদর্শ হিসাবে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকে গ্রহণ করা হয়।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রচলনের ফলে বিবিধ কৃষ্টির তুলনামূলক বিচার অপেক্ষা উহাদের বিবর্তন ও গতিপথ আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেহ পারিবারিক সংস্থা, কেহ অর্থনৈতিক সংস্থা, আবার কেহ রাজনৈতিক সংস্থার আদি রূপ ও উহার বিবর্তনের ধারা লইয়া গবেষণা করিতে থাকেন।

উনবিংশ শতকে ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ কর্তৃক পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও দর্শন এই তিনের সমবেত অনুসন্ধানের ফলে কৃষ্টি-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রুত প্রসার লাভ করে। আদিম কৃষ্টি লইয়া গবেষণা করেন টাইলর (Tylor) ; বিভিন্ন কৃষ্টি সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেন বোয়াস (Franz Boas) ; কৃষ্টি-বিজ্ঞান (Cultorology) নামে এক পৃথক বিজ্ঞান স্থাপন করেন হোয়াইট্ (Leslie White)।

সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ লেখকই বিভিন্ন কৃষ্টি, তাহাদের রূপ (pattern) এবং পারস্পরিক প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে আবার কৃষ্টির বিভিন্ন পরিক্রমা ও চক্রক আবর্তন সম্বন্ধে প্রকল্প গঠন করেন। ভিকো (Vico), স্পেঙ্গলার্ (Spengler), বের্গসোঁ (Bergson), টয়েন্‌বি (Toynbee), সোরোকিন্ (Sorokin) প্রমুখ লেখকরা তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কৃষ্টির বিভিন্ন চক্রক আবর্তনের পরিকল্পনা করেন।

মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন ফ্রয়েড্। নৃতত্ত্বের দৃষ্টি হইতে কৃষ্টির কামিকতা (function) লইয়া আলোচনা

করেন ম্যালিনোস্কি। প্রয়োগবাদ (pragmatism)-এর দৃষ্টি হইতে কৃষ্টির পুনর্গঠন (reconstruction)-এর কথা বলেন ডিউই (Dewey)। তাঁহার মতে কৃষ্টি সম্বন্ধে কোন পূর্ব পরিকল্পিত আদর্শ গঠন করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন আদর্শের সাফল্য বিচার করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, যে কোন দার্শনিক আলোচনায় কৃষ্টিমূলক আলোচনাকে প্রধান স্থান দান করা উচিত। তাঁহার মতে কৃষ্টির দার্শনিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইবে কৃষ্টি-সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ, কৃষ্টির আদর্শগুলির মূল্যনিরূপণ এবং বাহ্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যাথার্থ্য-অযাথার্থ্য বিচার।

সাম্প্রতিক কালে নর্থরোপ্ (F. S. C. Northrop) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির তুলনামূলক বিচার করিয়া ইহাদের সমন্বয় কিভাবে ও কতদূর সম্ভব তাহা আলোচনা করিয়াছেন।[৪২]

১০। প্রাচীন ভারতের কৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য (Chief characteristics of Ancient Indian Culture):

প্রাচীন ভারতের উচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১৮৩ ও ২৫০) আভাস পাইয়াছি। আমরা বৈদিক ভারতের পারিবারিক সংস্থার আদর্শ ও শিক্ষার আদর্শ আলোচনা কালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে অধ্যাত্মবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত; কিন্তু তাই বলিয়া জাগতিক উন্নতি ও জাগতিক সুখবিধানের প্রতি ভারত উদাসীন ছিল না। জনসাধারণ যাহাতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারে, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব কর্তব্য অনুধাবন করিতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বিবিধ সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আখ্যা হইয়াছিল 'মানবধর্ম' বা 'মানবসংস্কৃতি'। ভারতীয় দর্শনই

৪২ নর্থরোপ্ (Northrop) আশা করেন: "......it should eventually be possible to achieve a society for mankind generally in which the higher standard of living of the most scientifically advanced and theoretically guided western nations is combined with the compassion, the universal sensitivity to the beautiful, and the abiding equanimity and calm joy of the spirit which characterize the sages and many of the humblest people of the Orient." (*The Meeting of East and West*, p. 496).

উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় কৃষ্টির বাহক। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্রগুলি অনুধাবন করিলেই ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে।

ভারতীয় জীবনদর্শনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের কথা বলা হয়; তবে এই চারিটির ভিতর মোক্ষকে চরম লক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করা হয়। মোক্ষলাভ ঘটিলেই আত্মার মুক্তি লাভ হয়। (পৃঃ ১৮৪)।

ভারতীয় দর্শনে জীবনকে কোন আকস্মিক ঘটনারূপে গণ্য করা হয় না। ব্যক্তিবিশেষের বর্তমান জীবন তাহার প্রাক্তন কর্মফল দ্বারা নির্ধারিত—তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ করিয়া নিষ্কামভাবে জ্ঞানলাভ করিলেই ঐহিক বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৮৫)। কিন্তু কামনা থাকিলে বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না—বাসনার জন্যই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বাসনাই আমাদের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। এইজন্য বাসনাকে সুসংযত করা এবং বাসনার বিষয়বস্তুকে মার্জিত করার উপর ভারতীয় দর্শন গুরুত্ব আরোপ করে। বাসনার বিষয়বস্তুকে প্রেয় এবং শ্রেয় এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। আত্মিক কল্যাণের জন্য যেগুলি শ্রেয় সেইগুলিকেই কামনা করা উচিত।

মোক্ষলাভ করিতে হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে তাহার উপযুক্ত হইতে হইবে এবং এই জন্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ধর্ম বা নীতির অনুশাসন অনুযায়ী কার্য করা উচিত। ধর্মই ব্যক্তিবিশেষকে ধারণ করে। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি হইল ধর্মের প্রধান অনুশাসন।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে চারিটি আশ্রমের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করা প্রয়োজন; এই চারিটি আশ্রম হইল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস (পৃঃ ১৮৪)।

প্রতিটি 'আশ্রম'-ই হইল কর্তব্যপূর্ণ। এমন কি গার্হস্থ্যজীবনও কেবল ভোগের জীবন নহে; ইহা হইল কর্তব্যের জীবন। গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য হইল পাঁচটি যজ্ঞ সাধন; যথা, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। (পৃঃ ১৯০)।

প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজব্যবস্থা চারিটি বর্ণবিভাগের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই চারিটি বর্ণ হইল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। (পৃঃ ১৮৪)। সমাজমধ্যে

নির্দিষ্ট বর্ণ-বিভাগ থাকিত বলিয়া সকলেরই জন্য এক একটি বৃত্তি সুনির্ধারিত থাকিত।[৪৩]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় জীবনদর্শনে যে কেবলমাত্র উচ্চ অধ্যাত্মবাদের কথা বলা হইত এবং উহা জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতি উদাসীন ছিল তাহা নহে; উহার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, আনন্দ ও কর্তব্যবোধের সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুযুগ হইতে ভারতে যে কৃষ্টির ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন লক্ষ্য পথ, বিভিন্ন বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, "যত মত, তত পথ।" এইজন্য প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের কৃষ্টিতে সহনশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরমতসহিষ্ণুতা, পরের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিবার চেষ্টা করা, অপরের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার মত উদারতা—এইগুলি হইল ভারতের সনাতন কৃষ্টির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এইজন্য ভারতের কৃষ্টিতে বহু আদর্শের সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং ইহা বৈচিত্র্যময়। বাস্তবিক, সভ্যজগতের এমন কোন আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী নাই যাহা কোন-না-কোন ভাবে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নাই।[৪৪]

৪৩ কেহ কেহ মনে করেন যে, উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থায় হিন্দুর বর্ণ-বিভাগের ন্যায় শ্রেণীভেদ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। আউস্‌পেন্‌স্কি (P. D. Ouspensky)-এর ভাষায়: "All the most brilliant periods of history, without exception, were periods in which the social order approached the caste system." (*A New Model of the Universe*, p. 447).

৪৪ ভারতীয় কৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন: "The culture of India is extremely complex; in its roots and in its implications, it is perhaps more complex than any other. And in its complexity, it is like life itself, like life it is all-inclusive. It is vast as nature herself, nature as she has been manifested in the minor continent of India...Indian culture in its broadest connotation would include all that has been achieved in the domain of thought and in the pursuit of the good life by the people of India, as a whole or in groups, ever since the component elements of the Indian people (the Austric, the Dravidian and the Aryan-speaking groups) began to form, in the upper Gangetic plains, a simple people having a single Aryan speech and sharing the same traditions, the same way of thought, the same attitude and the same life." (*Interrelations of Cultures*, pp. 160, 161).

ভারতীয় কৃষ্টিতে কলা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে চতুঃষষ্ঠী কলার উল্লেখ আছে। নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কলাশাস্ত্র ভারতে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছিল। শিল্পীর সৃষ্টি কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ নহে—শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একাগ্রচিত্তে সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেন; শিল্পীর শিল্পসাধনা যোগসাধনারই অনুরূপ ছিল। যোগী যেমন ধ্যান দ্বারা পরমসত্তার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করিতেন, শিল্পসাধকও সেইরূপ তাঁহার অনুভূতিকে সুসমঞ্জস বাহ্যরূপ দিবার প্রয়াস করিতেন। শিল্পের মাধ্যমেও ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদকে রূপায়ণের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

১১। সর্বকৃষ্টি-সমন্বয়—সর্বজনীন কৃষ্টির আদর্শ (Synthesis of all Cultures—the Ideal of Universal Culture) :

বর্তমান যুগের মানব সমাজের একটি প্রধান সমস্যা হইল আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন। আজ মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মত পার্থক্যের জন্য জগৎ শতধা বিচ্ছিন্ন। এক এক সময় মনে হয় যে, সমগ্র মানবজাতি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—মানবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার এক সঙ্কটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়া যেন সমগ্র মানব সমাজ চলিয়াছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায় কী ? অনেকে ইহা মনে করেন যে, মানবসমাজের এই অন্তর্বিরোধের মূল কারণ হইল মানসিক। অর্থাৎ এই বিরোধের মূলে আছে বিভিন্ন আদর্শ ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাত। কিন্তু যে কোন সমাজের আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী উহার কৃষ্টি হইতে উদ্ভূত। সুতরাং **সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তর্মানবিক সম্বন্ধ ও সমগ্র জগতের শান্তি স্থাপন করিতে হইলে বিভিন্ন কৃষ্টির আদর্শের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইবে, সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া উহাদের বিচার করিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব উহাদের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।**

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থাপন সম্ভব হইয়াছে ; ভৌগোলিক দূরত্ব আজ আর পরস্পরের সহিত সংযোগে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থানগত দূরত্বের অসুবিধা কমিয়া যাইলেও মানসিক সঙ্কীর্ণতা সেই অনুপাতে কমিয়া যায় নাই ;

পরস্পরের সহিত সংযোগ ঘটিলেও আজ কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, এক জাতি অপর জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছে, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নব নব মারণাস্ত্র সৃষ্টি করিতেছে, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্থানগত বা বাহ্য দূরত্ব অতিক্রম করাই আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও শান্তি স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার জন্য প্রয়োজন উন্নততর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী—পরস্পরের সহিত অন্তরের যোগ, পরস্পরকে জানা, পরস্পরকে বুঝা, পরস্পরের আদর্শের স্বরূপ উপলব্ধি করা এইরূপ পারস্পরিক বুঝার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইল বিবিধ কৃষ্টির সমন্বয়।

কিন্তু বিবিধ সামাজিক কৃষ্টির সমন্বয় ও ঐক্যসাধন কি ভাবে সাধিত হইতে পারে? বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয় সাধনের প্রধান অসুবিধা হইল যে, প্রতি গোষ্ঠীরই স্বীয় গোষ্ঠীর কৃষ্টির প্রতি একদিকে থাকে রক্ষণশীল মনোভাব, এবং অপরদিকে থাকে স্বীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে সু-উচ্চ ধারণা। স্বীয় কৃষ্টির প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব থাকার জন্য ব্যক্তি-বিশেষ সহজে অন্য কৃষ্টির আদর্শ গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহা ছাড়া, কোন বিশেষ কৃষ্টির প্রভাবাধীন ব্যক্তিরা মনে করে যে, তাহাদের কৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি এবং তাহাদের মতবাদ, ধারণা, আদর্শ ইত্যাদিই যুক্তিপূর্ণ এবং অন্যগুলি নহে।

এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দূর করিতে হইলে ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতে হইবে যে, জগতের প্রতি বস্তুরই বিভিন্ন দিক্ আছে। একজন কোন বস্তুকে বুঝিবার জন্য উহার হয়ত' একটি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে; আর একজন হয়ত' অন্য বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এইজন্য একই বস্তু সম্বন্ধে দুইটি পৃথক্ মতবাদ গড়িয়া উঠে, অথচ এই দুইটি মতবাদ পৃথক হইলেও হয়ত' বিপরীত নহে—ইহারা পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারে। বাস্তবিক, আমাদের বিবিধ বিশ্বাস ও মতবাদকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই যে, উহাদের মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নাই। একই বস্তু বা একই ঘটনা বা একই পরিস্থিতিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং এই কারণ উহাদের সমন্বয় সম্ভব।[৪৫]

---

৪৫ দর্শন হইল উচ্চ পর্যায়ের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শক। সেই দর্শনের ক্ষেত্রে বহুবিধ মতবাদ আছে—ইহাদের সমন্বয় কিভাবে সম্ভব তাহার উল্লেখ করিয়া ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন: "...although reality is one, it has various aspets, many forms and manifes-

সুতরাং কৃষ্টির সমন্বয় সাধনের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে :

(ক) কোন জাতির কৃষ্টির মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে হইলে উহার মধ্যে মূল্যবোধের কোন্ ধারণা নিহিত আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

(খ) কোন সমাজের মূল্যবোধের ধারণার প্রকাশ ঘটে ঐ সমাজের বিবিধ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সংঘের মাধ্যমে, উহার বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে, ও উহার সমষ্টিগত কার্যের দ্বারা। সুতরাং ঐ সকল সংস্থা, আদর্শ ইত্যাদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

(গ) এই প্রকার বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন সমাজের কৃষ্টির তুলনামূলক বিচার করিতে হইবে। অনেকস্থলে একই সুপ্রাচীন কৃষ্টির পরিবর্তন নানা গোষ্ঠীর মধ্যে নানাভাবে হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানের কোন সামাজিক গোষ্ঠী বা জাতির কৃষ্টি বিচার করিতে হইলে উহার অতীত ইতিহাস জানা প্রয়োজন এবং একই মূল কৃষ্টি কিভাবে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন কৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও জানিতে হইবে। এইরূপ বিচারের ফলে বিভিন্ন কৃষ্টির বৈচিত্র্যের পশ্চাতে যে ঐক্য আছে, তাহা আবিষ্কার করা যায়।

(ঘ) কোন সামাজিক কৃষ্টির প্রভাবে ঐ সমাজের শিশুরা কিভাবে শিক্ষালাভ করে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং ঐ শিক্ষণপদ্ধতির সহিত অন্য প্রকার শিক্ষণপদ্ধতির তুলনামূলক বিচার করিতে হইবে।

(ঙ) প্রতি জাতি তথা প্রতি রাষ্ট্রকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদান করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন আবিষ্কারকে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করা উচিত নহে, নবলব্ধ জ্ঞান যদি অন্যের সহিত বণ্টন করিয়া লওয়া যায় তবেই জ্ঞানের প্রসার ও প্রগতি ঘটিবে। সুতরাং বিশ্বশান্তির জন্য কেবল যুদ্ধনিরোধের উপায় অবলম্বনই যথেষ্ট নহে; উহার জন্য প্রয়োজন

tations. As such, reality is many-faced and many-sided. This is true, not only of absolute reality, but also of every object in the world. Any object has innumerable positive and negative characteristics. So, any object may be said to be many-faced and many-sided. If this is so, then the ultimate truth about reality or the world must be manifold, and different beliefs and philosophies will be but expressions of different aspects of it. They may be shown to be complementary parts of one system, and so there may be no quarrel among them." (Dr. S. C. Chatterjee, 'On Philosophical Synthesis,' *Philosophy, East & West*, Vol. X).

কৃষ্টির ক্ষেত্রে—অর্থাৎ শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে—ভাবের আদানপ্রদান এবং অন্যের আদর্শ বিচার। কোন আদর্শ বিচার করিবার সময় কেবলমাত্র বিচারকারীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহা বিচার করিলে চলিবে না. ঐ আদর্শ যাহারা অনুসরণ করে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও উহার বিচার করিতে হইবে।

বর্তমান যুগের বিভিন্ন সমাজের কৃষ্টির তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের কৃষ্টির মিলন ও সমন্বয় বাঞ্ছনীয়[৪৬]:

(ক) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃষ্টির সমন্বয়;

(খ) লাতিন আমেরিকার প্রাচীন কৃষ্টি এবং বর্তমান যুগের ইওরোপ-আমেরিকার কৃষ্টির সমন্বয়;

(গ) গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের আদর্শের সমন্বয়;

(ঘ) মধ্যযুগীয় ইউরোপের আদর্শ ও বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জগতের আদর্শের সমন্বয়।

যদিও বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় এই সকল কৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়াছিল, এবং যদিও তাহাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর বহুল পার্থক্য আছে, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে পূর্ণ বিরোধিতা নাই। কারণ মানুষে মানুষে যেমন পার্থক্যও আছে, সেইরূপ সাদৃশ্যও আছে; সুতরাং মানুষের প্রয়োজন ও প্রতিযোজনমূলক কার্যের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে—এই কারণে বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়।[৪৭] দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই সকল মূলগত সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা উচিত। যদি আমরা বিভিন্ন কৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমরা দেখি যে, কোন কৃষ্টিতে প্রয়োজন-পরিতৃপ্তির উপর প্রাধান্য, কোনটিতে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য, কোনটিতে অনুভূতির প্রাধান্য; কিন্তু এই সকল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং কৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখিয়া উহাদের ঐক্য ও সমন্বয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ নাই। বাস্তবিক, কোন সমাজই আজ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না.

৪৬ F. C. S. Northrop, *The Meeting of East and West*, p. 436.

৪৭ তুলনীয়:

"নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্।"

বর্তমান কালের উন্নততর যোগাযোগ ও পরিবহন পদ্ধতির ফলে বোধ হয় কোন সামাজিক গোষ্ঠীই অন্য গোষ্ঠীসমূহের প্রভাব হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারে না।[৪৮]

কৃষ্টির বাস্তব সমন্বয় গভীর হয় যখন বিভিন্ন কৃষ্টির অনুগামীদের মধ্যে হৃদয়ের সংযোগ ঘটে; কিন্তু হৃদয়ের সংযোগকে স্থায়ী রূপ দান করিতে হইলে উহার পশ্চাতে থাকা উচিত বৌদ্ধিক যৌক্তিকতা। এই স্থানেই দর্শনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। দর্শন যদি যুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ বৈপরীত্য সম্বন্ধে ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করিতে পারে, যদি মিথ্যা অহঙ্কার দূর করিতে পারে, যদি একই লক্ষ্যের বহুমুখিতা দেখাইতে পারে, তাহা হইলে কৃষ্টি-সমন্বয়ের পথে সুষ্ঠু বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হইতে পারে।[৪৯]

১২। কৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা (Necessity of Culture):

কোন কোন লেখক কৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তথা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। 'কৃষ্টি' পদটি যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন নিরর্থক। কারণ সামাজিক

৪৮ উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে যে বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয়সাধন সম্ভব হইতে পারে, তাহার বাস্তব উদাহরণ পাই আমরা ভারতের পুণ্যভূমিতে। কবিগুরুর ভাষায়:

"কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

৪৯ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর জাতীয় সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে দার্শনিকের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিভিন্ন কৃষ্টি-সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: "It is the duty of the philosophers to supply the basis of the necessry intellectual integration. Emotions are like floods which sweep away everything before them... Philosophers must help to shape the channels along which emotions can be made to flow. Once such intellectual integration takes place, once an intellectual scaffolding has been provided, emotions will do the rest." (Prof. Kabir's Presidential Address at the 36th. Session of Indian Philosophical Congress).

গোষ্ঠীমাত্রই উহার পরিবেশের সহিত কোন-না-কোন ভাবে প্রতিযোজন করে ও এইভাবে একটি নির্দিষ্ট আচরণ-পদ্ধতি গড়িয়া উঠে এবং উহাই হইল ব্যাপক অর্থে ঐ গোষ্ঠীর কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। সুতরাং সমাজভুক্ত মানুষ ইচ্ছা করুক বা নাই করুক, সে সর্বদাই এক বিশেষ প্রকারের কৃষ্টির প্রভাবে আসিয়া পড়ে। অতএব, তাহার পক্ষে কৃষ্টি গ্রহণ করা বা পরিহার করার প্রশ্ন উঠে না।

'কৃষ্টি'-পদটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিলে উহা উচ্চ পর্যায়ের মানসিক উৎকর্ষতা এবং নীতি, ধর্ম ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বিবিধ আদর্শ বুঝায়। কালক্রমে প্রতি সমাজেই নীতি, ধর্ম ইত্যাদির একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে এবং নীতি, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহা ছাড়া, ইহাও বলা হয় যে, এই সকল আদর্শের শাশ্বত ও অন্তর্নিহিত (eternal and intrinsic) মূল্য আছে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে কয়েক দল লেখক আপত্তি করেন।

(ক) মার্কসবাদীরা বলেন যে, তথাকথিত সনাতন কৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট আদর্শসমূহের নিজস্ব কোন অলঙ্ঘনীয় মূল্য নাই। অধিকাংশ সামাজিক আদর্শগুলি দরিদ্র জনগণের নিপীড়নের জন্য পুঁজিবাদী কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল (পৃঃ ৬৯-৭০)। সুতরাং সামাজিক আদর্শসমূহের অপরিহার্যতার দাবী স্বীকার করা যায় না।

এই মতবাদ সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, সমাজস্থ সকল আদর্শই পুঁজিবাদী দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। সমাজে পুঁজিবাদের উদ্ভবের বহু পূর্বেই অনেক আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সকল আদর্শকে ব্যাখ্যা করিলে ঐ ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত হইয়া পড়ে।

(খ) ধর্ম, নীতি প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক আদর্শ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয়রা মনে করেন যে, উহাদের নিজস্ব মূল্য নাই। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের জীবনে কাম (libido)-ই প্রধান প্রেষণা (motivating force)-রূপে কার্য করে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এইরূপ যে, সকল কামজ বাসনাকে পূর্ণ করা সম্ভব নহে। আমরা এইজন্য কামের অবদমন (repression) ও উদ্গতি (sublimation)-এর প্রচেষ্টা করি। মানুষের সভ্যতারই সৃষ্টি হইয়াছে কামের এই অবদমন ও উদ্গতির প্রচেষ্টা হইতে; ইহারই ফলে সমাজে ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে।[৫০]

---

৫০ Freud, *Civilisation and its Discontent* এবং Marcuse, *Eros and Civilisation* দ্রষ্টব্য।

এই মতও পূর্বের মতের ন্যায় একদেশদর্শী। কেবলমাত্র কামের দ্বারা মানুষের সকল আদর্শ এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। ফ্রয়েডীয়রা মনে করেন যে, কামের অবদমন ও উদ্গতি ঘটে বলিয়াই কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে বলিয়াই সে কামের প্রকাশ্য এবং উচ্ছৃঙ্খল পরিতৃপ্তিকে অন্যায় বোধ করে। সুতরাং কামের অবদমনের সাহায্যে সভ্যতাকে ব্যাখ্যা না করিয়া সভ্যতার দ্বারা কামনিয়ন্ত্রণকে ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত।

(গ) আবার কেহ কেহ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনে করেন যে, মানবজীবনে বিজ্ঞানেরই সর্বোচ্চ স্থান এবং এইজন্য একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণযোগ্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একমাত্র বাহ্য অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা সমর্থনযোগ্য তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম, নীতি ইত্যাদি কৃষ্টিমূলক আদর্শ এবং উহার 'অন্তর্নিহিত মূল্য' সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা বাহ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করা যায় না। অতএব বর্তমান কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে কৃষ্টিমূলক আদর্শ বলিয়া অপরিহার্য কোন কিছু থাকিতে পারে না।

এই মতও গ্রহণযোগ্য নহে। বর্তমানযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটিয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী এ কথা বলা যায় না। বরং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত অধিকাংশ স্থলে নীতি ও ধর্মের সংস্রব না থাকার জন্য উহার বিষময় ফল দেখা দিতেছে। বিজ্ঞান আজ জগতের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত না হইয়া ধ্বংসের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জাগতিক মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের সহিত নীতি, সৌন্দর্য ও ধর্মের সংযোগ বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানই উন্নতির পরাকাষ্ঠা নহে।[৫১] এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, অভিজ্ঞতামূলক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি কৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে না, বরং উচ্চপর্যায়ের কৃষ্টির অপরিহার্যতাই প্রমাণ করে। প্রকৃত বিজ্ঞান উচ্চ কৃষ্টির বিরোধী নহে, বরং উহার সহায়ক।[৫২]

---

৫১ তুলনীয়: "Science is not the last word, but at best the last word but one."

৫২ যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (natural science)-কে কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞান (cultural science) হইতে পৃথক্ করা হয় (পৃঃ ২৮৭ পাদটীকা), তাহা হইলেও প্রকৃত বিজ্ঞানের সহিত চরম মূল্য বা পুরুষার্থের বিরোধ নাই। এইজন্য অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) ব্যাপক অর্থে সকল

(ঘ) প্রয়োগবাদ (Pragmatism)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একদল দার্শনিক বলেন যে, কৃষ্টিমূলক কোন আদর্শকে শাশ্বত ও অপরিহার্য বলা যায় না। যে কোন আদর্শকে বিচার করিতে হইলে কার্যক্ষেত্রে উহাকে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে উহা কতদূর সাফল্য লাভ করে।

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২৩৫-৯৭) শিক্ষাদর্শন আলোচনা কালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রয়োগবাদ পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

অতএব, পরিশেষে আমরা মন্তব্য করিতে পারি যে, **কৃষ্টি মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য**। কলাশিল্প প্রভৃতি মানুষের সৃজনী শক্তি বিকাশের সহায়তা করে এবং মানুষকে নির্মল আনন্দ দান করে; নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং তাহাকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তোলে। এ কথা সত্য যে, প্রতি সমাজেরই নীতি, ধর্ম প্রভৃতি সংক্রান্ত কৃষ্টিমূলক আদর্শকে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া যাহা কিছু পুরাতন তাহা পুরাতন বলিয়াই পরিহার করা উচিত নহে (পৃঃ ১৩৪), আবার আদর্শমাত্রই সুবিধাবাদের প্রকাশ বা কামের প্রকাশ এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। বাস্তবিক, উচ্চ পর্যায়ের কৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, ইহাই সকল শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় মানুষের সকল মানসিক সু-প্রবৃত্তির সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, একমাত্র উচ্চপর্যায়ের কৃষ্টি দ্বারাই ইহা সাধিত হইতে পারে।[৫৩]

বিজ্ঞানকেই কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করেন ; তিনি বলেন, "Science is sometimes apt to be conceived as rather antagonistic to culture. ......But the failure to recognize its cultural significance is largely due to the narrow way in which the term is generally used." (*op. cit*, p. 231).

৫৩ তুলনীয় : "If we are right in thinking that the ultimate good for man lies in the perfection of the higher elements of his nature, and in the control of the lower by means of them, it is evident that it is in the various forms of culture that we find the gradual realisation of this. The truly cultivated man has achieved 'the best of which human nature is capable." (Mackenzie, *op. cit.*, p. 240).

দশম অধ্যায়

ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থা

প্রাচীন বা নবীন, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীর কৃষ্টি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার কোন-না-কোন ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মীয় মতবাদ আছে। এ কথা সত্য যে, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ধর্মমতের মধ্যে প্রচুর বিভেদ আছে, এবং আদিম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বহুলাংশে পৃথক্; কিন্তু তাহা হইলেও এমন কোন সামাজিক কৃষ্টি পাওয়া যায় না যাহার মধ্যে কোন প্রকার ধর্মমত নাই। ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ নাস্তিক থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র সমাজই নাস্তিক এরূপ সাধারণতঃ ঘটে না।[১] এইজন্য সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনে ধর্মের স্বরূপ, বিবর্তন, প্রভাব ও মূল্য সম্বন্ধীয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

১। ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Religion):

যদিও সাধারণভাবে বলা যায় যে, ধর্মের সার্বিক অস্তিত্ব আছে, তাহা হইলেও ইহার কোন সংক্ষিপ্ত, সুষ্ঠু সংজ্ঞা দান করা কঠিন। যদি যুক্তিশাস্ত্রসম্মত কোন সংজ্ঞা দান করিতে হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞাটি এমন হওয়া উচিত যে, উহা যেন প্রাচীন ও নবীন, প্রধান ও অপ্রধান সর্বপ্রকার ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

'ধর্ম' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল যাহা ব্যক্তি-বিশেষকে ধারণ করে এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যক্তি-বিশেষের সকল আচার ও আচরণ ধর্মের অন্তর্গত। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম বলিতে চারিটি আশ্রমের উপযুক্ত চারি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট সকল কর্মই বুঝায়।[২] হিন্দুমতে কর্তব্যসাধনের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান তথা জগতের আদি সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

---

১ বর্তমান কালে কোন কোন সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ধর্মের কোন স্থান নাই; কিন্তু এরূপ রাষ্ট্রে প্রত্যকটি নাগরিকই বিনা দ্বিধায় নাস্তিক হইয়াছেন এমন বলা যায় না।

২ ধৃ+মন্=ধর্মন্. ইহা হইল 'ধর্ম' পদের ব্যুৎপত্তি। গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ধর্মকারদের শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে: বর্ণবিভাগ, আশ্রম-পরম্পরা, গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত বিবিধ সংস্কার, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অনধ্যায়, স্নাতক, বিবাহ, শৌচ, পঞ্চযজ্ঞ, দান, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শুদ্ধি, অশৌচ শ্রাদ্ধ, স্ত্রীধন, স্ত্রীপুংধর্ম, রাজধর্ম, ব্যবহার আপদ্ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম, বিপাক, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ইত্যাদি।

সকল ধর্মেই বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালনের উপর অল্পাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এইরূপ আচরণের পশ্চাতে এই বিশ্বাস থাকে যে, এইরূপ আচরণের দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে অবস্থিত শক্তি বা শক্তিনিচয়ের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইবে।

অতি প্রাচীন যুগের টোটেম পূজা, প্রেতপূজা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বহুদেববাদ, একেশ্বরবাদ পর্যন্ত বিবিধ ধর্মীয় মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়[৩]:

(ক) ধর্মমাত্রেই এমন এক বা একাধিক শক্তিতে বিশ্বাস করা হয় যাহা বা যিনি বা যাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী এবং গুণশালী, অথচ মানুষের পূজাদির ফলে তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারেন না—বরং মধ্যে মধ্যে তাহাদের প্রার্থনাদি পূরণ করিয়া থাকেন।

(খ) এই শক্তি বা শক্তিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া উহা বা উহাদের প্রতি মানুষের মনে ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম ইত্যাদি ভাবাবেগের অভ্যুদয় হয়।

(গ) এই সকল ভাবরাশি হইতে নানারূপ ক্রিয়াকলাপ, পূজা, আচার-আচরণ ইত্যাদি দেখা দেয়।

এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, ধর্মের ভিতর **জ্ঞান, অনুভূতি ও আবেগ এবং কর্মের অপূর্ব সমন্বয়** ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, আদিমযুগের ধর্মের সহিত যে সকল ধারণা, ভাবাবেগ ও ক্রিয়া জড়িত ছিল ধর্মের বিবর্তনের

এইরূপ বিরাট্ ও ব্যাপক তালিকার উপর মন্তব্য করিয়া কাণে (P. V. Kane) মন্তব্য করিয়াছেন: "The writers on dharmaśāstra meant by dharma not a creed or religion, but a mode of life or a code of conduct, which regulated a man's work and activities as a member of a society and as an individual and was intended to bring about the gradual development of a man and to enable him to reach what was deemed to be the goal of human existence' (*History of Dharmaśāstra*, Vol. II, p. 2).

হিন্দুর ধর্ম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নিষ্ঠা সহকারে আচরণের উপর ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, কতকগুলি আচার পালনের মধ্যেই হিন্দুধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু আচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ এই যে, হিন্দুদের মতে শুদ্ধভাবে আচার পালন ও কর্তব্যসাধনের মাধ্যমেই ব্যক্তিবিশেষ উচ্চতর ঐশী সত্তাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

৩ গ্রন্থকার রচিত প্রবন্ধ "ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম কি সম্ভব?" (দর্শন-পত্রিকা, ১৩৬৬ সন, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬-২১) দ্রষ্টব্য।

ফলে তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে যেখানে ধর্মের আরাধ্য শক্তিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, ক্রোধী, অমিত দৈহিক ও প্রাকৃত শক্তির অধিকারী মনে করা হইত, আজ তাঁহাকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, প্রেমময়, ক্ষমাসুন্দর, আত্মিকশক্তির অধিকারী মনে করা হয়। পূর্বে যেখানে আরাধ্যশক্তিকে স্বার্থের জন্য তুষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হইত, যেখানে ভক্তি অপেক্ষা ভয়েরই প্রাধান্য ছিল, আজ সেখানে মানুষ অনেকক্ষেত্রে অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্বে যেখানে ধর্মের জন্য অনৈতিক বীভৎস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত, আজ সেখানে মানুষ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সুন্দর, সরল পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদি কার্য একক অথবা সংঘবদ্ধভাবে সাধন করে। অবশ্য, বিবর্তনের ফলে ধর্মের বাহ্যরূপ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইলেও, উহার অন্তর্নিহিত মূল 'উপাদান'-গুলি সমান আছে ; অর্থাৎ ধর্মের ভিতর জ্ঞান ও বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতি, কার্য বা ক্রিয়াকলাপাদি কোন-না-কোন রূপে চিরকাল বিদ্যমান—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়েই ধর্ম সংগঠিত। প্রাচীন ও নবীন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও ধর্মমাত্রেরই একটি **সামাজিক মূল্য** আছে, কারণ ধর্মীয় মনোভাব হইতে সামাজিক সংহতি দেখা দেয়। ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক পরিবেশ ধর্মীয় আচার-আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে ; আবার বিবিধ ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুশীলনের ফলে সমাজের গতিপথ পরিবর্তিত হইয়াছে।

ধর্মের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়া যদি ধর্মের একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা দান করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, **ধর্ম হইল মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর বা মহত্তর এক বা একাধিক শক্তিতে বিশ্বাস ও ঐ সম্বন্ধীয় ধারণা, উহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ভাব বা অনুভূতির সঞ্চার এবং উহা হইতে প্রসূত কতকগুলি কর্মপ্রবৃত্তি**—ইহাদের সহিত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জড়িত আছে ব্যক্তিগতভাবে পার্থিব বা অপার্থিবভাবে কোন কিছু প্রাপ্তির আশা ; আবার এই সব আচরণের ফলে সাধারণতঃ উদ্ভূত হয় সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন এবং গঠিত হয় সামাজিক আদর্শ।[৪]

৪ তুলনীয় : (১) "Religion is man's belief in a being or beings mightier than himself and inaccessible to his senses, but nor indifferent to his sentiments and actions, with the feelings and practices which flow from such a belief." (Robert Flint, *Theism*, p. 32)

সর্বোচ্চ আদর্শের দিক্ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যে ধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং যাহা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ একেশ্বরবাদ (ethical monotheism)-ই সর্বোচ্চ ধর্ম।[৫]

যদিও ধর্মের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও কোন কোন লেখক একটি বিশেষ উপাদানের উপর (যেমন, কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র অনুভূতি বা কেবলমাত্র ক্রিয়ার উপর) গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উহার সাহায্যেই ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, এ সকল ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। **ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য তিনটি উপাদানের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।**[৬]

২। ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন (Origin & Evolution of Religion):

আমরা যতদূর পর্যন্ত মানবসমাজের ইতিহাস অনুধাবন করিতে পারি, ততদূরই কোন-না-কোন প্রকারের ধর্মবিশ্বাস তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচয় পাই। কিন্তু মানবসমাজে আদি বা মূল ধর্ম কী ছিল বা কোন্ কোন্ স্তরের মধ্যে দিয়া উহার বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে এখনও যে সকল আদিম জাতি পৃথিবীতে বসবাস করে, তাহাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং

(২) "Religion is the endeavour to secure the conservation of socially recognised values through specific actions that are believed to evoke some agency different from the ordinary ego of the individual, or from other merely human beings, and that imply a feeling of dependence upon this agency." (W. K. Wright, *A Student's Philosophy of Religion*, p. 47)

৫ মার্টিন্যু (Martineau) তাঁহার সংজ্ঞায় একেশ্বরবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন: "Religion is a belief in an ever-living God, that is, a Divine Mind and Will ruling the universe and holding moral relations with mankind." (*Study of Religion*, Vol. I, p. 1).

৬ এইজন্য ফ্লিন্ট (Flint) মন্তব্য করিয়াছেন: "All facts which always go together and are always equally found in any state or process are its equally essential components. When we always find certain elements together, and can neither discover nor imagine them apart, we have no right to represent some of them as essential to the compound into which they enter and others as non-essential. *They are all essential.*" (*op cit.*, p. 36).

সাধারণভাবে মানব মনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করিয়া আদি ধর্ম সম্বন্ধে কল্পনা করা হইয়া থাকে; অর্থাৎ নৃতত্ত্ব (anthropology) এবং মনোবিদ্যা (psychology), এই দুই বিজ্ঞানের যুক্ত প্রচেষ্টায় আদিম ধর্ম সম্বন্ধে প্রকল্প গঠিত হয়। সুতরাং এই সকল মতবাদের যাথার্থ্য বিচার করিবার সময় আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে যে, নৃতত্ত্ব-সংগৃহীত উপাত্তসমূহ কতদূর সুব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা বিচার করিবার সময় দেখিতে হইবে উহা মানব মনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কতদূর সমর্থনীয়।[৭]

আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিব।

(ক) সর্বপ্রাণবাদ বা সর্বাত্মবাদ (Animism):

এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ই. বি. টাইলর (E. B. Tylor)। তিনি মনে করেন যে, মানবীয় কৃষ্টির বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সবত্রই মানুষ এককালে প্রকৃতির সকল বস্তুর উপরই প্রাণ বা আত্মার ধারণা প্রক্ষেপ করিত। চন্দ্র, সূর্য, নদ-নদী, পর্বত, মেঘ সব কিছুই সে প্রাণবান্ মনে করিত—অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের অনুরূপ প্রাণ আছে বলিয়া সে বিশ্বাস করিত। তাহার প্রাণ আছে এবং ইচ্ছা শক্তি আছে বলিয়া তাহার বিবিধ কার্য সম্ভব হয়, এরূপ ধারণা অস্পষ্টভাবে আদিম মানুষের মনে ছিল এবং এই ধারণার ভিত্তিতে বাহ্য জগতে যেখানেই সে কোন প্রকার গতি বা সজীবতার কোন লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিত, সেখানেই সে 'প্রাণময় আত্মা' (living spirit) আছে বলিয়া কল্পনা করিত।[৮] টাইলরের মতে এই কল্পনা বা বিশ্বাস হইতেই ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল।[৯] কারণ বাহ্য জগতে যেখানে সে

---

৭ তুলনীয়: "The anthropologist needs the help of psychology to enable him to solve his problem and the psychologist likewise needs the help of psychology......Anthropology and history will subserve the psychological interest. This means that the fruitful method of discovering the essence of religion is what Höffding has called the psychological genetic method." (M. Edwards, *The Philosophy of Religion*, pp. 35-36).

৮ অধ্যাপক ম্যারেট (R. R. Marett) এই প্রসঙ্গে Animatism ও Animism এই দুই পদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, animatism কেবল বাহ্য প্রকৃতিতে সজীবতার ধারণা আরোপ করে এবং animism আত্মার ধারণা আরোপ করে। বলা বাহুল্য, আদিম মানুষের মনে প্রাণ ও আত্মার পৃথক্ পৃথক্ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা বলা যায় না।

৯ তুলনীয়: "Animism is, in fact, the groundwork of a philosophy of religion, from that of savages upto that of civilised men." (*Primitive Culture*, Vol. I, p. 426.)

প্রাণের লক্ষণ দেখিতে পাইত, তাহার সহিত তাহার নিজেব যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করিত।—বাহ্য জগতের শক্তিমান্ 'আত্মা'-দের তুষ্টি বিধান এবং দুষ্ট 'আত্মা'-দের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা হইতেই আদিম যুগের মানবের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখা দেয়।

আদিমযুগের মানুষের মনে আত্মার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে টাইলর প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে, স্বপ্নের মধ্যে আদিম-যুগের মানুষ যখন অশরীরী প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করিত, তখন তাহার মনে "দেহ-হীন সত্তা" সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সে ক্রমশঃ বিদেহী আত্মার কথা কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আত্মা-সম্বন্ধীয় ধারণা আদিমযুগের মানব মনে যে-ভাবেই গঠিত হউক্ না কেন, টাইলর প্রমুখ লেখকগণ বলেন যে, সর্বপ্রাণবাদ তথা সর্বাত্মবাদ সুদূর অতীতে এক সার্বিক রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং মানব মনে 'ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা' সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে:

(ক) সর্বপ্রাণবাদ তথা সর্বাত্মবাদ প্রাচীনতম ধর্মমত হইতে পারে না। প্রাণ ও আত্মার ধারণা হইল বিমূর্ত প্রত্যয় (abstract concept)-এর ধারণা এবং এইরূপ ধারণা গঠনের জন্য কিছু পরিমাণ বৌদ্ধিক প্রগতির বা উন্নতির প্রয়োজন। সুতরাং আদিমযুগের মানুষ এইরূপ বিমূর্ত ধারণা গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহা সত্য না হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

(খ) তাহা ছাড়া, প্রকৃতির সকল বস্তুই যে সমভাবে আত্মার দ্বারা অধ্যুষিত তাহা আদিম যুগের মানুষ মনে করিত না। কতকগুলি প্রাকৃতিক বস্তুকে সে পছন্দ করিত ও পূজা করিত, কতকগুলির প্রতি উদাসীন ছিল, কতকগুলির প্রতি আবার তীব্র বিরাগ ছিল। তাহার আবেগের এই বৈচিত্র্য নানা কারণে ঘটিত; সুতরাং কেবলমাত্র আত্মাসম্বন্ধীয় ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের উপর প্রক্ষেপের ফলেই ধর্মের উৎপত্তি ঘটিতে পারে না।

(গ) আত্মাসম্বন্ধীয় ধারণা প্রক্ষেপ না করিতে পারিলেও অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তি সম্বন্ধে আদিম মানুষের মনে অস্পষ্ট ধারণা গঠিত হইতে পারে; এবং ইহা যে বস্তুতঃ গঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও আমরা কিছু কিছু পাই। কোন কোন আদিম জাতি

বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অচেতন দ্রব্যকে (যথা, রক্ত, বিশেষ আকারের প্রস্তরখণ্ড) অদ্ভুত এবং অদৃশ্য শক্তির আধার মনে করে, অথচ উহাদের উপর প্রাণ ও আত্মার ধারণা প্রক্ষিপ্ত হয় না।

সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, সর্বপ্রাণ ও সর্বাত্মবাদ কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও ইহাই আদিম বা সর্বাপেক্ষা পুরাতন বা প্রাথমিক ধর্ম এ কথা বলা যায় না।

(খ) প্রেতপূজা (Ghost-worship) :

স্পেন্সার (Herbert Spencer) মনে করেন যে, মৃত পূর্বপুরুষগণের পূজার পদ্ধতি হইতে ধর্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে মৃত ব্যক্তির প্রেত বা অশরীরী 'আত্মা'কে পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। যে মারা গিয়াছে, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অধিকতর শক্তির অধিকারী হয়, এই বিশ্বাস আদিম সমাজে প্রচলিত আছে। এই বিশ্বাসের ফলে তাহাকে নানারূপে তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা হয় এবং ইহা হইতেই ক্রমশঃ বিবিধ ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। স্পেন্সার আরও বিশ্বাস করিতেন যে, সর্বাত্মবাদ (animism) হইল প্রেতপূজা হইতে উদ্ভূত মতবাদ।

স্পেন্সার কর্তৃক প্রকল্পিত এই মতবাদও সমর্থনযোগ্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে :

(ক) মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা বিবিধ আদিম সামাজিক প্রথাগুলির অন্যতম। মাত্র একটি প্রথা হইতে ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় জটিল ধারণা জন্মলাভ করিয়াছিল বলা যায় না। এইজন্য মনে হয় যে, স্পেন্সারের মতবাদ এত সরল যে উহাকে ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থার ন্যায় জটিল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।[১০]

(খ) সকল আদিম জাতি তাহাদের সকল পূর্বপুরুষকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহাদের তাহারা পূজা করিত তাহারা মৃত বলিয়াই তাহাদের পূজা করিত না; কোন কারণে তাহাদের দেবতাজ্ঞান করিত বলিয়াই তাহাদের পূজা করিত।[১১]

---

১০ তুলনীয় : "Religion is too complex a phenomenon to be accounted for by the growth and spread of a single custom." (M. Jastrow, *The Study of Religion*, p. 185.).

১১ Dr. Jevons তাঁহার *Introduction to the History of Religion*-গ্রন্থে (pp. 196 ff) এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন : "It never happenes that the spirits of

(গ) তাহা ছাড়া, আমরা এমন আদিম জাতি পাই (যেমন, মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতি) যাহারা মৃত পূর্বপুরুষদের অশরীরী অবস্থাতে বিশ্বাস করে, অথচ তাহাদের দেবতাজ্ঞান করে না। অপরপক্ষে, পূর্বপুরুষদের 'আত্মা' নহে এমন বস্তুকে পূজা করিবার উদাহরণ পাই। সুতরাং পূর্বপুরুষদের অশরীরী অবস্থায় বিশ্বাস ও পূজা বা ধর্মীয় মনোভাব আদিম যুগে সমব্যাপক ছিল ইহা বলা যায় না।

অনেক আদিম জাতির মধ্যে যে প্রেতপূজা প্রচলিত ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রেতপূজাই যে প্রাচীনতম ধর্ম এবং ইহা হইতেই পরবর্তী যুগের বিবিধ ধর্ম-বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটিয়াছে, স্পেন্সারের এই মতের সপক্ষে আমরা উপযুক্ত প্রমাণ পাই না।

(গ) টোটেম্-পূজা (Totem Worship) ঃ

একদল চিন্তানায়ক মনে করেন যে, টোটেম্-পূজাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী কালের বিবিধ ধর্মীয় মতবাদ ও অনুষ্ঠানের অভ্যুদয় টোটেম্-পূজা হইতেই ঘটিয়াছে। স্মিথ্ (W. Robertson Smith) এবং জেভন্স্ (F. B Jevons) এই মতের প্রধান প্রবর্তক এবং পরবর্তী কালে ইহা ডুর্কহাইম (Durkheim) কর্তৃকও সমর্থিত হয়।

টোটেম্ কাহাকে বলে? **টোটেম্ বলিতে বংশচিহ্নরূপে গৃহীত এবং দেবতা বলিয়া পূজিত বিশেষ শ্রেণীর মনুষ্যেতর প্রাণী (এমন-কি বৃক্ষও) বুঝায়।** টোটেমের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ : (ক) টোটেম্ হইল বিশেষ শ্রেণীর জন্তু বা বৃক্ষ—টোটেম্ বলিতে কোন একটি জন্তু বা বৃক্ষ না বুঝাইয়া একটি শ্রেণী বুঝায়। (খ) এইরূপ কোন একটি শ্রেণীর সহিত একটি সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত মনে করে। তাহারা মনে করে যে, ঐ শ্রেণীর সহিত তাহাদের জীবনের এক রহস্যময় সংযোগ আছে এবং তাহা হইতেই তাহাদের বংশের উৎপত্তি সুদূর অতীতে ঘটিয়াছিল। সুতরাং টোটেম্ হইল গোষ্ঠীগত

---

the dead are conceived to be gods......The worshipper's pride is that *his* ancestor was a God and no more mortal......The fact is that ancestors known to be human were not worshipped as gods, and that ancestors worshipped as gods, were not believed to be human."

উৎপত্তি ও সংহতির প্রতীক। (গ) টোটেম্ শ্রেণীর জীবেরা শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র; বিশেষ কোন অনুষ্ঠান ব্যতীত টোটেম্ অভক্ষ্য।[১২] (ঘ) টোটেম্ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা বিশেষ প্রকার শক্তির অধিকারী। অতএব, তাহাদের সহিত যে সকল জাতি নিজেদের সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট মনে করে, তাহারাও নিজেদের অনুরূপ শক্তির অধিকারী মনে করে এবং উহাদ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে।[১৩] (ঙ) টোটেম্ কখনও মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত নহে। তবে টোটেম্‌কে যদিও বর্তমানের সভ্য মানুষ নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) বলিয়া মনে করে, তাহা হইলেও আদিমজাতীয়দের নিকট (অর্থাৎ টোটেম্ উপাসকদের নিকট) বোধ হয় ইহা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (personal) বলিয়া প্রতীত হয়।

জেভন্স ইত্যাদি মনে করেন যে, আদিমযুগে টোটেম্‌ই সর্বপ্রথম উপাস্য বস্তু হইয়াছিল এবং বহুদিন ধরিয়া মানুষ টোটেম্‌কেই পূজা করিয়া আসিত।[১৪] ডুর্কহাইম্ এই মতের অল্প পরিবর্তন সাধন করিয়া বলেন যে, টোটেম্-পূজা প্রাচীনতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হইতেও পারে, কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী স্তরের আমরা কোন প্রমাণ বা পরিচয় পাই না।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপিত হয় :

(১) বর্তমানে যে সকল গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে, তাহার আলোকে ইহা বলা যায় না যে, পৃথিবীর সর্বত্রই এককালে টোটেম্-পূজা প্রচলিত ছিল বা ইহাই প্রাচীনতম ধর্ম। টোটেম্-পূজা যে অন্যতম প্রাচীন পদ্ধতি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে সার্বিক (universal) পদ্ধতি ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখনও যে সকল আদিম জাতি বর্তমান আছে,

১২ আবার এমন অনেক আদিম জাতি আছে যাহারা কোন উপলক্ষেই টোটেম্‌কে ভক্ষণ করে না। আরুণ্টা ও কাইটিশ্ উপজাতির মধ্যে বিশেষ উপলক্ষে টোটেম্ ভক্ষণের রীতি প্রচলিত আছে। (Spencer & Gillen, *Northern Tribes of Central Australia* দ্রষ্টব্য)।

১৩ তুলনীয় : "Primitive people believe that there is a power possessed by different groups of people in connection with certain animals or plants and that through the medium of this common power the people can exercise a control over the natural objects." (Irving King).

১৪ Jevons-এর ভাষায় : "Animals were the first of the external objects that thus came to be worshipped, and totemism was the first form of that worship." (*An Introduction to the History of Religion*, p. 411).

তাহাদের সকলের মধ্যে (যেমন, সিংহলের ভেদ্দা, আফ্রিকার বাণ্টু, আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে) টোটেম্-পদ্ধতি প্রচলিত নাই।

(খ) টোটেম্-পদ্ধতি যে সকল উপজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল (বা এখনও আছে), সে সকল ক্ষেত্রে টোটেম্ যে দেবতারূপে সর্বত্র পূজিত হয়, তাহা নহে। টোটেম্‌কে ভক্তি ও সঙ্কোচ সহকারে জ্ঞান করিলেও দেবতার স্তরে ইহা উন্নীত হয় নাই। টোটেম্ অধিকাংশ স্থলেই কেবলমাত্র 'বংশচিহ্ন'-রূপে পরিগণিত হয় এবং ইহাকে কোন বিশেষ উপজাতির 'সৃষ্টিকর্তা'-রূপে গণ্য করা হয়। এইজন্য অনেকে বলেন যে, টোটেম্-পূজা ঠিক দেবতার পূজা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নহে, ইহা দেবপূজার অনুরূপ অনুষ্ঠান।[১৫]

(গ) টোটেমের প্রকৃত তাৎপর্য সামাজিক। কারণ টোটেম্ বংশচিহ্নরূপে পরিগৃহীত হওয়ার ফলে ইহা অধিকাংশ স্থলেই সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের পরিচায়ক।[১৬] কোন একটি বিশেষ প্রাণীকে টোটেমরূপে গ্রহণ করার ফলে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর শ্রেণীভুক্ত সকলেই নিজেদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ মনে করে।

টোটেম্-মতবাদের সপক্ষে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ইহা সর্বাত্মবাদ (animism) অপেক্ষা পূর্ববর্তী বা প্রাচীনতর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে ধর্মমাত্রই এক অতিব্যক্তিক (superindividual) শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, টোটেমের প্রতি আদিম মানুষের যে মনোভাব তাহা এই অতিব্যক্তিক সত্তা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট, প্রাথমিক ধারণা নির্দেশ করে। তথাপি অতীতে কোন এক যুগে মানবসমাজে সর্বত্র ইহা প্রচলিত ছিল এবং টোটেম্ মাত্রই দেবতারূপে পূজিত হইত, এই প্রকল্পের সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকায় আমরা টোটেম-বাদকে পরিহার করি।

---

১৫ তুলনীয় : "Though it has been denied that totemism is a religion, it is undeniably on the border-lire and that there are variations such that...the totems are *almost, if not quite,* Gods." (*Encyclopaedia of Religion & Ethics,* Art. on Religion). [আবার ঐ Encyclopaedia-তে Hartland তাঁহার 'Totemism' নামক নিবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : "the totem is *never*...prayed to as a God."]

১৬ এইজন্য ডঃ গ্যালোওয়ে (Galloway) মন্তব্য করিয়াছেন ; "The religious importance of Totemism lies in the social motive which works behind it......The religious significance of the totem implies the social significance of religion." (*Philosophy of Religion,* p. 97).

(ঘ) 'মানা'-বাদ (The doctrine of Mana):

আমরা ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে (পৃঃ ৩০৪), ধর্মভাবাধীন চেতনা (religious consciousness)-এর মধ্যে থাকে কতকগুলি ধারণা (ideas), কতকগুলি আবেগ (emotion) এবং কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ (practices)। আদিমযুগের ধর্মের মধ্যে আবেগ ও ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য ছিল ; সে যুগের ধর্মের ভিতর উচ্চতর ধারণা বা বিশ্বাস ছিল না। বুদ্ধির অগ্রগতির ফলে মানুষ পরমসত্তা সম্বন্ধে (এমন কি দেবদেবী সম্বন্ধে) ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, মানুষের মনে যখন প্রথম ধর্মের উন্মেষ ঘটিয়াছিল, তখন প্রকৃতির বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বস্তুর প্রতি তাহার ছিল ভক্তিমিশ্রিত ভয়, এক রহস্যময় অনুভূতি, এক অনির্বচনীয় মনোভাব। সে তখন মনে করে যে, যাহা কিছু অদ্ভূত, যাহা কিছু আশ্চর্যজনক, যাহা কিছু বিচিত্র, তাহারই পশ্চাতে আছে কোন শক্তি। এই শক্তি যে কী, ইহার স্বরূপ যে কী প্রকার, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, অথচ ইহার অস্তিত্ব এবং বিরাটত্ব সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এই অপূর্ব, অদ্ভুত বা বিচিত্র শক্তিকে বিভিন্ন স্থানের আদিম অধিবাসীরা নানাভাবে অভিহিত করে; কেহ বলে মানিতৌউ (manitou), কেহ বলে ওয়াকোন্দা (wakonda), আর কেহ বলে মানা (mana)। ধর্মযাজক কড্রিংটন্ (Bishop Codrington) জগৎ-পরিচালনাকারী শক্তি সম্বন্ধে আদিম মানুষের ধারণাকে বর্ণনা করিবার জন্য 'মানা'-পদটি পছন্দ করেন ; এবং এই অনুসারে প্রাচীনতম ধর্মীয় মতবাদকে তিনি 'মানা'-বাদ (Doctrine of Mana) আখ্যা দিয়াছেন।[১৭]

'মানা' বলিতে আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত এক শক্তি বুঝায়। ইহা জগতের পশ্চাতে, চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে থাকিয়া কার্য করিতেছে—ইহা রহস্যজনকভাবে, অপ্রত্যাশিত উপায়ে, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্য করিতেছে। ইহা ঠিক সচেতন নহে, আবার নির্জ্ঞান জড়শক্তিও নহে, ইহা জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে বা বিশেষ বিশেষ বস্তুর

১৭ 'মানা'-পদটি মেলেনেশীয় উপজাতি কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং Bishop Codrington তাঁহার *The Melanesians* গ্রন্থে ইহা ব্যবহার করেন। তিনি ইহার সংজ্ঞা দান করিয়া বলিয়াছেন, "a force altogether distinct from physical power, which acts in all kinds of ways for good and evil, and which it is of the greatest advantage to possess or control."

মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। আদিম মানুষ বিশ্বাস করিত যে, যদি কোন ব্যক্তি অমিত দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার মানা আছে; যদি সে যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহার মানা আছে; যদি সে অনেক মাছ ধরিতে পারে, তাহার জালে মানা আছে; যদি কোন প্রস্তরখণ্ড বা শিকড় বা অনুরূপ কোন কিছু 'ধারণ' করিলে সে সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে উহার মানা আছে; যদি কোন নৌকা দ্রুত চলে, তাহা হইলে উহার মানা আছে ইত্যাদি। মোট কথা, **মানা বলিতে এমন এক রহস্যময় অর্ধ-পার্থিব শক্তি বুঝায় যাহার-সহিত মানুষের এক গূঢ় রহস্যময় সংযোগ থাকে, যাহা অতি-মানবিক অথচ যাহাকে মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে—যেখানে কোন বৈচিত্র্যের প্রকাশ, সেখানেই উহার অস্তিত্ব আছে বুঝিতে হইবে।**[১৮]

বর্তমান কালের অধিকাংশ লেখক মনে করেন যে, আদিম মানুষের ধর্মীয়ভাবকে 'মানা'-পদটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে। এইজন্য বলা হয় যে, **মানা-সম্বন্ধীয় মনোভাব হইতেই আদি ধর্মের উৎপত্তি**। অর্থাৎ মানবসমাজে ধর্মের উৎপত্তি এমন এক মনোভাব হইতে ঘটিয়াছিল যেখানে বাহ্য জগতের পশ্চাতে কোন এক শক্তি আছে বলিয়া এক অস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল কতকগুলি তীব্র বা গভীর অনুভূতি ও আবেগ এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান।

যাহার ভিতর 'মানা' আছে, তাহার দিকে আদিম মানুষের যেমন এক দিকে ছিল ভয়মিশ্রিত ভক্তির এক অপূর্ব অবস্থা, সেইরূপ অপর দিকে তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করা হইত না; অর্থাৎ সে মানার অধিকারী ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত আচরণে কতকগুলি বাধানিষেধ পালন করিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আদিম মানুষের ধর্মের দুইটি দিক্ ছিল—সদর্থক (positive) এবং নঞর্থক

১৮ তুলনীয়: "(Mana is) quasi-mechanical something with which spirits are in peculiar rapport, but which is also in a measure controlled by men who have distinguished themselves by great bravery and by daring feats, and hence by easy transfer, is also possessed by the ghosts of these men as long their memory is comparatively fresh." (I. King. *Development of Religion*).

(negative)। সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাহাকে মনে করা হইত বিচিত্র শক্তির অধিকারী, নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহাকে 'সাধারণ' জ্ঞান করা হইত না এবং এই কারণে উহার সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করিতে হইত। মানার অধিকারীর প্রতি আচরণে যে নিষেধাত্মক দিক্ ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য কোন কোন লেখক 'টাবু' (Tabu)-পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব, বলা যাইতে পারে যে, 'টাবু-মানা' এইরূপ সংযুক্ত ধারণা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই সংযুক্ত ধারণার তাৎপর্য হইল যে, জগতের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বস্তু, ঘটনা বা কার্যের পশ্চাতে বিচিত্র শক্তি কার্যকরী আছে—এই শক্তির প্রতি একদিকে থাকা উচিত বিচিত্র অনুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাব, অপরদিকে থাকা উচিত সঙ্কোচ ও ভয়যুক্ত মনোভাব।[১৯]

সর্বাত্মবাদ (animism) ও টোটেম্‌বাদ (totemism) এই দুই মত অপেক্ষা মানা-বাদ প্রাচীনতর ধর্মীয় মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে। সর্বাত্মবাদের প্রভাবে মানুষ যখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে প্রাণময় ও আত্মময় বলিয়া কল্পনা করিত, তখন উহাদের নিশ্চয়ই বিশেষ এবং অত্যাশ্চর্যকর শক্তির কেন্দ্র মনে করিত। আবার টোটেমবাদের প্রভাবে মানুষ যখন বিশেষ বিশেষ প্রাণীকে পূজা বা শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিত, তখনও সে নিশ্চয়ই ঐ সকল প্রাণীকে অসাধারণ শক্তিসমন্বিত মনে করিত। অতএব, বলা যাইতে পারে যে, সর্বাত্মবাদ বা টোটেম্‌বাদ যাহাই গ্রহণ করা যাউক না কেন, উহার পূর্ববর্তী স্তর হইল মানা-সম্বন্ধীয় মনোভাব।

(ঘ) ইন্দ্রজাল ও ধর্ম (Magic & Religion):

ধর্মের উদ্ভব আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, উহার উদ্ভবের আদিযুগে চরম সত্তা সম্বন্ধে মানুষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। সে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের পশ্চাতে কোন এক অদ্ভুত শক্তি কার্য করিতেছে এই ধারণা করিতে থাকে এবং তাহার ধর্মবোধের মধ্যে বিশেষ কোন ধারণা (idea) অপেক্ষা ভাবাবেগ ও ক্রিয়াকলাপাদিরই প্রাধান্য ছিল। তাহার

১৯ এইজন্য Marrett বলেন: "Negatively, the supernatural is *tabu*, not to be lightly approached, because positively, it is *mana*, instinct with power above the ordinary." (*op. cit.*, p. 100).

মধ্যে একদিকে ছিল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণের বাসনা, আর এক দিকে ছিল এই সকল শক্তিকে তুষ্ট রাখিয়া কোন কিছু লাভ করা বা কোন কিছু প্রতিহত করার বাসনা। এখন প্রশ্ন হইল: মানুষের মধ্যে কোন্ বাসনা প্রথমে দেখা দিয়াছিল—সে কি স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিত, অথবা প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত শক্তি বা শক্তিসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিত? নিজের ক্ষমতার দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা হইল ঐন্দ্রজালিক-সুলভ মনোবৃত্তি, ইহার ফলে আদিম মানুষ নানারূপ অদ্ভুত অনুষ্ঠানদ্বারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিত। অপর পক্ষে, জাগতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পূজাদির দ্বারা তাহাকে তুষ্ট রাখিয়া নিজের কার্যসিদ্ধির প্রচেষ্টা হইল আদিম ধর্মীয় মনোভাবের প্রকাশ। ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল যে, দুইটিই মানুষের প্রয়োজন পরিতৃপ্তির জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, তথাপি উহারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া চলে। কেহ কেহ বলেন যে, এই দুইটি বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে বলিয়া ইহারা একই সময় উদ্ভূত হয় নাই। সুতরাং বর্তমানের আলোচ্য বিষয় হইল: কোন্‌টি প্রাথমিক—ঐন্দ্রজালিক-সুলভ মনোবৃত্তি অথবা ধর্মীয় মনোবৃত্তি? ধর্ম হইতে ইন্দ্রজাল, অথবা ইন্দ্রজাল হইতে ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে? এ বিষয়ে দুইটি বিপরীত মতবাদ গঠিত হইয়াছে। আমরা প্রথমে উহাদের আলোচনা করিব।

(১) ডঃ জেভন্স বলেন যে, অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস হইল প্রাথমিক—ইহা হইল আদিযুগের ধর্মীয় মনোভাব। ইহা হইতেই ইন্দ্রজালের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মের বিবর্তন কোন সরল উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই—ধর্মের বিবর্তনের পথে যেখানে উহার অধোগতি ঘটিয়াছে সেখানে ইন্দ্রজালের উদ্ভব ঘটিয়াছে।[২০] আদিম মানুষ যেখানে পূজাদির দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেখানে ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়াছে; অর্থাৎ **ধর্মের অসাফল্য হইল ইন্দ্রজালের জনক।**

২০ Dr. Jevons এর ভাষায়: "belief in the supernatural [=religion] was prior to the belief in magic, and that latter, whenever it sprang up, was a degradation or a relapse in the evolution of religion." (*op. cit.*, p. 25).

এই মতের বিপক্ষে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে :

(ক) যদি ধর্ম ও ইন্দ্রজাল পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়, তাহা হইলে একটি অপরটির উদ্ভাবক হইবে কিরূপে? কারণ ও কার্যের মধ্যে সমধর্মিতা থাকে, কিন্তু জেভন্সের মত অনুসারে ইন্দ্রজালের উদ্ভবের যাহা কারণ (অর্থাৎ ধর্ম), তাহা কার্য (অর্থাৎ ইন্দ্রজাল) হইতে পৃথক্। ধর্মের মধ্যে আছে বিনয় ও আত্মনিবেদনের ভাব, ইন্দ্রজালের মধ্যে আছে ঔদ্ধত্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা। সুতরাং একটি অপরটির উদ্ভব কিভাবে ঘটাইবে?

(খ) জেভন্সের মতে ইহা কল্পনা করা হইয়াছে যে, ধর্মের উদ্ভবের প্রাক্কালে উহার একটি শুদ্ধরূপ ছিল এবং তাহারই অধোগতির ফলে ইন্দ্রজালের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু মানুষের আদিধর্মের একটি পরিপূর্ণ শুদ্ধরূপ ছিল, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। আমাদের মনে যে ভাবে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান আছে, আদিম মানুষের মনে তাহা হইতে পারে না।

(গ) ইহা সত্য যে, ধর্মের সহিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি বিজড়িত থাকে; কিন্তু ইহারাই যে ইন্দ্রজালের কারণ এমন কোন প্রমাণ নাই। ইহাও হইতে পারে যে, ইন্দ্রজালের কোন পৃথক্ উৎপত্তি ছিল এবং পরে ইহা ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কুসংস্কার ইত্যাদির সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

(২) দ্বিতীয় মতবাদ হইল যে, **ইন্দ্রজাল হইতে ধর্মের উদ্ভব বা বিবর্তন ঘটিয়াছে।** এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন জেম্স্ ফ্রেজার (James Frazer)। তিনি বলেন যে, ইন্দ্রজালের অসাফল্য হইল ধর্মের জনক। আদিম মানুষের ছিল প্রচুর আত্মবিশ্বাস—প্রথমে স্বীয় ক্ষমতার দ্বারা এবং ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে সে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; তখন সে আত্মপ্রাধান্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-নিবেদনের পথ অবলম্বন করিল এবং এইভাবেই ক্রমশঃ ইন্দ্রজালের পর ধর্মের বিবর্তন ঘটিল; অর্থাৎ ইন্দ্রজালের যুগের পর ধর্মের যুগের উদ্ভব ঘটিল। মানুষ যদিও কয়েক স্থানে তাহার ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলেও অধিকাংশ স্থলেই সে পরাজিত হইতে লাগিল। এই পরাজয়ের মনোভাব হইতে সে এই শিক্ষালাভ করিল যে, প্রাকৃতিক শক্তির তুলনায় সে নিতান্ত দুর্বল;

তাই সে ধীরে ধীরে তাহার আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা পরিহার করিল।[২১] এককালে সে নিজেকে মনে করিত অমিত ক্ষমতার অধিকারী; পরে ধীরে ধীরে তাহার এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইল—সে বুঝিল তাহার অপেক্ষা শক্তিশালী অতিমানবিক আত্মাদের তুষ্টিবিধানই হইল তাহার কর্তব্য। প্রার্থনা, পূজা, নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান ইত্যাদিই হইল ইন্দ্রজালের পরবর্তী যুগের মানুষের প্রধান অবলম্বন বা উপায়।

ফ্রেজারের মত এককালে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে :

(ক) এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা ধর্মের উদ্ভবের এত সরল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে যে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। আদিম মানুষ যে অনেক স্থলে স্বীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিত, তাহা সহজেই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু ইহার ফলে 'প্রকৃতি সর্বত্র তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন' এইরূপ একটি সার্বিক বচন সে গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। তাহা ছাড়া, প্রকৃতির সহিত মানুষের যে সংযোগ তাহা প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ভাবাবেগমূলক। সুতরাং আদিম মানুষ প্রথম হইতেই কিভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে, সেই চিন্তায় সে মগ্ন ছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না; কারণ তাহা হইলে কল্পনা করিতে হয় যে, আদিম মানুষের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল বৌদ্ধিক; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই স্বীকৃত হয় যে, আদিম মানুষের মনে বুদ্ধির প্রাগর্ষ অপেক্ষা ভাবাবেগেরই প্রাধান্য ছিল।[২২]

২১ তুলনীয়: "Step by step he must have been driven back from his proud position; foot by foot, he must have yielded, with a sigh, the ground which he had once viewed as his own." (Frazer, *Golden Bough*).

২২ এইজন্য M. Edwards মন্তব্য করিয়াছেন: "It (Frazer's theory) is far too intellectualistic a view of the origin of religion. It seems to represent early man as almost a full-blown arm chair philosopher in search of a working theory of life and the world, and ignores spontaneous emotional response to environment which played a much greater part in the life of primitive man than reflective thought did". (*op. cit.*, p. 50).

(খ) তাহা ছাড়া, সাফল্যের মাপকাঠিতে ধর্মের বিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না। ফ্রেজার কল্পনা করিয়াছেন যে, ইন্দ্রজালের যখন পরাজয় ঘটিল, মানুষ তখন দম্ভ ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা, বলিদান ইত্যাদির মাধ্যমে জাগতিক শক্তিনিচয়কে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এখানেও যে সকল ক্ষেত্রে সে সাফল্য লাভ করিতে লাগিল এমন কথা বলা যায় না; অর্থাৎ, যেমন তাহার ঐন্দ্রজালিক শক্তির অনেক সময় পরাজয় ঘটিয়াছিল, সেইরূপ পূজাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও অনেক সময় পরাজয় ঘটিতে লাগিল। সুতরাং আদিম মানুষ কেন ইহার প্রতি আসক্ত রহিল? সাফল্যের মাপকাঠিতে বিচার করিলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহও তাহার পরিত্যাগ করা উচিত ছিল না কি?

(গ) জেভন্সের মতবাদের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছিল, এখানেও সেই অসুবিধা আছে। যদি ধর্মীয় মনোভাব ও ঐন্দ্রজালিকসুলভ মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তাহা হইলে একটি অপরটির কারণ হইবে কি করিয়া? আত্মদম্ভের মনোভাব হইতে আত্মনিবেদনের উদ্ভব কিভাবে ঘটিবে?

(ঘ) ফ্রেজার ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা নঙর্থক*। কারণ তাঁহার মতে ইন্দ্রজালের অসাফল্যই ধর্মের উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। সুতরাং মানুষ কী করিতে না পারার জন্য ধর্মের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, এই ব্যাখ্যায় তাহাই বলা হয়; কিন্তু ইহা মনে হয় যে, ধর্মের উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটিয়াছিল।

(ঙ) এই মতবাদে ইহাও কল্পনা করা হইয়াছে যে, আদিম মানুষের মনে আত্মপ্রাধান্য এবং আত্মনিবেদন এই দুই বিকল্প পন্থা সম্বন্ধে প্রথম হইতেই অবগতি ছিল; তাই সে প্রথমটির অসাফল্যে দ্বিতীয়টি লইয়া যেন পরীক্ষণ সুরু করিল। কিন্তু আদিম মানুষের মনে বিকল্প পন্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না।

(চ) ধর্মের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে; এইজন্য ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইন্দ্রজালের ঐরূপ সামাজিক তাৎপর্য নাই। যে অর্থে নানাবিধ ধর্মীয় সংস্থা আছে, সেই অর্থে ঐন্দ্রজালিক সংস্থা নাই।[২৩]

২৩ তুলনীয়: "There is no Church of Magic...The magician has a clientele and not a Church...Religion, on the other hand, is inseparable from the idea of a Church." (E. Durkheim, *Elementary Forms of the Religious Life*, pp. 44 ff.)

(৩) মন্তব্য :

আমরা উপরে যে দুইটি মতবাদের আলোচনা করিলাম, তাহারা ত্রুটিপূর্ণ; সুতরাং ধর্ম হইতে ইন্দ্রজালের উদ্ভব ঘটিয়াছে বা ইন্দ্রজাল হইতে ধর্মের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, এইরূপ কোন একদেশদর্শী মতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। আদিম মানবের ধর্মীয় সংস্কার পর্যালোচনা করিলে ইহা মনে হয় যে, প্রাচীনতম পর্যায়ে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। আমরা যদি ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য মানা বাদ গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, আদিম মানুষের ধর্মের মধ্যে বিস্ময়-বিহ্বল অথচ ভীতসঙ্কুচিত মনোভাবের প্রাবল্য ছিল—সেখানে কোন কিছু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বৌদ্ধিক ধারণা গঠিত হইতে পারে না। সে যুগের মানুষের মনে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের বিকল্পতা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ যে সকল প্রতিক্রিয়া করিত, তাহাকে 'কেবল ধর্মীয়' বা 'কেবল ঐন্দ্রজালিক' এইরূপ কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রকৃতির সহিত মানবমনের সংযোগের ফলে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের যুগপৎ উদ্ভব ঘটিয়াছিল, অথচ উহারা যে পৃথক্ সে সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মলাভ করে নাই।[২৪] আদিম মানুষ কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠার বা আত্মদম্ভের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, আবার কখনও আত্মনিবেদনের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু সে যে সকল সময় কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নহে। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যে, যদিও ধর্ম ও ইন্দ্রজাল পরস্পর হইতে পৃথক্ (এমন কি বিপরীতমুখী) হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলেও সুদূর অতীতে একদিন ছিল যখন মানুষের মনে ঐ দুই-এর পার্থক্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ঐ দুই সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট, মিশ্র ধারণা হইতেই ধীরে ধীরে উহারা পৃথক্ পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

২৪ Dr. Edwards-এর অভিমত লক্ষণীয়: "...while religion and magic are potentially or implicitly distinct from the first, and differ profoundly in principle and method..., yet they have a common root in primitive man's emotional reaction to his environment and his random experiments with the unseen forces of the universe." (*op. cit.*, pp. 53-54).

৩। ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য (Sociological Significance of Religion):

ধর্ম যেমন একদিকে মানুষের সহিত এক বা একাধিক রহস্যময় শক্তির সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, সেইরূপ ইহা মানবমনের উপর এমন এক প্রভাব বিস্তার করে যাহার ফলে একই ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে উহা একদিকে সংহতির সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহিত পার্থক্যের সৃষ্টি করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যখন ধর্মের বিচার করা হয়, তখন ধর্মের এই দুই প্রকার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে সংহতি ও বিভেদ সৃষ্টির যে যুগপৎ ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে, সে সম্বন্ধে সমাজবিদ্যা অলোচনা করে।[২৫] একথা সত্য যে, উচ্চপর্যায়ের ধর্মসমূহ এই শিক্ষাই দেয় যে, সকল ধর্মের সার বা লক্ষ্য একই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের অনুগামিগণ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় গঠন করে।

ধর্ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী মধ্যে যে ঐক্য বা সংহতি সাধিত হয়, তাহা কতকাংশে বৌদ্ধিক, কতকাংশে আবেগজ এবং কতকাংশে অনুষ্ঠানগত। একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকে যে, তাহারা ধর্মের পূজার্হ শক্তি সম্বন্ধে যেন একই প্রকার অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ করিতেছে—ঐ সম্বন্ধে তাহাদের যেন বিশেষ প্রকার জ্ঞান আছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়গত লোকেরা ঐ প্রকার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। এক একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা একই প্রকার 'পবিত্র' জ্ঞানের সম্ভাব্যতাতে বিশ্বাস করে, উহার উপর সর্বোচ্চ মূল্য আরোপ করে এবং এই ভাবে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ, বিশ্বাস, উপকথা, গাথা, কাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত হয় এবং জনগণ সাধারণতঃ উহাদের বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং এইভাবে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় মধ্যে একটি বৌদ্ধিক ঐক্য গঠিত হয়; অর্থাৎ সমধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি বৌদ্ধিক সংহতি স্থাপিত হয়।[২৫]

ধর্মমাত্রই কতকগুলি মতবাদ (dogma)-র সমন্বয় নহে। প্রতি ধর্মের মধ্যেই কতকগুলি তীব্র অনুভূতি ও ভাবাবেগ জন্মলাভ করে এবং কতকগুলি

২৫ তুলনায়: 'The influence of religion, sociologically speaking, then, is twofold: there is a positive or cohesive, integrating influence and there is a negative, destructive, disintegrating influence." (Wach, *Sociology of Religion*, p. 36).

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও আচার-আচরণ দেখা দেয়। বাস্তবিক ঐগুলিই হইল ধর্মের বিশেষ আধার বা আশ্রয়স্থল। সুতরাং ধর্মীয় সম্প্রদায় মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের সহায়ক হিসাবে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানগুলি কার্য করে। একই প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাসী যাহারা তাহারা একই প্রকার ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাতে বিশ্বাস করে এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানপালনের মাধ্যমে তাহাদের ভিতর অনেকাংশে 'হৃদয়ের সংযোগ' স্থাপিত হয় বলা যায়। প্রার্থনা, পূজা, আচার ইত্যাদির দ্বারা সম্প্রদায়গত সংহতি স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া, ধর্মসংক্রান্ত পবিত্রজ্ঞানের অধিকারী হইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না; কিন্তু যথাসাধ্য অনুষ্ঠান পালন সকলেই করিতে পারে। বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য (বিশেষতঃ প্রার্থনা ও পূজার জন্য) বিভিন্ন পবিত্র স্থান তথা মন্দিরাদি ভজনালয়ের সৃষ্টি হয়। এই সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া আবার নূতন ভাবাবেগ ও কর্তব্যের উদ্ভব হয় এবং নূতন করিয়া জনসংহতি দেখা দেয়।

ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি সমাজে কতকগুলি নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়। এইগুলি সামাজিক আচরণকে একটি স্থায়ী রূপ দান করিয়া থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক আচরণের আদর্শ অনেকাংশে ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই গঠিত হয়।

সমাজমধ্যে যদি ধর্মবোধ জাগরিত না হইত, সমাজের প্রতি ব্যক্তিই যদি নিজের বিচার-বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা হইলে সমাজে—বিশেষতঃ আদিম সমাজে—বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা দেখা দিত। আদিম মানুষের পক্ষে একাকী 'স্বাধীন' চিন্তার বিপদ আছে এবং এই দিক্ হইতে ধর্মীয় মনোভাব তাহাকে রক্ষা করে—অর্থাৎ অন্য সকলের মত একই ভাবে, একই দিকে সে চিন্তা করিতে শিক্ষা করে। সুতরাং মনোগত সমতা বা ঐক্য স্থাপনে সাহায্য করে ধর্মীয় আদর্শ।[২৬]

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সামাজিক সংহতি স্থাপনে ধর্মের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারি—

(১) সমাজমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধের ধারণা আছে—এই মূল্যবোধই

---

২৬ এইজন্য দার্শনিক বের্গসোঁ (Bergson) বলিয়াছেন: "Primitive religion, taken from our first standpoint, is a precaution against the danger man runs, as soon as he thinks at all, of thinking of himself alone." (*The Two Sources of Morality & Religion*, p 113).

সমাজমধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক সংঘাত অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং হতাশা বা নৈরাশ্যের হাত হইতে ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষা করে। বলা বাহুল্য, সমাজমধ্যে —বিশেষতঃ আদিম সমাজমধ্যে—স্থায়ী মূল্যবোধ গঠনের প্রধান সহায়ক হইল ধর্ম।

(২) ধর্মের একটি প্রধান সুবিধা হইল যে, ইহা মানুষের সহিত অতিমানবিক সত্তার সংযোগস্থাপন করে বলিয়া মানুষের বিশ্বাস। সুতরাং ধর্মীয় ধারণা মনোমধ্যে গভীর রেখাপাত করে। মানুষ ইহার ফলে অনেক সময় স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিতে পারে এবং এইভাবে সে অন্যের সহযোগিতায় একই প্রকার উদ্দেশ্য সাধনে ও একই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারে।

(৩) সামাজিক জীব হিসাবে কোন্‌টি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে করণীয়, আর কোন্‌টি নহে—কোন্ আদর্শ অনুধাবনযোগ্য আর কোন্ আদর্শ অনুধাবনযোগ্য নহে —সে সম্বন্ধে ইহা ব্যক্তি-মনের উপর আলোকপাত করে।

ধর্ম যদিও সামাজিক সংহতি স্থাপনে সহায়তা করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রে বিভেদ, পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যে সকল ধারণা, বিশ্বাস, মতবাদ, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি একই ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে, সেইগুলিই আবার ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহিত বিভেদ, পার্থক্য, কলহ ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, একই সমাজ মধ্যে ধর্ম যে সকল ক্ষেত্রেই সংহতি স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, এরূপ দাবী করা যায় না। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ধর্ম সামাজিক সংহতি স্থাপনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে না :

(ক) সমাজমধ্যে যদি একাধিক ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত থাকে, অথবা একই ধর্মমত যদি বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, তাহা হইলে ধর্ম সুষ্ঠ সামাজিক সংহতি স্থাপন করিতে পারে না।

(খ) যদি বিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতির ফলে মানুষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির উপর কম নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলেও সমাজমধ্যে ধর্মের প্রভাব কমিয়া যায়।

(গ) বিভিন্ন সমাজ মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে কোন একটি বিশেষ ধর্মমতের প্রভাব কমিয়া আসে।

(ঘ) যদি রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রত্যক্ষভাবে কোন ধর্মমতের বা সাধারণভাবে সকল ধর্মের বিরোধিতা করে, তাহা হইলেও সমাজমনে ধর্মের প্রভাব কমিয়া আসে।

৪। সমাজ, ব্যক্তি ও ধর্ম (Society, Individual & Religion):

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। ব্যক্তিমাত্রই সমাজের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল—সে তাহার বিবিধ ধারণা, আদর্শ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ হইতে অনেকাংশে গ্রহণ করে। কিন্তু যে সকল বিবিধ সামাজিক গোষ্ঠী হইতে ব্যক্তি-বিশেষ শিক্ষালাভ করে ও যাহাদের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ধর্মীয়-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। অবশ্য মানবসমাজের আদিম অবস্থায় সম্ভবতঃ এরূপ পার্থক্য করা সম্ভব ছিল না; কারণ আদিম যুগে কোন সমাজের সাধারণ কৃষ্টি ধর্মীয় কৃষ্টি হইতে পৃথক্ ছিল না। উচ্চতর চিন্তার ও প্রগতির ফলে যদিও সমাজমধ্যে বর্তমানে বহুবিধ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, হইলেও ধর্মীয় গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট প্রভাব সমাজমধ্যে সাধারণতঃ কার্য করে।[২৭]

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র 'ভ্রাতৃত্ববোধ' বা সাম্প্রদায়িকতাবোধ গড়িয়া উঠে—বিবিধ ধর্মীয় আচরণ তথা অনুষ্ঠানসমূহ অনেক সময়ই ঐ ধর্মের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মনে একই প্রকারের তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং উহার ফলে মানসিক ঐক্য বা সংহতির সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান (religious rite)-গুলি সমাজমধ্যে সমবেতভাবে পালিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠান যদিও বিভিন্ন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পালন করে, তাহা হইলেও তাহাদের এই ধারণা থাকে যে, সমাজের অন্য সকলেও ঐরূপ অনুষ্ঠান পালন করিতেছে বা উহাতে অংশগ্রহণ করিতেছে। আবার এই সকল অনুষ্ঠান পালনদ্বারা সকল বস্তুকে পবিত্র ও অপবিত্র এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—বিবিধ আচারাদির দ্বারা যেগুলি পবিত্র, সেগুলির সহিত সংযোগস্থাপন এবং

---

২৭ কোন কোন লেখক মনে করেন যে, অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রকারের অনুভূতির সৃষ্টি হয়, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও সেইরূপ অনুভূতি দেখা যায়। অন্যান্য গোষ্ঠীর আচরণের মধ্যেও যেরূপ একদল অপরদলের নিকট আত্মনিবেদন করে, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও সেইরূপ আত্মনিবেদনের ভাব দেখা দেয়। সিমেল (Simmel) বলেন: "We can safely assume that many human relations harbour a religious element. The relation of a devoted child to its parent, of an enthusiastic patriot to his country, of the fervent cosmopolite to his country......all these relations may have a common tone which can be described as religious." (*American Journal of Sociology*, 1905)

যেগুলি অপবিত্র সেগুলি পরিহারের (এমন কি প্রয়োজন হইলে, ধ্বংসেরও) চেষ্টা করা হয়।[২৮]

ব্যক্তির দিক্ হইতে এই সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশেষ অর্থপূর্ণ। এই সকল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ফলে ব্যক্তিবিশেষ নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া মনে করে। মানুষ যখন নিজেকে অসহায়, বিপদগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানপালন এবং ধর্মীয় চিন্তার মাধ্যমে সে অনেকক্ষেত্রে সান্ত্বনা পাইয়া থাকে বা পাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ধর্মীয় মনোভাব অনেক সময় ব্যক্তি-বিশেষকে বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনে সক্ষম করিয়া তোলে। এইভাবে ধর্ম ব্যক্তি-বিশেষকে দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় বলিয়া সামাজিক কাঠামোও দৃঢ় হইয়া উঠে।

আদিম যুগের ধর্মসমূহ-বিশ্লেষণ করিলে সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণতঃ বিশেষ প্রকারের জনসমাবেশ হইত এবং তাহার ফলে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুযোগ লাভ করিত। তাহা ছাড়া, ধর্মের মাধ্যমে কতকগুলি বিশেষ প্রকারের সামাজিক বিধি উদ্ভাবিত হইত, নীতির অনুশাসনের সৃষ্টি হইত এবং কালক্রমে কতকগুলি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিত। আবার, সমাজমধ্যে ধর্ম বিভিন্ন শ্রেণীর (যথা—পুরোহিত-শ্রেণী, যাজক-শ্রেণী ইত্যাদি) সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সকল শ্রেণীর বৃত্তিও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হইয়াছে।[২৯] এই সকল

২৮ এইজন্য Durkheim ধর্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন: "A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden—beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them."

২৯ সমাজতত্ত্ববিৎ ভেবের (Weber) বলেন যে, এক এক প্রকার ধর্মীয় মতবাদ এক এক প্রকার শ্রেণীর সহিত বিজড়িত ছিল। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন :

"Confucianism was the status ethic of prebendaries, of men with literary educations who were characterised by a secular rationalism. If one did not belong to this *cultured* stratum he did not count....

Early Hinduism was borne by a heriditary caste of cultured literati, who being remote from any office, functioned as a kind of ritualist and spiritualist advisers for individuals......Buddhism was propagated by strictly contemplative, mendicate monks, who rejected the world and, having no homes, migrated......"

(*From Max Weber : Essays in Sociology*, Ed. by Gerth & Mills, Ch. XI).

সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব যেমন অনেক সময় সমাজমধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করিয়াছে, সেইরূপ সংঘাতেরও কারণ হইয়া উঠিয়াছে। (পৃঃ ৩২২)।

ধর্মের উদ্ভব নানাবিধ সামাজিক পরিবর্তনের কারণরূপেও কার্য করিয়াছে। রাষ্ট্রের বিবর্তনের পর ধর্মীয় সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ইহার ফলে ধর্মীয় সম্প্রদায় বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।[৩০]

বর্তমান যুগে সমাজের বহুমুখী বিস্তারের ফলে সমাজমনের উপর ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলনায় অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু তাহা হইলেও সমাজ ও ব্যক্তির উপর ইহার প্রভাব তিরোহিত হয় নাই। বর্তমানকালের অধিকাংশ মানুষ তাহার বৌদ্ধিক উন্নতির ফলে ধর্ম তথা ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বিচার করিয়া উহাদের মধ্যে যেগুলি গ্রহণযোগ্য মনে করে সেইগুলি নিষ্ঠাসহকারে পালনের চেষ্টা করে ; তাহা ছাড়া, কতকগুলি অনুষ্ঠান অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বা অন্য লোকে পালন করিতেছে বলিয়াও পালন করে।

ধর্মের যদিও বাহ্য, সামাজিক রূপ আছে, তাহা হইলেও ইহাই ধর্মের একমাত্র রূপ নহে। ধর্ম যেমন একদিকে হইল বাহ্য আচরণাদির মাধ্যমে পরিপালনযোগ্য কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র, সেইরূপ অপরদিকে উহা ব্যক্তিগতভাবে অনুধ্যানের বিষয়। তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-মনের পক্ষে অনুষ্ঠানগুলিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।[৩১]

৩০ আদিম সমাজমনের উপর ধর্মের প্রভাবের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া ম্যালিনোস্কি বলেন : "*First of all,* social co-operation is needed to surround the unveilng of things sacred and of super-natural beings with solemn grandeur. The community whole-heartedly engaged in performing the forms of ritual creates the atmosphere of homogeneous belief....Religion standardizes the right way of thinking and acting and society takes up the verdict and and repeats it in unison. In the *second* place, public performance of religious dogma is indispensable for the maintenance of morals in primitive *communities. Thirdly and finally,* the transmisson and conservation of sacred tradition entails publicity or at least collectiveness of performance." (*Science, Religion and Reality,* Ed. by Needham, pp. 62-64).

৩১ ধর্মীয় আচার পরিপালনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া H. G. Wells বলেন: "Rites and ceremonials are essentially social activities. ...Ritual is a kind of emotional cement which can give cohesion to great masses of

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানবসমাজে ধর্ম এক অনুপম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা এক অতিমানবিক, অতীন্দ্রিয় সত্তার ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত, অথচ ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। ইহা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে উদ্ভূত, অথচ ইহা সামাজিক সংহতি রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে। একদিকে যেমন ধর্মের অনুশীলনের জন্য সমাজ তথা সম্প্রদায়ের প্রয়োজন, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক নীতি ও আদর্শ রক্ষার জন্য সমাজের পক্ষেও ধর্মকে প্রয়োজন।[৩২] আবার, যদিও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সমাজ মধ্যেই উহারা পরিপালিত হয়, তাহা হইলেও একথা বলা যায় না যে, ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সামাজিক আচরণের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ধর্মের প্রধান উৎস হইল ব্যক্তিগত অন্তঃকরণ। ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই আচরণ নিছক সামাজিক অনুকরণ হইতে সঞ্জাত নহে। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে যে নিবিড় অনুভূতি দেখা দেয়, তাহা হইতেই মানুষ ধর্মের প্রেরণা লাভ করে। ধর্মীয় আত্মনিবেদনের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ এক অনুপম আত্মতৃপ্তি ও মনোবল লাভ করে বলিয়াই মানুষ তাহার চলার পথে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া রাখিতে চায়।

৫। ধর্মীয় সংস্থা বা সম্প্রদায় (Religious Institution or the Institution of Church):

ধর্মবোধের দুইটি দিক্ আছে—একটি আন্তর, আর একটি বাহ্য। ধর্মের বাহ্য প্রকাশ ঘটে কতকগুলি ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে। এইগুলিকে স্থায়ী, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট

people" (*Ends and Means*, p. 248).

বর্তমানের মানুষের পক্ষেও যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ফ্রোম্ (Fromm) বলেন: "We not only have the need for a frame of orientation which makes some sense of our existence and which we can share with our fellow men; we also have the need to express our devotion to dominant values by *actions shared* with others. A ritual, broadly speaking, is *shared action expressive of common strings rooted in common values.*" (*Psychoanalysis and Religion*, p.108). সেইরূপ Young & Mack মন্তব্য করেন: "Religion provides the individual with an institutionalized outlet for his hopes and fears." (*Sociology & Social Life*, p. 397).

৩২ তুলনীয়: "Religion needs the community as a whole so that its members may worship in common its sacred things and its divinities, and society needs religion for the maintenance of moral law and order." (Malinowski, *op. cit.*, p. 52).

রূপদানের জন্য বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সংস্থা গঠিত হয়। ধর্মীয় সংস্থা কার্যকরী হইতে হইলে বিশেষ ধর্মের অনুগামীদের বা ভক্তদের লইয়া একটি সঙ্ঘ গঠিত হওয়া প্রয়োজন, উহার মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের প্রয়োজন, ঐ সঙ্ঘের পরিচালনা কার্যে বিশেষ বিশেষ ধর্মযাজক ও পুরোহিত নিযুক্ত থাকা প্রয়োজন এবং ঐ ধর্মের সমর্থনে বিশেষ মতবাদ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হওয়া প্রয়োজন।[৩৩]

সুতরাং ধর্মীয় সংস্থার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি :

(ক) কোন বিশেষ ধর্মীয় সংস্থাগঠনের মূলে আছে ঐ ধর্মের অনুগামীদের উপাস্য শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ মতবাদ ও বিশ্বাস (dogma)।

(খ) সাধারণতঃ ঐ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ঐ সকল ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করে এবং ঐগুলি দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা করে।

(গ) ঐ সকল ধর্মমতকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন প্রকারের গোষ্ঠী গঠিত হয়।

(ঘ) ঐ সকল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিশেষ প্রকারের শৃঙ্খলা, সংহতি ও ঐক্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়।

(ঙ) সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিচালকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের উপর বিভিন্ন কর্তব্য ন্যস্ত থাকে।

(চ) অনেক ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঐ ধর্মের একজন বিশেষ প্রবর্তক ছিলেন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিশেষ ধর্মমত স্থাপিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

ধর্মীয় সংস্থা সুগঠিত হইবার পর উহা মানবমনের উপর বিশেষ কর্তৃত্ব বিস্তার করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তি কার্য করিতেছে বলিয়া মানুষ সাধারণতঃ বিশ্বাস করে, ধর্মের মাধ্যমেই তাহার সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সুতরাং ধর্মীয় সংস্থা সামাজিক সংস্থা হইলেও ইহার যেন একটি অতি-সামাজিক (supra-social) সত্তা থাকে এবং মানুষ বিশ্বাস করে যে, ইহারই সাহায্যে সে কোন-না-কোন ভাবে উপাস্য শক্তির আনুকূল্য লাভ করিবে। এইজন্য ধর্মীয় সংস্থা মানবমনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে

---

৩৩ ধর্মীয় সংস্থা বা religious institution-কে অনেক সময় Church বা গীর্জা বলিয়া অভিহিত করা হয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'গীর্জা' বলিতে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের ভজনালয় বা উপাসনাগৃহ বুঝায় ; হিন্দুদের পূজাস্থানকে যেমন 'মন্দির' বলা হয়, খৃষ্টানদের উপাসনার স্থানকে সেইরূপ গীর্জা বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইংরাজী 'church' শব্দটি যে-কোন ধর্মসংস্থা বুঝায়। সুতরাং যদিও ইহা খৃষ্টীয় ধর্মমতের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা হইলেও ব্যাপক অর্থে যে-কোন ধর্ম-মতাবলম্বীদের সম্প্রদায়কেই 'চার্চ'-নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

—ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাসকে মানুষ সাধারণতঃ সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করে, ধর্মের অনুশাসনগুলি মানিয়া চলিবার চেষ্টা করে এবং ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিয়া থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ধর্মীয় সংস্থাসমূহ তাহাদের কর্তৃত্বের দ্বারা জনমনকে—বিশেষতঃ জনগণের বাহ্য সামাজিক আচরণকে—নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে। ধর্মীয় সংস্থা যত পুরাতন ও প্রাচীন হয়, ততই উহার প্রভাব দৃঢ়তর হয় এবং উহা সহজে উহার মতবাদ (এমন কি, যেগুলি অন্ধবিশ্বাসমাত্র সেগুলিও) পরিহার বা পরিবর্তন করিতে চাহে না। এইজন্য কখনও কখনও ধর্মীয় সংস্থাসমূহ সামাজিক প্রগতির সহিত নিজেদের প্রতিযোজন করিতে পারে না। ধর্মীয় সংস্থাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের অন্তর্বর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। অতিজাগতিক সত্তার সহিত ইহার যোগসূত্র আছে বলিয়া সাধারণ মানুষের যে বিশ্বাস তাহার জন্য ইহার প্রভাবে আসিয়া মানুষ অনেক সময় দুর্নীতির পথ পরিত্যাগ করে এবং নৈতিক উন্নতি লাভে সক্ষম হয়; তাহা ছাড়া, প্রকৃত শান্তির সন্ধানও অনেকে পাইয়া থাকে। ব্যক্তিগত কল্যাণ ব্যতীত সামাজিক কল্যাণও ইহা দ্বারা সাধিত হয়। বিবিধ ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মিলন-কেন্দ্রস্বরূপ কার্য করে এবং এইভাবে ইহারা সামাজিক কৃষ্টির ধারক, বাহক ও পরিবেশকরূপে সামাজিক ঐতিহ্য রক্ষা করে। তাহা ছাড়া, সভ্য জগতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ জনহিতকর কার্যে অংশ গ্রহণ করে।

অপর পক্ষে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি অনেকসময়ই প্রত্যক্ষভাবে জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। উহারা বহুল পরিমাণে পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের দৈনন্দিন কার্যে অবাঞ্ছিত প্রভাবও বিস্তার করে। অর্থাৎ যে অনুপাতে উহারা জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়ে, সেই অনুপাতে উহারা অতিজাগতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে না। সুতরাং ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যতই মহান্ হউক্ না কেন, ধর্মীয় সংস্থাসমূহ সকল ক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে সক্ষম হয় নাই।[৩৪]

---

৩৪ তুলনীয়: **"Exercising power, it (church) is not unlikely to become engrossed in the problems of power. Regulating mundane affairs, it may very well become itself mundane. Using political means, it may**

৬। ধর্মের দার্শনিক বিচারের স্বরূপ (Nature of the Philosophical Examination of Religion) :

আমরা এ পর্যন্ত প্রধানতঃ সামাজিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মের প্রভাব ও বিবর্তন আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সমাজদর্শনের পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত নহে ; সুতরাং সমাজদর্শন প্রশ্ন করে : ধর্মের দার্শনিক বিচারের স্বরূপ কী হইবে ?

দর্শন মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিচার করিয়া সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে একটি চরম ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা করে। আমরা মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখি যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানুষের ইতিহাসে তথা ব্যক্তিগত জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং দর্শন যখন মানুষের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা লইয়া আলোচনা করে, তখন স্বতঃই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লইয়া ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করে। সমাজদর্শনও দর্শন হিসাবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আলোচনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করে ; এইজন্য সমাজদর্শন প্রশ্ন করে : সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ কেন, কিসের প্রেরণায় ধর্মের প্রতি ধাবিত হয় এবং উহা সমাজ তথা ব্যক্তির উপর কী প্রভাব বিস্তার করে ?

ধর্মের দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিচার্য বিষয় হইল ধর্মের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিবর্তন, মূল্য এবং তাৎপর্য। কোন বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মকে সমর্থন করা দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। দর্শনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ধর্মীয় মনোভাবের স্বরূপ নির্ধারণ ও মূল্য বিচার— এই মূল্য বিচারকালে দর্শনকে আলোচনা করিতে হইবে ব্যক্তিমনের ও সমাজমনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কোথায়। দর্শন ধর্মের মূল্য বিচারকালে প্রথমতঃ বিভিন্ন বাস্তব ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং তাহার পর তাত্ত্বিক আলোচনায় নিযুক্ত হয়।

(ক) ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রথম পর্যায়ে দর্শন উহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে 'উপাদান' সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত থাকে। ধর্ম সম্বন্ধে 'উপাদান', 'উপাত্ত' বা তথ্য দুই প্রকারের—বস্তুগত ও মনোগত। বস্তুগত উপাদান সংগ্রহের জন্য দর্শনকে নৃতত্ত্ব

---

become immersed in political deals." (MacIver & Page, *Society*, p. 491).

কোন কোন লেখক (যথা, Tawney) মনে করেন যে, ধর্মীয় সংস্থাসমূহের পক্ষে পার্থিব ব্যাপারে বিজড়িত হওয়া উচিত নহে ; কেহ কেহ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন ; আবার কেহ কেহ (যথা, Weise) বলেন যে, ধর্মসংস্থার পক্ষে পার্থিব ও অপার্থিব কর্তব্যের এই দ্বন্দ্ব সমাধানযোগ্য নহে।

(anthropology), সমাজতত্ত্ব (sociology) ও ইতিহাসের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল বিজ্ঞান হইতে দর্শন ধর্মের বিভিন্ন বাস্তবরূপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু ধর্মের বাহ্য প্রকাশের পশ্চাতে আছে ব্যক্তিগত আন্তর অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি। সুতরাং দর্শনকে মনোবিদ্যারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানুষ কেন ধর্মকে পরিহার করিতে পারে নাই, মানুষ ধর্মের মধ্যে কী তৃপ্তি পাইয়া থাকে, ধর্মীয় মনোভাব মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে—এই সকল প্রশ্নের সদুত্তরের আশায় দর্শনকে মনোবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের দার্শনিক সমালোচনা যে সকল তথ্য বা ঘটনার ভিত্তিতে করা হয়, সেগুলি বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রকারের এবং এইজন্য ধর্মসম্বন্ধীয় দার্শনিক সমালোচনা একদিকে সমাজতত্ত্ব প্রমুখ বস্তুকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত এবং অপরদিকে মনোবিদ্যার ন্যায় মনঃকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত।

(খ) কেবল তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেই দার্শনিকের কার্য পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। বিবিধ তথ্য বা উপাত্তগুলিকে বিচার করিয়া দার্শনিক তাত্ত্বিক (metaphysical) আলোচনা আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসিয়া দর্শন প্রথমতঃ প্রশ্ন করে: মানুষের জ্ঞানের উৎস কি কি? মানুষের পক্ষে অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান সম্ভব কি? মানুষ কি জাগতিক অভিজ্ঞতার সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে? অর্থাৎ তাত্ত্বিক আলোচনার পূর্বে দর্শনকে জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রিক (epistemological) আলোচনা করিতে হয়। জ্ঞানবিদ্যা যদি তাত্ত্বিক আলোচনার সম্ভাব্যতা স্বীকার করে, তাহা হইলে দর্শন প্রশ্ন করে: বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপ কি? উহা কি এক অথবা একাধিক? বিশ্বমানবের সহিত উহার কী সম্পর্ক? মানুষের ভবিষ্যৎ পরিণতি কোথায়? মানুষের বিবিধ মূল্যবোধের ধারণার তাৎপর্য কি?[৩৫]

---

৩৫ তুলনীয়: (১) "Philosophy of Religion is not tied to a particular religion, but takes religion *as such* for its province. It tries to understand religion in all its varied forms and degrees, to appreciate its place and function in human civilization and in the individual. Above all, it tries to evaluate religion, to justify it as a reasonable attitude for reasonable beings." (Hoernlé).

(২) "At one time it (philosophy) is occupied with the depiction and explanation of a given set of facts (historical & psychological

দার্শনিক এই সকল তাত্ত্বিক প্রশ্নের যে সমাধান করিবেন তাহার দ্বারা আমরা সামাজিক তথা ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন জীব হিসাবে আমাদের সামাজিক এবং অতি-সামাজিক কর্তব্য কী হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিতে পারি।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উচ্চ পর্যায়ের ধর্ম এবং দর্শনের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে—দর্শনের ন্যায় উচ্চ পর্যায়ের ধর্মের আলোচনাতেও বিশ্ব তথা মানবের চরম সমস্যাগুলির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়[৩৬]; সুতরাং **মানুষ তথা জগৎ সম্বন্ধীয় মূল সমস্যার আলোচনাকালে ধর্ম ও দর্শন পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র এক নহে।** ধর্মীয় মনোভাবের মধ্যে বিশ্বাস, অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রাধান্য, কিন্তু দর্শনে মূলতঃ যুক্তির প্রাধান্য। দর্শন হইল মূলতঃ বৌদ্ধিক শাস্ত্র (intellectual discipline)—সেইজন্য দর্শনে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্বন্ধে মত দান করা হয়। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে অনুভূতির মাধ্যমে পরম সত্তার সহিত ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়[৩৭]। তাহা ছাড়া, দর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তু ধর্ম অপেক্ষা ব্যাপকতর—দর্শনে এমন অনেক বিষয় আলোচিত হয়, যেগুলির সহিত ধর্মের প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই। ধর্মের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আলোচনা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং একটির আলোচনা অন্যটির সহিত সংযুক্ত; কিন্তু দর্শনে তাত্ত্বিক আলোচনাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং আচার-অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনা দর্শনের প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু নহে। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিকের প্রাধান্য

standpoints), at another with a critical examination of the possibility of these facts in the establishment of a new religious ideal in connection with a determinate metaphysics." (Külpe).

৩৬ তুলনীয়: "The great religions of the world express, in general, the efforts of human spirit to grasp the nature of the universe, to understand man's true place in it, to realise the kind of conduct and the general attitude of thought and feeling that befits that place and to find the most suitable means for the cultivation of such modes of thought, feeling and action." (Mackenzie, *Elements of Constructive Philosophy*).

৩৭ Archbishop Temple-এর ভাষায়: "The heart of Religion is not an opinion about God, such as Philosophy might reach as the conclusion of its argument; it is a personal relation with God." (*Nature, Man and God*, p. 30).

এবং ধর্ম দাবী করে যে, ইহা ব্যক্তি-বিশেষকে মুক্তি-পথের সন্ধান দেয়। দর্শনের প্রধান লক্ষ্য বস্তু হইল সত্য এবং সেই কারণ যুক্তির উপর স্থাপিত শুদ্ধ সত্যকে পাইবার জন্য দর্শন আগ্রহান্বিত।

তবে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে এই সকল পার্থক্য থাকার অর্থ এই নহে যে, ইহাদের মধ্যে মূলগত বিরোধ আছে। ধর্মকে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব দার্শনিক বিচারের উপর উহাকে স্থাপিত হইতে হইবে; আবার দর্শনকে যদি ব্যাপক ও উদার হইতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির তুলনামূলক বিচার করিতে হইবে।

৭। ধর্ম-বিরোধী কয়েকটি মতবাদ (A few anti-religious theories):

যদিও অধিকাংশ মানুষের মনে কোন-না-কোন ভাবে ধর্মবিশ্বাস আছে, তাহা হইলেও বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দার্শনিক মতবাদের সমর্থকেরা ধর্মবিশ্বাসের—বিশেষতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের—বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে এইরূপ কয়েকটি ধর্ম-বিরোধী দার্শনিক মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(ক) জড়বাদ (Materialism):

জড়বাদীরা মনে করেন যে, **জাগতিক বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি কতকগুলি প্রাণহীন, জড়াণু হইতে ঘটিয়াছে।** অণুগুলির আকস্মিক সংযোগ বা সমাবেশের ফলে বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুগুলির পশ্চাতে ঈশ্বররূপ কোন সৃষ্টিকর্তা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণের বিবর্তন বলিতে নূতন কোন কিছুর উদ্ভব বুঝায় না—কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রাণের সৃষ্টি ঘটিয়াছে। আবার, মন বা চেতনা বলিতে জড়দেহ হইতে পৃথক্ কোন শক্তি নির্দেশ করে না—মস্তিষ্ক কার্য করার ফলে উহা আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়। সুতরাং জগতের মূল সত্তা এক নহে—উহা বহু; মূলসত্তা বলিতে বহুবিধ জড়াণু (material atoms) বুঝায়।

সমালোচনা:

এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। জগতের ঐক্য, বৈচিত্র্য ও কৌশলকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন সচেতন সত্তা কল্পনা করা একান্ত

প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, জড় হইতে প্রাণ বা চেতনার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(খ) স্বভাববাদ (Naturalism):

স্বভাববাদের সমর্থকেরাও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। জড়বাদ, অজ্ঞাবাদ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার, ইহাদের সমন্বয়েই স্বভাববাদ গঠিত হইয়াছে। স্বভাববাদ 'স্বভাব' বা প্রকৃতির প্রাধান্য স্বীকার করে এবং প্রকৃতি বলিতে বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি বুঝায়। স্বভাববাদ দাবী করে যে, ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত[৩৮]; সুতরাং **ইহা ইন্দ্রিয়াতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না।** তবে স্বভাববাদীরা প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলেন না এবং সেইজন্য ইহা অজ্ঞাবাদ (agnosticism)-এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়।[৩৯]

স্বভাববাদ বাহ্য প্রকৃতিকে জড়াণু এবং উহাদের গতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা অধ্যাত্মবাদের বিরোধী এবং জড়বাদের সমতুল্য। সত্তা হিসাবে জড় এবং আত্মা উভয়েই আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, তবে উহাদের প্রকাশকে আমরা জানিতে পারি—সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তা সম্বন্ধে নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত। তাহা ছাড়া, স্বভাববাদীরা চেতনাকে কোন উচ্চ মান দান করিতে প্রস্তুত ন'ন—চেতনা হইল উপবস্তু (epiphenomenon), জড়বস্তুর ছায়ামাত্র। মানুষ হইল সজীব যন্ত্রবিশেষ—চেতনা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক পদার্থমাত্র। যেমন বাষ্পযান চলিতে থাকিলে তাহার ছায়া পড়ে, অথচ ঐ ছায়া তাহার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, সেইরূপ সজীব মানুষের মস্তিষ্ক কার্য করিতে

৩৮ তুলনীয়: "It places emphasis upon physical sciences, especially upon physics and chemistry and it is inclined to think that the laws of these sciences are sufficient to explain the world even in its most evolved forms." (G. T. W. Patrick, *Introduction to Philosophy* p. 202).

৩৯ বর্তমান যুগের স্বভাববাদ প্রাচীন জড়বাদের ন্যায় জড়ই চরম সত্তা, ইহা বলে না। সুতরাং প্রাচীন জড়বাদ (dogmatic materialism)-এর সহিত ইহার পার্থক্য আছে; অপর পক্ষে, ইহা জড়, প্রাণ ও চেতনা ইহাদের ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত মনে করে না—এই স্থলে জড়বাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য। আবার, যেহেতু জড়সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা নীরব থাকে, সেই হেতু ইহা অজ্ঞাবাদকে গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। সেইজন্য প্রাচীন জড়বাদের সহিত পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে অনেক সময় agnostic naturalism বলা হয়।

থাকিলে উহা হইতে স্বতঃই চেতনার বিকাশ ঘটে ; কিন্তু তাই বলিয়া চেতনাকে পৃথক্ মর্যাদা দান করা যায় না।

মোট কথা, প্রকৃতির কোন অংশকেই ব্যাখ্যা করিবার জন্য অতি-প্রাকৃত কোন সত্তা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তাহাদের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচালিত। প্রাকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে প্রাকৃত ঘটনার দ্বারাই হইতে পারে।

সমালোচনা :

স্বভাববাদও জড়বাদের ন্যায় ত্রুটিপূর্ণ। যদিও স্বভাববাদের বর্তমান সমর্থকেরা প্রকাশ্যে অজ্ঞাবাদ ও সমান্তরবাদ সমর্থন করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে জড়বাদের সমর্থক—অন্ততঃ তাঁহাদের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য জড়বাদের সিদ্ধান্তের তাৎপর্যের সমতুল্য হইয়া পড়ে, কারণ তাঁহারা প্রাণ ও চেতনাকে জড়ের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এইজন্য তাঁহাদের দর্শনে জড়েরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং জড়বাদের বহু ত্রুটিরই পুনরাবৃত্তি স্বভাববাদে ঘটিয়াছে।

জড়বাদীদের ন্যায় স্বভাববাদীরাও বিশ্বের বৈচিত্র্য ও ঐক্যকে কেবলমাত্র অচেতন জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিশ্বের যে-কোন বস্তু বা ঘটনা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে কিছু-না-কিছু ঐক্য, সামঞ্জস্য ও সংহতি আছে এবং এইগুলি সবই হইল উদ্দেশ্যসাধনপ্রয়াসী মনের প্রকাশ। সুতরাং এইগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য এক জগদ্ব্যাপিনী চিৎ-শক্তির কল্পনা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে।

স্বভাববাদীদের বিচারপদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণ ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে উচ্চ পর্যায়ের সত্তা দ্বারা নিম্নপর্যায়ের সত্তাসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু স্বভাববাদীরা ইহার বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করেন ; অর্থাৎ নিম্নপর্যায়ের সত্তা দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের সত্তা ব্যাখ্যা করেন (যেমন, চেতনা দ্বারা জড়কে ব্যাখ্যা না করিয়া জড় দ্বারা চেতনাকে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করেন)।[৪০]

---

৪০ স্বভাববাদের সমালোচনা করিয়া D. M. Edwards মন্তব্য করিয়াছেন : "Sociological and psychological phenomena are interpreted in terms of Biology, the biological are reduced to the level of the physico-chemical, and these, again, reduced to bare quantitative relationships." (*The Philosophy of Religion*, p. 225).

চেতনার স্বরূপ ব্যাখ্যাকালেই স্বভাববাদের ব্যাখ্যার দৈন্য বিশেষভাবে প্রকট হইয়া পড়ে। স্বভাববাদীরা বলেন যে, চেতনা তথা মন একটি অসার, অপ্রয়োজনীয় উপবস্তু-মাত্র—চেতনা থাকা বা না থাকার উপর মানবের স্বরূপ নির্ভর করে না। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকেই বলিতে পারি যে, চেতনা যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের স্বরূপ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইত এবং আমরা বর্তমানে যেভাবে কার্য করিতেছি, সেভাবে কার্য করিতে পারিতাম না। আমাদের চেতন মনই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেহ মনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে, স্বভাববাদীরা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যেভাবে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ইত্যাদির কোন স্থান নাই।

সুতরাং স্বভাববাদীরা জগৎকে ঈশ্বরবিহীন বলিয়া যে বর্ণনা দান করিয়া থাকেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

(গ) অজ্ঞাবাদ (Agnosticism):

আমরা স্বভাববাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাবাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) হইতে উদ্ভূত। এই মতবাদ অনুসারে **বাহ্য অভিজ্ঞতার বহির্ভূত সত্তার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই।** সুতরাং আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে আমাদের কোন যথাযথ জ্ঞান নাই। ঐরূপ সত্তা সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র ইহাই জানি যে, আমরা ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। অতএব, অজ্ঞাবাদী যদি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহাকে বলিতে হয়, 'হে ঈশ্বর!—যদি তুমি থাক—তুমি আমার আত্মাকে রক্ষা কর—যদি আমার আত্মা বলিয়া কিছু থাকে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানবাদ (gnosticism) এবং অবিশ্বাসবাদ (scepticism) এই দুই চরম মতবাদের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে অজ্ঞাবাদ।

'অজ্ঞাবাদ'-পদটির আধুনিক কালে প্রবর্তন করেন হাক্স্‌লি (Huxley)[৪১] হাক্স্‌লির মতবাদ হ্যামিল্‌টনের মত দ্বারা সম্ভবতঃ প্রভাবিত হইয়াছিল। হ্যামিল্‌টন্

৪১ কথিত আছে যে, ১৮৬৯ সালে লণ্ডনের অধুনালুপ্ত Metaphysical Society-র অধিবেশনে বিভিন্ন সদস্য যখন তাঁহাদের নিজ নিজ মতবাদ (ism) ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন হাক্সলি বলেন যে, তাঁহার নিজস্ব মতবাদ হইল agnosticism (*a*=নঙ্‌.; *gnosticism* = ——বাদ)।

(Hamilton) মনে করিতেন যে, আমরা কোন কিছু জানিতে হইলে উহাকে অন্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া থাকি ; কিন্তু ঈশ্বর হইলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্— সকল সম্বন্ধের উর্ধ্বে। সুতরাং তাঁহাকে জানা সম্ভব নহে।

সেইরূপ স্পেন্সার বলেন যে, আমরা জানি যে, বিশ্বের পশ্চাতে এক বিরাট্ শক্তি আছে—আমরা জানি যে, উহা আছে, কিন্তু উহা যে কী তাহা আমরা জানি না।

সুতরাং ধর্মের প্রধান আরাধ্য ব্যক্তি—অর্থাৎ ঈশ্বর—সম্বন্ধে যথাযথভাবে কিছুই বলা সম্ভব নহে।

সমালোচনা :

এই মতবাদ পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, যদি আমরা অতীন্দ্রিয় সত্তাসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না ইহা বলা চলে না। বাস্তবিক, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাবাদকে সমর্থন করা সম্ভব নহে ; কারণ অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে আমাদের কিছু না-কিছু ধারণা বিদ্যমান আছে। অতএব, ধর্মের প্রধান আরাধ্য অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে আমাদের অবগতির বহির্ভূত, ইহা বলা চলে না। একথা সত্য যে, সসীম জীব হিসাবে আমরা অসীমের সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি না ; কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে সদর্থক বা নঙর্থক কোন উক্তি করিবার কোন অধিকারই নাই, ইহাও স্বীকার করা যায় না।

(ঘ) দৃষ্টবাদ (Positivism) :

আধুনিককালে সমাজবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা কোঁৎ (Comte) দৃষ্টবাদ (positivism) নামক দার্শনিক মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। এই মতবাদ অনুসারে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কেবলমাত্র তাহারই অস্তিত্ব স্বীকার্য। বলা বাহুল্য, এই মত গ্রহণ করিলে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং কোঁৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব তথা তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics)-এর সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেন।[৪২] তাঁহার মতে বিজ্ঞানের যুগে দৃষ্টবাদই একমাত্র সমর্থনযোগ্য

---

৪২ কোঁতের মতে মানুষের চিন্তাধারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছে। প্রথম স্তর হইল কল্পনার যুগ (imaginative stage)—এই যুগে মানুষ ছিল শৈশব অবস্থায় এবং তাহাদের চিন্তাধারা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং কল্পনা-প্রবণ মানুষ বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর কল্পনা করিত এবং এই যুগ ছিল দেবকেন্দ্রিক

মতবাদ। এই যুগে ঈশ্বরের কল্পনা গ্রহণযোগ্য না হইলেও ধর্ম একেবারে অচল নহে। এ যুগে ধর্মের জন্য প্রয়োজন এমন কিছু যাহা অন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। সমাজবিদ্যার প্রবর্তক হিসাবে তিনি আরও বলেন যে, ধর্মের উদ্দেশ্য একদিকে হইল সামাজিক সংহতি ও ঐক্য রক্ষা এবং অপরদিকে হইল মানুষের মনে দয়া, প্রেম, করুণা, মৈত্রী ইত্যাদি সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহের সুষ্ঠু প্রকাশ।[৪৩] এইজন্য কোঁৎ প্রচার করিলেন যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া নরপূজার প্রয়োজন। **মানুষ যদি কাল্পনিক, অসার, অতীন্দ্রিয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া মানুষেরই প্রতি তাহার শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি অর্পণ করে, তাহা হইলেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।** এইজন্য কোঁৎ তাঁহার প্রচারিত ধর্মে মানবের জয়গান করিয়া মানবতার উদ্দেশ্যে বহু গাথা রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি মহাজনের স্মৃতিতর্পণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।[৪৪]

সমালোচনা ঃ

কোঁতের মতবাদের গুণ এই যে, তিনি মানুষের বিভিন্ন নৈতিক গুণের উৎকর্ষতা সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তিনি মানব-মনের পক্ষে প্রার্থনা, পূজা, ইত্যাদির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সমাজের দিক্ হইতেও যে ধর্মের প্রয়োজন সে বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল ঃ ঈশ্বরকে পরিহার করিয়া কোন ধর্ম স্থাপন করা সম্ভব কি ?

(theocentric)। দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা আয়ত্ত করিল এবং সে অতিজাগতিক অতীন্দ্রিয় সত্তার কল্পনা করিতে লাগিল। ইহা হইল তত্ত্ববিদ্যার স্তর metaphysical stage)। সর্বশেষ আসিয়াছে বিজ্ঞানের যুগ—এ যুগে দেবকেন্দ্রিক ধর্মের প্রচলন থাকিতে পারে না।

৪৩ কোঁতের ধর্মমতের এই দুইটি দিক্ ব্যাখ্যা করিয়া J. A. Nicholson বলিয়াছেন: "(According to Comte)...religion secures social harmony...,or to use one of Comte's favourite analogies, religion may be represented as one of the vital organs in the social organism. Social life, he believed, could not function properly without a healthy religion." "The primary function of religion is to cultivate the affective side of man's religion. It seeks to attach man's love finally to a supreme object of value." (*Philosophy of Religion*, pp. 155 & 161).

৪৪ কোঁৎ শেষ পর্যন্ত ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু নারীর মধ্যেই দয়া, প্রেম ইত্যাদি মূর্ত হইয়া উঠে, সেইহেতু নারী-পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, কোঁৎ-প্রদর্শিত[৪৫] পন্থা গ্রহণযোগ্য নহে। মানব-প্রেম ও নর-পূজা কখনই ঈশ্বরানুরক্তি ও ঈশ্বর-পূজার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। নর-পূজায় পূজার্হ ব্যক্তি বা বস্তু কে বা কি? সকল মানুষই কি সমভাবে পূজার যোগ্য? বিভিন্ন মানুষের মনে কত নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা আছে—যদি মানুষকে পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে কি তাহার নীচতা, ক্ষুদ্রতা বা হীনতা সত্ত্বেও পূজা করিতে হইবে? নিশ্চয়ই কোঁৎ ইহা সমর্থন করিতেন না। তাঁহার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে 'আদর্শ নর'-এর জয়গান করা হইত। বাস্তবিক, তিনি মানবকে পূজা না করিয়া মানবতাকে পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই মানবতা হইল আদর্শ মানবতা (ideal humanity)—ইহা সকল হীনতা, মলিনতা ও ক্ষুদ্রতার বহু উর্ধ্বে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কোঁৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, আদর্শ পূজার জন্য এমন এক সত্তার প্রয়োজন যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নাই এবং যাহাকে বিমূর্ত চিন্তার মাধ্যমে কল্পনা করিতে হয়।

তাহা ছাড়া, মানবতার সহিত সসীমতার ধারণা বিশেষভাবে জড়িত। একটা বিশেষ যুগে ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সেই মানুষ কিভাবে অসীম, অনন্ত ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে? মানুষ কোথা হইতে আসিল, কী তাহার পরিণতি, মানুষের আবির্ভাব কিসের ইঙ্গিত করিতেছে ইত্যাদি প্রশ্নের কোন সদুত্তর সম্ভব হয় না যদি মানুষ নিজেই নিজের পূজার বস্তু হইয়া পড়ে।

আবার, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কেবল নৈতিকতার যে কথা তিনি প্রচার করেন তাহাও সমর্থন করা দুরূহ। কারণ নীতিকে সমর্থন করিতে হইলে ধর্মের প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহাও বলা যায় যে, এ পর্যন্ত যতগুলি ঈশ্বরবিহীন ধর্ম প্রচলনের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই "ঈশ্বর-বিহীন" বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইলেও ক্রমশঃ ঐ সব ধর্মের প্রচারকেরা ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন, অথবা উহারা ক্রমশঃ সেশ্বর ধর্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

---

৪৫ কেবলমাত্র কোঁৎই ঈশ্বরবিহীন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মও ঈশ্বরবিহীন ধর্মরূপে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

(ঙ) মার্কস্‌বাদ (Marxism) :

সাম্প্রতিককালে মার্কস্‌পন্থীরা ধর্ম তথা ঈশ্বরবিশ্বাসের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাসের কোন যৌক্তিকতা নাই। **ঈশ্বর ও ধর্মের কল্পনা দরিদ্রজনগণের নিপীড়নের জন্য সুবিধাবাদী ধনতান্ত্রিকগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।** অসহায় দুর্বল মানুষকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ভয় হইতেই ভগবানের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। **ধর্ম হইল অহিফেন-সেবনের নামান্তর।** অহিফেন-সেবন দ্বারা যেমন মানুষ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ধর্ম দ্বারা মানুষকে এতদূর নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ করিয়া ফেলা যায় যে, সে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সাহস পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে।[৪৬]

মার্ক্সবাদীদের ধর্ম-বিমুখতার কারণ নিম্নলিখিতরূপ :

(ক) মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে, জগৎকে ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিকসুলভ মনোভাব প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঈশ্বরের কল্পনা হইল নিতান্ত অসার বা অলীক, কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করা যায় না। প্রার্থনারও কোন অর্থ নাই, কারণ ইহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং প্রাক্‌-বৈজ্ঞানিক যুগে যে ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়াছিল আজ তাহার মূল্য নাই।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে, জগতের সংগঠন ও স্বরূপকে একমাত্র বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুতান্ত্রিক গঠনবৈশিষ্ট্যের ফলে যে শ্রেণী-সংঘাত চলিয়াছে তাহার পরিণতিতে এমন এক দিন আসিবে যখন শাসক ও শোষকের মধ্যে যে সংঘাত চলিতেছে তাহার সমাপ্তি ঘটিবে এবং নিপীড়িত, দরিদ্র জনগণের জয়লাভ ঘটিবে। সুতরাং যে ধর্মের মূলে আছে শোষণের গোপন পরিকল্পনা তাহাও অবলুপ্ত হইবে। অবশ্য এই ধর্মীয় মনোভাব এত যুগ ব্যাপিয়া মানুষের মনে গ্রথিত হইয়াছে যে, উহাকে আকস্মিকভাবে উৎপাটিত করা যাইবে না। ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে জনরাজ্য প্রতিষ্ঠার সহিত ধীরে ধীরে ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।

---

৪৬ তুলনীয় : (১) "Religion is the soul of the oppressed creature, the heart of a heartless world, the spirit of conditions utterly unspiritual. It is the opium of the poor." (Marx).

(গ) কেবল যে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঈশ্বরকে সমর্থন করা যায় না তাহা নহে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও ঈশ্বর অসিদ্ধ। ভাববাদী (idealistic) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়া থাকে—এই মতবাদে মনের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ দার্শনিক দৃষ্টি হইতে ভাববাদ সমর্থন করা যায় না। জগতের বিবর্তনকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র দ্বন্দ্ববাদ (dialectics)-এর সাহায্যে। দ্বন্দ্ববাদের সাহায্যে জগৎকে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে, চরম সত্তা মন বা চেতনা নহে—চরম সত্তা হইল জড় (matter)। চেতনা হইল জড়েরই আভাস (appearance) মাত্র। সুতরাং কোন প্রকার অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার কল্পনা সমর্থনীয় নহে।

মার্ক্সবাদীরা বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে কেহ কোন ধর্মমত পোষণ করিতে পারে ; কিন্তু রাষ্ট্রে এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোন স্থান নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজে ভীত জনগণকে ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয় ; কিন্তু ধনতান্ত্রিকতার অবসানের সহিত রাষ্ট্র হইতে ধর্মেরও অবসান ঘটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

সমালোচনা :

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্মের নামে অনেক স্থানে শোষণনীতি চালান হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিবর্তনের পর রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় সংস্থা পরস্পরকে প্রভাবিত করার চেষ্টার ফলে অনেক সময় ধর্মের নামে গণ-অত্যাচার সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মের এই অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ ঘটিলেও ধর্ম যে সর্বদা নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য তাহা নহে, কারণ কোন সৎবস্তুর মন্দ ব্যবহার বা প্রয়োগ ঘটিলে, ব্যবহারকারীই নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তু নিন্দনীয় হয় না।

তবে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপিত হয় :

(ক) মানুষের ইতিহাসের সহিত সমান্তরাল হইল ধর্মের ইতিহাস। সুতরাং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে শাসক ও শোষকের পার্থক্য হইতেই

---

(২) "Fear of the blind force of capital—blind because its action cannot be foreseen by the masses—a force which at every step in life threatens the worker and the small with sudden, unexpected, accidental destruction and ruin...this is the *top-root of* modern religion." (Lenin).

ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই ভয় হইতেই ধর্মের আদি উৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা বলা যায় না।

(খ) মার্ক্সবাদীরা বলেন যে, ধর্ম হইল নিপীড়িত, দরিদ্র জনমানবের শেষ আশ্রয় স্থল। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এমন দেখা যায় না যে, সমাজের একদল, অর্থাৎ 'শোষিত' শ্রেণী, ধর্মের আচারাদি পালন করিতেছে এবং অপর দল, অর্থাৎ 'শোষক' শ্রেণী, ঐ সম্বন্ধে উদাসীন ; বরং সাধারণতঃ সমাজের সকলকেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মপালনে উদ্যোগী দেখা যায়।

(গ) উচ্চতর ধর্মের ভিতর আমরা কোন নিপীড়নের পরিচয় পাই না ; বরং উচ্চতর ধর্মে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, করুণা ইত্যাদি সম্বন্ধেই শিক্ষাদান করা হয়। প্রকৃত ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা সদ্‌গুণেরই ধারক, বাহক ও প্রচারক।

(ঘ) ধর্মপ্রচারের মূলে সকল সময়ই যে অত্যাচার ও শোষণের ইচ্ছা থাকে তাহা নহে ; ধর্ম-প্রচারকেরা নিজেরাও অনেক সময় অত্যাচারিত হইয়াছেন এমন উদাহরণও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

(ঙ) ঈশ্বরসাধনালিপ্ত মানুষ যে কত মহান্ হইতে পারেন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জাগরিত হওয়ার ফলে মানুষের মনে যে হৃদয়ের পরিবর্তন আসিয়াছে ও মানুষ পাপ কার্য হইতে বিরত হইয়াছে, মার্ক্সবাদীরা তাহা লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া মনে হয়।[৪৭]

(চ) মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে, বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে ধর্ম আর সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলগত বিরোধ নাই ; বরং অনেক বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে প্রকৃতির সর্বত্র ঈশ্বরের লীলার পরিচয় পাইয়াছেন।[৪৮]

৪৭ তুলনীয়: "It (Marxism) has neither the belief in the inherent dignity of man as a child of God, nor the belief in man's chronic sin, which is an antidote to self-righteousness. In short, it misses both sides of Pascal's famous paradox; it sees neither the essential greatness nor the essential misery of man." (D. E. Trueblood, *Philosophy of Religion*, p. 175).

৪৮ ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি লক্ষণীয়:

(ক) "Only a higher power than man can control the power of atomic energy." (L. Meitner).

(খ) "Science is growing; yet a world that has Science needs, as ne[illegible]

(ছ) তাহা ছাড়া, বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদই দার্শনিক মতবাদ হিসাবে একমাত্র সমর্থনযোগ্য মতবাদ তাহাও বলা যায় না। দ্বন্দ্ববাদের যে তাৎপর্য মার্ক্সবাদীরা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা সকল দার্শনিক গ্রহণ করেন নাই।

মার্কসীয় মতবাদে সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ প্রচারিত হয় (পৃঃ ৬৯-৭০); মার্ক্সবাদীদের মতে ঐ আদর্শ যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র বস্তুতান্ত্রিক গণবিদ্রোহের মাধ্যমেই উহা সম্ভব। কিন্তু সর্বজনীন কল্যাণকে সফল করিতে হইলে প্রয়োজন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং এইজন্য ধর্মের প্রয়োজন। স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক ধর্ম নিন্দার্হ হইলেও ধর্মের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায় না। **কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের মাধ্যমেই সমাজের চরম উন্নতি হয় না। সমাজের চরম মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের আধ্যাত্মিক বিমুক্তি** এবং একমাত্র উচ্চপর্যায়ের ধর্মই আমাদের উন্নতির পথে পরিচালিত করবে।[৪৯]

(ঙ) ফ্রয়েডীয় মতবাদ (Freudian view):

সাম্প্রতিক কালে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মের বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন ফ্রয়েড্।[৫০] তিনি বলেন যে, ধর্মের বিষয়বস্তু নিতান্ত কাল্পনিক বা অসার। ঈশ্বরের কল্পনা আমাদের নির্জ্ঞানস্তরে বিরাজমান অপূরিত বাসনা-পূরণের

(গ) "A deeper and firmer belief in God can be the only result of a better insight into truth." (Winchester).

(ঘ) "His (God's) wisdom is infinite; that of which we are ignorant are contained in Him, as well as the little that we know." (Kepler).

৪৯ (অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ মার্কসবাদের উপর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন: "Religion is a dynamic process, a renewed effort of the creative impulse working through exceptional individuals, and seeking to uplift mankind to a new level. If social quietism, which is said to be the result of mysticism, is bad, economic fatalism is equally bad. Marx's main intention is to make us dedicate ourselves to the spiritualisation of the collective. By liberating the human spirit we make the world better in the only way in which it can be made, the *internal* way." (*Religion and Society*, p. 78).

৫০ ফ্রয়েড্ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ *Totem and Tabu*, *The Future of an Illusion* এবং *Moses and Monotheism*, এই তিন গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থেই তিনি ধর্মের সাধারণ বিচার করিয়াছেন।

ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত। মানুষ কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে একা দেখিয়া বড়ই বিব্রত বোধ করে। কোন শিশু যখন নিজেকে একা মনে করে, তখন কল্পনার মানসনেত্রে সে অনেক সঙ্গী দেখিতে পায়। সেইরূপ নির্বান্ধব নিরুপায় মানুষ স্নেহ, ভালবাসা লাভ করিবার আশায় জগৎ-পিতার অস্তিত্ব কল্পনা করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ফ্রয়েড্ মনে করেন, **ধর্ম অলীক কল্পনা মাত্র।**

মোট কথা, ধর্মের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডের সাধারণ অভিমত হইল যে, ধর্মীয় মতবাদ-সমূহ সবই ভ্রান্ত, কারণ সেগুলি প্রমাণযোগ্য নহে। অবশ্য তিনি সখেদে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যদিও উহারা প্রমাণযোগ্য নহে, তাহা হইলেও মানবমনের উপর উহারা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।[৫১]

সমালোচনা :

ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে :

(ক) ফ্রয়েডের মতে মানবের পক্ষে ঈশ্বরের প্রয়োজন শিশুর পক্ষে সঙ্গীর প্রয়োজনের সহিত তুলনীয়। কিন্তু সঙ্গিহীন শিশুর সঙ্গী সম্বন্ধে কল্পনা কি যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কল্পনার সমতুল্য ?

(খ) ফ্রয়েড্ বলেন যে, ধর্ম তথা ধর্মীয় মতবাদ মাত্রই অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হইল : মানবজাতি আজও কেন অলীকের মোহে মুগ্ধ আছে ? মানবজাতির এই মানসিক বিকারের কারণ কি ?

(গ) যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা করা যায় যে, নির্জ্ঞানস্তরে অবদলিত ইচ্ছাগুলি সর্বদাই তৃপ্তির পথ সন্ধান করিতেছে এবং যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর-

৫১ তুলনীয় : "Inspite of their incontrovertible lack of authenticity, religious ideas have exercised the strongest influence on mankind....... These which profess to be dogmas, are not the residue of experience or the final result of reflection ; they are *illusions*, fulfilments of the oldest, strongest and most inconsistent wishes of mankind ; the secret of their strength is the strength of these wishes." (*The Future of an Illusion*, pp. 51, 52).

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বামপন্থী হেগেলীয় চিন্তানায়ক লুড্‌ভিগ্ ফয়ারবাখ্ (Ludwig Feuerbach) মনে করেন যে, ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা-পুত্তলিকা (wish being) মাত্র ; তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "Man has given objectivity to himself, but has not recognized the object as his own nature."

সম্বন্ধীয় ধারণা অতৃপ্ত বাসনা পূরণের চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা কি বলিতে হইবে যে, যেহেতু আমরা কোন কিছু ইচ্ছা করিতেছি, সেই হেতু তাহা মিথ্যা? আমাদের বাসনার বিষয়বস্তু বহুবিধ। আমরা প্রকৃত বস্তু ইচ্ছা করিতে পারি, আবার অলীক বস্তুও ইচ্ছা করিতে পারি। সুতরাং কোন কিছু আমরা কামনা করি বলিয়াই তাহা মিথ্যা বা অলীক, ইহা বলা যায় না। কাম্যবস্তুর সত্যাসত্য একমাত্র বাস্তবের সাহায্যেই স্থিরীকৃত হয়, সুতরাং কোন বস্তু আমরা ইচ্ছা করি বলিয়া উহা মিথ্যা বা অসার হয় না।

(ঘ) ফ্রয়েড্ তাঁহার যুক্তির সপক্ষে কতকগুলি উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে উদাহরণ-নির্বাচন বা উপাত্ত-সংগ্রহ তিনি বিশেষ নিরপেক্ষ দৃষ্টি হইতে করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারগুলিই লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু উচ্চতরস্তরে বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুভূতি কিরূপ পরিবর্তন সূচনা করে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। অর্থাৎ তিনি ধর্মের সু-প্রভাব লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র কু-প্রভাবই দেখিয়াছেন।[৫২]

(ঙ) মনঃসমীক্ষণ এমন কিছু দেখাইতে পারে নাই যাহার জন্য বলিতে হইবে যে, ধর্ম-জীবনের অনুতাপ, ক্ষমাভিক্ষা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি বাসনা অলীক প্রমাণিত হইয়াছে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মনঃসমীক্ষণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দান করিয়াছে, তাহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিতে পারি যে, নব্যফ্রয়েডীয়গণ—বিশেষতঃ এরিশ্ ফ্রোম্ (Erich Fromm)—ফ্রয়েডের মতবাদ পরিহার করিয়াছেন। ফ্রোম্ মানুষের পক্ষে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা তথা অপরিহার্যতার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৩২৭, পাদটীকা ৩১, দ্রষ্টব্য)।

(চ) যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (Logical Positivism):

সমসাময়িক কালের 'যৌক্তিক দৃষ্টবাদী'দের অভিমত অভিজ্ঞতাবাদের উপর স্থাপিত। ইঁহারা বলেন যে, কোন বচনের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য বাস্তব

৫২ এইজন্য Samuel M. Thompson মন্তব্য করিয়াছেন: "... ...he (Freud) saw the frequent close relation of religious ideas with neurotic syndromes. But nowhere in Freud's principal writings is there the slightest indication that he ever dreamed of what religion at its best means to men and women whose religious faith feels itself completely at home and entirely secure in the company of their own highly developed critical intelligence". (*A Modern Philosophy of Religion*, p. 135).

অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে যে, উহা সত্য কি না। যে সকল বচন অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হয় না, সেগুলি অর্থহীন। এইজন্য ইহারা বলেন যে, দর্শনের পক্ষে অতীন্দ্রিয় সত্তার আলোচনার মূল্য নাই এবং দর্শন হইতে তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) বহিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন।[৫৩] সুতরাং **ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন বচনের কোন অর্থ থাকিতে পারে না।** যাহা বাহ্য অভিজ্ঞতাব বিষয়বস্তু হইতে পাবে না, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিবর্থক। ধর্ম-দর্শনে অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু বাহ্য অভিজ্ঞতাব সাহায্যে এ সম্বন্ধে কোন বচনেবই যৌক্তিকতা বা যাথার্থ্য আমবা বিচাব করিতে পাবি না। সুতবাং এ বিষয়ে কোন বচন গঠন করিলে তাহা নিতান্তই অর্থহীন শব্দসমষ্টি হইবে। ঈশ্বর ইত্যাদি তথাকথিত অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে আমবা অনেক সময় একাধিক পরস্পব-বিবোধী বচনেব সম্মুখীন হই, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে একটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিয়া অন্যটিকে পরিহার করিবার কোন উপায় নাই।

এইজন্য **যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা তথাকথিত ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির ভিত্তিতে গঠিত কোন বচনের মূল্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।** এইপ্রকার অভিজ্ঞতা লইয়া মনোবিদ্যা আলোচনা করিতে পারে; কিন্তু তর্কবিদ্যা তথা দর্শনের দিক্ হইতে উহার কোন মূল্য নাই, কাবণ ঐরূপ অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা কোন বচনেব যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারি না।[৫৪] তথাকথিত ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় বচনগুলি ব্যক্তিগত

৫৩ সুতরাং দৃষ্টবাদীদের মতে দর্শনের কর্তব্য হওয়া উচিত নিম্নরূপ : "It (Philosophy) lays down the conditions under which propositions have meaning, lists the more useful of the arbitrary definitions that people employ in their thinking, and exhibits, through the new techniques, what these definitions formally imply." (B. Blanshard, *The Nature of Thought*, II, p. 403).

৫৪ যৌক্তিক দৃষ্টবাদের অন্যতম সমর্থক আয়ার (A. J Ayar) বলেন : "The argument from religious experience is altogether fallacious. The fact that people have religious experiences is interesting from the psychological point of view, but it does not in any way imply that there is such a thing as religious knowledge, any more than our having moral experiences implies that there is such a thing as moral knowledge. The theist, like the moralist, may believe that his experiences are cognitive experiences, but, unless he can formulate his 'knowledge' in propositions that are empirically verifiable, we may be sure that he is deceiving himself" (*Language, Truth and Logic*, p 115).

অনুভূতি বা আবেগের প্রকাশক; ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নির্দেশদানকারী বচনগুলি কেবলমাত্র 'আদেশ' বা অনুশাসন জ্ঞাপন করে।

মোট কথা, ধর্মীয় অনুভূতির সম্ভাব্যতা যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদের মতে বাস্তব ঘটনা হিসাবে ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদির অস্তিত্ব নাই, অন্ততঃ ঐ সম্বন্ধীয় বচনের কোন মূল্য নাই।

সমালোচনা :

বর্তমান যুগের দৃষ্টবাদীদের সমালোচনার ফলে দর্শন হইতে যে অনেক নিষ্ফল আলোচনা বন্ধ হইয়াছে বা অনেক তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দার্শনিকগণ নূতন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি যৌক্তিক দৃষ্টবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।

(ক) দৃষ্টবাদীরা মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই সকল বচনের সত্যাসত্য নির্ধারণের একমাত্র উপায় নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে "কোন বচন ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গৃহীত না হইলে অর্থপূর্ণ হইবে না" এইরূপ সার্বিক বচন সত্য বলিয়া তাঁহারা কেন মনে করেন? নিশ্চয় এই সার্বিক বচন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় নাই। ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল যে, অভিজ্ঞতা যে বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষও হইতে পারে, তাহা ইঁহারা স্বীকার করেন না।

(খ) দৃষ্টবাদীরা অভিযোগ করেন যে, পুরাতন দার্শনিকেরা অনেকক্ষেত্রেই জাগতিক তত্ত্বসম্বন্ধে পূর্ব প্রকাশিত ধারণা (pre-conceived idea) লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দৃষ্টবাদীরা নিজেরাও কতকগুলি বিষয়ে পূর্ব প্রকল্পিত ধারণা লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহারাও বিনা বিচারে বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎই একমাত্র বাস্তব জগৎ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাই সত্য; তাহা ছাড়া, চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিবিধ চিহ্ন, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলির সহিত বাস্তবের কী সম্পর্ক তাহাও তাঁহারা ব্যক্ত করেন নাই।[৫৫]

৫৫ এইজন্য ক্রাফ মন্তব্য করিয়াছেন: "The positivist is right in saying that it is not merely the logic of the theoretical arguments which directs the argumentation of the metaphysician, but rather a certain pre-conceived conviction which has been borne out throughout his life. Yet the same is true of the positivist himself.......It must be an irrational belief, this selfsame belief in the perceptible world and in the natural life which, to

(গ) দৃষ্টবাদীরা যেন ইচ্ছাপূর্বক চিন্তার ক্ষেত্রে দৈন্য আনিয়াছেন। বাস্তব সত্তা যে পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সহিত সমব্যাপক নহে, উহার ক্ষেত্র যে বিস্তৃততর, সে সম্বন্ধে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক চিন্তা করেন নাই।[৫৬]

মন্তব্য :

আমরা উপরে ধর্মবিরোধী কয়েকটি প্রধান মতবাদের আলোচনা করিলাম। ইহাদের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। এ কথা সত্য যে, বিবিধ আনুষ্ঠানিক ধর্মের সহিত অনেক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জড়িত হইয়া গিয়াছে এবং এইজন্য ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। কিন্তু সেই কারণে **ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিবর্জনের প্রশ্ন উঠে না।** তাহা ছাড়া, যে কোন ধর্মীয় সংস্থান সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, উহা সামাজিক সংস্থা; সুতরাং অন্য সামাজিক সংস্থার ন্যায় ইহার মধ্যেও অল্পবিস্তর ত্রুটি থাকিবে। এইজন্য প্রয়োজন বিবিধ ধর্মের দার্শনিক সমালোচনা—এইরূপ সমালোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন ধর্মের সার সত্য একই। সুষ্ঠু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য বিবাদ বা বিরোধ অর্থহীন। ধর্মমত মানুষের মজ্জাগত; সুতরাং মানুষ ইহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব ধর্মমত যাহাতে মার্জিত হয়, যাহাতে ইহা একাধারে আত্মিক কল্যাণ ও সামাজিক সংহতির[৫৭] সৃষ্টি করিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

him, is the ultimate truth upon which he has decided to stake his whole existence once for all." (Urich Frank, *Philosophical Understanding & Religious Truth*, p. 39). সেইরূপ Tillich বলেন : "A philosophy which is so radically critical of all other philosophies should be sufficiently self-critical to see and to reveal its own ontological assumptions." (*Systematic Theology*, Vol. I, p. 20).

৫৬ তুলনীয় : "It (Logical Positivism) may be described as an extreme poverty of the intellect, not a poverty forced upon the philosopher from outside, but one which is self-inflicted." (Trueblood, *op. cit.*, 199).

৫৭ কেহ কেহ মনে করেন যে, ধর্মের নিজস্ব মূল্য কিছু নাই, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য সামাজিক বন্ধন রক্ষা করা—সেই কারণ সামাজিক আদর্শের রক্ষক হিসাবে কতকগুলি নিয়ম পালন করাই যথেষ্ট। কিন্তু এই মত পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ধর্ম পরিপালন দ্বারা যদিও সামাজিক বন্ধন আসিতে পারে, তাহা হইলেও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্য লইয়া কেহ ধর্মের পথে অগ্রসর হয় না। সমাজ-মনোবিজ্ঞাবিৎ আলপোর্ট

৮। রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংস্থা (The State & the Church) :

আদিম যুগের মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখি যে, মানুষের মনে কোন-না-কোন ধর্মমত বিদ্যমান ছিল। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, মানুষের সমাজে রাষ্ট্রীয় সংস্থা যখন দেখা দেয় নাই, তখনই ধর্ম তথা ধর্মীয় সংস্থা মানবসমাজে প্রচলিত হয়। ধর্মের সহিত ধর্মীয় সংস্থার যখন আবির্ভাব ঘটিল, তখন উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিল। সমাজ মধ্যে পুরোহিত ক্রমশঃ অমিতক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিলেন ; কারণ অদৃশ্য শক্তিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহারের ইচ্ছা মানুষের মনে চিরজাগরূক আছে এবং যেহেতু পুরোহিতের সহিত অদৃশ্য শক্তির নিবিড় সংযোগ আছে বলিয়া সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করিতে লাগিল, সেই হেতু সে সহজেই পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্রমশঃ যখন রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিল, তখন সমাজনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও পুরোহিত-সম্প্রদায় বা ধর্মীয় সংস্থা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইহার ফলে কোথাও বা পুরোহিত-সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করিল, কোথাও বা রাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিল, আবার কোথাও বা উহার বিপক্ষতা করিতে লাগিল। ফলে, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থার প্রতি রাষ্ট্রও নানারূপ মনোভাব পোষণ করিতে লাগিল ; অর্থাৎ রাষ্ট্র কোথাও ধর্মীয় সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল, কোথাও উহার বিরোধিতা করিল, আবার কোথাও প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে সমর্থন করিতে লাগিল। এইজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধ সমাজদর্শনে বিতর্কমূলক রূপ ধারণ করিয়াছে।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মীয় সংস্থা ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে নাগরিকতাবোধ ও ধর্মীয় চেতনা অথবা নাগরিকের কর্তব্য এবং ধর্মীয় কর্তব্যের সম্বন্ধ নিরূপণ তথা সমন্বয়-সাধন প্রয়োজন : এক্ষেত্রে আমরা নাগরিকতাবোধ ও ধর্মীয়চেতনার বিরোধ সমাধানের তিনটি প্রচেষ্টার উল্লেখ করিব।

(Allport) বলেন : "The social scientist argues that the function of religion is to produce social stability. Yet no individual, I venture to assert, is religious for any such reason. Indeed, most people would discard their religion, if they thought it was merely a device to keep them out of the hands of the police and out of their neighbour's hands." (*The Individual and his Religion*, p. 25).

(ক) একদল মনে করেন যে, ধর্মীয়-চেতনাতে ঈশ্বরের কোন স্থান না দেওয়া ভাল—ঈশ্বরের পরিবর্তে মানবের পূজা করা উচিত। ঈশ্বর-পূজার পরিবর্তে নর-পূজা করিলে মানুষ একদিকে মিথ্যা অতীন্দ্রিয় সত্তার মোহ হইতে মুক্ত হইবে এবং অপরদিকে মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে, দয়া-মায়া ইত্যাদি সদ্‌গুণের উৎকর্ষতা ঘটিবে ও সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় হইবে। এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন কোঁৎ (পৃঃ ৩৩৭-৩৮)। এই মত অনুসারে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসকারী ধর্মের কোন প্রয়োজন সমাজ তথা রাষ্ট্রের পক্ষে নাই; সুতরাং ঐরূপ ধর্মের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রতি উদাসীন থাকা উচিত। অপরপক্ষে, নরপূজার সমর্থক ধর্ম রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সেইরূপ মার্ক্সবাদেও ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তিবিশেষ রাষ্ট্রের অধীন এবং রাষ্ট্রমধ্যে ধর্মের কোন স্থান নাই। (পৃঃ ৩৩৯-৪১)।

আমরা পূর্বেই কোঁতের দৃষ্টবাদের এবং মার্ক্সবাদের সমালোচনা করিয়াছি এবং ইহাদের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব সমালোচনার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র এইটুকু বলিব যে, মার্ক্সবাদী ও দৃষ্টবাদীরা যে কারণে ধর্মকে পরিহার করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। (পৃঃ ৩৩৯ ও ৩৪২)।

(খ) মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদে খৃষ্টীয়-ধর্মের অনুশাসনের প্রভাব। সুতরাং এই মত অনুসারে রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করিবে ধর্মীয় সংস্থা ও সম্প্রদায়।[৫৮]

বলাবাহুল্য, এই মতও গ্রহণযোগ্য নহে। রাষ্ট্র যদি ধর্মীয় সংস্থা ও যাজকবর্গের কুক্ষিগত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র উন্নতিলাভ করিতে পারে না এবং ধর্মীয় সংস্থারও অবনতি ঘটে।

৫৮ মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেণ্ট্ অগাষ্টাইন্ (St. Augustine) মনে করিতেন যে, ধর্মীয় সংস্থা ব্যতীত জাগতিক সকল সংস্থাই ত্রুটিপূর্ণ এবং মানবের পতনের পরিচায়ক। একমাত্র ঈশ্বরের রাজত্ব (City of God) ত্রুটিবিহীন। ঈশ্বরের রাজত্বের পরিচালনা এবং স্থাপনার চেষ্টা করে ধর্মীয় সংস্থা (বা Church)। সুতরাং রাষ্ট্র ইহার অধীন থাকিয়া কার্য করিবে। সেণ্ট্ টমাস্ (St. Thomas) রাষ্ট্রকে মানবীয় পতনের পরিচায়ক না মনে করিলেও ইহাই বলিতেন যে, রাষ্ট্রীয় এবং নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে প্রকাশিত—সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্যের মাধ্যমে মানুষ মুক্তি পায় না; তাহাকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য।

(গ) হেগেল তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের দাবীর সমন্বয় সাধন করিয়া একদিকে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়াছেন, আবার অপরদিকে ধর্মের নিজস্ব ক্ষেত্রে উহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

ধর্মের নিজস্ব বিষয়বস্তু আলোচনাকালে উহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং এইজন্য উহাকে প্রাধান্য দান করিতে হইবে। কিন্তু ধর্মীয় সত্য যে আকারে বা রূপে ব্যক্তিমনের নিকট প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ উহার যে বাহ্যরূপ থাকে, তাহা রাষ্ট্রের অধীন। সুতরাং ধর্ম যে পরিমাণে নৈতিক কর্তব্যের সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণে উহা সমাজ তথা রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ ; কিন্তু তাহার পর উহাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রই হইল ঈশ্বর বা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ, প্রকাশ বা অভিব্যক্তি এবং সেই হিসাবে ধর্ম বা ধর্মীয় সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া পড়ে। ধর্মের ক্ষেত্রে চরম সত্য অনুভূতি ও কল্পনার মাধ্যমে জানা যায় ; কিন্তু ঐ চরম সত্য রাষ্ট্রের রূপ ধরিয়া মূর্ত হইয়া উঠে।[৫৯] সুতরাং রাষ্ট্র যদি পরমসত্তা বা ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে ধর্মীয় সংস্থা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না এবং তাহাদের কার্যক্ষেত্র কতকাংশ পৃথক্ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ধর্মীয় সংস্থা (Church)-এর কার্য হইল নাগরিকের ঐহিক জীবনের সহিত পারত্রিক জীবনের সংযোগ সাধন এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলি যদি তাহাদের এই কর্তব্য সাধন করিতে থাকে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের উচিত উহাদের রক্ষা করা। অতএব, হেগেলীয়-দর্শনে রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে, অথচ ধর্মকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রকে প্রাধান্যদান সত্ত্বেও ধর্মীয় সংস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ রাষ্ট্র হইল পরম সত্তারই প্রকাশ।

---

৫৯ তুলনীয় : "Religion has absolute truth for its object and thus implies the highest attitude of mind. As intuition, feeling, imaginative knowledge occupying itself with God as the infinite Ground and Cause on which all things depend, it contains the claim that everything should be conceived in relation to this and reach its confirmation, justification certainty in it. State and laws, like duties, receive in this relation for consciousness the highest verification and the highest binding power, seeing that even state, laws and duties are in reality something definite which pass up into and find their foundations in a higher sphere... While religion thus constitutes the ground on which the ethical world in general and the State in particular rest, it is at the same time only the foundation, and it is here that they separate." (Hegel, *Philosophy of Law*, §. 70).

হেগেলের এই সমাধানের অসুবিধা হইল যে, ইহা যেভাবে রাষ্ট্রকে প্রাধান্ত দান করিয়াছে, তাহা ত্রুটিপূর্ণ। রাষ্ট্র যত উন্নত পর্যায়েরই হউক্ না কেন, উহা হইল মানবীয় সংস্থা; সুতরাং উহার মধ্যে মানবীয় ত্রুটি থাকিয়া যাইবে এবং এইজন্য রাষ্ট্রকে পরমসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।[৬০] রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংস্থা, অথচ উহার উপর সর্বোচ মূল্য আরোপ করার ফলে হেগেল রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংস্থার যথোপযুক্ত সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি একবার ধর্মীয় সংস্থার উচ্চ মান ইঙ্গিত করিতেছেন, আবার রাষ্ট্রকে উচ্চাসন দিতেছেন।

মন্তব্য ঃ

উপরের মতবাদগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, আমরা **রাষ্ট্র অথবা ধর্মীয় সংস্থা ইহাদের কোনটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র অপরটির একমাত্র আধিপত্য স্বীকার করিতে পারি না।** এই দুইটি সংস্থার তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, সসীম সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের পক্ষে এই দুইটিই অপরিহার্য। সুসংহত রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করিবার, জনগণের সেবা করিবার এবং কর্তব্য সাধন করিবার সুযোগ পায়।[৬১] কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে কর্তব্যসাধন করাই যথেষ্ট নহে। মানুষের আত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষ চায় অতীন্দ্রিয় সত্তার সহিত সুনিবিঢ় সংযোগ; এবং এই স্থলেই আসে উচ্চ পর্যায়ের ধর্মের প্রয়োজন।

ধর্মীয় সংস্থা ও রাষ্ট্র যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে কার্য করিতে পারে, সেজন্য উভয় পক্ষকেই স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রের সীমারেখা সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। ধর্মীয় সংস্থাসমূহের পরিচালকবর্গের উচিত রাষ্ট্রের কার্যে অযথা হস্তক্ষেপ না করা। ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান

---

৬০ এইজন্য Hetherington ও Muirhead মন্তব্য করিয়াছেন: "He (Hegel) failed to see the limits which the imperfections of the state as it actually exists imposed upon his doctrine of its essential nature and upon his claim for its right to suborn religion and the Church to its own ends." (*Social Purpose*, p. 304).

৬১ তুলনীয়: 'If we are to love our neighbours, we must believe in the power of the state." (Scott Holland, *Our Neighbours*, p. 84).

পালনে সহায়তা করা এবং ঐ বিষয়ে নির্দেশদান করা ব্যতীত মানুষের আত্মিক কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা, মানুষকে নৈতিক পথে পরিচালিত করা, মানুষের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া তোলা, জনকল্যাণ সাধন করা প্রভৃতি কার্যও ধর্মীয় সংস্থাসমূহের উচ্চতর কার্যসূচীর অন্তর্গত। ধর্মীয় সংস্থাসমূহ যদি এই সকল কার্য পালন না করে, অথবা 'কর্তব্য'-সাধনের অন্তরালে যদি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় অথবা রাজনৈতিক প্রচার কার্যে যোগদান করে, তাহা হইলে ইহারা সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সাধন করিতে পারে না, এবং ইহাদের অবনতি ঘটিবে। অবশ্য রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নৈতিক পরামর্শদান করিবার অধিকার ধর্মীয় সংস্থাসমূহের পরিচালকদের আছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হইয়া না পড়েন। সুতরাং **ধর্মীয় সংস্থাসমূহ যেন জোর করিয়া রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব না করে।**[৬২]

অপর পক্ষে, **রাষ্ট্রেরও উচিত ধর্মীয় সংস্থার স্বাধীন পরিচালনায় হস্তক্ষেপ না করা।** ধর্মীয় সংস্থাসমূহ যদি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে—অর্থাৎ যদি তাহারা জনমঙ্গলের কার্যে নিযুক্ত থাকে—তাহা হইলে রাষ্ট্রের উচিত তাহাদের স্বাধীন কার্য করিবার অধিকার দান করা। যে অর্থে পারিবারিক গোষ্ঠী, শিক্ষামূলক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থাসমূহের স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকার আছে (পৃঃ ১৫৪-৫৮, ২২৭-৩০ ও পৃঃ ২৮৬), সেই অর্থে ধর্মীয় সংস্থাসমূহেরও স্বাধীন কার্যের অধিকার আছে। কিন্তু কোন সংস্থা যদি এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে—যেমন, যদি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিতে থাকে, অথবা যদি গোপনে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার হানিকর কোন কার্য করিতে থাকে—তাহা হইলে রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মীয় সংস্থার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ বা খর্ব করিতে পারে। ধর্মের দুইটি দিক আছে—একটি হইল ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অপরটি হইল সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের দিক্। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, কিন্তু এই বিশ্বাস যখন বিশেষ বিশেষ কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন রাষ্ট্র উহাদের নৈতিকতা বিচার করিতে পারে।

---

৬২ এইজন্য Dr. Figgis অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: "I do not think any policy ought to be forwarded by the Church as a corporate society and imposed in its name on a state of which churchmanship has no longer anything to do with the qualification of citizenship." (*The Churches in the Modern State*, p. 128).

তাহা ছাড়া, যে রাষ্ট্রে বহুবিধ ধর্মমত প্রচলিত আছে, সে রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) থাকা বাঞ্ছনীয়। ধর্মনিরপেক্ষতার এই অর্থ নহে যে. রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের বিরোধিতা করিবে ; ইহার অর্থ হইল যে, **বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র যেন পক্ষপাতিত্ব না দেখায়।**

৯। ধর্মের তুলনামূলক বিচারের স্বরূপ (Nature of the Comparative study of different religions) :

আমরা পূর্বে (পৃঃ ৩২১) ধর্মের দুইটি প্রধান অথচ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি—ধর্ম একদিকে সামাজিক সংহতি ও সংগঠনের সহায়ক, আর এক দিকে উহা বিভেদ ও কলহের সৃষ্টি করে। এইজন্য প্রশ্ন উঠে : মানবসমাজের পক্ষে কি এক ধর্ম অথবা বহু ধর্ম থাকা প্রয়োজন, অথবা কোন ধর্মেরই প্রয়োজন নাই ? আমরা ধর্মবিরোধী মতবাদগুলির আলোচনাকালে (পৃঃ ৩৩৩-৪৮) লক্ষ্য করিয়াছি যে, ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা মানবমনের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং প্রশ্ন হইল মানবসমাজের কল্যাণের পক্ষে এক অথবা বহু ধর্ম থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বৈচিত্র্যই হইল মানবসমাজের অন্যতম ধর্ম—সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রেও বহুত্ব থাকিবে এবং উহাদের সম্পূর্ণরূপে এক ধর্মে রূপান্তরিত করা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে, আদর্শের দিক্ হইতে সকল ধর্মের পরিবর্তে এক সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ স্থাপন করা উচিত। কিন্তু এই আদর্শ বাস্তবে রূপান্তর করা অসম্ভব ; কারণ, তথাকথিত এই সর্বজনীন ধর্ম কিভাবে ধর্মের সাধারণ গুণগুলি নির্বাচন করিবে ? যে ভাবেই এই নির্বাচন কার্য সাধিত হউক্ না কেন, বিভিন্ন ধর্মের যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিহার করা হইবে, সেই সেই ধর্মের অনুগামিগণ তাহাতে আপত্তি করিতে পারে। এক ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপর ধর্মের যে মতবাদ বা যে আচার অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে, অপর সেই ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে। তাহা ছাড়া, ধর্মমাত্রেরই একটি বাহ্য রূপ আছে এবং তথাকথিত 'সর্বজনীন ধর্ম' যদি স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলেও তাহার আচার-অনুষ্ঠান একটি বা দুইটি বিশেষ ধর্মের অনুমোদিত রূপ ধারণ করিত। জলের যেমন নিজের বর্ণ নাই, কিন্তু উহার আধারের বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ তথাকথিত সর্বজনীন ধর্মের অনুষ্ঠানসমূহ একটি বিশেষ ধর্মের রূপ ধারণ করিবে। তাহা ছাড়া, এইরূপ ধর্মসাধনের পক্ষে আর একটি অসুবিধা হইল যে, প্রতি ধর্মের

অনুগামিগণের মধ্যে সাধারণতঃ স্বীয় ধর্মের প্রতি একটা তীব্র অনুরাগ বা আকর্ষণ থাকে যাহার জন্য সে সহজে উহার পরিবর্তন চাহে না।

এই সকল অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ যতই লোভনীয় হউক, উহা কার্যক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু সেইজন্য আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। বিভিন্ন ধর্মের বাস্তবতা ও বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়া পরস্পরকে বুঝিবার ও জানিবার মত উদার দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্টির সমন্বয়ের আলোচনাকালে আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২৯৫-৯৯) বলিয়াছি যে, বহুত্বের মধ্যে ঐক্যকে আবিষ্কার করা এবং পরস্পরকে বুঝিবার, পরস্পরকে জানিবার মত উদারতা ও সহনশীলতা প্রয়োজন। কৃষ্টি-সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইয়াছে, ধর্মের ক্ষেত্রে উহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। **আজ যদি ধর্মের ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে সহনশীল, উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এক ধর্মের অনুগামিগণের অপর ধর্মকে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।** এইরূপ উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টিগঠনে সহায়তা করে দর্শন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচারের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা উচিত: (ক) বাহ্য জগৎসম্বন্ধে ধর্মীয় মতবাদ যে জ্ঞান দান করে, তাহার সহিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বা সমতা থাকা প্রয়োজন। এ কথা সত্য যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান সমব্যাপক নহে; তাহা হইলেও ধর্ম যখন প্রাকৃতিক ঘটনাকে প্রাকৃত উপায়ে বর্ণনা করে, তখন যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সহিত উহার মিল থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচারকালে দেখিতে হইবে উহার বর্ণনা পদ্ধতির কতদূর বাস্তবের সহিত মিল আছে।[৬৩] (খ) ধর্মের তুলনামূলক বিচারকালে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে উহা মানুষের মনে তথা সামাজিক ক্ষেত্রে কী মূল্যবোধের সৃষ্টি করে এবং কি প্রকার আদর্শ অনুধাবনে উৎসাহ

৬৩ তুলনীয়: "though religious truth has ranges that science as such does not and cannot deal with, religions do deal to an important extent with the same world of time and space reality, of physical and historical happenings, with which men deal in their other disciplines of thought......Thus, if a religion is to speak to men, it must persuade them that it is true in the light of the other knowledge they possess." (W. L. King, *Introduction to Religion*, p. 479).

দান করে। (গ) ধর্মের প্রায়োগিক দিকের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে উহা কি প্রকারের জীবনযাপন করিতে উৎসাহ দেয়, জীবনের গতিপথে কী পরিবর্তন সূচনা করে। মোট কথা, ধর্মের তুলনামূলক বিচারকালে দেখিতে হইবে উহা বিশ্বসংসার সম্বন্ধে কতদূর সুসঙ্গত, সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা দান করিতে পারে, উহা কতদূর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে, উহা সামাজিক সংহতি কি পরিমাণ রক্ষা করে, উহা সুস্থ, শান্তিপূর্ণ, নৈতিকজীবন যাপনে ব্যক্তিবিশেষকে কতদূর উৎসাহিত করে। কিন্তু এইরূপ বিচারকালে নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া অপরের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত—ধর্মীয় আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচার সহানুভূতিশীল ও উদার মনোবৃত্তি লইয়া করা উচিত।

১০। বর্তমান জগতে ধর্মের স্থান (The place of Religion in Modern World):

আদিম যুগের মানুষের মনে যে ভাবে বা যে অর্থে ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বা আদিম সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় সংস্থা যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, বর্তমানে সেইরূপ নাই। আজ মানুষ ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠে: বর্তমানের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম কী স্থান অধিকার করিবে? বর্তমান মানুষের এই মনোভাবের সহিত সমতা রক্ষায় মানুষ কিভাবে অগ্রসর হইবে?

বর্তমান যুগের মানুষের মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, একদিকে যেমন সে ধর্মের বাহ্য আচরণের প্রতি অনেকাংশে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে অথবা সকল আচরণের উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করিতেছে না, অপরদিকে ধর্ম সম্বন্ধে বৌদ্ধিক আলোচনায় সে পূর্বের তুলনায় অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রগতি, সামাজিকতাবোধ, নীতিবোধ, মানবতাবাদ ইত্যাদি বর্তমান মানুষকে ধর্মের মূল্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে ধর্মকে যদি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে যুগোপযোগী হইতে হইবে। ধর্মের সমর্থকদের দেখাইতে হইবে যে, ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের প্রকৃত বিরোধ নাই, ধর্ম ব্যক্তিমনের অভাব পূরণ করে এবং ব্যক্তিমনকে তৃপ্তি দান করে, ধর্মের সামাজিক মূল্য আছে এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহা সমর্থনযোগ্য।

ধর্মকে সমর্থন করিবার সময় প্রথমেই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জগতে যত ধর্ম আছে এবং এই সকল ধর্মের যত কিছু অনুশাসন আছে, তাহাদের সবগুলি সমভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। প্রতি ধর্মেরই সারাংশ আছে এবং তাহার সহিত অনেক অপ্রয়োজনীয়, অসার বিষয় সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্মের অন্তর্নিহিত সার সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া উহার অসার অংশকেও অন্ধভাবে সমর্থন করিলে চলিবে না। ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বর্জন করিবার মত সৎসাহস প্রয়োজন।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যদি কিছু দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে সেগুলিকে বর্জন করিতে হইবে, অথবা তাহাদের পরিমার্জিত করিতে হইবে।

ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আজ দেখা দিয়াছে একদিকে বিজ্ঞান এবং অপরদিকে মানবিকতাবাদ (humanism)। সুতরাং ধর্মকে দেখাইতে হইবে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নহে, অপর পক্ষে সমগ্র জগৎকে বিরাট চিচ্ছক্তির প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করিলেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করে। বিজ্ঞান সাধারণতঃ কেবলমাত্র পারিমাণিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জগৎকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু জগৎকে বুঝিতে হইলে ইহাই যথেষ্ট নহে। মানুষের মন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিমাণ-সাপেক্ষ বস্তুর মধ্যেই সীমিত থাকিতে পারেন না—মানুষের ভিতর মূল্যবোধ ও আদর্শের যে ধারণা থাকে, তাহাদের সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার কল্পনা প্রয়োজন। সুতরাং **বর্তমান যুগের ধর্ম যদিও বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করিবে না, তাহা হইলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিকট ধর্মের আত্মসমর্পণের প্রয়োজন নাই।**[৬৪]

মানবিকতাবাদের বিরুদ্ধেও ধর্মকে দেখাইতে হইবে যে, ধর্মের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই, কিন্তু **কেবল নরপূজা বা সমাজসেবাই যথেষ্ট নহে।** যদি কেহ প্রশ্ন করে কেন নীতির প্রয়োজন, কেন সামাজিকতা ও মানবিকতাবোধের প্রয়োজন, তাহা হইলে জড়বাদ বা স্বভাববাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহার উত্তর দান করা যায় না। মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, করুণা ইত্যাদি সদ্গুণের ব্যাখ্যা সম্ভব হয় যদি সমগ্র জগৎকে আমরা সহানুভূতিশীল সচেতন ঐশী শক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত মনে করি।

---

৬৪ তুলনীয়: "While religion must always be sensitive to scientific criticism and its truth subject to comparison with scientific truth, it will not surrender its own specific intuitions or moral insights." (W. L. King, *op. cit*, p 494).

কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী মতবাদের উত্তরদানই বর্তমান ধর্মের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। যদি ধর্মকে স্বীয় উচ্চস্থান রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে বাস্তব-ক্ষেত্রেও উহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রতি ধর্মকেই ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকিতে হইবে এবং পরমতসহিষ্ণুতা বা সহনশীলতা দেখাইতে হইবে। প্রকৃত ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে বীজ লুক্কায়িত থাকে তাহাকে সুস্পষ্ট রূপদানের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। যন্ত্রযুগের মানুষ সহজেই বস্তুতান্ত্রিক প্রগতি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিলেও মানুষ প্রকৃত শান্তির সন্ধান পায় নাই। আজ তাই হৃদয়ের পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—মানুষ যদি অন্তরের অন্তরতমস্থল হইতে বুঝিতে পারে যে, মানুষ মাত্রই একই ঈশ্বরের সন্তান, ঐহিক সুখই জীবনের চরম কাম্য নহে, ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই মানুষ জড়জগতে আবির্ভূত হয় নাই, তাহা হইলেই সে বিশ্বশান্তি স্থাপনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু **মানুষের অন্তরে স্থায়ী পরিবর্তন আনিতে যদি কোন শক্তি সফল হয়, তাহা হইল উচ্চ পর্যায়ের মার্জিত ধর্মীয় শক্তি; এইখানেই বর্তমান জগতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা।**[৬৫]

(৬৫ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়: "We must educate men into the reality, the nature and responsibility of human brotherhood....It is an education of the heart and the imagination, more than that of the intellect......we must create the temper of the mind to use the machinery. We must cultivate democracy as a state of mind, a style of life. A world brotherhood can be born only by the achievement of community within ourselves. Here is the task for religion." (*Religion and Society*, p. 100))

একাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র

সমাজতত্ত্ব যখন বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি আলোচনা করে, তখন স্বতঃই রাষ্ট্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। কারণ সকল প্রকার সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে রাষ্ট্রই সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা সুসংহত এবং ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। সমাজের অগ্রগতির ফলে যখন হইতে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিল, তখন হইতেই উহা ধীরে ধীরে সামাজিক জীবনের সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, পারিবারিক জীবন, শিক্ষায়তন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র কোন-না-কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছে; অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, ইহা সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে বা বিস্তারের চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জীবন যাপনের মধ্যেই আমাদের কর্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না, রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট আদেশ বা অনুশাসন পালন করাও কর্তব্য। সুতরাং সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান, রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহিত অন্য সামাজিক সংস্থার সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা, রাষ্ট্রের সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় সমাজদর্শন বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

১। রাষ্ট্রের স্বরূপ (Nature of State):

(ক) রাষ্ট্র কাহাকে বলে? (What is a State?):

সামাজিক সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার রাজনৈতিক সংগঠন এবং ইহার ক্ষমতাশালিতা। সমাজ মধ্যে যতগুলি বিবিধ সংস্থা বিবর্তিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলেই মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংযতভাবে যৌথজীবন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে।[১]

---

১ বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন: (ক) সমাজতত্ত্ববিদগণ রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক সংস্থা তথা জনসম্প্রদায়রূপে বর্ণনা করেন এবং ব্যক্তি ও বিবিধ সামাজিক সংস্থার সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধের রূপ নির্ণয় করেন; (খ) ব্যবহারশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আইন-প্রণয়নে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; (গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞা রাষ্ট্রকে মূলতঃ রাজনৈতিক সংস্থারূপে দেখে; (ঘ) দার্শনিকগণ 'রাষ্ট্র' প্রত্যয়টির স্বরূপ বিচার করেন এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের নৈতিকতা ও যৌক্তিকতা আলোচনা করেন।

রাষ্ট্র মাত্রেরই একটি নির্দিষ্ট বাহ্য সীমারেখা থাকে; রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে ব্যাপিয়া। এই ভূখণ্ডে বহুলোকের বাস—ইহাদের সামাজিক তথা ব্যক্তিগত জীবনকে রাষ্ট্র অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া উহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে; এইভাবে রাষ্ট্র মধ্যে উহার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। রাষ্ট্রের পরিচালন-ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্র মধ্যে বহুবিধ নিয়ম বা আইন প্রণীত হইয়া থাকে; সুতরাং বিবিধ নিয়ম বা আইন প্রণয়ন করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কেবল যে রাষ্ট্র মধ্যে স্বীকৃত হয় তাহা নহে, উহা সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্র হইল এমনই এক সংস্থা যাহা অন্য রাষ্ট্রের সহিত বিবিধ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিবিধ দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারে। রাষ্ট্র তাহার দায়িত্ব পালন করে মুখ্যতঃ একটি শাসন-সংস্থা বা সরকার (government)-এর মাধ্যমে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইল : (১) একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (২) একটি জনসমষ্টি, (৩) একটি শাসন-সংস্থা এবং (৪) সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে রাষ্ট্রের নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞাদান করা যাইতে পারে। **রাষ্ট্র বলিতে এমনই এক জনসম্প্রদায় বুঝায় যাহা মোটামুটি স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া থাকে, যাহা রাষ্ট্রবহির্ভূত কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না এবং যাহা একটি সুসংহত শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করে।**[২]

২ তুলনীয়: (১) "(State is) a numerous assemblage of human beings, generally occupying a certain territory, among whom the will of the majority or of an ascertainable class of persons is by the strength of a such a majority or class made to prevail against any of their number who oppose it." (Holland, *Elements of Jurisprudence*, p. 40.)

(২) "The marks of an independent state are that the community constituting it is permanently established for a political end, that it possesses a definite territory, and that it is independent of external control." (Hall, *International Law*, p. 18).

(৩) "The state......is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control, and possessing an organized government

উপরের সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি :

(১) **জনসম্প্রদায় বা জনসমষ্টি** (Population)—জনসমষ্টি বা সম্প্রদায় ব্যতীত কোন রাষ্ট্র সম্ভব নয়। রাষ্ট্র হইল একপ্রকার জনসঙ্ঘ—নাগরিকদের সহযোগে ইহা গঠিত। সুতরাং জনগণ ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব হইবে ? নিশ্চয়ই জনমানবহীনতা বা জনশূন্যতার মধ্যে রাষ্ট্র দেখা দিতে পারে না।

(২) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Territory)—রাষ্ট্রের উদ্ভব ও স্থায়িত্বের জন্য রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা প্রয়োজন। যাহারা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী নহে—যাহারা যাযাবর—তাহাদের দ্বারা কোন রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের সীমানা যদিও মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলেও রাষ্ট্রের অধিকৃত ভূখণ্ডের আয়তন মোটামুটি নির্দিষ্ট না থাকিলে রাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা যায় না। তাহা ছাড়া, এক রাষ্ট্রের অধিকৃত ভূখণ্ডের সহিত আর এক রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের পার্থক্য থাকে বলিয়া এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ করা যায়।

(৩) **শাসন-যন্ত্র বা সরকার** (Government)—কোন জনসমষ্টির পক্ষে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করাই যথেষ্ট নহে। ঐ জনসঙ্ঘকে সুনিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন ; নচেৎ রাষ্ট্র মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে না এবং রাষ্ট্রও উহার পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে সাধন করিতে পারে না। এই কারণে বিশেষভাবে গঠিত শাসনযন্ত্র বা সরকার প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রের কার্য সাধন করে বলিয়া অনেক সময় রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুইটি এক নহে। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হইতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সরকার গঠন করে। কোন রাষ্ট্রের সরকারের পরিবর্তন ঘটিলেও

---

to which the great body of inhabitants render habitual obedience." (Garner, *Political Science & Government*, p. 52).

(৪) 'The state we may define as the institution or a system of institutions, which, in order to secure certain elementary common purposes and conditions of life, unites under a single authority the inhabitants of a clearly marked territorial area." (Hetherington & Muirhead, *Social Purpose*, p. 225).

(৫) "A state is a people organized for law within a definite territory." (Wilson).

রাষ্ট্রের সহজে পরিবর্তন ঘটে না ; অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আছে, কিন্তু সরকারের সেইরূপ নাই। রাষ্ট্র যে ব্যবহারবিধি বা আইন প্রণয়ন করে, যে পরিকল্পনা গঠন করে, যে লক্ষ্যপথে চলিতে যায়, সেগুলিকে কার্যকরী করিয়া বাস্তবে রূপদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার বা শাসকবর্গ।[৩]

(৪) **সার্বভৌমত্ব** (Sovereignty)—সার্বভৌমত্ব থাকার ফলে রাষ্ট্র স্বীয় সীমানার মধ্যে অপ্রতিহতভাবে নিজের অধিকার স্থাপন করে এবং বহিঃশক্তির প্রভুত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখে। এই কারণে রাষ্ট্র যে সকল আইন প্রণয়ন করে সেগুলির প্রতি রাষ্ট্র আনুগত্য দাবী করে এবং আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র মধ্যে উহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত অধিকারকে রাষ্ট্র বহির্ভূত অন্য কোন শক্তিরও প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই, ইহাও দাবী করা হয়।[৪]

(৫) **রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য** (Political rights and duties)—রাষ্ট্রমাত্রই নাগরিকদের নিকট তাহাদের আনুগত্যের মাধ্যমে কতকগুলি অধিকার দাবী করে ; আবার এই অধিকার দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইতে পারে, যদি রাষ্ট্রও নাগরিকদের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য করে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে যেগুলি কর্তব্য নাগরিকদের পক্ষে সেগুলি রাজনৈতিক অধিকারের রূপ ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের যেগুলি অধিকার, নাগরিকের পক্ষে সেগুলি কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।[৫]

৩ তুলনীয় : 'State and government should be carefully differentiated ; the former includes traditions, political instruments such as constitutions and charters and the whole set of institutions and conventions that have to do with the application of force. The latter is a group of individuals entrusted with the responsibility and equipped with the authority to carry out the purposes of the state." (*Dictionary of Sociology*, Ed. by Fairchild).

৪ অবশ্য বর্তমান সভ্যজগতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রেরই নিরঙ্কুশ অধিকার কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় না।

৫ নাগরিকের দিক্ হইতে রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া Cole বলেন : "Membership of the State is an almost barren theory without recognised political rights." (*Social Theory*, p. 94).

(খ) রাষ্ট্র কী নহে (What the state is *not*) :

রাষ্ট্রের স্বরূপ লইয়া এত প্রকার মতভেদ হইয়াছে এবং এত জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকে সমতুল্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের সহিত পৃথক্ করা প্রয়োজন।

(১) রাষ্ট্র ও জনসম্প্রদায়—জনসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ মানসিক ঐক্য ও হৃদ্যতা থাকে। কিন্তু সম্প্রদায় মধ্যে যে প্রকারের নিবিড়তা বা পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হইতে পারে, রাষ্ট্র মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই তাহা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র যেরূপ ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ করিয়া নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সম্প্রদায় সেরূপ করিতে পারে না। রাষ্ট্র যেভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়মের প্রতি আনুগত্য নাগরিকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়, সম্প্রদায় তাহা পাবে না। সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্র সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্যাপকতর।

(২) দেশ ও রাষ্ট্র—যদিও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য ভূখণ্ডের প্রয়োজন, তাহা হইলেও রাষ্ট্র ও দেশ সমার্থক নহে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকগুলি দেশ থাকিতে পারে; যেমন সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি রাষ্ট্র এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত আছে একাধিক দেশ। তাহা ছাড়া, 'দেশ'-পদটির দ্বারা সাধারণতঃ ভৌগোলিক অবস্থান বুঝায়, কিন্তু রাষ্ট্র-পদটিতে রাজনৈতিক সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) জাতি ও রাষ্ট্র—জাতি ও রাষ্ট্র পদ দুইটিও অনেক সময় সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়।[৬] জাতি বলিতে সাধারণতঃ এমন একটি সমষ্টি বুঝায় যাহা কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং যাহার মধ্যে ধর্মগত, কৃষ্টিগত, ভাষাগত, ঐতিহ্যগত, সাহিত্যগত অথবা অন্য কোনরূপ ঐক্য থাকে। বাস্তবিক, কোন জাতি গঠিত হইবে কি না, তাহা নির্ভর করে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর; অর্থাৎ জাতিগঠনকারী ব্যক্তিগণ যদি নিজেরা বোধ করে যে, তাহারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাহা হইলেই জাতি গঠিত হয়। জাতি গঠনের সহিত রাজনৈতিক চেতনা সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু জাতিমাত্রই যে কোন রাষ্ট্র গঠন করিবে তাহা নহে—

---

৬ যেমন League of Nations পদটির মধ্যে Nation-পদটি state বা রাষ্ট্র অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

এমন পরাধীন জাতি থাকিতে পারে যাহার কোন নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র নাই। আবার, একই রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক জাতি থাকিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রকে সকল সময় জাতির সহিত সমার্থক করা যুক্তিযুক্ত নহে।[৭]

(৪) শাসনসংস্থা ও রাষ্ট্র—আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৩৬১) উল্লেখ করিয়াছি যে, রাষ্ট্র ও শাসনসংস্থা বা শাসনযন্ত্রকে একার্থবোধক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। রাষ্ট্রের যে প্রকার স্থায়িত্ব আছে, শাসনসংস্থার তাহা নাই; শাসনসংস্থা রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রীয় নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে।

(গ) রাষ্ট্র ও অন্যপ্রকার জনসঙ্ঘ (State & Other Associations):

রাষ্ট্র একটি জনসঙ্ঘ এবং সমাজমধ্যেই ইহা বিবর্তিত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও জনসঙ্ঘ (association) হিসাবে রাষ্ট্রের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) যে সকল কৃত্রিম সঙ্ঘ সমাজে গঠিত হয়, সেগুলির অন্তর্ভুক্তি সদস্যদের ইচ্ছাধীন; কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। সুতরাং কোন একটি রাষ্ট্রমধ্যে জন্মগ্রহণ করার ফলেই ব্যক্তি-বিশেষ কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হয়; ভবিষ্যতে সে হয়ত' এই নাগরিকত্ব পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রথম বা আদি নাগরিকত্ব তাহার ইচ্ছাধীন নহে।[৮]

(২) একই ব্যক্তি একই সময় একাধিক কৃত্রিম সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারে, কিন্তু একই সময় সে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না।

(৩) রাষ্ট্র মাত্রই একটি ভৌগোলিক সীমার অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু সকল কৃত্রিম সঙ্ঘের সদস্য কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার

---

৭ এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে জাতি (nation) ও খণ্ডজাতি (nationality) এই দুইটি পদই অনেক সময় রাষ্ট্রের সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আবার জাতি ও খণ্ডজাতি এই দুইটিরও মধ্যে সকল সময় সুস্পষ্ট পার্থক্য করা যায় না। গার্ণার (Garner)-এর ভাষায়: "The terms 'nation' and 'nationality' have frequently been and still are used as synonyms, and those who have distinguished between them have by no means in agreement as to the difference." (*op. cit.*, p. 115).

৮ এইজন্য Cole বলেন: "The state is, for the dwellers within its area, a *compulsory* association, and its compulsory character is revealed in two ways—in its power to compel all persons in its area, and in the right of all such persons to membership of it." (*op. cit*, p. 94).

অধিবাসী নাও হইতে পারে—এমন বহুবিধ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ আছে যাহার সদস্যেরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে।

(৪) সাধারণতঃ একটি বা দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটি কৃত্রিম সঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুবিধ ও বহুমুখী। রাষ্ট্রের উপর নাগরিকগণের পারিবারিক, নৈতিক, কৃষ্টিমূলক, শিক্ষামূলক প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে উন্নতির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

(৫) যে সকল কৃত্রিম সঙ্ঘ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গঠিত হয় (যেমন, দুর্ভিক্ষনিবারণী সঙ্ঘ), সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গেলে ঐ সঙ্ঘেরও অবসান ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্রের ঐভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে না। সুপ্রাচীন রাষ্ট্র বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া নাগরিকগণের বংশপরম্পরায় বহুবিধ উদ্দেশ্যসাধন করিয়া থাকে।

(৬) রাষ্ট্রের যেরূপ সার্বভৌমত্ব থাকে, রাষ্ট্র যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন বা অপ্রতিহতভাবে উহার অন্তর্গত নাগরিকগণকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোন কৃত্রিম সঙ্ঘ তাহা করিতে পারে না। রাষ্ট্র কোন গুরুতর অপরাধে কোন নাগরিকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারে, মৃত্যুদণ্ড দান করিতে পারে ইত্যাদি; কিন্তু অপর কোন সঙ্ঘের ঐরূপ অধিকার নাই। কোন কৃত্রিম সঙ্ঘ অপরাধী সদস্যকে সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে বা অর্থদণ্ড করিতে পারে; কিন্তু অন্য প্রকার শাস্তি সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, কোন সঙ্ঘের কার্যাবলী বিচারের জন্য কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র মধ্যে রাষ্ট্রেরই একচ্ছত্র আধিপত্য—অন্য সঙ্ঘের নহে।

২। সমাজ ও রাষ্ট্র (Society & State):

সমাজমধ্যে বিশেষ প্রকার রাজনৈতিক সংহতির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। কতকগুলি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী জনসঙ্ঘের নাম সমাজ। ইহা কোন আকস্মিক জনসমাবেশ নহে, আবার কোন পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্য লইয়া কৃত্রিম জনসঙ্ঘও নহে। পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যাপক অর্থে সমাজ মানবের অস্তিত্বের সহিত সমব্যাপক; অর্থাৎ যতদিন মানুষের বিবর্তন ঘটিয়াছে, ততদিন সে কোন-না-কোন প্রকারের সমাজ গঠন করিয়া বসবাস করিতেছে। (পৃঃ ২-৩ ও ৪০-৪১)।

সমাজের অগ্রগতি ঘটার ফলে সমাজকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ; সমাজের প্রধান সমস্যা হইল সমাজ মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষা। এইজন্য সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অবশ্য ঠিক কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা বলা কঠিন ; তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে যে কোন-এক প্রকারের সমাজের অস্তিত্ব ছিল তাহা বলা যায়। যেহেতু সমাজের পটভূমিতেই রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছিল, সেইহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয় প্রশ্ন উঠে।

সমাজ মধ্যে একদিকে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা আছে, সেইরূপ পারস্পরিক প্রতিযোগিতাও আছে ; এই কারণে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস ঘটে। কখনও তাহারা মিলিত হয়, আবার কখনও তাহাদের মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়। এইভাবে বাস্তবক্ষেত্রে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহাব প্রতিচ্ছবি ব্যক্তিমনেও প্রতিফলিত হয়। মানুষের মন চিরদিন দ্বন্দ্ব বা বিভেদ লইয়া থাকিতে পারে না ; সে এইজন্য শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং মানুষ দুইটি বিষয় অভাব বোধ করিতে লাগিল—মনের দিক্ হইতে সে চাহিতে লাগিল 'এমন কিছু' যাহা সকল মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং বাস্তবক্ষেত্রে সে এমন এক প্রতিষ্ঠান কামনা করিতে লাগিল যাহার মাধ্যমে এই মনোভাবকে রূপ দিতে পারে। সুতরাং সমাজ মধ্যে একদিকে যেমন বহু গোষ্ঠী, সঙ্ঘ ইত্যাদির উদ্ভব ঘটিতে লাগিল, অপর দিকে সেইরূপ এই সকল সঙ্ঘকে আবার ঐক্যবদ্ধ বা একত্রীকরণের প্রয়োজন দেখা দিতে লাগিল।[১] রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে এই একত্রীকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের উপর গুরু দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। সমাজ মধ্যে পারিবারিক সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি যে সকল সংস্থা আছে, তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্থাই সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষায় সর্বাধিক উপযোগী। সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অপর কোন সামাজিক সংস্থাই রাষ্ট্রীয় সংস্থার সমতুল্য নহে। ক্ষাত্রশক্তির অধিকারী হওয়ার ফলে রাষ্ট্র উহার অন্তর্গত নাগরিকদের এবং অপর সামাজিক সঙ্ঘগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ইহা

---

১ সমাজ মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয় দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। যাঁহারা বহুবাদ (pluralism)-এর সমর্থক তাঁহারা বলেন যে, মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু সঙ্ঘের উদ্ভব ঘটে এবং ইহাদের কোনটিই অপরটিই অপেক্ষা শ্রেয়ঃ নহে বা অপরটির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। অপর পক্ষে যাঁহারা ঐক্যবাদ (monism)-এর সমর্থক, তাঁহারা মনে করেন যে, সমাজ হইল ঐক্যবদ্ধ সঙ্ঘ এবং এইজন্য বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ককে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন।

ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সঙ্ঘগুলিকে তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্যদান করে।[১০] বিবিধ নিয়ম প্রবর্তন করিয়া এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করিয়া সমাজের বিভিন্ন অংশগুলিকে সংযুক্ত করিয়া সমগ্র সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ সামগ্রিক রূপদান করিতে সমর্থ হয় একমাত্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার উৎপত্তি হইল উহার সার্বভৌমত্ব।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, **রাষ্ট্র সমাজের সহিত সমব্যাপক নহে—ইহা সমাজের অন্তর্ভুক্ত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংস্থা এবং ইহাই সমাজকে শৃঙ্খলাপূর্ণ রূপদান করিয়া সমাজের বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধনকে সম্ভবপর করিয়া তোলে।**[১১] অতএব, এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে: সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্য কোথায়?

বর্তমান যুগে জাতীয় সমাজ (national society) এবং জাতীয় রাষ্ট্র (national state) গঠনের দিক্ হইতে মোটামুটি একই প্রকারের, অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গই রাষ্ট্র গঠন করিয়া থাকে। তথাপি উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বিদ্যমান:

(১) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (goal বা end) বিষয়ে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য একটি—যথা, রাষ্ট্র মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা। রাষ্ট্র যদি এই প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, তবেই ইহা নাগরিকদের অন্যান্য উদ্দেশ্যসাধন সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারে। সমাজ মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সঙ্ঘ ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ব্যাপক-অব্যাপক বহুবিধ উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে বা আনুকূল্যে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। পারিবারিক গোষ্ঠী, শিক্ষায়তন, কৃষিমূলক প্রতিষ্ঠান

---

১০ তুলনায়: (১) "The State may be regarded as being, at least in theory, an organisation which is designed to enable the members of a community to realise in the best way their aim to live the good life." (Wright, *The Elements of Sociology*, pp. 158-59).

(২) "Every human being is in need of protection. All, therefore, need, and to a point depend on, the association that provides it. The State controls the force that assures protection." (L. Lipson, *The Great Issues of Politics*, p. 155).

১১ MacIver-এর ভাষায়: "The State is a structure not co-eval and coextensive with society, but built within it as a determinate order for the attainment of specific ends." (*The Modern State*, p. 40).

ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যেকেই এক একটি উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র তাহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলেই এই সকল প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। রাষ্ট্র সাধারণতঃ এই সকল প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধন করিতে স্বাধীনতা দান করে এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণসাধনের জন্যই উহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে।

(২) সংগঠনের দিক্ হইতে বলা যায় যে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ যেমন একদিকে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ অপরদিকে তাহারা বিভিন্ন সামাজিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। একই ব্যক্তি অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সঙ্ঘের সদস্য, আবার তাহারা সকলেই একই রাষ্ট্রের নাগরিক। সুতরাং সংগঠনের দিক্ হইতে বলিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন সঙ্ঘগঠনকারী সদস্যেরা যদিও সকলেই একই সঙ্ঘের সদস্য নহে, তাহা হইলেও তাহারা একই রাষ্ট্রের নাগরিক।

(৩) কার্যপদ্ধতির দিক্ হইতেও বলা যায় যে, রাষ্ট্র ও সমাজস্থ অন্য প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপদ্ধতি এক নহে। রাষ্ট্র দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া বা প্রয়োগের ভয় দেখাইয়া অন্যের নিকট হইতে আনুগত্য স্বীকার করাইয়া লয় বা অন্যকে ইহার নির্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য করে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রমধ্যে যে সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থাকে, সেগুলি সাধারণতঃ নিজ হস্তে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ধারণ করিতে পারে না এবং এই কারণে এই সকল সংস্থার (বিশেষতঃ কৃত্রিম সঙ্ঘসমূহের) পরিচালন-পদ্ধতি রাষ্ট্রের পরিচালন-পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন। (পৃঃ ৩৬৪)। সুতরাং কৃত্রিম সঙ্ঘসমূহের সদস্যদের যে পরিমাণ ঐচ্ছিক স্বাধীনতা থাকে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সেই প্রকার স্বাধীনতা থাকে না। অবশ্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আশা করা যায় যে, নাগরিকেরা স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিবে। অপরপক্ষে, উগ্রপন্থী কৃত্রিম সঙ্ঘও কোন কোন ক্ষেত্রে তথাকথিত "বিপরীতগামী" সদস্যদের উপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিতে পারে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই সকল পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বৈপরীত্য নাই বা আদর্শ অবস্থার মধ্যে থাকা উচিত নহে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্র ও অন্য সকল সামাজিক সঙ্ঘগুলির বিশেষভাবে অবহিত থাকা প্রয়োজন। সমাজস্থ বিভিন্ন সংস্থা ও সঙ্ঘগুলির এমন আচরণ করা উচিত যাহাতে উহাদের উদ্দেশ্য

ও কার্যাবলী রাষ্ট্রবিরোধী না হয়। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করিয়া সমাজ তথা রাষ্ট্রের যাহাতে সামগ্রিক কল্যাণ হয়, সামাজিক সঙ্ঘসমূহের সেই ভাবেই চেষ্টা করা উচিত। অপরপক্ষে, রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং এইজন্য প্রয়োজন না হইলে বিভিন্ন সঙ্ঘের কার্যের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। নাগরিকদের বিভিন্ন সঙ্ঘের নিকট হইতে সহযোগিতা দাবী করাই রাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্ট নহে—রাষ্ট্রকেও সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি লইয়া উহার উপযুক্ত হইতে হইবে। রাষ্ট্র যদি প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে চায়, তাহাতেও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে না।

সুতরাং আশা করা যায় যে, আদর্শ রাষ্ট্রের সহিত সুসংহত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক হওয়া উচিত সহযোগিতার সম্পর্ক, অন্ততঃ উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাহা বিরোধিতার সম্পর্ক নহে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক হওয়া উচিত বৈচিত্র্যের পশ্চাতে ঐক্যের সম্পর্ক।[১২]

আমরা সমাজের সহিত রাষ্ট্রের সাধারণ সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিবিধ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারিবারিক সংস্থা এবং জনসম্প্রদায় (community)-এর সহিত রাষ্ট্র বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

(ক) পারিবারিক গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র—

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমত্ব—ইহার জন্য রাষ্ট্র অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করে এবং সাধারণ অবস্থায় নাগরিকগণও উহা স্বীকার করিয়া লয়। প্রতি রাষ্ট্রই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করে এবং রাষ্ট্রের শাসনসংস্থার মাধ্যমে ইহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। জটিল রাষ্ট্রের মধ্যে যেভাবে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে, আদিম সমাজের বিরাট্ পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যেও উহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। এইভাবে পারিবারিক গোষ্ঠীই রাষ্ট্রীয় সংস্থার উদ্ভবের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

---

১২ অধ্যাপক লাস্কি (Laski)-র ভাষায়: "We obey the state because in the end it most truly represents ourselves. We discover the identity of our will and its own the more clearly we grasp the nature of social relationships." (*A Grammar of Politics*, p. 30).

পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে (বিশেষতঃ পুরাতন সমাজব্যবস্থায়) পরিবারের একজন "প্রধান" থাকে (যেমন, প্রাচীন রোমক পারিবারিক গোষ্ঠীতে patria potestas)। "প্রধান" ব্যক্তিই সাধারণতঃ অমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়। সাধারণতঃ পরিবারস্থ সকলেই ইহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং ইহার নির্দেশে নিজেদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার এই 'প্রধান ব্যক্তি'-র ব্যবহার কিরূপ হইবে এবং অন্য সকলে তাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ অলিখিত সামাজিক প্রথা, নিয়ম বা আদর্শ প্রচলিত থাকে। পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং পরিবার পরিচালনার জন্য পরিবারের 'প্রধান' কয়েকজনের সাহায্য লইয়া ঐ কার্য সম্পন্ন করে। রাষ্ট্রের সহিত পারিবারিক জীবনের এই সাদৃশ্য আদিম পারিবারিক সমাজব্যবস্থায় অধিকতর স্পষ্ট বা প্রকট ছিল। আদিম যুগের বৃহৎ যৌথ পারিবারিক জীবনে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বা বর্তমানের অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যেরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার সংগঠনের সহিত রাষ্ট্রের সংগঠন তুলনীয়। এমন কি, আদিম যুগে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানসমূহই অনেক স্থলে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার কার্য করিত।[১৩]

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে ব্যবস্থা লক্ষ্য করি তাহাই কতকাংশে আমাদের ভাবীকালে নাগরিক হইবার উপযুক্ত করিয়া তোলে। পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্বের প্রতি যে আনুগত্য ব্যক্তি-বিশেষে দেখায়, তাহার ফলে সে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (State Authority)-এর প্রতি আনুগত্য দেখাইতে শিখে।

---

১৩ অধ্যাপক MacIver এই সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন: "In the simplest societies we know the main locus of government is the family circle. This circle is more inclusive than the unitary family of modern civilization......It has a definite head, whether the paterfamilias, the patriarch, the maternal uncle or some other member....It makes and enforces the rules that are needed to meet the various contingencies that arise. Its ability to do so depends, of course, on the customs that are common to a community composed of a number of such families." (*The Web of Government*, p. 33).

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, পারিবারিক গোষ্ঠী রাষ্ট্রের সহিত দুই ভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক্ হইতে অনুমান করা যায় যে, সুদূর অতীতে যখন রাষ্ট্র সংগঠিত হয় নাই, তখন বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীগুলিই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্য করিত, এবং এই কারণ বলিতে পারা যায় যে, এইরূপ পারিবারিক সংগঠন বা শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। আবার, ব্যক্তি-মনের দিক্ হইতে বলা যায় যে, প্রতি ব্যক্তি স্বীয় পরিবার মধ্যে যে শৃঙ্খলা, আনুগত্য, কর্তৃত্ব ইত্যাদি শিক্ষা করে, তাহা হইতেই সে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ইত্যাদি প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে।

(খ) জনসম্প্রদায় ও রাষ্ট্র (Community & State):

সম্প্রদায় হইল সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক বৃহত্তর গোষ্ঠী। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ভাষা, ধর্ম, স্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে একটি সাধারণ জীবন-যাপন করে এবং একটি সংহতি গঠন করে। (পৃঃ ১২৩-২৫)। সম্প্রদায় মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক যেরূপ নিবিড় বা ঘনিষ্ঠ থাকে, বৃহৎ রাষ্ট্রমধ্যে উহা সেইরূপ থাকে না। মানুষে মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে সম্প্রদায় মধ্যে বহুবিধ নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং বহুবিধ প্রথার সৃষ্টি হয়। সম্প্রদায়ের নিজস্ব একটি জীবনযাত্রা-প্রণালী আছে এবং উহা সম্প্রদায়ের নিজস্ব নিয়ম বা প্রথা দ্বারা অনুশাসিত হয়। সুতরাং সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের সহিত সমব্যাপক নহে। সাম্প্রদায়িক জীবন যেভাবে এক পরিবারকে অপর পরিবারের সহিত গ্রথিত করে, যেভাবে এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর সহিত সংযুক্ত করে, তাহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা সম্ভব নহে।

একনায়কত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক জীবনের পৃথক্ অস্তিত্ব বা স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উহা যে সকল ক্ষেত্রে সফল হয়, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্প্রদায় তথা সাম্প্রদায়িক জীবনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুক্তি-সঙ্গত সাম্প্রদায়িক দাবী মিটাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, সম্প্রদায়গত মতবাদ রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এমন কি, সাম্প্রদায়িক জনমত যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের পতন ঘটিবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাম্প্রদায়িক জীবন যেভাবে চলে, জনমত যেভাবে সম্প্রদায় মধ্যে গঠিত হয়, তাহার প্রভাব কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে

পারে না। সাম্প্রদায়িক জীবনে আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদির দ্বারা সকলের অলক্ষ্যে যে সকল সংস্থা গঠিত হয়, সেইগুলি রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও নীতি পরিচালিত করে। মোট কথা, সুগঠিত রাষ্ট্র যেমন উহার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক সম্প্রদায়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইরূপ সকল রাষ্ট্রই সমাজের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের অলিখিত নিয়ম দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়।[১৪]

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State):

(১) রাষ্ট্রীয় উদ্বর্তনের মূল কারণ (Main Causes of the Origin of State):

যে-কোন সামাজিক সংস্থার ন্যায় রাষ্ট্রীয় সংস্থারও উৎপত্তি ও বিবর্তন পূর্ণভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ঠিক কিভাবে, কবে, কোথায়, কেন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে জানা না যাইলেও আমরা ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি সুষ্ঠু প্রকল্প গঠন করিতে পারি।

কেহ কেহ মনে করেন যে, কতকগুলি মনোগত কারণের ফলে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছিল। মানুষের মনোমধ্যে যে সামাজিকতা বোধ আছে তাহা হইতেই রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছিল।[১৫] এই সামাজিকতাবোধ হইতেই মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায় এবং ইহারই ফলে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

গোষ্ঠীর গঠন-বৈশিষ্ট্য আবার বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হইতে পারে এবং ইহার ফলে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। সুতরাং এক এক দল মানুষ এক এক

১৪ তুলনীয় : "The institutions and associations they (community) promote can never be co-ordinated into the institutions of the state Even in its most totalitarian pretensions the state can never abolish them or take their place....Democracy, and democracy alone, gives a constitutional sanction to the universal principle....In the old empires, the customs of the people and not the decrees of government regulated the greater part of everyday life. The folkways were dominant." (*Ibid.*, pp 195-96).

১৫ তুলনীয় : "(State originated from) the acceptance of conditions which come into existence by the sociability inherent in man, and were developed by man's spontaneous search after convenience." (Morley) (Quoted by Wilson, *The State*, p. 13).

প্রকার গোষ্ঠীর গঠন করিতে থাকে এবং এই সকল গোষ্ঠী কখনও কখনও পরস্পরের সহযোগিতা করিতে লাগিল, আবার কখনও কখনও উহাদের বিরোধিতা করিতে লাগিল।

এই সকল গোষ্ঠীর সংগঠন কেবলমাত্র গোষ্ঠী-চেতনা হইতেই হইয়াছিল, ইহা বলা যায় না। পরিবেশগত এবং জাতিগত পার্থক্য হইতেই গোষ্ঠীগত পার্থক্য প্রধানতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, আত্মীয়তাবোধ (kinship), ধর্ম, শিল্প, এবং যুদ্ধ এইগুলিও বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে।[১৬]

আত্মীয়তাবোধ ও পারিবারিক সংস্থার মধ্যে যে প্রকার সংহতি থাকে এবং একজন প্রধান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে আনুগত্যের সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির অন্যতম 'উপাদান' বলা যায়। (পৃঃ ৩৭০)।

আদিম মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব তীব্র ছিল। অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক ঘটনার সম্মুখে তাহার মনে এক বিস্ময় বিহ্বল ভাবের সৃষ্টি হইত এবং সে নিজের অনুকূলে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করিত (পৃঃ ১১১-১২)। এইভাবে তাহার মনে ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব হয় এবং সে যখন এক এক প্রকার পুরোহিত-সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন সমাজমধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী রচিত হইল। এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে পুরোহিত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া যে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহাও কালক্রমে রাষ্ট্রীয় সংহতির উপাদান হয়।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটার ফলে সমাজমধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সৃষ্টি হইল এবং ঐ প্রকার স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়াও সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল এবং ঐগুলিও রাষ্ট্র সংগঠনে সহায়তা করিল।

তাহা ছাড়া, যুদ্ধের ফলেও এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে করায়ত্ত করিয়া লইল এবং ইহার ফলে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। যুদ্ধের ফলে যখন নূতন কোন ভূখণ্ড ও উহার অধিবাসীরা করায়ত্ত হইল, তখন শাসার

---

১৬ এইজন্য গেটেল্ (Gettell) বলেন: "Aside from those influences of the physical environment that caused men to aggregate in certain places, that separated one group from another, and that created ethnic similarities among individuals of the group, thus paving the way for state formation, the most important forces that have contributed to the origin of the state are (1) kinship, (2) religion, (3) industry, (4) war." (*Political Science*, p. 60).

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে নূতন জাতির উদ্ভব ঘটিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধে জয়লাভের ফলে যখন নূতন জাতির বিবর্তন ঘটিল, তখন আবার তাহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ধীরে ধীরে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। অবশ্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রথম পর্যায় হইতেই যে সুগঠিত আইন প্রণীত হইয়াছিল তাহা নহে ; প্রথম অবস্থায় সামাজিক প্রথাসমূহেরই প্রাধান্য ছিল এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের স্থিতি ও প্রগতির ফলে ইহারা স্থায়ী নিয়ম বা আইনের রূপ ধারণ করিল।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, বিশেষ কোন একটি অবস্থা বা একটি কোন ঘটনা হইতে বিশেষ এক সময় রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটে নাই। সমাজমাত্রেরই যে গতীয়তা (dynamism) আছে তাহারই ফলে রাষ্ট্র বিবর্তিত হইয়াছে। নূতন নূতন রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে নূতন জাতির সমন্বয়, ধর্মের সমন্বয়, ভাষার সমন্বয় ঘটিতে লাগিল।[১৭]

(২) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ (Different Theories of the Origin of the State) :

যদিও রাষ্ট্রের বিবর্তন কোন একটি বিশেষ ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহা হইলেও এক এক দল লেখক এ বিষয় এক এক প্রকার মতবাদ গঠন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে কয়েকটি মতের উল্লেখ করিতে পারি।

(ক) দৈব উৎপত্তি (Divine Origin) :

এক দল লেখক বলেন যে, দেবতা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়াই রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা হইলেন ঈশ্বরের প্রতিভূ। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে রাজাকে পূজা করা ঈশ্বরকে পূজা করার সমতুল্য। আবার, রাজা তাঁহার কার্যাবলীর জন্য প্রজাদের

১৭ Blackmar ও Gillin-প্রদত্ত বর্ণনা লক্ষণীয় : "Out of war and conquest as a first step, grew the assimilation of peoples, which, if not too different in their customs and manners, amalgamated sooner or later, and produced a more plastic-minded people......War and conquest are self-limiting and necessarily lead to other things. The conquerors marry, or at least cohabit with, the women of the conquered. A mixed race appears with the religion of the mothers, yet not hostile to the ideas and service of the conquerors...Constantly new laws have to enacted...Language is modified, art develops, ideas, clash and coalesce." (*Outlines of Sociology*, p. 167).

নিকট দায়ী নহেন, তিনি তাঁহার কার্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অতএব, জনগণকে তাঁহার কার্যের কোন কৈফিয়ৎ দিতে তিনি বাধ্য নহেন।

এই মতবাদের সমর্থনে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য বা উপাত্ত প্রদর্শন করা যায় না। ইহা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ সাধারণতঃ পরিহার করেন। তাহা ছাড়া, দর্শনের দিক্ হইতেও ইহা আপত্তিজনক। রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং নরপতিকে জীবলোকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিভূ বলিলে রাষ্ট্র তথা নরপতির সকল অপকার্য ইত্যাদির সহিত ঈশ্বর সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। আবার কেন তিনি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন তাহাও বোধগম্য হয় না।

(খ) দৈহিক বল হইতে উৎপত্তি (Origin from Force):

কোন কোন লেখক বলেন যে, দৈহিক শক্তি বা ক্ষাত্রবল হইতে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছে। আদিম জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত এবং যাহাদের দৈহিক বল অধিকতর ছিল, তাহারাই অপরের করায়ত্ত ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া লইত। এইভাবে "জোর যার মুলুক তার" এই নীতির প্রসার ঘটিতে লাগিল।[১৮]

রাষ্ট্র যে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই অনেক সময় রাষ্ট্র-প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করিতে জনগণকে বাধ্য করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র দৈহিক বলপ্রয়োগ হইতেই রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারাই উহা নিজের স্থায়িত্ব রক্ষা করে, এ কথা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না। মানুষ কঠোরতর দৈহিক শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিলেও কেবলমাত্র উহার জন্য সে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব স্বীকার করে না। তাহার মনে যূথচারিতা, সঙ্ঘবদ্ধতা ইত্যাদির

১৮ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন লেখক দৈহিক বল সম্বন্ধীয় মতবাদ সমর্থন করেন। দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই রাষ্ট্র উহার নিয়মকানুন প্রচলিত রাখে এবং জনগণের আনুগত্য স্বীকার করাইয়া লয়; এইজন্য কেহ কেহ বলেন দৈহিক শক্তির প্রয়োগ হইতেই রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র অনেক সময়ই বিশুদ্ধ নৈতিক পথ অনুধাবন করিতে পারে না এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়া থাকে—এইজন্য কেহ কেহ বলেন যে, রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের যন্ত্র। মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা মনে করিতেন যে, জাগতিক সকল সংস্থাই পাপ, দুর্নীতি ও অধঃপতনের পরিচায়ক, সুতরাং রাষ্ট্রের মূলে আছে বলপ্রয়োগ। আবার নৈরাজ্যবাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, দৈহিক বল হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া উহার অবসান ঘটান যাইতে পারে।

ইচ্ছাও জাগরূক আছে বলিয়া সে সমাজ তথা রাষ্ট্রমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য আগ্রহান্বিত। তাহা ছাড়া, যদি কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির দ্বারাই রাষ্ট্র নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিত, তাহা হইলে কোন রাষ্ট্রই স্থায়িত্ব অর্জন করিত না; কারণ মানুষের মন চিরদিন দৈহিক শক্তির প্রভুত্ব মানিয়া চলে না—সে একদিন-না-একদিন উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। এইজন্য বলা হয় যে, পারস্পরিক সম্মতি বা স্বাধীন ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি—দৈহিক শক্তি নহে।[১৯]

(গ) স্বভাবজ উৎপত্তি (Natural Origin) :

কেহ কেহ (যথা, আরিষ্টটল) বলেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জীব এবং তাহার মধ্যে সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠন করিয়া জীবন যাপনের ইচ্ছা আজন্ম বিদ্যমান। এই স্বাভাবিক ইচ্ছার ফলেই রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষের ধর্মই হইল রাষ্ট্রবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করা। রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন সংস্থাই মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করিতে পারে না এবং এইজন্য মানুষের ভিতর হইতে রাষ্ট্রবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণা জাগে। অতএব, রাষ্ট্র কোন কৃত্রিম সংস্থা নহে।

এই মতবাদ রাষ্ট্র যে স্বাভাবিক সংস্থা, উহা যে ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে; কিন্তু ঠিক কী কী অবস্থার সমন্বয়ে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছে এই মতবাদে তাহার উল্লেখ নাই।

(ঘ) সামাজিক-চুক্তি (Social Contract) :

একদল লেখক (যথা, হব্‌স্‌, রুশো, লক্‌ ইত্যাদি) মনে করেন যে, রাষ্ট্রের বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের উৎপত্তি ঘটিয়াছে সামাজিক চুক্তি হইতে। একদিন ছিল যখন সমাজ বা রাষ্ট্র ছিল না; কিন্তু মানুষ এই অবস্থায় নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করার জন্য বাধ্য হইয়া পরস্পরের সহিত চুক্তি করিয়া সমাজবদ্ধ বা রাষ্ট্রবদ্ধ হইল। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃঃ ৪৩-৪৭ দ্রষ্টব্য)।

এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই এবং ইহার সপক্ষে উপযুক্ত উপাত্ত প্রদর্শন করা যায় না। তবে ইহার গুণ হইল যে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য যে জনগণের সম্মতির প্রয়োজন, সে দিকে ইহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

---

১৯ তুলনীয় : "Will, not force, is the basis of the state." (Green).

(ঙ) সুপ্রাচীন নিয়মকর্তাদের নির্দেশ হইতে উদ্ভব (Origin from the Traditions of Law-givers) :

কেহ কেহ মনে করেন যে, সুদূর অতীতে সামাজিক নিয়মকর্তৃগণ সমাজব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেইগুলিই কালক্রমে এক সামাজিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন লেখকগণ কর্তৃক মোজেজ্ (Moses), মনু, লাইকারগাস্, সোলোন, নুমা, আলফ্রেড ইত্যাদির নাম উল্লিখিত হয়।

যদিও রাষ্ট্র-সংগঠনে এই সকল প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবদান অস্বীকার করা যায় না, তাহা হইলেও ইঁহাদেরই নির্দেশ বা বিধির ফলে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। কারণ, যখন ইঁহারা নির্দেশ বা বিধি রচনা করিয়াছিলেন, তখন পূর্ব হইতে কোন-না-কোন প্রকারের সামাজিক সংগঠন ছিল বলিয়াই নিয়ম বা নির্দেশ দানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল এবং কল্পনা করা যায় যে, এই প্রকার সামাজিক সংগঠন পূর্ব হইতেই রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল বিধি বা নির্দেশদানকারিগণ নূতন নিয়মের সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাঁহারা পুরাতনের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।

পরিশেষে, আমরা এই মন্তব্য করিতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিবিহীন বিবরণ দান সম্ভব নহে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ মতবাদ দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৩) রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ধারা (General trends of the development of State) :

যদিও একটি বিশেষ ঘটনা হইতে বা অথবা কোন সরল পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটে নাই, তাহা হইলেও ইহার বিবর্তনের কতকগুলি সাধারণ শিল্পের উল্লেখ আমরা করিতে পারি। একদিন ছিল যখন একটি ক্ষুদ্র উপজাতিই রাষ্ট্রের আকার ধারণ করিয়াছিল অথবা রাষ্ট্র বলিতে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র বুঝাইত। কালক্রমে এই সকল রাষ্ট্রের আয়তন ও সংগঠনের পরিবর্তন ঘটিল—কোথাও বা বিরাট্ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, কোথাও বা সামন্তরাজ্য স্থাপিত হইল, আবার কোথাও বা জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতিরও

পরিবর্তন ঘটিল—রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শাসন-পদ্ধতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল।

বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রের উদ্ভব লক্ষ্য করিলে আমরা নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই :[২০]

(ক) অন্যান্য যে-কোন বিবর্তনের ধারার ন্যায় রাষ্ট্রীয় বিবর্তনও **সরল হইতে জটিল আকার** ধারণ করিয়াছে। রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালন কার্য নানা ধারায় বিভক্ত হইয়াছে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কও অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট আকার হইতে স্পষ্টতর রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার ফলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

(খ) **রাষ্ট্রের অগ্রগতির সহিত রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যাও** অনেক স্থলে বিস্তারলাভ করিতে থাকে। পূর্বে যে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেবলমাত্র কোন উপজাতি বা খণ্ড জাতি বা নগরের মধ্যে সীমিত ছিল, তাহাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিস্তৃততর পরিধির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। পরিবহন ও যোগাযোগ রাখার উন্নততর উপায় আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সংযোগ ঘটিতে লাগিল এবং সংহতি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যাপকতর রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

(গ) **রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ** রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। আদিম যুগ হইতেই মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে এবং যে সামাজিক সংঙ্ঘ বা গোষ্ঠী হইতে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে স্বাভাবিক যূথচারিতাবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের বিবর্তন ও প্রগতির ফলে নাগরিকগণের মনে উন্নততর রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগিতে লাগিল—রাষ্ট্র ও নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যকে সুনির্দিষ্ট রূপ দিবার জন্য নানাপ্রকার নিয়ম বা আইন প্রবর্তিত হইল। কোথাও পুরাতন সামাজিক প্রথা বর্জিত হইল, কোথাও বা উহা মার্জিত হইল ; শাসনব্যবস্থা নানাদিকে সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিল ; রাষ্ট্রের অধিপতির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অনেক স্থানে ক্ষুণ্ণ হইল ; নাগরিকগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ তথা রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হইল। মোট কথা, রাষ্ট্রের বিবর্তনের আদি যুগে যে অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তা ছিল, তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে থাকিল।

২০ Gettell, *Political Science*, Ch. VII, দ্রষ্টব্য।

(ঘ) রাষ্ট্রের বিস্তারের সহিত রাষ্ট্রমধ্যে নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল এবং এই কারণ **রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সহিত সম্বন্ধজনিত সমস্যা** দেখা দিতে লাগিল। যেমন, একদিন ছিল যখন ধর্মীয় সংস্থা সামাজিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও ধর্মীয় সংস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্ন উঠিল। সেইরূপ শিক্ষামূলক সংস্থা, কৃষ্টিমূলক সংস্থা, শিল্পীয় সংস্থা ইত্যাদির সহিতও রাষ্ট্রের কি সম্বন্ধ, রাষ্ট্র কতদূর উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ইত্যাদি বিষয় নানাসমস্যা দেখা দিতে লাগিল এবং উহাদের সমাধানের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল।

(ঙ) রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে **রাষ্ট্রের প্রকারভেদ** ঘটিতে লাগিল। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার মধ্যে যেমন নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় সংস্থার ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখা যায়। ইহার ফলে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ, নানা সংঠনযুক্ত রাষ্ট্র দেখা দিতে লাগিল। অর্থাৎ ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা কারণে রাষ্ট্রের সংগঠন ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল তাহার ফলে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

(চ) রাষ্ট্র ও নাগরিকেব পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি সমস্যা হইল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পারস্পরিক বিরোধ। রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রারম্ভে শাসক-বর্গের অপ্রতিহত ক্ষমতাই অধিকতর স্বীকৃত হইত এবং সাধারণ শাসিত ব্যক্তি বা প্রজাকে অধীন দাসরূপে গণ্য করা হইত। কিন্তু মানুষের নীতিবোধের প্রগতির ফলে রাষ্ট্রীয় আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটিল। অনেক ক্ষেত্রেই **রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবীর সমন্বয়সাধনের** প্রচেষ্টা দেখা দিল। সকল স্থলেই যে সুষ্ঠ বা শান্তিপূর্ণ সমাধান ঘটিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু রাষ্ট্র-মধ্যে যে নাগরিক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। আবার প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই যে সার্বভৌমত্বের অধিকারী ইহাও বলা হইয়া থাকে। যাহাতে শাসনব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হয়, সেজন্য তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর শাসনভার অর্পিত থাকে। তাহা ছাড়া, জনগণকে গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য স্বায়ত্তশাসনাধীন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয় এবং জনগণকে ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহ দান করা হয়।

✱ ৪। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রের বিচার (The State from a sociological standpoint):

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের স্বরূপ বিচার করা হয়। সমাজের বিবর্তনের পর সমাজমধ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে এবং রাষ্ট্র উহাদের অন্যতম। কিন্তু রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংস্থা হইলেও উহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সমাজমধ্যে উহার প্রভাব অপরিসীম। যদিও সমাজমধ্যে উহা উদ্ভূত হইয়াছিল এবং বৃহত্তর সমাজের প্রভাব উহা অস্বীকার করিতে পারে না, তাহা হইলেও উহা অনেকক্ষেত্রে দৈনন্দিন সামাজিক জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, আবার অনেকক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক জীবনযাপন করা বা বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে নিজ নিজ আদর্শ অনুধাবন করা সম্ভব করিয়া তোলে। সমাজজীবনে রাষ্ট্রের এই প্রভাবের জন্য সমাজতত্ত্বে রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় আলোচনার উপর গুরুত্ব করা হয়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং সমাজতত্ত্বও ঐ বিষয়ে আলোচনা করে; কিন্তু ঐ দুই বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, কারণ সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রীয় বিবর্তনকে আদিম অবস্থা হইতে পর্যালোচনা করিতে থাকে বলিয়া যে সকল রাষ্ট্র বিধিসম্মতভাবে আদিমযুগে গঠিত হয় নাই সেগুলিও উহা আলোচনা করে, অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব আদিমযুগ হইতে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রের বিবর্তনের ধারা এবং বিভিন্নযুগে সমাজ ও ব্যক্তিমনের উপর উহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণতর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণতঃ সুসংহত রাষ্ট্র এবং বিশেষতঃ শাসনব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করে। সাধারণতঃ যেখানে কোন সুনির্দিষ্ট সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, অথবা কোন নির্দিষ্ট সংবিধানের আকারে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, অর্থাৎ যেখানে রাষ্ট্র কোন বিধিসম্মত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সেই সকল কার্য-সম্বন্ধেই উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করে। আইন বা বিধিসঙ্গতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্যান্য কোন কার্য বা প্রভাব সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে না।[২১]

---

২১ অধ্যাপক গিডিংস্ (F. H. Giddings) সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন: "Political science studies the state within the consti-

আবার, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকতর। সমাজ-দর্শনও সমাজতত্ত্বের ন্যায় রাষ্ট্রকে অন্যতম প্রভাবশালী সামাজিক সংস্থারূপে গণ্য করে। কিন্তু সমাজদর্শন সামাজিক সংস্থারূপে রাষ্ট্রের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কী স্থান তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করে।

সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন তথা সমাজদর্শনকে সাহায্য করিয়া থাকে। সমাজতত্ত্ব প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন সম্বন্ধে যে সকল উপাত্ত সংগ্রহ করে, তাহারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মূল্য কী হইতে পারে দেখা যাউক্। অনেকে মনে করেন যে, সমাজ তথা রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে সংস্কারের জন্য নিয়ম বা আইন প্রণয়নই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, শত নিয়ম বা আইনের সাহায্যেও বাঞ্ছিত সংস্কার সাধিত হয় না। ইহার কারণ হইতেছে যে, সামাজিক বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে বা সমাজমনের একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে এবং যদি তথাকথিত সংস্কার সমাজবিবর্তনের এই ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহা সাফল্য লাভ করে না। সমাজতত্ত্ববিৎ গিডিংস[২২] সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন: (ক) যে সমাজের অভীষ্ট লক্ষ্য (interest)-এর সংখ্যা অল্প এবং তাহাদের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, সেই সমাজ সাধারণতঃ সংস্কারের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করে ; অপরপক্ষে, যে সমাজের লক্ষ্য বহুবিধ এবং যেগুলির সামঞ্জস্যবিধান হয় নাই, সেই সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী। (খ) যে সমাজে কোন লক্ষ্যকে

tution and shows how it expresses its will in acts of government. It inquires how this state within the constitution is created and moulded by the state behind the constitution, but beyond this political science does not go. The state behind the constitution, or natural society as we should otherwise call it, is for politics, as for political economy, a datum. The detailed study of its origins and evolution falls within the province of sociology." (*Principles of Sociology*, pp. 35-36).

২২ Giddings, *Inductive Sociology*, pp. 177-181.

পাইতে হইলে জটিল ও পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই সমাজ আবেগ প্রণোদিত হইয়া আকস্মিকভাবে কোন সংস্কার সাধন করিতে পারে না। এই নিয়মগুলি পর্যাপ্ত না হইতে পারে বা ইহারা সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইতে পারে; কিন্তু এই সকল নিয়ম হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন বা সংস্কারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে উহা সেই বিশেষ সমাজের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং কোন রাষ্ট্রের সংস্কার সাধনে, উন্নতি বিধানে ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মূল্য অপরিসীম।[২০]

৫। রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Different theories as to the nature of the State):

রাষ্ট্রের স্বরূপ লইয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধীয় আলোচনা সাধারণতঃ দার্শনিক আলোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এইরূপ আলোচনা মানুষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিবর্তন যেমন একদিকে নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ নূতন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ পুরাতন রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন সাধন করিয়াছে — এমন কি, নূতন ভাবে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করিয়াছে।

এই সকল মতবাদ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন মতবাদ কেবলমাত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকেই উচ্চ মূল্য দিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা বিশেষ স্বীকার করে নাই—কোন কোন চরম মতবাদ নৈরাজ্যবাদ সমর্থন করিয়াছে।

২০ সমাজের সংগঠন অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ কিরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহার উদাহরণ দিয়া Blackmar ও Gillin বলেন: "A law which will be obeyed in 'prohibition' Iowa, whose people have long been in America and have imbibed the Puritan ideals, will be broken in Wisconsin or Minnesota with their large foreign populations possessing other social customs and ideals. A republic in ignorant Mexico cannot be the same as in enlightened Canada or France. Sociology provides the foundations on which the political scientist may build his science of government, and the political philosopher his theory of the state." (*op. cit.*, p. 189).

আবার কোন কোন মতবাদে রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিশেষ স্বীকৃত হয় নাই। যে সকল মতবাদ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে, সেগুলির কোন কোনটি রাষ্ট্রকে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছিত সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; কোন কোনটি আবার রাষ্ট্রকে অবাঞ্ছিত অথচ প্রয়োজনীয় সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় মতবাদ যে রাষ্ট্রসংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু মননশীল মানুষ রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ভাবে চিন্তা করিয়াছে তাহা এই সকল মতবাদে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই দিক্ হইতেও ইহাদের মূল্য আছে। মানুষের চিন্তাশক্তি থাকার জন্য সে যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহার মূল্য ও যৌক্তিকতা কী এবং উহার দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করে এবং এই সকল প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টা হইতেই বিভিন্ন মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে।[২৪]

আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করিব।

(ক) ব্যবহারশাস্ত্রীয় মতবাদ (Juristic Theory):

ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ বা আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'রাষ্ট্র'-কে একটি বিমূর্ত ব্যবহারশাস্ত্রীয় পদ (abstract legal concept) রূপে গণ্য করেন।[২৫] আইনগত বা ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইঁহারা আইনের স্রষ্টা ও পরিপালকরূপে রাষ্ট্রকে দেখেন এবং এই কারণে ইঁহাদের নিকট রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য যে কোন সঙ্ঘ অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সঙ্ঘ বলিয়া পরিগণিত হয়।

২৪ তুলনীয়: "Intelligent men naturally wish to understand the authority under which they live, to analyse its organisation and activities, and to speculate concerning the best forms of political existence. The fact that many of the greatest thinkers of all time—Plato, Aristotle, Aquinas, Locke, Rousseau, Kant, Mill and others—were concerned with the political aspects of philosophy is an indication of its importance as a form of intellectual effort." (Gettell, *Political Science*, pp. 118-19).

২৫ ব্যবহারশাস্ত্রীয় বা আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী আবার বৈশ্লেষিক, ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক যে কোন প্রকারের হইতে পারে। বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রকে আইনের প্রণয়নকর্তা, ব্যাখ্যা-কর্তা, প্রয়োগকর্তা ইত্যাদিভাবে বর্ণনা করা হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হয় যে, যদিও রাষ্ট্র আইনকে সুস্পষ্টরূপ দান করে, তাহা হইলেও রাষ্ট্রীয় আইনের অনেকাংশই সামাজিক প্রথা দ্বারা গঠিত। আবার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কেহ কেহ বলেন যে, রাষ্ট্র সংগঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই নিয়ম বা প্রথার অস্তিত্ব এবং উহা রাষ্ট্রীয় ইচ্ছানিরপেক্ষ।

সাধারণ মানুষ যে সকল গুণের অধিকারী, আইনের কল্পনায় রাষ্ট্রের উপর সেই সকল গুণ আরোপ করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্র হইল 'কৃত্রিম ব্যক্তিবিশেষ' (artificial person)।[২৬] যে কোন ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্র সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে, চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে, বিচারালয়ে অভিযোক্তা বা অভিযুক্ত যে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে।

সমালোচনা :

রাষ্ট্রের উপর যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়, তাহা কাল্পনিক। আইনের দৃষ্টি হইতে ইহার বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্র 'যেন একটি স্বাধীন ব্যক্তি', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সজীব সচেতন ব্যক্তি নহে। ইহার অর্থ রাষ্ট্রের বাস্তবতা অস্বীকার করা নহে—ইহার অর্থ হইল যে, যে অর্থে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন ব্যক্তি, রাষ্ট্র সেইরূপ কোন ব্যক্তি নহে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্যবহারশাস্ত্রীয় মতবাদ একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীরূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।[২৭]

(খ) যান্ত্রিকতাবাদ (Mechanistic Theory) :

যান্ত্রিকতাবাদের সমর্থকেরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রমাত্রই নিতান্ত কৃত্রিম জনসমাবেশমাত্র। একটি যন্ত্র যেমন বিভিন্ন অংশের সংযোগমাত্র, রাষ্ট্রও সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির সংযোগমাত্র। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহারা সমবেত হয় এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে ঐরূপ সমাবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। রাষ্ট্রকে সেইজন্য একটি বিরাট সৌধের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; স্থপতি-শিল্পী যেরূপ পুরাতন আবর্জনা অপসারিত করিয়া নূতন সৌধ স্থাপন করেন, সেইরূপ পুরাতন, প্রাচীন, অচলায়তন সংস্থাসমূহকে অপসারিত করিয়া নূতনভাবে নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। ফরাসী বিপ্লবীরা এই মত সমর্থন করিতেন।

---

২৬ ব্লুন্টস্লি (Bluntschli) প্রমুখ জার্মাণ লেখক মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব নিতান্ত কাল্পনিক নহে; উহা বাস্তব। ব্লুন্টস্লি মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব পুরুষোচিত (masculine) গুণবিশিষ্ট। তাঁহার ভাষায়: "The State is a combination or association of men, in the form of government and governed, on a definite territory, united together into a moral organised masculine personality." (*The Theory of the State*, Bk. I, Ch. I. § 7).

২৭ অধ্যাপক গার্ণার (Garner)-এর ভাষায়: "The juridical theory...is merely a point of view from which the state is envisaged by the jurist. It may rest upon a fiction......, it is sometimes by means *of fictions that* realities are translated into understandable terms." (*Op. cit.*, p. 210).

সমালোচনা :

এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি হইল যে, যদিও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে জনসমাবেশের প্রয়োজন, তাহা হইলেও পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। মানুষের মনে সহজাত যূথচারিতা-বৃত্তি আছে এবং ইহারই ফলে সে সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকিতে চায়। সেইজন্য রাষ্ট্র ও অনুরূপ সামাজিক সংস্থা নিতান্ত কৃত্রিম নহে। (পৃ: ৫১-৫৩)।

(গ) জৈব মতবাদ (Organismic Theory) :

জৈবমতবাদের সমর্থকেরা রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রাণি-দেহে যেমন প্রচয়, বিবর্তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে, রাষ্ট্রেরও সেই সকল বৈশিষ্ট্য আছে। জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কার্য সাধন করিয়া থাকে, রাষ্ট্রেরও সেইরূপ বিভিন্ন অংশ আছে এবং এক একটি অংশের উপর এক একটি কার্যভার ন্যস্ত থাকে।[২৮]

জীবদেহের সহিত সমাজ তথা রাষ্ট্রের যে সাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জীবদেহে যেমন পরিবর্তন আছে, রাষ্ট্রেরও সেইরূপ পরিবর্তন আছে। জীবদেহে যেমন প্রচয় (development) আছে, রাষ্ট্রেরও সেইরূপ পরিবর্ধন আছে। জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষ লইয়া গঠিত, রাষ্ট্রও সেইরূপ বহু নাগরিকের সমাবেশের ফল। জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের বিভিন্ন নাগরিক এবং নাগরিক দ্বারা গঠিত বিভিন্ন সংস্থা সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং রাষ্ট্রকে একটি সজীব সত্তা বলাই যুক্তিযুক্ত।

সমালোচনা :

রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ বহু বিষয় বৈসাদৃশ্যও আছে। জীবদেহে যেমন বিভিন্ন কোষ ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট স্থান ও কার্য আছে, প্রতি নাগরিকের জন্য সেইরূপ একটি মাত্র নির্দিষ্ট স্থান বা কার্য নাই। রাষ্ট্রমধ্যে একই নাগরিক বিভিন্ন স্থান অধিকার করিতে

২৮ জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা প্লেটো, সিসিরো, রুশো ইত্যাদি করিয়াছেন। তবে ব্লুণ্ট্স্লি, স্পেন্সার প্রমুখ লেখকগণ এই সাদৃশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রকে সজীব প্রাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (পৃ: ৩৮৪, পাদটীকা ২৬, দ্রষ্টব্য।)

এবং বিভিন্ন কার্য সাধন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, জীবদেহে যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক ইত্যাদি কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ আছে, তথাকথিত রাষ্ট্রদেহে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। আবার যে অর্থে জীবজগতে বিবর্তন ঘটে, রাষ্ট্রীয় বিবর্তন ঠিক সেরূপ নহে। (পৃঃ ৫৩-৫৭)।

সুতরাং রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত সম্পূর্ণভাবে তুলনা করা যায় না। তবে এই মতবাদের বিশেষ গুণ হইল যে, রাষ্ট্র যে আকস্মিক জনসমাবেশ মাত্র নহে, উহার অস্তিত্ব যে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, সে বিষয় ইহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং এইরূপ মতবাদ চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কুফল প্রতিহত করে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় সংহতির ভিতর যে ঐক্য আছে, তাহার উপরও ইহা গুরুত্ব আরোপ করে। আবার, রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে ব্যক্তিবিশেষ যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, সে বিষয়ও ইহা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোট কথা, এই মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত আছে; ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে অতিশয়োক্তিজনিত ত্রুটি দেখা দেয়।

(ঘ) চুক্তি মতবাদ (Contract Theory) :

এই মতবাদ অনুসারে মানুষ এমন এক অবস্থায় পূর্বে বাস করিত যখন কোনপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি ছিল না; কিন্তু এইরূপ অবস্থা মানুষের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। হব্‌স্ মনে করেন যে, এইরূপ অবস্থায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল হিংস্র শ্বাপদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ন্যায়। সুতরাং মানুষ এই অসহনীয় অবস্থা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রবদ্ধ হইবার চুক্তি করিল। লক্ মনে করিতেন যে, আদিম অবস্থা শান্তিপূর্ণ হইলেও অপরাধীকে শাস্তিদান, ন্যায়বিচার ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রীয় সংগঠন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল—এবং মানুষ তখন শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট স্বীয় স্বাধীনতা সমর্পণ করিল। সেইরূপ রুশো মনে করিতেন যে, আদিম অবস্থা ছিল শান্তিপূর্ণ স্বর্গরাজ্যস্বরূপ; কিন্তু পরে সমাজমধ্যে কলহবিদ্বেষ দেখা দিতে লাগিল এবং মানুষ তখন চুক্তিবদ্ধ হইয়া সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠন করিল—মানুষ কোন বিশেষ শাসকগোষ্ঠীর বা রাজার নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া সমষ্টিগত ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং উহা দ্বারা পরিচালিত হইতে স্বীকৃত হইল।

সমালোচনা :

এই মতের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি করিয়াছেন।[২৯] অনেকে মনে করেন যে, ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ইহার কোন ঐতিহাসিক যুক্তি নাই। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রকে যদি স্বাধীন চুক্তিরূপে গণ্য করা যায়, তাহা হইলে উহার এই তাৎপর্য হয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠন নাও করিতে পারিত। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রবদ্ধতা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে, সে সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন না করিয়া পারে না, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং চুক্তির ধারণা বা প্রত্যয় দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। বাস্তবিক, রাষ্ট্র গঠিত না হইলে চুক্তিকে মর্যাদা দানের প্রশ্ন উঠে না।[৩০] (পৃ ৪৩-৪৭ এবং পৃঃ ৩৭৬)।

তবে সামাজিক চুক্তি-মতবাদ দ্বারা একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী বা রাজা যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নন, তাঁহাদেরও অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাহা এই মতবাদে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(ঙ) ভাববাদী দার্শনিক মতবাদ বা তত্ত্ববিদ্যা-সম্মত মতবাদ (Idealistic or Metaphysical Theory) :

ভাববাদী দর্শন (idealistic philosophy)-এতে সাধারণতঃ রাষ্ট্রের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য আরোপ করা হইয়া থাকে—ইহার মতে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করা উচিত।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্লেটো, আরিষ্টটল ইত্যাদি এই মতের প্রবর্তন করেন,

২৯ গ্রীণ (Green) এই মতবাদকে 'অসার কল্পনা' (fiction) বলিয়াছেন, উলসে (Woolsey) ইহাকে 'সর্বৈব মিথ্যা' (utterly false) বলিয়াছেন, পোলোক (Pollock) ইহাকে 'রাজনৈতিক মিথ্যাচার' (most successful and fatal of political impostures) বলিয়াছেন।

৩০ কোন কোন লেখক মনে করেন যে, যদিও চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, তাহা হইলেও সরকার বা শাসনসংস্থা (government) চুক্তির ফলে উদ্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক কালে প্রখ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) এই মতের প্রধান সমর্থক এবং তাঁহার নাম ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।[৩১]

হেগেলীয় দর্শনে বলা হয় যে, **রাষ্ট্রই ব্রহ্ম (Absolute)-এর প্রকাশ। ইহা কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ নহে—রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাষ্ট্র নিজেই। সুতরাং ইহা সর্বশক্তিমান্, সকল ভ্রান্তির উর্ধ্বে এবং ইহারই মধ্যে কার্য করিয়া ব্যক্তি-বিশেষ আত্মোপলব্ধি করিতে পারে।** রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রাষ্ট্রের আদেশ পালনই ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সর্বোচ্চ কর্তব্য।[৩২]

হেগেলীয় মতবাদে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়:

(ক) রাষ্ট্র হইল সজীব, সচেতন প্রাণি-বিশেষ (living organism)। জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পারস্পরিক সহযোগিতায় 'একক'-ভাবে কার্য করে, রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি সেইরূপ রাষ্ট্রের অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া 'একক'-ভাবে কার্য করে।

(খ) রাষ্ট্র হইল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা। রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিধি ও সংস্থার মাধ্যমে।

---

৩১ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, আরিষ্টটল্ ও তাঁহাদের অনুগামিগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্র হইল স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্তা (self-sufficing entity) এবং উহা সমগ্র সমাজের সহিত সমব্যাপক। এইজন্য তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র কোনোপ্রকার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা বলেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জীব, সুতরাং সমাজ তথা রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যের সাহায্যে কার্য করিয়াই মানুষ আত্মোপলব্ধি করিতে পারে।

আধুনিক কালে যে সকল লেখকের রচনা রাষ্ট্রের প্রাধান্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন বার্ক (Burke), মেইন্ (Maine), রুশো (Rousseau), কাণ্ট (Kant)।

হেগেলের পরবর্তী যুগে কয়েকজন জার্মান দার্শনিক—যথা, নীৎসে (Nietzche), ট্রাইট্‌স্কে (Treitschke) ইত্যাদি—রাষ্ট্র সম্বন্ধে হেগেলের মতবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে বিস্তারিত করেন। নব্য হেগেলীয়গণের মধ্যে ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন্ (T. H. Green) ও বোসাঙ্কে (Bosanquet) হেগেলীয় মতকে সমর্থন করেন।

৩২ হেগেলের কয়েকটি উক্তি লক্ষণীয়: "It (the State) is the march of God in the world." "It is the divine idea as it exists on earth." "It is its own end". "It is the ultimate end which has the highest right against the individual whose highest duty is to be a member of the state." "It carries back the individual, whose tendency it is to become a centre of his own, into the life of the universal substance."

(গ) রাষ্ট্রীয় চেতনার সহিত সমব্যাপক হইল সামাজিক নৈতিকতা বা ঔচিত্যবোধ। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া এক বিরাট্ চিচ্ছক্তি বিরাজমান এবং এই চিচ্ছক্তি স্বরূপতঃ নৈতিকশক্তি। সুতরাং সমাজ তথা রাষ্ট্রের কার্যাবলী এই বিশ্বজনীন নৈতিকতাবোধের প্রকাশক এবং উহারা কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিমনের পরিচায়ক নহে।[৩৩]

(ঘ) রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব নাগরিকদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্ব এরূপভাবে অভিভূত করিয়া রাখে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ইচ্ছার পৃথক্ মূল্য নাই। রাষ্ট্র ও নাগরিক কেহই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, 'সমগ্র' 'অংশ'-সমূহ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না, আবার 'অংশ'-সমূহেরও 'সমগ্র' হইতে পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহার সামগ্রিক' চেতনার নিকট ব্যক্তিগত চেতনাকে নতি স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্রের এই সামগ্রিক চেতনাই ব্যক্তিগত চেতনার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

(ঙ) রাষ্ট্র হইল উচ্চতর নৈতিকতার অধিকারী। রাষ্ট্রের যে 'ইচ্ছা', তাহা হইল 'সমষ্টিগত বা সাধারণ ইচ্ছা' (collective or general will)। যেহেতু ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছার 'সাধারণ উপাদান' (common factors) লইয়া গঠিত, সেইহেতু ইহা নিরপেক্ষ, নির্দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারে এবং ব্যক্তিগত পৃথক্ ইচ্ছা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।[৩৪] রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা নিষ্ঠার তাৎপর্য এই

৩৩ হেগেলীয় দর্শনের সামাজিক নৈতিকতাবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করিয়া বার্কার (Barker) বলেন: "Social righteousness is a spirit and habit of life expressed in the social opinion and enforced by the social conscience of a free people. It is at one and the same time a mind or self-consciousness, because it is a spirit, and a thing or external existence, because it is a visible system of habit and conduct. By it our relations to one another are controlled" (*Political Thought in England from Herbert Spencer to the Present day*).

৩৪ হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক Joad বলেন: "Following the line of thought embodied in Rousseau's theory of the general will, Hegel argued that the whole which is the repository of the general will, just because it comprises and gathers up within itself all the *common* wills of its component parts, is more disinterested and, therefore, more moral than the individual's will which is composed of selfish as well as of disinterested elements." (*Guide to the Philosophy of Morals & Politics*, p. 592).

নহে যে, পরিবার, ধর্ম, বা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য থাকিবে না—রাষ্ট্র ব্যতীত অপর সকল সামাজিক সংস্থার প্রতি আনুগত্য হইল অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায়ের এবং ইহাদের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠার মাধ্যমে।

হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিণতি হইল যে, **ব্যক্তির উর্ধ্বে রাষ্ট্রের স্থান।** রাষ্ট্রমধ্যে রাষ্ট্র-কর্তৃক আরোপিত কর্তব্য সাধন দ্বারাই ব্যক্তি আত্মোপলব্ধি লাভ করে। রাষ্ট্রমধ্যে এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির যে সম্পর্ক এবং সমগ্র রাষ্ট্রের সহিত যে সম্পর্ক তাহা দ্বারাই প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত। রাষ্ট্র যাহা কিছু সাধন করে, তাহা নাগরিকদের ব্যক্তিগত-স্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে করে এবং **রাষ্ট্রের ইচ্ছা সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতীক।** সুতরাং ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য বা অবদমিত করিবার ইচ্ছা রাষ্ট্রের আছে। বাস্তবিক ব্যক্তির প্রকৃত নৈতিক ইচ্ছার সহিত রাষ্ট্রের ইচ্ছার কোন বিরোধ নাই, কারণ রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যেখানে ব্যক্তি স্বীয় কল্যাণকে বুঝিতে পারে না, সেখানেই রাষ্ট্রের কল্যাণের সহিত ব্যক্তিগত কল্যাণের বিরোধ দেখা দেয়।[৩৫] রাষ্ট্রের পক্ষে কোন দুর্নীতিমূলক কার্য করা সম্ভব নহে।[৩৬] যেহেতু রাষ্ট্র দেবসুলভ গুণের অধিকারী এবং যেহেতু রাষ্ট্র সর্বোচ্চ নৈতিকতার অধিকারী, সেইহেতু কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের নিকট মাথা নত করে না। হেগেলের মতে রাষ্ট্র এইরূপ সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রক্ষা পাইয়া থাকে, কারণ একমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রই অস্বাস্থ্যকর সামাজিক প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিতে পারে।[৩৭]

---

৩৫ যেহেতু রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ নাই সেই হেতু রাষ্ট্র যাহা কিছু করে, তাহা এক হিসাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছারই প্রকাশক। এই জন্য অধ্যাপক জোড্ উদাহরণ দিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে যখন কোন চোরকে বিচারক কারাদণ্ড দেন, তখন প্রকৃতপক্ষে বিচারক চোরের প্রকৃত ইচ্ছাকে প্রকাশ করিতেছেন! (Joad, *op cit.*, p. 597).

৩৬ হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া বোসাঙ্কে (Bosanquet) বলেন: "The state as such, certainly cannot be guilty of personal immorality and it is hard to see how it can commit theft or murder in the sense in which those are moral offences." (*Philosophical Theory of the State*, p. 300)

৩৭ তুলনীয়: "To Hegel, state sovereignty was a necessary instrument for preserving middle-class society. For the sovereign state would remove the competitive element from the individuals and make competition a positive interest of the universal ; it would be capable of dominating the conflicting interests of its members......Sovereignty of the state

হেগেল-উত্তর যুগে নীৎসে, ট্রাইট্‌সকে, বার্ণহার্ড রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই কারণে ইঁহারা রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্যতা ও নৈতিকতার কথা বিশেষভাবে বলেন। সেইজন্য ইঁহারা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক নীতির অধীনতা স্বীকার করেন না। অর্থাৎ ইঁহারা হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের উপর যে ব্যাখ্যা আরোপ করেন তাহার ফলে যুদ্ধকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়।

নব্য হেগেলীয়গণের মধ্যে ইংরাজ দার্শনিক গ্রীণ্ (Green) রাষ্ট্র ও নাগরিকগণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করেন, যদিও তিনি হেগেলের প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তিনি ইংরাজদের জাতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া, তিনি ইহাও বলেন যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দৈহিক বলের উপর স্থাপিত নহে—উহা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত।

হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে সাম্প্রতিককালে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন বোসাঙ্কে। তিনি বলেন যে, সমাজ তথা রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিবিশেষের কোন নিজস্ব সত্ত্ব থাকে না। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগত ইচ্ছা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেই ব্যক্তি সামাজিক নিঃসঙ্গতা তথা একাকিত্বের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাবাদ কর্তৃক সমর্থিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিশেষ মূল্য নাই। সুসংহত রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই মানুষ তাহার জীবনের পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। রাষ্ট্রের যাহা লক্ষ্য, তাহাই সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র বাঞ্ছিত লক্ষ্য।[৩৮]

thus presupposes international competition among antagonistic political units, the power of each of which resides essentially in its undisputed authority over its members' (H Marcuse *Reason and Revolution* pp 172–73)

৩৮ বোসাঙ্কে (Bernard Bosanquet) তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন: "The ultimate end of society and the state as of individual is the realisation of the best life .. ...And the best life which has most of the general character, the character which so far as realised, satisfies the fundamental logic of man's capacities . ..Individuals are limited and isolated in many ways, but their true individuality does not lie in their isolation, but in that distinctive act or service by which they pass into unique contributions to the universal" (*Philosophical Theory of the State*, pp 169-70)

সমালোচনা :

ভাববাদী—বিশেষতঃ হেগেলীয়—রাষ্ট্রতত্ত্বের যে অভিনবত্ব আছে এবং উহা যে সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির নিগূঢ় সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মতবাদের এবং ইহার প্রয়োগের যে সকল ত্রুটি আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তত্ত্ববিদ্যার দিক্ হইতে ইহা ত্রুটিপূর্ণ, বাস্তবের সহিত ইহা সম্পর্কবিহীন, এবং রাষ্ট্রকে অনেক দুর্নীতিমূলক কার্যে প্ররোচনা দিবার সম্ভাবনা ইহার মধ্যে আছে।[৩৯]

আমরা এই স্থলে হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করিতে পারি :

(ক) এই মতবাদে সমগ্র সমাজের সহিত রাষ্ট্রের ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে এবং ইহারই ভিত্তিতে দাবী করা হইয়া থাকে যে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান্ (omnipotent)। যেহেতু এখনও পর্যন্ত সমগ্র জগতে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং বিভিন্ন জাতি ও সমাজকে লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে, সেই হেতু এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সুতরাং কোন রাষ্ট্রের তথাকথিত সর্বশক্তিমত্তা প্রকৃতপক্ষে সীমিত এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় সর্বশক্তিমত্তা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

(খ) কোন রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে উহার যে সর্বশক্তিমত্তার কথা হেগেল বলিয়াছেন তাহা পুরাপুরি সমর্থন করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রকে যদি এইরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র নীতির ঊর্ধ্বে নহে, রাষ্ট্রকেও নীতির অনুশাসন স্বীকার করিতে হয়।[৪০]

৩৯ হেগেলীয় মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া C.E M. Joad বলিয়াছেন : "It is denounced as unsound in theory, untrue to fact, and liable to extend a dangerous sanction to the more unscrupulous actions of existing States in the sphere of foreign policy." (*Introduction to Modern Political Theory*, p 17).

৪০ রাষ্ট্রকে যদি নীতির ঊর্ধ্বে মনে করা যায় তাহা হইলে এমন ধারণা হইতে পারে যে, শাসিতদের জন্য যে নীতির প্রচলন আছে, শাসকবর্গের জন্য সেই নীতি চলিতে পারে না। দার্শনিক নীৎসে মনে করিতেন যে, নীতি দুই প্রকারের—প্রভুদের জন্য একরকম, সাধারণের জন্য আর একরকম। প্রথমোক্ত শ্রেণীর জন্য হইল Master morality (বা *Herren-moral*) এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর জন্য হইল Slave morality অথবা morality of the herd (বা *Herden- moral*)।

রাষ্ট্র যে কেবল উহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত নৈতিক সম্পর্ক রাখিতে বাধ্য তাহা নহে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এক রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের সহিত নৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অর্থ এই নহে যে, ইহা নৈতিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত।

(গ) হেগেল মনে করেন যে, রাষ্ট্র কোন উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক (means to an end) নহে—উহা নিজেই নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (end in itself)। কিন্তু ইহাও পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না। রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকদের হইতে পৃথক্ কোন সত্তা নাই। ব্যক্তি রাষ্ট্রের দাস নহে—বরং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

(ঘ) রুশোর ন্যায় হেগেলও ব্যক্তিগত ইচ্ছা হইতে পৃথক্ এক সমষ্টিগত ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে, রাষ্ট্রের যেন অতি-ব্যক্তিক সত্তা আছে। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৫৮-৬৩) লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমাজ বা রাষ্ট্র যদিও মানসিকগুণ বিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলেও ব্যক্তিমন হইতে পৃথক্ ইহার নিজস্ব কোন স্বাধীন অতিব্যক্তিক সত্তা নাই (পৃঃ ৩৮৪)। রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণের সহিত জনকল্যাণের বিরোধ না থাকিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে, রাষ্ট্র যখনই যাহা করে তাহা জনমনের তথাকথিত সমষ্টিগত ইচ্ছার পরিচায়ক।

(ঙ) বর্তমানের প্রগতিশীল রাষ্ট্রমাত্রই বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আপেক্ষিক স্বাধীনতা স্বীকার করে বা স্বীকার করা উচিত। শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ঐরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে উহারা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হইতে পারে না। (পৃঃ ২২৭-৩০, ৩৪৯-৫৪)। কিন্তু হেগেলীয় আদর্শ অনুধাবন করিলে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা অধিক।

(চ) হেগেল ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন না করিলেও তাঁহার মতবাদের এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যাহার ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সমর্থন লাভ করে। বলা বাহুল্য, কোন রাষ্ট্রই যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া বর্তমান যুগের অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির জন্য কোন রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই রাষ্ট্র কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে।[৪১]

---

৪১ তুলনীয় : "Those abstract ends of the state for which wars are fought are of less value than a single man's blood, or a single woman's tears." (Joad, *Guide to the Phil. of Morals & Politics*, . p 768).

(ছ) হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরুদ্ধে আর একটি প্রধান অভিযোগ হইল যে, ইহা ব্যক্তিমনের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট করে ; কারণ হেগেলীয় মতবাদ গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের কোন কার্য বা নীতি স্বাধীনভাবে বিচার করিবার কোন অধিকার ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে থাকে না। রাষ্ট্র ভাল-মন্দ যাহাই আদেশ করুক, তাহাই অন্ধভাবে পালন করা ব্যতীত ব্যক্তির পক্ষে গত্যন্তর থাকিবে না।

(জ) হেগেল বলেন যে, ধরাধামে রাষ্ট্রই ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ—জগদ্ব্যাপিনী চিৎ-শক্তির ইহাই বাস্তব রূপ। কিন্তু মানবীয় সংস্থামাত্রই সসীম ও ত্রুটিপূর্ণ, সুতরাং রাষ্ট্র যত উন্নতই হউক্ উহাকে ঈশ্বরের সমতুল্য বা নরলোকে ঈশ্বরের বাস্তব রূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কোন রাষ্ট্রই ত্রুটিবিহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা হইতে পারে না।

আমরা হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা করিলাম বলিয়া **আমরা ব্যক্তি-জীবনে তথা সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য অস্বীকার করি না।** রাষ্ট্রই যে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে, রাষ্ট্রই যে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং সেই অনুসারে ব্যক্তিগণকে কার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে, রাষ্ট্রই যে জনকল্যাণের আদর্শ অনুসারে সুষ্ঠুভাবে কায করিতে পারে, সাধারণ অবস্থায় যে ব্যক্তিগণের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখান উচিত, রাষ্ট্রীয় শাসনসংস্থা যে অনেকাংশে জনমনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি, এই সকল মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রমাত্রই যে নীতি-দুর্নীতির উর্ধ্বে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং উহার অতিব্যক্তিক সত্তা আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। **রাষ্ট্রকে চরম মূল্য দান না করিয়া আপেক্ষিক মূল্য দান করাই বাঞ্ছনীয়।**[৪২]

৪২ **অধ্যাপক হব্‌হাউস (L. T. Hobhouse)-এর মন্তব্য লক্ষণীয় :** "The state is a great organization. Its well-being is something of larger and more permanent import than that of any single citizen. Its scope is vast. Its service calls for the extreme of loyalty and self-sacrifice. All this is true. Yet when the state is set up as an entity superior and indifferent to component individuals, it becomes a false god, and its worship the abomination of desolation, as seen at Ypres or on the Somme." (*Metaphysical Theory of the State*, p. 136).

(চ) মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং নৈরাজ্যবাদ (The Marxist Theory of State and Anarchism) :

হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান্, শাশ্বত, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহাকে নরলোকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। সেই কারণে রাষ্ট্রের উপর অতি-ব্যক্তিক সত্তা আরোপ করা হয়। মার্ক্সীয় দর্শনে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যক্ত হইয়াছে। মার্ক্সবাদ জড়বাদ সমর্থন করে এবং ইহা অর্থ নৈতিক মুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

হেগেলীয় দার্শনিকরা মনে করেন যে, যেহেতু রাষ্ট্র ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এবং যেহেতু উহার অতি-ব্যক্তিক সত্তা আছে, সেইহেতু উহাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। **মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স্ ও তাঁহাদের সমর্থকেরা বলেন যে, রাষ্ট্র-মাত্রই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহাসিক প্রত্যয় দ্বারাই উহার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হয়—ঐতিহাসিক শক্তিসংঘাতেই রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।** সমাজমধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা সৃষ্টি হওয়ার ফলে উহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষ ঘটে এবং রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। আবার যখন এই শ্রেণী-সংঘর্ষ অবলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন রাষ্ট্রও অবলুপ্ত হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ঐতিহাসিক কারণে বা শক্তিসংঘাতে রাষ্ট্র জন্মলাভ করে এবং ঐতিহাসিক কারণেই উহার মৃত্যু ঘটিবে। আবার, যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব থাকিবে, ততদিনই উহা কেবলমাত্র সামাজিক তথা অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানভাবেই থাকিবে, এবং উহার আত্মিক সত্তা বলিয়া কোন কিছু নাই।[৪৩]

মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র হইল মূলতঃ ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। এইজন্য রাষ্ট্রশক্তিকে বিদ্রোহের মাধ্যমে করায়ত্ত করিতে হইবে কিন্তু

---

৪৩ তুলনীয় : "The state, then, is by no means a power forced on society from outside ; neither is it the realization of the ethical idea, the image and the realization of Reason as Hegel maintians. It is simply a product of society at a certain stage of evolution. It is the confession that this society has become hopelessly divided against itself, has entangled itself in irreconcilable contradictions which it is powerless to banish. In order that these contradictions...may not annihilate themselves and society in a useless struggle, a power becomes necessary that stands apparently above society.......And this power, the outgrowth of society, but assuming supremacy over it and becoming more and more divorced from it, is the State." (Engels, *Origin of th Family*, pp. 215-6).

বিদ্রোহের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তি করায়ত্ত করার ফলে শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণী কর্তৃক যে রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, তাহাও কোন পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠান নহে, উহা 'অসমাপ্ত বা অর্ধসম্পূর্ণ রাষ্ট্র' (quasi-state) ; সুতরাং ইহাও অস্থায়ী বা সাময়িক প্রতিষ্ঠানমাত্র। **কালের গতিতে এই অস্থায়ী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে** এবং অত্যাচার ও উৎপীড়নের যন্ত্র হিসাবে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহার পরিবর্তে দেখা দিবে স্বাধীন সামাজিক সংগঠন (free organization of society)। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মার্ক্সবাদীরা শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদ (anarchism) সমর্থন করেন। এই নৈরাজ্যবাদ বলিতে কোন প্রকার অরাজকতা বুঝায় না ; মার্কস্‌বাদীরা যে নৈরাজ্য বা রাষ্ট্রবিহীন অবস্থা কল্পনা করেন, তাহা অসার স্বপ্নবিলাস বা কল্পনা (utopia) নহে—ইহা হইল প্রকৃত শ্রেণীসংঘাতবিহীন শান্তিপূর্ণ অবস্থা।[৪৪] বর্তমানে সামাজিক বিবর্তন যে পথে চলিয়াছে এবং বর্তমানের জনমন যেভাবে প্রাচীন অবিসম্বাদী কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, একদিন আসিবে যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবে এবং ইহার সহিত অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষকে পুঁজিবাদাদের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে না, ঈশ্বর ইত্যাদি কাল্পনিক সত্তায় বিশ্বাস করিতে হইবে না এবং সর্বোপরি কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সহ্য করিতে হইবে না।

নৈরাজ্যবাদী ক্রোপোট্‌কিন্‌ প্রমুখ চিন্তানায়ক বলেন যে, শিক্ষার জন্য, জ্ঞানবিকাশের জন্য বা অন্য কোন প্রকার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন নাই, কারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতই এইরূপ উন্নতিলাভ সুষ্ঠুভাবে ঘটিতে পারে। দেশের নিরাপত্তার জন্যও রাষ্ট্রের প্রয়োজন নাই—কারণ রাষ্ট্র সত্ত্বেও নিরাপত্তাবাহিনীর বহুস্থলে পরাজয় ঘটিয়া থাকে। অপরপক্ষে, রাষ্ট্র থাকার ফলে একদল লোকের হস্তে অযথা অতিরিক্ত

৪৪ নৈরাষ্ট্রবাদ বা নৈরাজ্যবাদ (anarchism)-এর অন্যতম ব্যাখ্যাতা ক্রোপোট্‌কিন (Kropotkin) বলেন: "(Anarchism is) a principle or theory of life and conduct under which society is conceived without government...harmony in such a society being obtained not by submission to law or by obedience to any authority, but by free agreements concluded between the various groups territorial and professional, freely constituted for the sake of production and consumption as also for the satisfaction of the infinite variety of needs and aspirations and of a civilised being." (Quoted by C.E.M. Joad, *Introduction to Modern Political Theory*, pp. 100-101).

ক্ষমতা সঞ্চিত হয় এবং উহা তাহাদের স্বার্থান্বেষী, অত্যাচারী, জনপীড়ক করিয়া তোলে—রাজনৈতিক শক্তির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, ইহা যেখানেই কেন্দ্রীভূত হইবে, সেখানেই ইহার অপব্যবহার ঘটিবে। বাস্তবিক কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শাসনসংস্থা বা সরকার কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাহাতে অসাম্যের সৃষ্টি হয়, তাহাই করিয়া থাকে। তথাকথিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা (representative government) দ্বারাও এই অব্যবস্থা দূর করা যায় না, কারণ এইরূপ প্রতিনিধিত্ব জনমনের কোন সাধারণ ইচ্ছা (common will)-কে রূপদান করিতে পারে না। কোন মানুষই অপর একজনের যথাযথ প্রতিভূ হইতে পারে না, সুতরাং বিরাট্ এক একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব অসম্ভব। তাহা ছাড়া প্রতি বিতর্কমূলক সমস্যার ক্ষেত্রেই জনগণের ইচ্ছার সঠিক রূপ নির্ণয় করিবার কোন সুষ্ঠু উপায়ও আবিষ্কৃত হয় নাই।

যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে তখন এমনই এক সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তন হইবে যাহার ফলে সুষ্ঠু সামাজিক সাম্যের সৃষ্টি হইবে। তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক সাম্য তথা নীতি সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করিবার ফলে রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় সংস্থায় রূপান্তরিত করিবে।[৪৫]

সমালোচনা :

মার্ক্সীয় সাম্যবাদ দাবী করে যে, ইহা নিপীড়িত জগৎকে আশার বাণী শুনাইয়াছে এবং মানুষে মানুষে যে বৈষম্য তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে।[৪৬] মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যে অভিনবত্ব আছে এবং ইহা যে সর্বজনীন কল্যাণের কথা চিন্তা করে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মার্ক্সপন্থীরা উচ্চ আদর্শের কথা বলিলেও ঐ উদ্দেশ্যসাধনের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন বা যে দার্শনিক যুক্তির উপর তাঁহাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৪৫ মার্ক্সবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া Joad বলেন : "In suppressing the *bourgeoisie*, the state is encompassing its own downfall ; for, in suppressing the *bourgeoisie*, it renders itself *superfluous*." (*Guide to the Philosophy of Morals & Politics*, p. 693)

৪৬ মার্ক্স-পূর্ব যে সকল চিন্তানায়ক সামাজিক অসাম্য দূর করিয়া সাম্যবাদের কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইলেন টমাস্ মুর (Thomas More) (১৪৭৮-১৫৩৫), ফুরিয়ার (Fourier) (১৭৭২-১৮৩৭), সাঁ-সিমোঁ (Saint-Simon) (১৭৬০-১৮২৫) এবং রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) (১৭৭১-১৮৫৮)।

দার্শনিক, নৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে :

(ক) মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ অনুসারে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা বাদ (**thesis**), প্রতিবাদ (**antithesis**) এবং সমন্বয় (**synthesis**)-এর গতিপথে অগ্রসর হয় ; আবার ঐ সমন্বয় নূতন করিয়া, বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে এবং সেই কারণ নূতন করিয়া বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় এবং উহাদের পুনঃসমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। সামাজিক বিবর্তনের এইরূপ গতির শেষ নাই এবং ইহা অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে : যখন সামাজিক বিবর্তনের ফলে সাম্যবাদ (**communism**)-এর সৃষ্টি হইবে, তখন কি বিবর্তনের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে ? মার্ক্সবাদীদের মতে ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে একদিন-না-একদিন সাম্যবাদ স্থাপিত হইবে ; যদি তাহাই হয়, উহার পর তথাকথিত ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ কি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে ? শ্রেণীবিহীন সমাজ স্থাপিত হইবার পর নিশ্চয়ই শ্রেণী-সংঘাত চলিতে পারে না। সুতরাং তাহার পর সামাজিক বিবর্তনের রূপ কী হইবে তাহা নির্দেশ করা কঠিন।

(খ) মার্ক্সবাদ সমগ্র সামাজিক বিবর্তনকে অর্থনৈতিক প্রত্যয় দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছে। সামাজিক বিবর্তন এত জটিল এবং এমন বহুমুখী যে, ইহা কোন একটি বিশেষ প্রত্যয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় অনেক তুচ্ছ ঘটনার আবর্তে, অথবা অর্থনৈতিক নহে এমন কারণের ফলে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আবার অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান থাকিলেও উহা ঠিক অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ না হইতে পারে।[৪৭]

(গ) মার্ক্সবাদ অনুসারে জাগতিক সকল ঘটনাই ঐতিহাসিক শক্তির অমোঘ নীতি অনুসারে চলিতে থাকে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না। তাহা যদি না থাকে, তাহা

---

৪৭ কত তুচ্ছ ঘটনার আবর্তে বিদ্রোহ ঘটিতে বা না ঘটিতে পারে তাহার উদাহরণ দিয়া রাসেল (Russell) বলিয়াছেন : "Admitting that the great forces are generated by economic causes, it often depends upon quite trivial and fortuitous events which of the great forces gets the victory. In reading Trotsky's account of the Russian Revolution, it is difficult to believe that Lenin made no difference, but it was touch and go whether the German Government allowed him to get to Russia. If the minister concerned had happened to be suffering from dyspepsia on a certain morning, he might have said, 'No' when in fact he said 'Yes', and I do not think it can be maintained that without Lenin the Russian Revolution would have achieved what it did."(Quoted by Joad, *op. cit*, pp. 715-6).

হইলে ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে, তখন তাহাদের নিন্দা করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই—কারণ তাহারা যাহা করে তাহা ঐতিহাসিক শক্তির চাপে পড়িয়াই করে।

(ঘ) নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, ইহা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবকে সমর্থন করে। ইহার মতে উদ্দেশ্য ভাল বা সৎ হইলেই উহা যথেষ্ট এবং উহা সাধনের জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করা চলে। কিন্তু নৈতিক আদর্শের দৃষ্টি হইতে সৎ উদ্দেশ্যের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন সমর্থন করা যায় না।[৪৮] তাহা ছাড়া, বিপ্লবের মাধ্যমে যে শাসনসংস্থা স্থাপিত হয়, তাহা নাগরিকের প্রতিটি কার্যই সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামান্য সমালোচনাও সমর্থন করে না। ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা (অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার) ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(ঙ) মার্ক্সীয় সাম্যবাদীরা দাবী করেন যে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, সাম্যবাদীদের সমাজও একেবারে শ্রেণীবিহীন নহে। এইরূপ রাষ্ট্র সাধারণতঃ একনায়কত্ববিশিষ্ট হয়—সর্বাধিনায়ক এবং তাঁহার অনুচরদের লইয়া একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী হয় এবং জনসাধারণ যেন আর একটি অসহায় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া, ক্ষমতা মাত্রই তমোগুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে ; সুতরাং একনায়কত্ববিশিষ্ট সাম্যবাদী রাষ্ট্রের অধিনায়কগণও ক্ষমতার দম্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

(চ) একদল সাম্যবাদী চিন্তানায়ক নৈরাজ্যবাদ বা নৈরাষ্ট্রবাদ সমর্থন করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্র একটি অপ্রয়োজনীয় সংস্থা ; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। মার্ক্সপ্রমুখ লেখকগণ মনে করেন কালক্রমে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ('withering away') ঘটিবে ; কিন্তু বর্তমান কালে মার্ক্সপন্থী রাষ্ট্রনায়কগণ এমন কিছু করেন না যাহার জন্য বলা যায় যে, তাঁহারা স্ব স্ব রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে চান।

মন্তব্য ঃ

আমরা উপরে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান প্রধান মতবাদের আলোচনা করিলাম। বলা বাহুল্য, কোন মতবাদই রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ

৪৮ তুলনীয় : "The end does not justify the means."

ব্যাখ্যা দান করিতে পারে না—ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে (পৃঃ ৩৮২-৮৩)। এই মতবাদগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কোনটি বিশেষ পূর্ব প্রকল্পিত ধারণা লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, কোনটি বা রাষ্ট্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর অথবা কোন একটি বিশেষ উপমার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং সেইজন্য ইহারা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণ এই সকল মতবাদের অতিশয়োক্তি পরিহার করিয়া সমন্বয় বাঞ্ছনীয়। আইনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়; কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে পুরাপুরি সচেতন ব্যক্তি বলা যুক্তিযুক্ত নহে; রাষ্ট্রের সহিত পরিবর্ধনশীল জীবদেহের কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের উপর সেই কারণে সজীব সত্তা আরোপ করা যায় না। ভাববাদে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে সমর্থন করিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য, কিন্তু রাষ্ট্রকে যদি অতিব্যক্তিক অতিনৈতিক সত্তা দান করা হয়, তাহা হইলে উহার অবাঞ্ছনীয় পরিণতি ঘটিতে পারে। আবার মার্ক্সবাদে জনকল্যাণ তথা ব্যক্তিসাম্যের যে আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য হইলেও, উহা বিদ্রোহের যে পন্থা অবলম্বন করে বা যেভাবে ইতিহাসের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। নৈরাজ্যবাদীদের সমালোচনায় রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ত্রুটির যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আমাদের বিবেচনা করা উচিত, কিন্তু সেইজন্য রাষ্ট্রকে পরিহার করার আদর্শ সমর্থন করা যায় না।

৬। রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব (Personality of the State):

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৩৮৩-৮৪ ও ৩৮৭-৯০) রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় বিবিধ মতবাদ আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, একদল লেখক রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন এবং অপর একদল লেখক রাষ্ট্রের উপর অতিব্যক্তিক সত্তা আরোপ করেন। যাঁহারা যান্ত্রিকতাবাদ অথবা মার্ক্সবাদ সমর্থন করেন, তাঁহারা রাষ্ট্রের পৃথক্ ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

ব্যবহারশাস্ত্রীয় (juistic) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব (পৃঃ ৩৮৪)। রাষ্ট্রের উপর যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়, তাহা নিতান্ত আইনগত সুবিধার জন্য

রাষ্ট্র যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহারা অবশ্য প্রত্যেকেই সচেতন ব্যক্তি ; কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে তাহা বলা যায় না।[৪৯] সুতরাং রাষ্ট্রের উপর যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়, তাহার তাৎপর্য হইল যে, রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম সমবায় প্রতিষ্ঠান (sovereign corporation)। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রাষ্ট্রের উপর যদি কৃত্রিম বা অসার ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্র নিজেই একটি অসার প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য, এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ এইরূপ ব্যক্তিত্ব আরোপের অর্থ হইল যে, যদিও সাধারণ সজীব ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব নাই, তাহা হইলেও আইনগত কার্যের সুবিধার জন্য মনে করিতে হইবে যে, যেন উহা একটি ব্যক্তি—অন্য ব্যক্তি যেরূপ কতকগুলি অধিকারের অধিকারী এবং কর্তব্যের সাধক, রাষ্ট্রও সেইরূপ। সেই কারণে আইনে অন্য ব্যক্তির সহিত যেরূপ আচরণ করা যায়, রাষ্ট্রের সহিতও সেইরূপ (বা প্রয়োজন হইলে বিশেষ প্রকারের) আচরণ করিতে হইবে।[৫০]

ভাববাদী লেখকগণের মধ্যে একদল মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব ঠিক সাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ন্যায় নহে—উহা হইল অতি-ব্যক্তিক (super-personal) সত্তাবিশিষ্ট। এই মতও সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই মতবাদ রাষ্ট্রকে সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে, সকল নীতির ঊর্ধ্বে, যে মর্যাদা দান করিয়াছে তাহা ত্রুটিপূর্ণ (পৃঃ ৩৯০)

---

৪৯ তুলনীয় : (১) "The theory of state personality...is a pure mental concept devoid of all positive reality." (Duguit).

(২) "It is *particular persons* who act on behalf of the state ; and the state, as such, cannot properly be regarded as a person." (Mackenzie, *op. cit.*, 146).

(৩) "......just as a house contains nothing over and above the materials which make it up, grouped in a certain way, so the state contains nothing over and above human individuals grouped in a certain way.......It is not therefore a person having a sort of mind of its *own*". (A. C. Ewing, *The Individual, the State & the World Government*, p. 178).

৫০ অধ্যাপক গার্ণার (Garner)-এর সুযুক্তি লক্ষণীয় : "When they speak of the state as being a 'person' in constitutional law or international law, they mean nothing more than that it is a sovereign corporation.......This does not imply...that the state thus personified is a fiction. On the contrary the state is a reality, the fiction being merely in the mind of the jurist or the provision of the law." (*op. cit.*, p. 209).

তাহা ছাড়া, এই মতবাদের সমর্থকেরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র যে কার্য সাধন করে তাহা সমষ্টিগত জাতীয় ইচ্ছা (collective will)-এর প্রকাশক। বাস্তবিকপক্ষে, সকল ইচ্ছার সাধারণ উপাদান গ্রহণ করিয়া কোন সমষ্টিগত ইচ্ছা গঠিত হয় না এবং যদিও বা উহা সম্ভব হইত, উহা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক সমাবেশ বলা যুক্তিযুক্ত নহে এবং যেহেতু উহা ব্যক্তি লইয়া গঠিত, ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণের জন্য নিয়োজিত এবং ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত, সেই হেতু উহার একটি **মানসিক রূপ** (mental aspect) আছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ ব্যক্তি হইতে পৃথক্ বা ব্যক্তির ঊর্ধ্বে উহার কোন নিজস্ব অতি-ব্যক্তিক সত্তা নাই। আমরা সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে মন্তব্য করিয়াছি যে, সমাজের একটি মানসরূপ থাকিলেও উহার কোন পৃথক্ অতিব্যক্তিক মন নাই (পৃঃ ৬০-৬৩) ; রাষ্ট্র সম্বন্ধে সেই একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, রাষ্ট্রকে অতি-ব্যক্তিক সত্তাসম্পন্ন মনে না করিয়া উহাকে **উদ্দেশ্য-সাধনাভিমুখী সামাজিক সংহতি** (teleological social organization) বলিয়া বর্ণনা করাই শ্রেয়ঃ।

৭। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকের অধিকার (Sovereignty of the State & the Rights of Citizens) :

(ক) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঃ

নাগরিক লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত এবং নাগরিকের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময়ই নাগরিকের অনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক আচরণে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে এমন ভাবে কার্য করিতে হয় যাহাতে রাষ্ট্রের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হয়, অথচ নাগরিকের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এবং তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক বিচার করিতে হইলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা (liberty of the individual) ও ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার (natural rights)-এর সম্পর্ক ও উহার তাৎপর্য বিচার করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব যদি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের বিরোধের সম্ভাবনা কমিয়া আসে, ; অপর পক্ষে, যদি এক বিশেষ শাসকগোষ্ঠীই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব

পরিচালনা করিতে থাকে, তাহা হইলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রাষ্ট্রই উহার সার্বভৌমত্বের অধিকারী, কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি সার্বভৌমত্ব পরিচালনা করে এবং এই জন্যই সমস্যার উদ্ভব হয়। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বলিতে সেই রাষ্ট্রের স্থায়ী, সুনির্দিষ্ট, সর্বব্যাপক, এক, অবিভাজ্য, স্বাধীন, অবিসম্বাদী শক্তি বুঝায়।[৫১] সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন হইল: রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সাধারণতঃ কাহার উপর ন্যস্ত থাকে এবং থাকা উচিত ?[৫২]

দার্শনিক **লক্** (John Locke) মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠের সকল কার্য সকল সময় যুক্তিপূর্ণ বা সমর্থনীয় না হইতে পারে; কিন্তু সুসংহত রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ-কর্তৃক সাধিত কার্য হইলেই উহা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরই সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত।

রুশো মনে করেন যে, সার্বভৌমত্ব জনসাধারণের উপর ন্যস্ত আছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইবে তাহা নহে—রাষ্ট্রের সকলেই উহার অধিকারী। রাষ্ট্রের শাসনসংস্থা (executive)-এর উপর বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য বিশেষ কোন ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের কোন একটি বিশেষ অংশে বা বিশেষ গোষ্ঠীর উপর সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকিবে ইহা সমর্থন করা যায় না।[৫৩]

লকের মতকে সমর্থন করিয়া **বেন্থাম্** (Jeremy Bentham) বলেন যে,

---

৫১ অধ্যাপক গার্ণার (Garner) সার্বভৌমত্ব (sovereignty)-এর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলেন: "The distinctive attributes or characteristics of sovereignty are permanence, exclusiveness, all-comprehensiveness, unity, inalienability, imprescriptibility, indivisibility, and absoluteness or illimitability." (*op. cit.*, p. 170)। [ফরাসী চিন্তানায়ক বোদিন (Bodin) (১৫৩০-১৫৯৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'সার্বভৌমত্ব'-প্রত্যয়টি প্রচলিত করেন।]

৫২ ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)-এর মতে রাষ্ট্রের শাসক (Prince)-এর হস্তে উহার সার্বভৌমত্ব সাধারণতঃ ন্যস্ত থাকে; কিন্তু হব্‌স্ মনে করেন যে, যদিও শাসকের হস্তেই উহা ন্যস্ত থাকা উচিত, তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শাসকের হস্তেই সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে না।

৫৩ রুশো যখন কোন রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমাজকেই ঐ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলেন, তখন তিনি ১০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক অধ্যুষিত নগররাষ্ট্রের কথাই চিন্তা করিয়াছিলেন। এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষে সমগ্র জনসমাজকে সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা যায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত।[৫৪] বেন্থামের মতে বিশ্বজনীন সুখ—অন্ততঃ পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ—বাঞ্ছনীয় ; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন কোন কার্য করে বা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করে, তাহা নিশ্চয়ই সর্বজনীন সুখের অনুকূল হইবে, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা নির্ণয় করিবার জন্য প্রতিনিধিমূলক সরকার (representative government) স্থাপন করা উচিত। বেন্থাম্ মনোবিদ্যা-সম্মত সুখবাদ (Psychological Hedonism)-এর সমর্থক এবং তাঁহার মতে আমরা যখনই কোন কার্য করি, তখনই ব্যক্তিগত সুখের বাসনার দ্বারা প্রেষিত হই। সুতরাং এইটুকু আশা করা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন কোন কার্য করিবে না যাহা সর্বজনীন সুখ তথা জনস্বার্থের বিরোধী হইবে।

বেন্থাম্ লকের মত গ্রহণ করিলেও তিনি লকের ন্যায় রাষ্ট্রের শাসননির্বাহক সংস্থা (executive) ও আইন-প্রণয়নসংস্থা (legislature) পৃথক্ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না ; বরং শাসননির্বাহক সংস্থাকে আইনপ্রণয়ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা বাঞ্ছনীয় বলিতেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত সুখ বা কল্যাণের জন্য নূতন নূতন আইনপ্রণয়ন প্রয়োজন এবং এই কারণ রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আইন-প্রণয়ন সংস্থাকে উচ্চতর মান দান করিতে হইবে।

যদিও বেন্থাম্ সংখ্যাগরিষ্ঠকেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা হইলেও মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন : রাষ্ট্রমধ্যে কে বা কাহারা জনমত (public opinion)-এর সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে ? যদিও জনমত মাত্রই সুখের ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহা হইলেও সাম্প্রদায়িক জীবনে জনসাধারণকে উন্নততর নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এবং ঐ বিষয়ে জনমত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন কয়েকজন হিতৈষী অথচ কঠোরমনা জননায়ক (benevolent dictators)।

বেন্থামের মতবাদকে পরিমার্জিত করেন **জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্**। বেন্থাম্ সর্বজনীন সুখকে নৈতিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন ; কিন্তু তিনি সুখের মধ্যে কোন পরিমাণ-গত পার্থক্য করেন নাই। জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ যে হিতবাদ বা উপযোগবাদ (utilitarianism) প্রচার করেন, তাহাতে সুখের গুণগত পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধিক-ঔৎকর্ষ্য-জাত সুখ (intellectual

---

৫৪ Bentham-রচিত *Fragment on Government* দ্রষ্টব্য।

pleasure)-কেই 'উচ্চতর সুখ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিল্ বেন্থামের রাজনৈতিক মতবাদকেও অনুরূপভাবে পরিমার্জিত করেন।[৫৫] বেন্থামের মতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারক হওয়া উচিত জনসাধারণ; অপরপক্ষে, মিল্ মনে করেন যে, সকল নাগরিকের পরিবর্তে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের হস্তে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত। মিল্ এই প্রসঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি **স্বাধীন মতবাদ পরিপোষণের অধিকার সমর্থন করেন**। প্রগতিশীল মানবের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন।

মিল্ দাবী করেন যে, সকল প্রকার মতবাদ প্রকাশ্যে সমালোচনা করিবার এবং তাহার নিজস্ব অভিমত অনুযায়ী উহাদের একটিকে গ্রহণ করিবার অধিকার প্রতি ব্যক্তিরই আছে। এই অধিকার ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সাধিত হয় না এবং তাহা না হইলে সমাজ তথা রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ যে মত পোষণ করে সেই মত সংখ্যাধিক্যের চাপে পড়িয়াই যে রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। **সংখ্যালঘিষ্ঠের মতবাদও সমানভাবে বিবেচনার যোগ্য**।[৫৬]

মিল্ যে কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সাধারণ মতবাদ পোষণের স্বাধীনতাই দাবী করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীন চিন্তা এবং ঐরূপ চিন্তা-প্রসূত কার্যের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীন চিন্তার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা উচিত নহে। তাহা ছাড়া, সমাজ ও রাষ্ট্রমধ্যে বিভিন্ন লোক যদি স্ব স্ব মত-পোষণের স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে মতবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইবে এবং এই প্রকার মতবৈচিত্র্যের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বৌদ্ধিক প্রগতি ঘটিতে পারে। সাধারণ লোকের চিন্তাশক্তির উপর মিল্ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি আশঙ্কা করেন যে, সাধারণ লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রথা, আদর্শ ও অন্যের মত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫৫ J. S. Mill, *Essay on Liberty* দ্রষ্টব্য।

৫৬ মিলের একটি বিখ্যাত উক্তি হইল: "If all mankind, minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind."

সংখ্যাগরিষ্ঠের হস্তে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত নহে; কারণ অধিকাংশ লোকেরই স্বাধীনভাবে চিন্তার ক্ষমতা নাই এবং তাহারা চেষ্টা করে অন্যেও যাহাতে চিন্তার ঔৎকর্ষ্য লাভ না করিতে পারে। ইহার ফলে কেবল মাত্র মধ্যম প্রকারের বুদ্ধি (mediocre intellect)-এর বিকাশ ঘটে। মিলের আর একটি আশঙ্কা হইল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চস্তরের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা রাখে না বলিয়া কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার জন্য উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের হস্তে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের হস্তে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত নহে।[৫৭] রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নাগরিকদের প্রকৃত বক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। কিন্তু সকলের বুদ্ধিশক্তি ও ব্যক্তিত্ব সমতুল্য নহে—সকল মানুষ এক নহে। বৈচিত্র্যই হইল প্রকৃতির ধর্ম। সকল মানুষ উচ্চতর বুদ্ধি-শক্তির অধিকারী হইতে পারে না—উচ্চপর্যায়ের বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সংখ্যায় অল্প। **সংখ্যাল্প হইলেও বুদ্ধির ঔৎকর্ষ্যের জন্য বুদ্ধিজীবীদের হস্তেই সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত।**

গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক হিসাবে মিল্ বলেন যে, জনসাধারণ-ই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত ধারক ও বাহক; কিন্তু প্রকৃত জনকল্যাণ ও নীতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি মনে করেন যে, উচ্চতর সুখের চিন্তা করিতে সক্ষম এইরূপ উন্নতবুদ্ধির অধিকারীদের হস্তেই ইহা ন্যস্ত থাকা উচিত। ইহাতে উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী জনসাধারণের কোন ক্ষতি হইবে না; অথচ রাষ্ট্রেরও প্রগতি সাধিত হইবে।

ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে **অস্টিন্** (John Austin) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, **সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র বা উৎস হইল রাষ্ট্রের নীতি বা আইন**। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়, রাষ্ট্রের কোন্ অংশের উপর সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে অস্টিন্ বলেন যে, রাষ্ট্রের যে সংস্থা কাহারও নিকট নতি স্বীকার করে না এবং যাহা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করে, তাহাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্রের বিধানপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইহা অন্য কোন কিছুর আজ্ঞা পালন করে না, কিন্তু অন্য সকলে ইহার আজ্ঞা পালন

৫৭ মিলের মত প্লেটোর মতের সহিত তুলনীয়। মিলের ন্যায় প্লেটোও বুদ্ধিজীবীদের আভিজাত্য (intellectual aristocracy)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

করে।[৫৮] তবে যদি প্রশ্ন করা যায়, "সংবিধান-পরিষদকে কে বা কাহারা এই ক্ষমতা অর্পণ করিল ?", তাহা হইলে উত্তরে বলিতে হয় "জনসাধারণ এই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।"

ঐতিহাসিক দিক্ হইতে অস্টিনের মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কোন লেখক এই আপত্তি করেন যে, অনেক দেশেরই রাষ্ট্রীয় বিধানের উৎপত্তি সামাজিক প্রথা হইতে ঘটিয়াছে। সুতরাং সংবিধান-পরিষদের 'আদেশ'-এর ফলেই যে বিশেষ বিশেষ বিধি সার্বভৌম আদেশ রূপে গণ্য হইতে লাগিল—ইহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে কেবলমাত্র আইনের দৃষ্টি হইতে ব্যাখ্যা করা পর্যাপ্ত নহে।

(খ) নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার :

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে উহার অধিষ্ঠান নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠে। আমরা পূর্বেই দেখিলাম যে, সকল নাগরিক অথবা নাগরিকের একাংশের উপর সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে বলিয়া অনেক লেখক অভিমত প্রকাশ করেন। সুতরাং এই প্রসঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন উঠে : নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকারের তাৎপর্য কী ?

নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights) সম্বন্ধে মতবাদ দুই প্রকারের। একদল লেখক সামাজিক চুক্তি সম্বন্ধীয় মতবাদের ভিত্তিতে স্বাভাবিক অধিকার আলোচনা করেন এবং আর একদল লেখক সমাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন ; অর্থাৎ প্রথমোক্ত মতবাদ উৎপত্তির উপর এবং দ্বিতীয়োক্ত মতবাদ চরম লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সামাজিক-চুক্তি-মতবাদের সহিত নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকারসম্বন্ধীয় যে সকল মতবাদ যুক্ত আছে, সেগুলি সবই আদিম প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ কিরূপ অধিকার ভোগ করিত সে সম্বন্ধে প্রকল্প গঠন করিয়াছে। (পৃঃ ৪৩-৪৭)। অবশ্য আদিম প্রাকৃতিক অবস্থার স্বরূপ কী ছিল সে সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। হবসের মতানুসারে এই আদিম অবস্থা ছিল হিংস্রশ্বাপদসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের ন্যায়—সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মানুষের আদিম প্রাকৃতিক অধিকার

---

৫৮ Austin-এর মতবাদের জন্য তাঁহার *Province of Jurispurdene* দ্রষ্টব্য।

Austin-এর মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া গার্ণার বলেন : "The test of sovereignty, according to Austin, is habitual obedience to a superior who owes no obedience to a like superior." (Garner, *op. cit.*, p. 179).

বলিতে বুঝাইত একজনের উপর আর একজনের ইচ্ছা বলপূর্বক: আরোপ করা; মানুষের এই অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া রাষ্ট্র সংগঠন করিতে চুক্তিবদ্ধ হইল। সুতরাং সমাজে প্রবেশ করিয়া রাষ্ট্রবদ্ধ জীবভাবে বসবাস করিতে সম্মত হওয়ার জন্য তাহার স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল।

জন্ লক্‌ও সামাজিক চুক্তির সমর্থক। কিন্তু তাঁহার মতে সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ফলে মানুষের কোন স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই—মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইল, জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের অধিকার।

রুশোও কল্পনা করিতেন যে, মানুষের আদিম অবস্থা ছিল স্বর্গরাজ্যতুল্য; কিন্তু মানুষ সমাজ তথা রাষ্ট্রসংগঠন করিয়া সমষ্টিগত ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। সুতরাং সমষ্টিগত ইচ্ছাই মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের ধারক।

সামাজিক চুক্তিতে বিশ্বাস না করিলেও টম্ পেন্ (Tom Paine) মানুষের স্বাভাবিক অধিকারে বিশ্বাসী—তিনি মনে করিতেন যে প্রতিটি 'নাগরিক অধিকার'-এর মূলে আছে কোন-না-কোন প্রকারের স্বাভাবিক অধিকার।

মোট কথা, স্বাভাবিক অধিকারের সমর্থকেরা মনে করেন যে, সমাজ তথা রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সৃষ্টি করে না এবং রাষ্ট্রসংগঠনের উদ্দেশ্য হইল এই সকল অধিকার সংরক্ষণ। সুতরাং যে রাষ্ট্র এই কর্তব্য পালন করিতে পারে না, তাহার বিরুদ্ধে নাগরিকের বিদ্রোহের অধিকার আছে।

দার্শনিক গ্রীণ্ উদ্দেশ্যসাধনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (teleological standpoint) হইতে স্বাভাবিক অধিকারের আলোচনা করিয়াছেন। মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকার বলিতে অতীত আদিম অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন বুঝায় না—স্বাভাবিক অধিকার বলিতে তাহার স্বরূপের বিকাশ সাধনের অধিকার বুঝায়। অবশ্য মানুষ তাহার এই অধিকার সমাজবহির্ভূত জীব ভাবে তৃপ্ত করিতে পারে না—অন্যের সমভিব্যাহারে এবং অন্যের সাহচর্যে সামাজিক জীব হিসাবে সে তাহার আত্মবিকাশ করিতে পারে। **মানুষের স্বরূপের বিকাশ সাধনের অধিকারই হইল তাহার প্রকৃত অধিকার।**

মন্তব্য ঃ

আমরা উপরে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং নাগরিকের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ করিলাম।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বাস্তব ঘটনা হিসাবে কোন বিশেষ রাষ্ট্রে কাহার বা কাহাদের উপর সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে ন্যস্ত আছে, তাহা সেই রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া নির্ণয় করা যায়। কিন্তু আদর্শের দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের জনগণের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। তবে জনগণকেও ইহার উপযুক্ত হইতে হইবে—রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য অবধারণ করিতে হইবে এবং উহা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বর্তমানকালের রাষ্ট্রের আকার অল্পবিস্তর বৃহৎ এবং উহার কার্যাবলী জটিল থাকে বলিয়া রাষ্ট্রের জনসাধারণের পক্ষে রাষ্ট্রপরিচালনার সকল কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব নহে।[৫৯] রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত ও প্রযুক্ত হয়, সেইজন্য জনসাধারণকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রকে যদি কেবলমাত্র ক্ষাত্রশক্তি বা দৈহিক শক্তির আধার ও বাহকরূপে প্রধানতঃ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আধার-সংক্রান্ত সমস্যা প্রবল হইয়া উঠে। অপরপক্ষে, যদি রাষ্ট্রকে অন্য সামাজিক সঙ্ঘ হইতে পৃথক্ করিবার সময় উহার দৈহিক শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উহার উদ্দেশ্যের বহুমুখিতা ও জটিলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহা হইলে সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান-সংক্রান্ত প্রশ্নের গুরুত্ব কমিয়া যায়। সমাজকে যদি রাষ্ট্রের সহিত সমব্যাপক না করা হয়, যদি রাষ্ট্রকে সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান্ সঙ্ঘ বলিয়া কল্পনা না করা হয়, যদি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য মুখ্যতঃ কতকগুলি আদর্শের প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উর্ধ্বে প্রাধান্য দিবার প্রশ্ন উঠে না।[৬০]

---

৫৯ এইজন্য অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলিয়াছেন: "The size of the modern State makes it necessary for the people to surrender direct control of principles and direct control of administration. They can, broadly, say yes or no to large general solutions, they can be for free trade or against child labour. But they must, in general, express their will by choosing persons to say yes or no on their behalf." (*A Grammar of Politics*, p. 265.)

৬০ তুলনীয়: (১) "If we can accept the view that the State is distinguished from other associations only by reason of the greater generality of its purposes, and not necessarily by its exercise of force, then the answer to the question, 'Where in a community Sovereignty resides?' is that it need not reside anywhere at all." (Joad, *op. cit.*, p. 562).

(২) "......since society is essentially federal in nature, the body

নাগরিকের পৃথক্ স্বভাবজ অধিকারে যে সকল লেখক বিশ্বাস করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, মানুষের সমাজবহির্ভূত পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই অবস্থায় যে সকল অধিকার দেখা দেয় সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা। কিন্তু এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নহে, এবং সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ লেখক মানুষের স্বভাবজ অধিকার (natural right) সম্বন্ধীয় আলোচনা অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। মানুষের অধিকার অন্যের সহিত সম্পর্কের ফলেই দেখা দেয়। সুতরাং যদিই বা সমাজবহির্ভূত কোন আদিম অবস্থা মানুষের এককালে ছিল, তাহা হইলেও এই অবস্থায় কোন 'অধিকার'-এর সৃষ্টি হইতে পারে না। আবার, যদিই বা কোন অধিকার থাকিত, তাহা হইলেও এই সকল অধিকার নির্ণয় করা এবং উহাদের কোন তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, যুবক-শিশু, সুস্থ-অসুস্থ মনোবিশিষ্ট সকলেই কি সব অধিকার ভোগ করিতে বা ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারে? স্বভাবজ অধিকার সম্বন্ধে যে কোন অভিমতই অপ্রমাণিত কতকগুলি কল্পনার উপর স্থাপিত।

তবে এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে প্রতি নাগরিকই এই দাবী করিতে পারে যে, যাহাতে সে সৎ জীবন যাপন করিতে পারে, যাহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটিতে পারে, রাষ্ট্রের পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। রাষ্ট্র মাত্রেরই কর্তব্য হইল মানুষ হিসাবে তাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহা দান করা। **রাষ্ট্র যদি নাগরিকের নিকট আনুগত্য দাবী করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের উচিত হইল এমন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে প্রতি নাগরিকই মানুষের মত বাঁচিতে পারে**

which seeks to impose the necessary unities must be so built that the diversities have a place therein. If it is time...that no association included the whole of myself, no association can legislate successfully for the whole of myself...... But because society is federal, authority must be federal also.......It means the abandonment of the sovereign State in the sense which equates the latter with society and gives it, thereby, the right to dictate to associations within society.......It does not envisage the allegiance of man as a series of concentric circles of which the great and all embracing circle is the State. It sees him as bound now here, now there, as his experience seems to warrant in each problem that arises." (Laski, *A Grammar of Politics*, p. 271).

এবং তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র যে ক্ষমতার অধিকারী, তাহার তাৎপর্য হইল মানুষের ন্যূনতম নৈতিক অধিকার রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতা ও সক্রিয় চেষ্টা।[৬১]

৮। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্য (The Purpose & Function of State) :

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কী এবং রাষ্ট্র কি কি কার্য সম্পন্ন করে, তাহা আলোচনার প্রারম্ভেই প্রশ্ন উঠে : রাষ্ট্রের মোটেই কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

যাঁহারা বহুবাদ (pluralism)-এর সমর্থক, তাঁহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যতম এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উত্থান-পতনের সহিত ইহারও উত্থান-পতন সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র বিশেষ কোন সার্বভৌম, সর্বব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী নহে। অতএব, রাষ্ট্রকে পৃথক্ মর্যাদা দিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা মার্ক্সবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই মতবাদের সমর্থকেরাও রাষ্ট্রকে অপ্রয়োজনীয় সংস্থা বলিয়া মনে করেন (পৃঃ ৩৯৬-৯৭)। তাঁহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যেই রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (withering away)-এর বীজ নিহিত আছে। মার্কস্‌বাদীরা অর্থনৈতিক ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজবিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, ধীরে ধীরে শ্রেণী-সংঘাতের অবসান ঘটিবে এবং রাষ্ট্রও অবলুপ্ত হইবে।

নৈরাষ্ট্রবাদ বা নৈরাজ্যবাদের সমর্থকেরা—যথা, প্রুদোঁ (Proudhon), বাকুনিন্ (Bakunin), ক্রোপোট্‌কিন্ (Kropotkin) ইত্যাদি—সাধারণভাবে মনে করেন যে, রাষ্ট্র অকারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে। ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপের ফলে ইহা তাহার নৈতিকতাবোধেরও প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। কারণ স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতীত নৈতিকতার কোন অর্থ থাকে না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীরা অধিকাংশ স্থলেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র যেহেতু দৈহিক বলের ধারক এবং দৈহিক বল দ্বারাই ইহার প্রতি

---

৬১ অধ্যাপক লাস্কি (Laski)-র ভাষায় : "The prescriptions of the State are never final prescriptions.......A state must give to men their due as men before it can demand, at least with justice, their loyalty... ...Men who are granted political powers sooner or later become insistent that the result of power be rights." (*Ibid.*, p. 99).

আনুগত্য স্বীকার করাইয়া লয়, সেই হেতু ইহা অপ্রয়োজনীয়, অনৈতিক সংস্থা। রাষ্ট্র এই কারণে কেবলমাত্র অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া থাকে।[৬২]

নৈরাজ্যবাদ নৈরাশ্যজনক মনোবৃত্তির চরম প্রকাশ। রাষ্ট্র যে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়, রাষ্ট্রমধ্যে যে ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র যখন স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে, তখন উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল জনগণের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ। পরিবার-মধ্যে শিশুর যথেচ্ছ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ যেমন তাহার ভাবী জীবনে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে, সেইরূপ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নাগরিকের কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া তাহাকে সুপথে পরিচালিত করে। প্রগতিশীল রাষ্ট্র যেমন একদিকে জনমনকে পরিচালিত করে, অপরদিকে রাষ্ট্রও জনগণের সুষ্ঠু পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং স্বীয় কার্যাবলী পরিমার্জিত করে। এইজন্য প্রকৃত জনরাষ্ট্রে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব অভিমত প্রকাশের সুযোগ থাকে।[৬৩]

সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং উহার অস্তিত্বের যৌক্তিকতার অর্থ হইল যে, রাষ্ট্র সমাজের সহিত সমব্যাপক না হইলেও বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একমাত্র **রাষ্ট্রই সামাজিক জীবনের তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া উহাকে মর্যাদা দান করিতে পারে।** রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাহা সমাজমধ্যে সুগঠিত, শান্তিপ্রিয় জনসঙ্ঘগুলিকে কার্য করিবার স্বাধীনতা দান করে, যাহা ব্যক্তিবিশেষকে পুরাতন সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা অর্পণ করে, যাহা ব্যক্তিবিশেষকে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার দেয়। এই আদর্শ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হইলেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা।[৬৪]

---

৬২ তুলনীয় : "Law since it allies itself with force begets lawlessness."

সেইরূপ Proudhon-এর একটি বিখ্যাত উক্তি হইল : "Whoever lays his hand on me to govern me is a usurper and a tyrant ; I declare him to be my enemy...... Government of man by man is a slavery,....(and its laws are) cobwebs for the rich and chains of steel for the poor."

৬৩ কবি Walt Whitman-এর ভাষায় :

"I say there can be no salvation for These States without innovators—without free tongues, and ears willing to hear the tongues ;
And I announce as a glory of These States, that they respectfully listen to propositions, reforms, fresh views and doctrines."

(*Leaves of Grass*).

৬৪ রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করিয়া দার্শনিক হকিং (W. E. Hocking) বলেন : "As all inclusive in extent and duration, or aiming to be, the state serves to *set other groups free* to find their own due extent and

সমাজমধ্যে ব্যক্তি-মন নিজেই যেন রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ (micro-state) এবং প্রতি ব্যক্তিই কেবলমাত্র সে নিজে যাহা করে অপেক্ষা অন্যে তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করিবে তাহা লইয়া চিন্তা করে। সুতরাং ব্যক্তিমনের ইচ্ছা তাহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করিয়া অন্যকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিমনের এই ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করা।

রাষ্ট্রকে যদি তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে দৈহিক বলের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এইজন্য প্রতি রাষ্ট্রকে যুদ্ধবাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, প্রতি রাষ্ট্রেরই অধীন ভূ-খণ্ড পরিমিত আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়—নহিলে আত্মবিস্তারের ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগত প্রণোদিত হইতে থাকিলে প্রতি রাষ্ট্রই নিজের এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করিবে। বিরাট্ রাষ্ট্রের নাগরিকেরা রাজ্যের শাসকসংস্থা হইতে অনেক দূরে চলিয়া যায় এবং তাহাদের মনে এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়।[৬৫] কোন রাষ্ট্রেরই উচিত নহে দৈহিক বল সঞ্চয় ও প্রয়োগকে চরম লক্ষ্য বলিয়া কল্পনা করা।

রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল **উহাকে জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা**। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অলসতার বিরুদ্ধে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম চালাইয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করাই রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রের-পরিচালকবর্গের কর্তব্য। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নাগরিককে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল, আত্মমর্যাদাশালী নাগরিক করিয়া তোলা। সুতরাং অপরিমিত ক্ষাত্রবলের পরিবর্তে নৈতিক তথা আত্মিক বলের উন্নতি সাধন করাই আদর্শ রাষ্ট্রের কার্যসূচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত।

অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্র মূলতঃ হইল দৈহিক বলের বাহক এবং দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়াই উহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যদিও দৈনন্দিন কর্তব্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রকে দৈহিক বল প্রয়োগ করিতে হয়,

duration......the state *sets the individuals free*......the state sets *the mind free*, by promoting a growing sensitiveness and intelligence in ordering its social connections.......The State promotes the rational meaning of social life." (*Man and the State*, p. 151).

৬৫ তুলনীয় : "Apart from war, the modern great State is harmful from its vastness and the resulting sense of individual helplessness." "The principal source of the harm done by the State is the fact that power is its chief end." (Russell, *Principles of Social Reconstruction*, pp. 60 & 62).

তাহা হইলেও দৈহিক বলই রাষ্ট্রের একমাত্র পরিচায়ক নহে। দৈহিক বলের উৎকর্ষ সাধনই যদি রাষ্ট্রের প্রধান গুণ বা উন্নতির নিদর্শন হইত, তাহা হইলে 'পুলিশী-রাজ্য'-ই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইত। অপরপক্ষে, যে রাষ্ট্র উচ্চপর্যায়ের কৃষ্টিসাধনে সহায়তা করে, যে রাজ্য জনকল্যাণের আদর্শ অনুধাবন করে, সেই রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র জনমনের ইচ্ছার পরিচায়ক—এই ইচ্ছা যুক্তিবিহীন অন্ধ ইচ্ছা নহে, ইহা হইল উদ্দেশ্যাভিমুখী যুক্তিপূর্ণ ইচ্ছা। রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি এই প্রকার ইচ্ছার মধ্যেই নিহিত আছে।[৬৬] বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার জন্য যে রাষ্ট্রে যত অল্প দৈহিক শক্তিপ্রয়োগ করিতে হয়, সেই অনুপাতে সেই রাষ্ট্র প্রকৃত উন্নতি করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

আমরা এই পর্যন্ত দেখিলাম যে, রাষ্ট্রকে অপ্রয়োজনীয় সংস্থারূপে পরিহার করা সম্ভব নহে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। বাস্তবিক সুগঠিত রাষ্ট্র আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক মঙ্গলকর কার্যসাধন করিয়া থাকে। এই কারণ রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগকারী সংস্থা জ্ঞান করা উচিত নহে।

রাষ্ট্র প্রধানতঃ সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করে। রাষ্ট্র যে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে বা রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা সম্পন্ন করা উচিত, সেগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকারের—(ক) এক জাতীয় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হইল এরূপ যে, তাহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে চাহে; (খ) আর এক জাতীয় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হইল সামাজিক অবিচার প্রতিরোধ করা।

(ক) সামাজিক মঙ্গলবিধানকল্পে বর্তমানের সুসভ্য প্রগতিশীল রাষ্ট্র সর্বত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা করে। যে সকল 'সমাজশত্রুর'-র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাদের অন্যতম হইল অজ্ঞতা। রাষ্ট্র মধ্যে

৬৬ অধ্যাপক হকিং (Hocking)-এর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: "The state is not reason served by force; it is will-force served by force." "We decline to make 'force-using' the essential and defining mark of the state. ......The force of the state must depend upon its rightful ascendency, not its ascendency upon force." (*Op. cit.*, pp. 67 & 76).

জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর না হইলে রাষ্ট্রের উন্নতি হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণকে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়; কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞতা দূরীভূত না হইলে তাহারা নাগরিক হিসাবে সুষ্ঠুভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে না।

অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য কেবল প্রাথমিক শিক্ষাই যথেষ্ট নহে। উচ্চতর শিক্ষার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যও রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে, সেগুলি রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রের উচিত নহে সেগুলির দৈনন্দিন কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করা; অর্থাৎ এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যদান করিলেও অভ্যন্তরীণ কার্যক্ষেত্রে উহাদের স্বাধীনতা দান করা উচিত।

রাষ্ট্র মধ্যে যাহাতে কোন রোগের বিস্তার ঘটিতে না পারে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, রাষ্ট্রের পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান জনকল্যাণকর কার্য।

(খ) রাষ্ট্রের পক্ষে কতকগুলি করণীয় কার্য হইল জনসাধারণের উপর বিশেষ বিশেষ নিষেধ আরোপ করা। সাধারণ নাগরিক এমন অনেক কার্য করিতে পারে যাহাতে অন্য নাগরিক তাহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারে না; অর্থাৎ একজন নাগরিক অন্যের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে। এইখানেই দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন—রাষ্ট্রের উচিত প্রতিবন্ধকের পথে প্রতিবন্ধক (hindrance to hindrances) সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রে যাহাতে অযথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের সৃষ্টি না হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ (যথা, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) যাহাতে যথাযথ রক্ষিত ও সুসমভাবে সমাজ মধ্যে বণ্টিত হয়, এইরূপ কার্যের জন্য রাষ্ট্রকে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই ব্যবস্থাগুলির কতকগুলি হইল নিষেধাত্মক; অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে নাগরিকদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নিষেধ আরোপ করিতে হয়।

সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে নাগরিকগণের উপর নিয়ন্ত্রণ তথা নিষেধ আরোপ করিতে হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে না পারিলে রাষ্ট্র তাহার অন্য উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে পারে না (পৃঃ ৩৬৭-৬৮)।

রাষ্ট্র যখন অন্য সামাজিক সঙ্ঘ বা ব্যক্তি-বিশেষের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে যাইবে, তখন যতদূর সম্ভব ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মর্যাদা দান করা উচিত। মোট কথা, **রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয় বাঞ্ছনীয়।** যাঁহারা সমাজ-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ পছন্দ করেন তাঁহাদের মতবাদকে সমাজবাদ বলে; অপরপক্ষে, যাঁহারা ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দান সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতবাদকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলে। এই দুইটিই হইল চরম মতবাদ এবং ইহাদের প্রত্যেকটির দাবীর মধ্যে যেমন সত্য আছে, সেইরূপ অতিশয়োক্তিও আছে। সুতরাং অতিশয়োক্তি পরিহার করিয়া ইহাদের সমন্বয় বাঞ্ছনীয়।[৬৭] (পৃঃ ৯২-৯৭)। রাষ্ট্রের পরিচালকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, রাষ্ট্র সামাজিক তথা ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সংস্থা হইলেও ইহা সমগ্র সমাজের কাঠামোর সহিত সমব্যাপক নহে; অতএব, ইহা অন্য সকল সামাজিক সংস্থার স্থান পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না।[৬৮]

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র মানবিক সংস্থামাত্র এবং ইহার ক্ষমতা যত অধিকই হউক্ তাহা শেষ পর্যন্ত সীমিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রাষ্ট্রীয় কার্যগুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়[৬৯]: (১) কতকগুলি কার্য আছে যাহা একমাত্র রাষ্ট্রই সম্পাদন করিতে পারে; যেমন, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা

৬৭ সমাজবাদ যে সকল সময়ই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পূর্ণবিরোধী তাহা নয়। প্রকৃত সমাজবাদী ও সমাজ-সংস্কারকেরা যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না, তাহা হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই সমাজের উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করেন। Sir Henry Jones-এর ভাষায়: "the displacement of the individual is but the first step in his re-instalment; and what is represented as the 'Coming of Socialism' may with equal truth be called the 'Coming of Individualism." (The *Working Faith of the Social Reformer*).

৬৮ তুলনীয়: "The State is an essential part, but never the whole, of the social structure. It is best conceived of as an agency of the community with very broad and important functions, but nevertheless limited. It does not and cannot take the place of other agencies." (MacIver & Page, *Society*, p. 455).

৬৯ MacIver ও Page রাষ্ট্রীয় কার্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীকরণ করিয়াছেন: (১) Functions peculiar to the State, (২) Functions for which the State is well adapted, (৩) Functions for which the State is ill adapted এবং (৪) Functions which the State is incapable of performing. (*op. cit.*, pp. 458-463).

রক্ষা। (২) কতকগুলি কার্য আছে যেগুলি অন্য সামাজিক সঙ্ঘ অপেক্ষা রাষ্ট্র অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সাধন করিতে পারে; যেমন, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি রক্ষা করা ও উহাদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থা করা। (৩) কতকগুলি কার্য আছে যেগুলি অন্য সামাজিক সংস্থার তুলনায় রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না; যেমন, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যগুলি রাষ্ট্র পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিলে সুফল লাভ হয় না। (৪) কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; যেমন, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, নীতিবোধ এইগুলিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না।

ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের কার্য কেবলমাত্র উহার ভৌগোলিক পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—প্রতি রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতি রাষ্ট্রের উপরই কতকগুলি কর্তব্য ন্যস্ত হয়।

কোন রাষ্ট্র তাহার দায়িত্ব কতদূর পালন করিতে সক্ষম হইবে তাহা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রে কোন্ প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে ভাবে বা যে যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালিত হয়, একনায়কত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রে সেইভাবে বা সেই সেই কর্তব্য পালিত না হইতে পারে।

৯। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বা সরকারের প্রকারভেদ (Forms of Government)—গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy vs. Dictatorship) :

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের কর্তব্যের আলোচনা কালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কেবলমাত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যেই রাষ্ট্রের কার্য পরিসমাপ্ত হয় না—রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নাগরিকের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। রাষ্ট্র কতদূর উহার এই কর্তব্য সাধন করিতে পারিবে, তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্রের শাসনসংস্থার উপর।

বলা বাহুল্য, সকল রাষ্ট্রে এবং সকল যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা একরূপ নহে। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা নানা আকারের হইতে পারে।

প্লেটোর মতে শাসনতন্ত্র পাঁচ প্রকারের হইতে পারে। তিনি মনে করেন যে, অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) হইল শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা; অবশ্য তিনি এখানে বৌদ্ধিক আভিজাত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী দার্শনিকেরাই শাসক হইবার যোগ্য। এই প্রকার অভিজাততন্ত্রের

অবনতি ঘটিলে প্রথমে দেখা যায় সম্ভ্রান্ততন্ত্র (timocracy), তাহার পরবর্তী নিম্ন স্তর হইল ধনিকতন্ত্র (oligarchy), তাহার পর জনতাতন্ত্র (democracy) এবং সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট রূপ হইল স্বৈরাচারতন্ত্র (tyranny বা despotism)।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কে বা কাহারা অধিকারী, সেই অনুসারে আরিষ্টটল্ শাসনসংস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করেন—যখন একজন রাজা উহার অধিকারী, তখন উহা রাজতন্ত্র (monarchy); যখন কয়েকজন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন উহা অভিজাততন্ত্র (aristocracy) এবং যখন বহুজন মিলিয়া উহা পরিচালনা করে, তখন উহার নাম জনরাজ্য (polity)। রাষ্ট্র-নায়কগণ যখন নিজের স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তখন যথাক্রমে দেখা দেয় স্বৈরাচারতন্ত্র (tyranny), ধনিকতন্ত্র (oligarchy) এবং গণতন্ত্র (democracy)।[৭০]

প্রাচীন যুগের অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের যে আদর্শ ছিল, বর্তমান যুগে তাহা নাই। বর্তমান কালের প্রধান সমস্যা হইল: কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিবে, অথবা উহা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত থাকিবে? যদি উহা জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে এবং জনকল্যাণই যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রই আদর্শ শাসনব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু এই মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রকে যদি প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ জনসাধারণের উপর শাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করা যায় না। এইজন্য প্রয়োজন অমিত ক্ষমতার অধিকারী এক নায়ক বা নেতা (dictator)। সুতরাং বর্তমানের শাসনসংক্রান্ত প্রধান সমস্যা হইল: গণতন্ত্র অথবা একনায়কত্ব (democracy বা dictatorship)?

গণতন্ত্র বলিতে এমনই এক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বুঝায় যেখানে পরিচালনব্যবস্থা জনগণের কল্যাণে জনগণ দ্বারাই পরিচালিত হয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গণতান্ত্রিক সমাজ বলিতে এমনই এক সামাজিক অবস্থা বুঝায় যেখানে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি অনুসৃত হয় না এবং সকলে সমান সুযোগ লাভ করে। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা এমনই এক রাষ্ট্রব্যবস্থা বুঝায় যেখানে

৭০ বর্তমান যুগে যে অর্থে গণতন্ত্র (democracy)-পদটি ব্যবহৃত হয় বা উহাকে যে মর্যাদা দান করা হয়, প্রাচীন গ্রীকযুগে সেইরূপ হইত না।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে। শাসনব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা এমনই এক অবস্থা বুঝায় যাহাতে শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়।[৭১]

(ক) গণতন্ত্র :

গণতন্ত্র বলিতে কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনব্যবস্থা বুঝায় না। **গণতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে একাধারে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত থাকে।** নিছক দৈহিক বল বা অর্থকৌলীন্য বা বংশগৌরবে কেহ সমাজ তথা রাষ্ট্রমধ্যে বিশেষ কোন অধিকারের দাবী করিতে পারিবে না। গণতন্ত্র বলিতে বিশেষ প্রকারের নৈতিক দায়িত্ব বুঝায়—রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির পারস্পরিক অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ প্রকারের সতর্কতা ও নীতিবোধের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক আদর্শ এমন কথা বলে না যে, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই বা উচ্চতর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষ কোন বিশেষ সম্মানলাভ করিবে না—ইহার অর্থ হইল প্রতি মানুষকেই সমাজ ও রাষ্ট্র সমান সুযোগ দান করিবে; সুতরাং কেহ যেন পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতার অভিযোগ আনিতে না পারে। প্রত্যেকেই সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগঠনের প্রতি মানুষের অবদানের কিছু-না-কিছু মূল্য আছে এবং রাষ্ট্রমধ্যে প্রত্যেকেরই অবদান অল্পবিস্তর স্বীকৃতি লাভ করা উচিত।[৭২]

৭১ 'Democracy'-পদের বিভিন্ন অর্থের জন্য F. J. C. Hearnshaw-রচিত *Democracy at the Crossways* দ্রষ্টব্য।

Democracy সম্বন্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন্ (Abraham Lincoln)-এর একটি বিখ্যাত উক্তি হইল যে, ইহা "government of the people, by the people, for the people."

৭২ গণতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বার্ন্স্ (C. Delisle Burns) বলেন: "Democracy as an ideal is a society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole. For although the contribution of each is not equal in value, each one who contributes is equally a source from which the common life is drawn. And further, democracy implies a burden for each, since in a true democracy no one can avoid his share of the moral responsibility for the actions performed in the name and for the interests of all." (*Political Ideals*, p. 278).

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপিত করা হয় :

(১) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে সকল নাগরিককে নাগরিক হিসাবে তুল্য মর্যাদা দান করা হয়। সকলেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমান এবং নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের নিকট কোন ব্যক্তিই বিশেষ কোন সুবিধামূলক অধিকার ভোগ করিবে না। অর্থাৎ গণতন্ত্র সকল বৈষম্যের বিরোধী এবং সাম্যের সমর্থক।

(২) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জনসাধারণের মনে এমন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারে যাহার ফলে তাহাদের মনে এই ধারণা দেখা দেয় যে রাষ্ট্র তাহাদের নিজস্ব সংস্থা। ইহার জন্য নাগরিক ও শাসকগোষ্ঠী দুইটি পৃথক্ এবং পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীতে পরিণত হয় না।

(৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে, সেই হেতু তাহাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ দেখা দেয়। প্রতি নাগরিকের মনে এই ধারণা জন্মে যে, তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল তাহার সহ-নাগরিকের তথা সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। এইভাবে নাগরিকের মনে সুষ্ঠু নাগরিকতাবোধ (civic consciousness) দেখা দেয়। জনমনের সহিত রাষ্ট্রের পরিচালক বা শাসকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকার জন্য রাষ্ট্র মধ্যে আকস্মিক বিপ্লবের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা অনুরূপ কোন জাতীয় বিপত্তির সময় জনসাধারণ রাজ্যসরকারকে স্বেচ্ছায় যথাসম্ভব সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়।

(৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিত উভয়দলই দায়িত্বশীল হইয়া উঠে। জনসাধারণ তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। অপর পক্ষে, যাহারা শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, তাহারাও তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে ভয় পায় ; কারণ তাহারা জানে যে, তাহারা কোন অন্যায় করিলে জনসাধারণের (বিশেষতঃ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের) কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং ক্ষমতায় মদমত্ত উচ্ছৃঙ্খল শাসকগোষ্ঠী সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কমিয়া যায়।

(৫) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিবিধান করিতে পারে।

(৬) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করিবার সুযোগ নাগরিকদের দান করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা একদিকে যেমন নীতিবোধের উৎকর্ষ সাধন

করে, অপরদিকে স্বাধীন সমালোচনামূলক ক্ষমতা মার্জিত করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল পৃথক্ রাজনৈতিক দলগঠনের স্বাধীনতা। প্রতি রাজনৈতিক দলই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কার্যাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বলিয়া প্রতি দলই জনস্বার্থের অনুকূলে কার্য করিবার চেষ্টা করে; তাহা ছাড়া, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলও ক্ষমতা লাভের পর নিশ্চিন্ত থাকিতে বা স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে না।

গণতন্ত্রের এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়া থাকে। গণতন্ত্রের সমালোচকগণ (যথা, সিজ্‌উইক্, মেইন্, লেকি ইত্যাদি) এই আপত্তি করিয়া থাকেন যে, গণতন্ত্রে চরম ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হস্তে থাকার ফলে রাষ্ট্র অজ্ঞ, অশিক্ষিত জনগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। কোন রাষ্ট্রেরই সকল নাগরিকের সমানভাবে উন্নত রাজনৈতিক বোধ, নৈতিক বল এবং বুদ্ধি বা চিন্তার ঔৎকর্ষ্য থাকে না। ফলে গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত জনতাতন্ত্র (mobocracy)-তে পরিণত হয়। অন্ততঃপক্ষে, রাষ্ট্রীয় সরকার অবিশেষজ্ঞ (inexpert), সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন (mediocre) ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপরিচালকদের সর্বদা বিরুদ্ধ সমালোচনায় সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা থাকার জন্য কোন পরিকল্পনাই তাঁহারা ত্বরিত গতিতে কার্যকরী করিতে পারেন না। আবার, জনগণের সকল অংশকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য রাজ্যসরকার অকারণ স্ফীত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে আর্থিক অপচয় ঘটে। যাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'ন, তাঁহাদের লক্ষ্যই থাকে কেবলমাত্র যে কোন প্রকারে গণমনকে সন্তুষ্ট রাখা; সুতরাং প্রকৃত জনকল্যাণমূলক কার্য করিবার মত ইচ্ছা বা উৎসাহ কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদের থাকে না।

গণতন্ত্রের এই সকল অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, উহা অপেক্ষা বৌদ্ধিক **অভিজাততন্ত্র** (aristocracy) শ্রেয়ঃ। কিন্তু অভিজাততন্ত্রের অসুবিধা হইল যে, বৌদ্ধিক ঔৎকর্ষ্যনির্ধারণ ও প্রকৃত অভিজাতদের নির্বাচনের কোন সুষ্ঠু উপায় নাই। সুতরাং গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

(খ) একনায়কতন্ত্র:

গণতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী শাসনব্যবস্থা হইল একনায়কতন্ত্র (dictatorship)। ইহার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপিত হয়:

(ক) একনায়কতন্ত্রে রাজ্যসরকার কয়েকজন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

সংযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া উহা অকারণ স্ফীত তথা অকর্মণ্য হইয়া উঠিতে পারে না।

(খ) এরূপ রাষ্ট্রে যে কোন পরিকল্পনা অল্পদিনের মধ্যেই কার্যকরী করিয়া ফেলা যায়। রাষ্ট্রপরিচালকগণ যাহা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর মনে করেন, তাহাকে সহজেই রূপদান করিতে পারেন।

(গ) রাষ্ট্রনায়ক ও তাঁহার অনুচরেরা জনসাধারণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া জনসাধারণও নিয়মানুবর্তী ও আজ্ঞাবহ হইয়া উঠিতে পারে।

(ঘ) এইরূপ রাষ্ট্রে আজ্ঞাবহ নাগরিক সৃষ্ট হইবার ফলে ইহা অল্পদিনেই দৈহিকবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে এবং এই কারণ ইহা সহজেই আত্মবিস্তার করিতে পারে, আবার অন্য রাজ্যের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করিতে পারে।

(ঙ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে যে, আমরা এরূপ রাষ্ট্রের শাসনকার্যের প্রায়ই বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া থাকি ; কিন্তু একনায়কতন্ত্রের বিশেষ সমালোচনা শুনা যায় না। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, একনায়কতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা অধিকতর উন্নত ও কার্যকরী।

একনায়কতন্ত্রের কতকগুলি সুবিধা থাকিলেও উহার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা হইয়া থাকে ; যথা—

(১) একনায়কতন্ত্রের যিনি নায়ক হইবেন, তিনি যে জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান্ এবং পরহিতব্রতী হইবেন এমন নিশ্চয়তা নাই। কৌশলে ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া লইয়া তিনি যে-কোন প্রকারে স্বীয় ক্ষমতাকে স্থায়ী রূপ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন এবং জনকল্যাণ ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবার বিশেষ অবকাশ তাঁহার থাকে না।

(২) এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রায়ই বিপ্লবের মাধ্যমে স্থাপিত হয় বলিয়া রাষ্ট্র-মধ্যে পুনরায় বিরুদ্ধ-বিপ্লব ঘটিবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। অনেক সময়ই দেখা গিয়াছে, অল্পদিনের মধ্যে একদলের নায়কের শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছে এবং বিরোধী দলের একজন নায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শাসনব্যবস্থার এই অস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার জন্য রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না।

(৩) একনায়কতন্ত্রে আজ্ঞাবহ নাগরিকগোষ্ঠী গঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু এই সকল রাষ্ট্রে দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া নাগরিকগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে বাধ্য করা হয়। সুতরাং তথাকথিত আজ্ঞাবহ নাগরিক-

গোষ্ঠী হইল সদাশঙ্কিত নিষ্প্রাণ গোষ্ঠীমাত্র। স্বেচ্ছায় আজ্ঞা পালন এবং বাধ্য হইয়া আদেশপালন এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট।

(৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যে উৎসাহ পায়, একনায়কতন্ত্রে তাহা সম্ভব নহে। একনায়কতন্ত্রে সকলকে এক বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী চিন্তা করিতে বাধ্য করা হয়। সুতরাং স্বাধীন সমালোচনার ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কগণ আত্মসংশোধনের যে সুযোগ পান, একনায়কতন্ত্রে তাহা সম্ভব নহে।

(৫) একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা বিশেষ শুনা যায় না, অতএব উহা গণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেয়ঃ—এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ একনায়কতন্ত্রে স্বাধীন সমালোচনার সম্ভাবনা নাই—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও নাই এবং উহাদের সমর্থক বিভিন্ন স্বাধীন সংবাদপত্রও নাই। সুতরাং এরূপ রাষ্ট্রে কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা আত্মপ্রকাশ করে না। যখন উহা করে, তখন হঠাৎ উহা প্রায়ই প্রবল বিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

আমরা উপরে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের দোষগুণের উল্লেখ করিয়াছি। এই দুইটিকে তুলনা করিলে **জনকল্যাণকামী গণতন্ত্রকে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়।** গণতন্ত্রের যে ত্রুটি তাহা প্রধানতঃ জনসাধারণের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অযোগ্যতা হইতে দেখা দেয়; কিন্তু ইহাদের কোনটিই যে একেবারে দূর করা যায় না তাহা নহে। নাগরিকগণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা যে পরিমাণে যে রাষ্ট্র দূর করিতে সক্ষম হইবে, সেই পরিমাণে সেই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের উপযোগী হইয়া উঠিবে। সুতরাং গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের উহার উপযুক্ত হইবার জন্য সদা-সর্বদা প্রচেষ্টা করিতে হইবে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, গণতন্ত্র মাত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার, কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যদি কোন ক্ষমতাশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনমনকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, তাহা হইলে জনসাধারণ উহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হ'ন তাঁহারা সংখ্যা ও দল নির্বিশেষে সমগ্র সমাজেরই কল্যাণ সাধন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। গণতন্ত্রের আদর্শ হইল, সকলের দুঃখ দূর করা, সকলকে নিরাময় করা, সকলের মঙ্গলবিধান করা।[৭৩] বাস্তবিক, গণতন্ত্রের আদর্শই একমাত্র

---

৭৩ মহামুনি ব্যাসের নিম্নলিখিত উক্তি গণতন্ত্রের আদর্শের পরিচায়ক :

"সর্বে চ সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥"

রাষ্ট্রীয় আদর্শ যাহাতে প্রতি ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হইয়া থাকে বা দেখাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং একমাত্র গণতন্ত্রই নৈতিক দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করে।[৭৪] স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গণতন্ত্রে যে সু-উচ্চ আদর্শের বাণী প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত করিতে কোন রাষ্ট্রই সফল হয় নাই এবং তথাকথিত গণরাষ্ট্রের অল্পাধিক আদর্শচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।[৭৫] সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচার করিতে হইলে কেবল মাত্র উহার ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করাই যথেষ্ট নহে। উহা কী কী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহাও বিচার করিতে হইবে।

পরিশেষে আমরা মন্তব্য করিতে পারি যে, রাষ্ট্র মাত্রই জনকল্যাণের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত (পৃঃ ৬৭-৭৪)। একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করিতে পারে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য স্বীকার করে এবং জননিপীড়ন না করিয়া জনকল্যাণের ব্যবস্থা করে। এই কারণে আমরা গণতন্ত্রকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। একনায়কতন্ত্রে যেমন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের দাসে পরিণত করা হয়, গণতন্ত্রে সেইরূপ নাগরিকদের (অথবা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের) মাধ্যমে তাহাদেরই কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা জনকল্যাণের সেবায় প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নাগরিক মাত্রই রাষ্ট্রের তথা সহ-নাগরিকগণের সেবায় অনেকাংশে আত্মোপলব্ধি ও আত্মশিক্ষালাভের সুযোগ পায়।[৭৬]

৭৪ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়: "Democracy is the political expression of the ethical principle that the true end of man is responsible freedom. Kant's celebrated moral principle, 'So act as to treat humanity, whether in thine own person or in that of any other always as an end, never merely as a means' is a formulation of the democratic faith." (*Religion & Society*, p. 90). সেইরূপ G. D. H. Cole বলেন: "I mean by democracy not merely the right of a majority to have its way, but an arrangement of public affairs which is designed to give every man and woman the best possible chance of finding out what they want, of persuading others to accept their point of view, and of playing an active part in the working of a system thus responsive to their needs." (*Essays in Social Theory*, pp. 97, 98).

৭৫ তুলনীয়: "Democracy is a form of government that is never completely achieved.......Democracy grows into being. There may be centuries of growth before we can say: 'Now this state is a democracy'." (MacIver, *The Web of Government*, p. 175).

৭৬ অধ্যাপক Joad-এর ভাষায়: "It is not true that democracy subordinates the state to the individual; on the contrary it enables the individual to realise himself in service to the state, while not forgetting that the true end of the state must be sought in the lives of the individuals." (*Guide to the Philosophy of Morals & Politics*, p. 807).

১০। যুদ্ধ-সংস্থা (The Institution of War):

যদিও অধিকাংশ রাষ্ট্রই পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকিতে চায়, তাহা হইলেও প্রতি রাষ্ট্রকেই যুদ্ধের জন্য অল্পবিস্তর প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই হিসাবে প্রতি রাষ্ট্রেই যুদ্ধকে স্থায়ী সংস্থারূপে স্বীকার করা হয়। যুদ্ধ বলিতে সাধারণতঃ দুই বিরুদ্ধপক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব বা বিরোধ বুঝায়—এই বিরোধের সময় প্রতি পক্ষই বিরুদ্ধে পক্ষের যত জন সম্ভব ব্যক্তিকে নিহত করিতে, পঙ্গু করিতে বা অন্য কোনরূপে তাহাদের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে; সাধারণতঃ প্রতিপক্ষ, অর্থ, সম্পদ, ভূখণ্ড ইত্যাদি অথবা কোন বিশেষ প্রকারের ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। যুধ্যমান রাষ্ট্রসমূহ যে সকল সময় ধীর মস্তিষ্কে ক্ষয়-ক্ষতির বিচার করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা নহে, বরং সাময়িক উত্তেজনা দ্বারা উহারা পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ যে সকল কার্য করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হয়, এক যুধ্যমান দলের অন্তর্ভুক্ত সৈন্যেরা অপর যুধ্যমান দলের বিরুদ্ধে সেই সকল কার্য করিবার জন্যই নিয়োজিত হয়। সুতরাং সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রশ্ন উঠে: যুদ্ধের যৌক্তিকতা কী?

(ক) যুদ্ধের উপকারিতা ও অপকারিতা:

যুদ্ধ সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত মতবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ যুদ্ধকে সকল অকল্যাণ তথা অমঙ্গলের আকর জ্ঞান করা হয়; এইজন্য বলা হয় যে, যুদ্ধকে ত্যাগ করা উচিত।[৭৭] অপর পক্ষে, আর একদল মনে করেন যে, যুদ্ধ মানব-জীবনের তথা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মানুষের জৈব প্রয়োজনে যুদ্ধের একান্ত আবশ্যকতা। যুদ্ধ ব্যতীত সহজ, সতেজ, নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব নহে।[৭৮] যাহারা যোদ্ধা, যাহারা ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করিয়াছে, যুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ তাহাদের পক্ষে আর কিছুই নাই।[৭৯]

---

৭৭ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রথম অধ্যায়ে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যুদ্ধের পরিণামে যে ভয়াবহ কুলক্ষয় হয় তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন:

"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত।" (১।৩৯)

৭৮ তুলনীয়: (১) Man shall be trained for war, and woman for the creation of the warrior, all else is folly." (Nietzche).

(২) "War is a biological necessity, an indispensable regulator in the life of mankind.......Without war inferior or demoralised races would swamp healthy and vital ones, and a general decadence would be the consequence. War is one of the essential factors of morality." (Bernhardi).

৭৯ তুলনীয়: "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।" (গীতা, ২।৩১)

বর্তমান যুগের অধিকাংশ চিন্তাবিদ্‌ই যুদ্ধকে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে উচ্চ মর্যাদা দান না করিলেও ইহাকে একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পরিহার করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বর্তমানে মানুষ যুদ্ধকে প্রয়োজনীয় দুর্ঘটনারূপেই গ্রহণ করিয়াছে।

যুদ্ধের সপক্ষে বলা হয় যে, যুদ্ধের ফলে মানুষ অলসতা পরিহার করিয়া আত্ম-নির্ভরশীল ও শ্রমশীল হইয়া উঠে। যুদ্ধকালীন দুঃখের আবর্তে পড়িয়াই মানুষ যথাশক্তি স্বীয় ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। আদিমযুগ হইতে যদি আমরা মানুষের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, মানুষ যুদ্ধেরই ফলে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীজীবন হইতে আত্মবিস্তার করিয়া রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার, যুদ্ধেরই ফলে মানুষ সামন্তরাজ্যের অবসান ঘটাইয়া সুসংহত রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহা ছাড়া, আধুনিক যুগে, যুদ্ধেরই ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধেরই ফলে সামাজিক জীবনেও অনেক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে ; পুরাতন, অর্থহীন, সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—মানুষে মানুষে অনাবশ্যক পার্থক্য দূর হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

যুদ্ধের ফলে যে সমাজে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হয় সে বিষয় সকলেই (সম্ভবতঃ স্বার্থান্বেষী যুদ্ধবাদী কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক ব্যতীত) একমত। **যুদ্ধের উপকারিতা যাহাই থাকুক না কেন, অপকারিতা বা ক্ষতির তুলনায় উহা নিতান্ত সামান্য।** যুদ্ধের ফলে সমগ্র সামাজিক ও নৈতিক জীবনে এক বিরাট্ আলোড়ন আসিয়া পড়ে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর সর্বাধিক মর্যাদা আরোপ করা হয় ; ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। মানুষের নৈতিকতাবোধ নষ্ট হয়—অনেকক্ষেত্রে মানুষের পারিবারিক জীবনের ঐক্য ও শান্তি ব্যাহত হয় এবং সেখানেও দুর্নীতি প্রবেশ করে। তাহা ছাড়া, মানুষের সুকুমারবৃত্তিগুলি নষ্ট হয় এবং মানুষের মনে ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লোভ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে সযত্নে পরিবর্ধিত করা হয়। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমিয়া আসে। ভাল-মন্দ যে-কোন প্রকারেই শত্রুকে পরাজিত করার প্রচেষ্টা হইতে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে মানুষ কোন দ্বিধাবোধ করে না। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়, তাহা অধিকাংশ সময়ই মানুষের প্রগতির পরিচায়ক নহে, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে

বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান মানুষকে বিনাশ করিবার বা পররাজ্য ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানের যে তথাকথিত প্রগতি সাধিত হয়, শান্তির সময়ও তাহা সাধিত হইতে পারিত। শিল্প, শিক্ষা, কৃষ্টি, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি যুদ্ধের সময় ব্যাহত হয়। অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুসম বণ্টন হয় না; বরং কেবলমাত্র যুদ্ধের কার্যে ব্যয়িত হওয়ার ফলে অনেক সময় উহাদের অপচয় ঘটে। তাহা ছাড়া, জনস্বাস্থ্য অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মহামারীরূপেও নানারোগ দেখা দিতে পারে।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যে তথাকথিত শান্তি আসে, তাহাতে বিজয়ী ও বিজিত সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধকালীন বা আপদকালীন সমাজব্যবস্থা হইতে শান্তিপূর্ণ সাধারণ জীবনযাত্রায় মানুষ যুদ্ধের পর সহজে নিজেকে অভ্যস্ত করিতে পারে না।

(খ) যুদ্ধের কারণ:

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সভ্য মানুষ উপলব্ধি করিতে পারিলেও আজ পর্যন্ত সে যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারে নাই। মানুষ যুদ্ধনিরোধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে; কিন্তু ঠিক কী উপায়ে যুদ্ধকে পরিহার করিতে পারা যায় তাহা সে উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। এমন কি, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ দ্বারাই যুদ্ধনিরোধের কথা সে চিন্তা করে! বাস্তবিক মানুষের জৈবিক, মানসিক ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার জন্য এক এক সময়ের ব্যবধানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এত বিবিধ কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে যে যুদ্ধের কারণসমূহের একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা দান করা সম্ভব নহে।[৮০] তবে আমরা সাধারণভাবে কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণের উল্লেখ করিতে পারি।

৮০ তুলনীয়: "The motives which have led to aggression by human populations are too numerous to mention. Leaders have sought wealth revenge, prestige, dynastic expansion, the deflation of internal revolt, adventure and the propaganda of religions; and the masses have supported them with the expectation of adventure, plunder, sadistic orgies, relief from boredom, better lands, higher wages, loyalty to the leader, religious enthusiasm, feminine approval." (Wright, *The Causes of War & the Conditions of Peace*, p. 108).

(১) মানুষের **জৈবিক** সংগঠন এইরূপ যে, তাহার পরিবেশের সহিত প্রতিক্রিয়া বা প্রতিযোজনকালে তাহাকে আক্রমণাত্মক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। জগতে জীবের আবির্ভাবের প্রথম যুগ হইতে মানুষকে তাহার পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে এবং জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং নিছক বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনে প্রত্যেক জীবকেই অল্পবিস্তর সংগ্রামশীল ও আক্রমণোদ্যতক হইয়া উঠিতে হয় এবং মানুষের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। তাহা ছাড়া, সজীব সচঞ্চল প্রাণীমাত্রই জীবনে উত্তেজনার একটা আকর্ষণ বোধ করিয়া থাকে—এই দিক্ হইতেও মনুষ্য সমেত সকল প্রাণীই মধ্যে মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের ফলে মানুষ যেন দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন হইতে ব্যতিক্রমের পন্থা দেখিতে পায়।[৮১]

(২) জৈবিক প্রয়োজনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইল কতকগুলি **মানসিক** কারণ। জৈবিক প্রয়োজনের ফলে মানুষের মনে আক্রমণাত্মক বৃত্তি দেখা দেয় এবং ইহা মানুষের মনে যুদ্ধের প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। রাষ্ট্রনায়কগণের মনে এমন ব্যক্তিগত কারণ নিহিত থাকে যাহার ফলে তাঁহারা নিজেদের তথা সমগ্র জাতিকে যুদ্ধের পথে পরিচালিত করেন। যেমন, ব্যক্তিগত জীবনে হীনতাবোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মদম্ভ প্রকাশ করিতে চান; সেইরূপ শৈশবে ঈডিপাস্-স্তরে অপপ্রতিযোজনের ফলে কেহ কেহ আক্রমণভোতক হইয়া পড়েন। এই সকল রাষ্ট্রপরিচালকগণ ক্রমাগত প্রচারকার্য চালাইয়া এবং কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনে যুদ্ধবাদের 'আদর্শ' গ্রথিত করেন। অর্থাৎ ইহারা জনগণের মধ্যে মিথ্যা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়া জনমনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলেন।

৮১ তুলনীয়: "Men like war. They often fight for the love of excitement or the mere lust of fighting. While it is true, as someone has said, that anyone will fight when he is mad enough, it is also a fact that men will fight when they are not aroused, but just for the fun of it. War offers diversion and relief from *ennui*. It provides a mode of escape from the monotony of a dull existence." (M. R. Davie, *The Evolution of War*, p. 147).

(৩) **সমাজতাত্ত্বিক** দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা হয় যে, **সমাজমধ্যে** বিভিন্ন **স্বার্থ** (interest)-কে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। **এই সকল স্বার্থ প্রায়ই** পরস্পর-বিরোধী হয়। বিরোধ যখন তীব্র হইয়া উঠে মানুষ তখন আর শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিরোধের মীমাংসার কথা চিন্তা করে না—বরং উত্তেজনার মুহূর্তে তাহারা দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়াই বিরোধের সমাধান করিতে চাহে। ইহারই ফলে সমাজজীবনে আন্তর্দলীয় বিরোধের উদ্ভব। ক্রমশঃ যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বিবিধ রাষ্ট্রের বিরোধের ক্ষেত্রেও এই উপায় প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

(৪) নানা প্রকার **অর্থ নৈতিক** কারণেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শিল্পের উন্নতির ফলে পণ্যদ্রব্যের আধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য উৎপাদনকারী দেশগুলি সুযোগ খুঁজে—ইহার ফলে তাহারা আত্মবিস্তারের প্রচেষ্টা করে। অনুন্নত দেশগুলি করায়ত্ত করিয়া তথায় নিজেদের পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে। সেইরূপ, কোন কোন ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলি কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য যে সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য আছে সেগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করে। আবার, যে সকল শিল্পপতি অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা পরিচালনা করিয়া থাকে, তাহারাও অনেক সময় নানাভাবে যুদ্ধের প্ররোচনা দান করিয়া থাকে। সাধারণ ব্যবসায়ীরাও যুদ্ধকালে অসৎ উপায়ে লাভের প্রচুর সুযোগ দেখিয়া নানাছলে দেশে-বিদেশে যুদ্ধের সপক্ষে সুকৌশলে প্রচারকার্য চালায়।

কেবল যে অর্থনৈতিক সুবিধার জন্যই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেও বিদ্রোহ তথা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(৫) **রাজনৈতিক** কারণেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বর্তমান যুগে অনেক রাষ্ট্রে উগ্র জাতীয়তাবাদ অথবা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা জাগরিত করিয়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনে ইচ্ছাপূর্বক ঘৃণা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদির বৃত্তি জাগরিত করিয়া রাখা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের জাতিভুক্ত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা নিকটবর্তী যে রাজ্যে বাস করে সেগুলিকে কোন-না-কোন অজুহাতে করায়ত্ত করার চেষ্টা করা হয়; অথবা পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে স্বীয় নাগরিকদের সুকৌশলে অনুপ্রবেশ করাইয়া দিয়া কোন-না-কোন ভাবে তথাকথিত রাজনৈতিক সমস্যার

সৃষ্টি করে এবং তাহার পর উহাদের সমাধানকল্পে দৈহিক বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে।

এখানে আমরা যুদ্ধসংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করিলাম। এই সকল কারণ যে সকল সময় পৃথক্ থাকে তাহা নহে। ইহারা অনেক সময়ই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া এমন এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

(গ) যুদ্ধনিরোধের উপায়ঃ

বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা হইল কেমন করিয়া যুদ্ধ নিবারণ করিয়া **বিশ্বশান্তি** স্থাপন করা যায়। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনায়কগণ যেমন একদিকে বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, অপরদিকে সেইরূপ কেহ কাহাকে বিশ্বাস করেন না, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন এবং এই কারণে জগতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না চলিতে থাকিলেও একটা মানসিক উত্তেজনা বা 'ঠাণ্ডা লড়াই' (cold war)-এর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

মানুষের জৈবিক, মানসিক ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই অনেক সময় যুদ্ধের কারণ নিহিত থাকে বলিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা মানবীয় সভ্যতা হইতে পূর্ণভাবে তিরোহিত হইবে, ইহা বলা যায় না। তবে বর্তমানের সভ্য মানুষ যদি চেষ্টা করে তাহা হইলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। এইজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন। বর্তমানকালে জাতীয়-রাষ্ট্র (Nation-State) সংগঠিত হইবার ফলে অনেক স্থানেই অন্ধ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তথাকথিত জাতীয় কল্যাণের জন্য মানুষ অন্য রাষ্ট্রের উপর অত্যাচার করিতে দ্বিধা বোধ করে না।[৮২] দেশপ্রেম বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া দেশের প্রতি অনুরক্তির অর্থ নহে পররাজ্যের প্রতি লোলুপতা। জাতীয়তাবাদ বাঞ্ছনীয়; কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ বা পরজাতির প্রতি ঘৃণা বাঞ্ছনীয় নহে। স্বীয়-ধর্মের প্রতি অনুরাগ বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ভিন্নধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ বাঞ্ছনীয় নহে।

৮২ অন্ধ জাতীয়তাবাদের নিন্দা করিয়া রাসেল্ (Russell) বলেন: "A nation which believes that its welfare can only be secured by suffering and inflicting hundreds of thousands of equally horrible sacrifices is a nation which has no very spiritual conception of what constitutes national welfare." (*Principles of Social Reconstruction*, p. 109).

যুদ্ধের সম্ভাবনা কমাইতে হইলে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা জাগরূক করিতে হইবে, নূতন করিয়া মূল্যায়ন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করিতে হইবে, আমরা যে সকলে একই জগতের অধিবাসী, একই ঈশ্বরের সন্তান এই বিশ্বাস গঠন করিতে হইবে, স্বীয় গোষ্ঠী বা স্বীয় সম্প্রদায়ের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার মত সংসাহস অর্জন করিতে হইবে। এইভাবে যদি প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করিতে পারে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কলহের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়া যাইবে।[৮৩]

যুদ্ধের সম্ভাবনা কমাইবার আর একটি উপায় হইল জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য লইয়াই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ (U. N. O.) গঠিত হইয়াছিল। ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ঐক্যের সৃষ্টি করিলেও বিশ্বশান্তি স্থাপন করিতে বা যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে অবলুপ্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যভুক্ত অধিকাংশ রাষ্ট্র একেবারে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, পররাজ্যলোলুপতা ত্যাগ করিতে পারে নাই, বরং উহারা স্ব স্ব সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করিয়া নব নব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন কারতেছে।[৮৪]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধের অন্যতম কারণ হইল রাষ্ট্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা—

৮৩ সর্বজনীনতার আদর্শের উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলেন: "We all look up at the same stars, we dream beneath the same sky, we are fellow-passengers on the same planet, and it does not matter if we endeavour to find the ultimate truth along different roads." (*Religion & Society*, p. 227).

৮৪ তুলনীয়: "So long as there are many sovereign States each with its own Army, there can be no security that there will not be war. There will have to be in the world one Army and one Navy before there will be any reason to think that wars have ceased. This means that, so far as the military functions of the State are concerned, there will be one State, which will be world wide." (Russell, *op. cit*, p. 101).

অনেক সময়েই মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য হইল দৈহিক বলের প্রাধান্য। রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই মনোভাবের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।[৮৫]

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে: **অহিংসার আদর্শের মূল্য কি?** আদর্শ হিসাবে অহিংসার আদর্শ যে সুমহান্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানবসভ্যতা যে পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোন রাষ্ট্রই দৈহিক বল বা ক্ষাত্রশক্তিকে একেবারে পরিহার করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও দণ্ডবিধানের ব্যাপারে কিছু পরিমাণ বল প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, জগতে যেহেতু সকল রাষ্ট্র একই সময়ে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে না, সেই হেতু কোন রাষ্ট্রই বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার মত মনোবল গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। প্রতি রাষ্ট্রকেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অহিংসা বলিতে কাপুরুষতা বুঝায় না। আত্মরক্ষা এবং পরের আক্রমণ প্রতিহত করাও প্রতি রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।[৮৬] সুতরাং বিশ্বশান্তির জন্য প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য পররাজ্যলোলুপতা পরিত্যাগ করা, অকারণ অন্যরাষ্ট্র আক্রমণ না করা; কিন্তু পররাষ্ট্র আক্রমণ করিলে তাহাকে যথাশক্তি প্রতিহত করাও প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যুদ্ধবাদ (militarism) এবং আত্মরক্ষার জন্য ক্ষাত্রশক্তি প্রয়োগ, এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য করিতে হইবে। **যুদ্ধবাদের আদর্শ সকল রাষ্ট্রের পক্ষে পরিত্যাজ্য; কিন্তু অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।** আদর্শ রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী বলিতে আক্রমণবাহিনী বুঝায় না, উহা হইল শৃঙ্খলারক্ষা-বাহিনী ও প্রতিরক্ষা-বাহিনী।

৮৫ **অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলেন:** "Our whole conception of the state requires alteration. Power and force are not the ultimate realities in human society.......This faith in force is a disease that has twisted and tortured the world. It deprives us of our manhood." (*op. cit.*, pp. 221, 222).

৮৬ **অহিংসার মন্ত্রসাধক মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরণযোগ্য:** "My non-violence does not admit of running away from danger, and leaving dear ones unprotected. Between violence and cowardly flight, I can only prefer violence to cowardice.......Non-violence is the summit of bravery." (*Young India*, 29.5. 1924).

১১। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (Nationalism vs. Internationalism):

পূর্ব অনুচ্ছেদে আমরা যুদ্ধের সম্ভাবনারোধ ও বিশ্বশান্তি স্থাপনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ অনেক সময়ই বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। মানুষ যদিও অনুভব করে যে, সকলেই এক পৃথিবীর অধিবাসী এবং তাহাদের স্বভাবজ বৃত্তিগুলি মোটামুটি একই প্রকারের, তাহা হইলেও তাহারা বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের এই জাতিগত পার্থক্য এক শান্তিপূর্ণ মানব গোষ্ঠী স্থাপনে বাধাস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই বর্তমানের মানুষের সমস্যা হইল যে তাহার নিষ্ঠা আজ দ্বিধাবিভক্ত—একবার সে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়, আবার সে বৃহত্তর বা ব্যাপকতর মানবসমাজের কথা চিন্তা করে।

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৩৬৩) বলিয়াছি যে, ভাষাগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক সংস্থানগত অথবা অনুরূপ কোন কাবণজনিত ঐক্যবোধ হইতে জাতীয় সংহতির সৃষ্টি হয়। ইহার মূলে প্রধানতঃ আছে একটি বিশেষ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী—জাতিসংগঠনকারী ব্যক্তিরা একই জাতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস করে বলিয়াই জাতির সংগঠন সম্ভব হয় এবং উহার ধারা রক্ষিত হয়।

বর্তমানযুগের অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ হইল, 'এক একটি জাতি, এক একটি রাষ্ট্র' (one nation, one state)। জাতীয়তাবোধের প্রভাবে এক একটি জাতীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব কৃষ্টি ইত্যাদি রক্ষার দাবী উত্থাপিত হইতে লাগিল এবং ইহাই বলা হইতে লাগিল যে একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমেই কোন জাতি তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।[৮৭]

৮৭ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রেনেশাঁস (Renaissance)-এর যুগ হইতেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ফরাসী বিদ্রোহের প্রভাবে ঐ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহা জগতের সর্বত্র প্রসারিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় গোষ্ঠীরা অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ করে। সুতরাং যাহা কেবলমাত্র জাতীয় অনুভূতি ছিল, তাহাই কালক্রমে রাজনৈতিক আদর্শে রূপান্তরিত হয়। মর্লে (Lor Morley)-এর ভাষায়: "National sentiment changed to Political idea.......From instinct (nationalism) became idea, from idea, abstract principle; then fervid prepossession; ending where it is to-day, in dogma, whether accepted or evaded." (*History and Politics*, pp. 71, 72).

[এই প্রসঙ্গে *Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. XI, C. J. H. Hayes-রচিত নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের সপক্ষে বলা হয় যে, ব্যক্তিবিশেষকে যদি সম্পূর্ণরূপে কোন গোষ্ঠীর কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যায়, তাহা হইলে যেমন তাহার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে না, সেইরূপ কোন জাতীয় গোষ্ঠীকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার নিজস্ব কৃষ্টি বিকশিত হইতে পারে না। যদি একাধিক জাতীয় গোষ্ঠীকে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলেই ঐ রাষ্ট্র মধ্যে একটি জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা দৈহিক বলের আধিক্য হেতু প্রাধান্য করিবে এবং অন্য জাতির গোষ্ঠীগুলির উন্নতি ব্যাহত হইবে (এমন-কি কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা অবলুপ্ত হইয়া যাইবে)। এই কারণ প্রতি জাতিকেই (তাহা যত ক্ষুদ্রই হউক্) রাজনৈতিক মর্যাদা দান করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে দেওয়া উচিত। কোন রাষ্ট্রের আকার বা পরিধি যে উহার উন্নতির নির্দেশক নহে, তাহার উদাহরণ পাই প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা বর্তমান যুগের ডেনমার্ক, বেলজিয়াম্ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। জাতীয়তাবাদের আদর্শবিরোধীরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, সমগ্র জগৎকে যদি জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে জগতে বিভেদ তথা কলহ বাড়িতে থাকিবে এবং বিশ্বশান্তি ব্যাহত হইবে। জাতীয়তাবাদের সমর্থকেরা মনে করেন যে, এই আশঙ্কা অমূলক। জাতীয়-রাষ্ট্র সৃষ্টি করার অর্থ নহে যে, উহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিবে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সাহচর্যে আসার ফলে তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, অথচ প্রতি জাতির নিজস্ব কৃষ্টি অনুধাবন ও উন্নতিসাধনের স্বাধীনতা থাকিবে। ব্যক্তিগতসম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষ বহুজনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে তাহার ব্যক্তিত্বের বহুমুখী প্রকাশ ঘটে, সেইরূপ কোন জাতি যদি বিভিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহক অন্য বিভিন্ন জাতির সাহচর্যে বা সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে উহার নিজের ও তৎসহ সমগ্র জগতেরই উন্নতি হইবে। সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল বৈচিত্র্য ; সুতরাং জাতীয়তাবাদ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে বলিয়া উহা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

জাতীয়তাবাদের আদর্শের যাঁহারা বিরোধিতা করেন, তাঁহারা বলেন যে, এই আদর্শ অনুসারে যদি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। জাতীয়তাবাদীরা অনেক সময়ই

উগ্রপন্থী, স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রমনা হইয়া উঠেন এবং জাগতিক কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধবাদের আদর্শ প্রচার করেন। সুতরাং জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক হইয়া পড়ে। এইজন্য জাতীয়তাবাদ পরিহারপূর্বক আন্তর্জাতিকতাবোধ গঠন করা উচিত। একমাত্র আন্তর্জাতিকতা-বোধই বিশ্বকল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি স্থাপন করিতে পারে। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র যে পরিমাণ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিকতার পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেই পরিমাণে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমিয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষিত হইতে পারে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের আদর্শ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হইলেও প্রকৃত জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের মধ্যে বৈপরীত্য নাই। জাতীয়তাবাদ যখন চরম উগ্ররূপ ধারণ করে, তখনই উহা জাতিবিশেষ তথা জগতের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিরোধী নহে। যিনি আদর্শবাদী, তিনি মনে করেন যে, "আমার জাতির যেমন উন্নতি করিবার অধিকার আছে, অন্য জাতিরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমার জাতির পক্ষে যেমন অন্য জাতির সহযোগিতার প্রয়োজন, অন্য জাতিরও সেইরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন।" অপরপক্ষে, উগ্র জাতীয়তাবাদী বলেন যে, "ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, আমার জাতি যাহা করিবে তাহাই সমর্থন করা উচিত। আমার জাতীয় উন্নতিরই সকল বিষয় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত এবং আমার জাতির উন্নতির জন্য যদি অন্য জাতিকে অবদমিত করার প্রয়োজন হয়, তাহাও বিনা দ্বিধায় করা উচিত।" এই শেষোক্ত প্রকার উগ্র জাতীয়তাবাদই বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। অপরপক্ষে, **আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের বিরোধী নহে —আন্তর্জাতিকতাবাদের অর্থ বিভিন্ন জাতির অবলুপ্তি নহে; বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ব্যতীত আন্তর্জাতিকতাবাদের অর্থ থাকে না। বৈচিত্র্যের পশ্চাতে ঐক্যই আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত তাৎপর্য।**[৮৮]

৮৮ তুলনীয়: (১) "Although nationalism and internationalism are considered to be mutually hostile,......it is not to be denied that an internationalism is conceivable which not only does not question nationalism but presupposes it." (*Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. XI).

(২) "To forget humanity is to suppress the aim of our labours. To cancel the nation is to suppress the instrument by which to achieve the aim." (Mazzini).

যদিও উচ্চ পর্যায়ের জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জাতিকতাবোধের বিরোধ নাই, তাহা হইলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদ সকল সময় সু-উচ্চ আদর্শ অনুধান করিতে পারে না এবং ইহার অবনতি ঘটে। ইহার ফলে এক উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় এবং উহা পররাজ্যলোলুপতা ও সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র দুর্বল জাতির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, সাম্প্রতিককালে অনেকস্থলেই উহারই নামে অনেক রাষ্ট্র আত্ম-বিস্তার ও পররাজ্যগ্রাসের চেষ্টা করিয়াছে।[৮৯] প্রায়ই ইহা মিথ্যা অহমিকা ও দম্ভের সৃষ্টি করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

সুতরাং জাতীয়তাবাদের আদর্শকে চরম মূল্য দান করা বা একমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। একথা সত্য যে প্রত্যেক জাতি তথা রাষ্ট্রের স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবং স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী জাতিগত কৃষ্টির প্রগতিসাধনের অধিকার আছে; কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্র বা জাতি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরশীল এবং অন্য সকল জাতির সহিত সম্পর্কবিহীন থাকিতে পারে না, সেই হেতু কোন জাতিই এমন আচরণ করিতে পারে না যাহার ফলে অন্যের ক্ষতি হইবে অথবা যাহা সাধারণভাবে নীতিবিরোধী বা দুর্নীতিমূলক হইবে। প্রত্যেক জাতীয়-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি এই আদর্শ স্মরণ রাখেন, তবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষিত হইতে পারে। যে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও দুর্নীতি অনুসরণ করিবে ও আত্মধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।[৯০]

৮৯ এইজন্য বার্ণস্ (C.D. Burns) বলিয়াছেন: "As things now stand, the nationalism which was the ideal of small oppressed or divided races has become identified with Imperialism when the nation has secured its position." (*Political Ideals*, p. 195). সেইরূপ অধ্যাপক লাস্কি (Laski) মন্তব্য করিয়াছেন: "A nationalism that implies the sovereign right of self-determination......involves the politics of prestige, and these, in their turn, involve a world so ordered that relationships between nations cannnot become matters to be determined by justice." (*A Grammar of Politics*, p. 225).

৯০ তুলনীয়: "A nation is entitled to live But because it cannot live to itself alone, the question of how it is to live is not a question it is entitled to determine *alone*.......The rights of a nation-state do not

১২। নাগরিক জীবনের আদর্শ (Civic Ideal) :

বর্তমান যুগে প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকের নাগরিকত্বের সহিত গুরুদায়িত্ব সংশ্লিষ্ট থাকে। কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়া (অথবা কোন কৃত্রিম উপায়ে) নাগরিকত্ব অর্জন করা এবং রাষ্ট্রকে কয়েকটি নির্দিষ্ট করদান করা অথবা নির্দিষ্ট সাময়িক ব্যবধানে ভোটদান করার মধ্যেই নাগরিকত্ব পরিসমাপ্ত হয় না। নাগরিকত্ব বলিতে আজ আর নির্লিপ্ত উদাসীন জীবনযাত্রা বুঝায় না—নাগরিককে লইয়াই রাষ্ট্র। সুতরাং **নাগরিকত্ব বলিতে সক্রিয় বা কর্মময় দায়িত্বপূর্ণ জীবন বুঝায়**। নাগরিক ও রাষ্ট্র পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ; বাস্তবিক নাগরিক ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন তাৎপর্য থাকে না। রাষ্ট্রের পরিচালনায় নাগরিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। যদি কোন রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহা হইলে নাগরিকগণের উচিত তাহাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা।

নাগরিকগণ যেমন একদিকে স্বীয় অধিকার রক্ষায় সচেতন থাকিবে, সেইরূপ তাহাদের কর্তব্য পালনেও সচেতন থাকিতে হইবে। আলস্য, কর্মবিমুখতা, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রকে সুসংহত ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নাগরিকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে যেমন একদিকে অযথা আত্মবিস্তারের চেষ্টা করিয়া পররাজ্য গ্রাস করা উচিত নহে, সেইরূপ অপরদিকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মোট কথা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকের উদাসীন থাকা উচিত ত' নহেই, বরং ঐ বিষয়ে সক্রিয় আগ্রহ দেখান উচিত। নাগরিকগণের পক্ষে সর্বদা আত্মশিক্ষা ও আত্মোন্নতির চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতীত নাগরিকগণের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও নাগরিকের আত্মিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

consist in safe-guarding its own interests at the expense of others. That is a politics of power which denies the idea of right in the relation between the states ; and it is elementary that the denial of right abroad means sooner or later, the denial of right at home". (*Ibid.*, pp. 225, 226).

নাগরিকের আর একটি কর্তব্য হইল স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের ক্ষমতা আয়ত্ত করা। নাগরিক যেন রাষ্ট্রীয় আদেশ নিষ্প্রাণ যন্ত্রের ন্যায় পালন না করে। **নির্ভীক, নিঃশঙ্কচিত্তে নীতির পথ অনুসরণ করিয়া চলাই নাগরিকের কর্তব্য।**[২১] সাধারণভাবে প্রতি নাগরিকের—এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্র পরিচালকদের—স্মরণ রাখা উচিত যে, নীতির দুইটি আদর্শ নাই, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে যাহা দুর্নীতিমূলক রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহা নৈতিক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত নীতি (private morality) এবং রাষ্ট্রীয় বা সর্বজন নীতি (public morality), এই দুই-এর মধ্যে যতদূর সম্ভব পার্থক্য অবলুপ্ত করিতে হইবে।[২২]

---

২১ ভারত সম্বন্ধে কবিগুরুর যে প্রার্থনা তাহা প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত :

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত,..................
............যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা,............
....
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

২২ বার্ণস্ (C.D. Burns)-এর ভাষায় : "The morality of a man acting for his group should not be lower than when acting for himself ; and again, every member of a group in so far as it is a moral association, should be unwilling to benefit by any act of his representatives which he would be ashamed to do for himself." (*op. cit.*, p. 350).

দ্বাদশ অধ্যায়

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক ব্যাধি

আমাদের সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজের আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীও সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। ইহার ফলে সমাজের সকলে সামাজিক অবস্থার সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারে না। এই কারণে প্রতি যুগে প্রতি সমাজেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইলে এই সকল সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই সকল সামাজিক সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

১। সামাজিক সমস্যা কাহাকে বলে? (What is a Social Problem ?) :

যদিও সামাজিক জীব হিসাবে আমরা সকলেই প্রতিনিয়তই কোন-না-কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহা হইলেও সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু সংজ্ঞাদান করা কঠিন। সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞাদানের একটি প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহার তালিকা অতি ব্যাপক এবং সেইজন্য অনির্দিষ্ট; সেই কারণ সমস্যাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোন সংজ্ঞা গঠন করা অসুবিধাজনক। আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন আলোড়ন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রীরা গোপনে পলায়ন করিতে কেন চেষ্টা করে বা বালক-বালিকারা কেন মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করে—এ সবই হইল সামাজিক সমস্যা।

'সামাজিক সমস্যা'-পদটির তাৎপর্য নির্ধারণ করিবার জন্য 'সামাজিক' ও 'সমস্যা' এই দুইটি পদেরই উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। 'সামাজিক' বলিতে ব্যক্তি-বিশেষের এমন আন্তর্ব্যক্তিক আচরণ বুঝায় যেগুলি ব্যক্তি-বিশেষ সমাজে বিচরণশীল জীব হিসাবে এবং অন্যের সহিত ভাবের আদান-প্রদানে বা মিথষ্ক্রিয়ায় প্রকাশ করে। কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বহির্ভূত জীব হিসাবে বাস করিতে পারে না; সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষের সকল আচরণই

অল্পাধিক সামাজিক হইয়া পড়ে। তবে সামাজিক সমস্যা আলোচনাকালে ব্যক্তি-বিশেষের যে সকল আচরণ সমাজের অন্যব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে, সেইগুলির উপরই মনোযোগ অর্পণ করা হয়। এখন প্রশ্ন হইল : 'সমস্যা' কাহাকে বলে? সমস্যা বলিতে এক জটিল পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু এই জটিলতার উদ্ভব হয় কি ভাবে? যখন একটি আদর্শ সমাজমধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হয় এবং উহার বিচ্যুতি ঘটে, কিন্তু কেন, কিভাবে এই বিচ্যুতি ঘটে ও কোন্ উপায়ে এই আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না, তখনই সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যার কারণ ও সমাধানের বিষয় লইয়া বিতর্ক দেখা দেয়।

সামাজিক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় :

(ক) সামাজিক সমস্যার পশ্চাতে আছে **পরিবর্তনের ধারণা**। সমাজ যদি পরিবর্তনবিহীন অচলায়তন হইত, তাহা হইলে নূতন নূতন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইত না। নূতন পরিস্থিতি বা নূতন আদর্শকে স্বীকার না করার জন্য অথবা উহার সহিত প্রতিযোজনের অক্ষমতা হেতু অনেক সময় সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এই সকল সমস্যাগুলির কতকগুলি হইল নূতন, আর কতকগুলি হইল পুরাতন সমস্যারই নূতন আকারে আবির্ভাব।

(খ) যদিও সামাজিক পরিবর্তন হইতেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহা হইলেও কোন সমস্যার সহিত কেবলমাত্র পরিবর্তনের ধারণাই সংশ্লিষ্ট থাকে না। যে কোন সামাজিক সমস্যার সহিত **আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতার ধারণাও** থাকে—সামাজিক সমস্যা লইয়া মানুষ যখন চিন্তা করে, তখন তাহার এই ধারণাও থাকে যে ঐ সমস্যা সাময়িকভাবে সমাজ-জীবনকে অল্পাধিক বিপর্যস্ত করিয়াছে এবং উহার স্থিতিশীলতা বা সাম্যভাবকে নষ্ট করিয়াছে; আবার ঐ সমস্যার সমাধান হইলে সাম্যভাব পুনঃস্থাপিত হইবে।

(গ) সামাজিক সমস্যা বলিতে কোন-না-কোন **সামাজিক আদর্শের** প্রতি ইঙ্গিত থাকে। ঐ আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়াই সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। আবার এই বিশ্বাস থাকে যে, সমাজের আদর্শ অনুসারে কার্য করিলে সমাজ তথা সমাজস্থ ব্যক্তিগণের জীবনযাত্রা সন্তোষজনকভাবে চলিবে।

(ঘ) সামাজিক সমস্যার সহিত আদর্শের ধারণা বিজড়িত থাকে বলিয়া স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যে আচরণ সমস্যার সৃষ্টি করে

তাহা **অস্বাভাবিক** (abnormal) বলিয়া পরিগণিত হয় বলিয়াই সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে : স্বাভাবিকতার মাপকাঠি কী ?

(ঙ) সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টার সহিত অল্লাধিক **আশাবাদ** বিজড়িত থাকে। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা সমাধান করিতে যাঁহারা অগ্রণী হ'ন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঐরূপ সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং ঐরূপ সমাধানের ফলে যখন নির্দিষ্ট পথ নির্বাচিত হইবে, তখন সেই পথ অনুসারে চলিলে সামাজিক প্রগতি ঘটিবে। মোট কথা, সামাজিক সমস্যার সমাধানে যাঁহারা ব্রতী হ'ন, তাঁহারা একাধারে সমাধানের সম্ভাব্যতা এবং প্রগতির সম্ভাব্যতায় আস্থাবান্।

বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজন ও আদর্শ বিভিন্ন। সুতরাং কোন এক সমাজের পক্ষে যাহা সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হয়, আর এক সমাজের পক্ষে তাহা সমস্যা না হইতে পারে অথবা সেইরূপ সমস্যার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে।

সামাজিক সমস্যামাত্রই বহু বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই বিতর্ক সাধারণতঃ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতে পারে ; অর্থাৎ সমস্যার স্বরূপ লইয়া বিতর্ক, সমাধানের উপায় লইয়া বিতর্ক এবং আদর্শ লইয়া বিতর্ক। প্রথমতঃ, কোন একটি বিশেষ সমস্যা বাস্তবিকই 'সমস্যা' পদবাচ্য কি না, বাস্তবিকই উহা সমাজমধ্যে কোন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে কি না, অথবা উহা সামাজিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারামাত্র, সে বিষয় মতভেদ থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি বিশেষ 'সমস্যা' সমস্যা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে—বিভিন্ন চিন্তাবিৎ বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পক্ষে কোন্ আদর্শ অনুধাবন-যোগ্য হইবে, সে বিষয়েও মতবৈষম্য দেখা দিতে পারে। এই সকল বিতর্কের সম্ভাবনার জন্য সামাজিক সমস্যার কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান অনেকক্ষেত্রেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

২। সামাজিক সমস্যার উদ্ভবের কারণ (Origin of the Social Problems) :

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, সামাজিক সমস্যা নানাবিধ হইতে পারে এবং ইহার কারণও বহুবিধ হইয়া থাকে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ কারণ দ্বারা সকল প্রকার সামাজিক সমস্যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যার প্রধান কারণ হইল **সামাজিক পরিবর্তন** (social change)। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে

এমন এক জটিলতার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত সমাজের অর্থনৈতিক, কৃষ্টিমূলক, ধর্মীয় এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বহুবিধ পরিবর্তন সূচিত হয় এবং প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ইহার ফলে সমাজজীবনে সমস্যার উদ্ভব হয়।

সামাজিক পরিবর্তনসমূহকে যদি আবার বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখি যে, কতকগুলি পরিবর্তন সমাজের সাধারণ গতীয়তা (dynamism)-এর ফলেই সাধিত হয়। অর্থাৎ সামাজিক জীবন একেবারে গতিহীন হইতে পারে না এবং তাহার ফলে কতকগুলি পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে। আবার কতকগুলি পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটিয়া থাকিতে পারে; যেমন, যুদ্ধের ফলে হঠাৎ অভ্যস্ত সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে সমাজের সকলক্ষেত্রেই এক বিরাট্ পরিবর্তন আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়ে। সেইরূপ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সমাজ-জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই কারণে জীবনযাত্রার মানও উন্নীত (অন্ততঃ পরিবর্তিত) হইয়াছে। আবার যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের ফলে নানাবিধ মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা যেন কমিয়া যায়; ইহার ফলে মানুষের মনে হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া, বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান মানুষের অনেক পুরাতন বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি নষ্ট করিয়া দেয়; সুতরাং প্রাচীন আদর্শ, লক্ষ্য ইত্যাদি পরিবর্তিত হইয়া সমাজজীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং এইজন্য বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিল্পীয় উন্নতি বা পরিবর্তনের ফলেও নানা সমস্যা দেখা দেয়।

বস্তুগত (objective) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাহা পরিবর্তন বলিয়া বর্ণিত হয়, **মনোগত (subjective) দৃষ্টিভঙ্গী** হইতে তাহাই আবার **প্রতিযোজনের সমস্যার** সৃষ্টি করে। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তনের সহিত মানুষ সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারে না বলিয়াই নানা প্রকার অদ্ভুত সামঞ্জস্যবিহীন আচরণ প্রকাশ পায়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে যদি এমন ঘটে যে, মানুষ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু—যথা, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সহজে সংগ্রহ করিতে পারে না বা সংগ্রহ করিতে বেগ বোধ করে, তখন সাধারণ মানুষের মনে ব্যর্থতা, হতাশা, আক্রোশ, নৈরাশ্য ইত্যাদি দেখা দেয় এবং এই কারণ সমাজে নানারূপ অশান্তি

দেখা দেয় ও সামাজিক সমস্যার আবির্ভাব হয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক বিষয়-বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা সমাজমধ্যে তীব্র এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে—ইহার ফলেও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। বর্তমানে শিল্পযুগে মানুষ শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারিলেও উৎপন্ন বস্তু ভোগ বা বণ্টনের ক্ষেত্রে কেহই সন্তুষ্ট নহে এবং ইহার ফলে পারস্পরিক বিরোধিতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান কালের সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের অন্যতম মাপকাঠি হইল বিত্ত বা সম্পদ। বিত্ত বা ধন দ্বারাই সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়। কিন্তু ঠিক কী পরিমাণ বিত্ত সামাজিক মর্যাদার জন্য পর্যাপ্ত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং তথাকথিত অর্থকৌলীন্য লাভের উদগ্র বাসনা মানবমনে থাকিয়া যায় এবং ইহার ফলে প্রায়ই সমস্যার উদ্ভব হয়। যদি কোন সমাজব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক সংগঠন পরিহার করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই সমাজে ধনবৈষম্যগত সমস্যাগুলি তিরোহিত হইবে আশা করা যায়; কিন্তু আবার অন্য প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হইবে।

মানুষ যখন বোধ করিতে থাকে যে, সে সমাজের যোগ্য নহে, বা সে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা পাইতেছে না বা সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিতেছে না, তখন সে নানাপ্রকার অপ-প্রতিযোজনমূলক ব্যবহার করে। কাহারও ভিতর তীব্র দুশ্চিন্তা, ভয় ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়, কাহারও কাহারও মধ্যে নানা প্রকারের মানসিক বৈলক্ষণ্য বা বাতুলতা দেখা দেয়, কেহ কেহ ক্ষতিপূরণমূলক (compensatory) আচরণ করে, কেহ কল্পনার জাল বুনিতে থাকে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত জীবনে এই প্রকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিলে, সমাজজীবনের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইবে—সামাজিক জীবনযাত্রার মান ক্ষুণ্ণ হইবে, সমাজে দুর্নীতি ও অপরাধ বাড়িতে থাকিবে। মোট কথা, ব্যক্তি-মনের অস্বাভাবিকতার ফলে সামাজিক স্বাস্থ্য (social health)-এর অবনতি ঘটিবে।

৩। সামাজিক সমস্যার পরিধি (The Exent of Social Problems):

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৪৩৯) ইঙ্গিত করিয়াছি যে, সামাজিক সমস্যার পরিধি ব্যাপক। আন্তর্জাতিক অশান্তি, এ্যাটম্ বা অণু বিস্ফোরণ এও যেমন সামাজিক সমস্যা, ক্ষুদ্র গ্রামের অখ্যাতনামা পরিবারের অবাধ্য বালকের আচরণও সেইরূপ এক হিসাবে সামাজিক সমস্যা। যদিও সামাজিক সমস্যার সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ তালিকা

দান সম্ভব নহে, তাহা হইলেও আমরা এ স্থলে কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করিতে পারি :—

(১) জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় সমস্যা—জনতার সংগঠন, জনতার হ্রাসবৃদ্ধি, জনসংখ্যার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের হার, জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা এবং উহাদের কোন একটি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইলে তাহার কারণ-নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের উপায় ইত্যাদি হইল জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় সমস্যা।

(২) বার্ধক্যজনিত সমস্যা—সমাজে যাহারা বৃদ্ধ, অক্ষম হইয়া পড়িতেছে সমাজ তাহাদের কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহাদের ভরণপোষণ ও চিকিৎসার কী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, তাহাদের অবসর যাপনের, ধর্মানুষ্ঠানের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ইত্যাদি হইল সমাজের বৃদ্ধদের সংক্রান্ত সমস্যা।

(৩) মানসিক বৈকল্য ও শারীরিক অক্ষমতাজনিত সমস্যা—প্রতি সমাজেই কিছু সংখ্যক লোক শারীরিক অক্ষমতার ফলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে; যেমন, কেহ অন্ধ, কেহ পঙ্গু, কেহ মূক ও বধির। ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়া উপার্জনক্ষম প্রতিযোজনশীল সামাজিক জীব করিয়া তোলা সমাজের সমস্যা। সেইরূপ যাহারা মানসিক বিকারে ভুগিতেছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখাও সমাজের কর্তব্য।

(৪) জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যা—সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা ও উহাকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা সামাজিক সমস্যা। এ বিষয়ে রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, জনগণের পুষ্টিসাধনের উপযুক্ত খাদ্যাদি সহজলভ্য করা, জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার করা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমাজের কর্ণধারদের চিন্তা করা উচিত।

(৫) পারিবারিক সমস্যা—সনাতন পারিবারিক ব্যবস্থায় সকল সমাজেই পরিবর্তন আসিয়া পড়ে। এইজন্য বিবাহের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পারিবারিক শান্তি, প্রবীণ ও নবীনদের সম্বন্ধ, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নানা সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়তই উদ্ভূত হইতেছে।

(৬) গ্রাম ও সহর সম্বন্ধীয় সমস্যা—প্রতি সমাজের অধিবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক নগরে বাস করে এবং বাকী লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের কতকগুলি নিজস্ব সমস্যা আছে যেগুলি নগরের নাই, আবার নগরের কতকগুলি সমস্যা আছে যেগুলি গ্রামের নাই। গ্রামীণ জীবনের মধ্যে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থাকে

যাহা নাগরিক জীবনে অভাব ; আবার গ্রামে কৃষিশিল্পের প্রাধান্য, কিন্তু নগরে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য ; গ্রামীণ জীবনে অনেক সময় সরল অনাড়ম্বর ভাব দেখা যায়, নাগরিক জীবনে বিলাসিতার প্রাধান্য। কিন্তু গ্রাম ও নগর পরস্পর হইতে বহুদিন পৃথক্ বা সম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। সেইজন্য নাগরিক জীবনের বিলাসিতা, দুর্নীতি ইত্যাদি গ্রাম্যজীবনকে প্রভাবিত করিতেছে। অপরপক্ষে, নগরে শিক্ষা ও অন্যান্য কৃষ্টিমূলক সংঘের যেরূপ সংখ্যাধিক্য আছে, সকল গ্রামে সেইরূপ নাই। ইহার ফলে গ্রাম্য জীবনে সকল সময় জ্ঞান-বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা নাই। সুতরাং কোন্ প্রকার সমাজব্যবস্থায় গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের সুবিধাগুলি রক্ষা করিয়া অসুবিধা বা কুফলগুলি দূর করা যায় তাহা একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা।

(৭) শিল্পসংস্থা সম্বন্ধীয় সমস্যা—বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য। প্রতি দেশেই বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনের ফলে বহু কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে। এইগুলি স্থাপিত হওয়ার ফলে যেমন উৎপাদনের সুবিধা হইয়াছে, সেইরূপ নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। অনেকস্থলে কুশলী কুটীরশিল্পী তাহার অন্নসংস্থানের অবলম্বন হারাইয়াছে। শিল্পকেন্দ্রে অপরিণতবয়স্ক বালক-বালিকারা এবং স্ত্রীলোকেরা শ্রমিকের কার্যভার গ্রহণ করায় তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, শিক্ষালাভের সুযোগ কমিয়া যাইতেছে, দুর্নীতি বাড়িতেছে, পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হইতেছে। তাহা ছাড়া, মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের ফলে প্রায়ই ধর্মঘট, কলহ ইত্যাদি সামাজিক-শান্তি-বিঘ্নকারী ঘটনা ঘটিতেছে।

(৮) শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা—শিক্ষার ক্ষেত্রে নানারূপ সমস্যা দেখা দিতেছে। কোন্ পদ্ধতিতে, কোন্ ক্রম-অনুসারে এবং কোন্ আদর্শের অনুসরণে শিক্ষা কার্য সাধিত হইবে, শিক্ষক-ছাত্রের আদর্শ সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সমাজে শিক্ষককে কিভাবে মর্যাদা দান করা যায়, ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কিভাবে সাধিত হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কি প্রকার হইবে ইত্যাদি হইল শিক্ষা-সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা।

(৯) ধর্ম-সংক্রান্ত সমস্যা—ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থা বর্তমান যুগের মানুষের উপর পূর্বের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে না ; অথচ মানুষের মনের পক্ষে ধর্মের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের অনুগামিগণ ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে সমাজে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবোধ এবং কলহ, বিদ্বেষ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং ধর্মের সার সত্য রক্ষা করিয়া উহার সহিত ক্ষতিকারক সাম্প্রদায়িকতা-বোধ কিভাবে পরিহার করা যায় তাহাও এক প্রবল সামাজিক সমস্যা।

(১০) কৃষ্টিমূলকসংস্থা-সংক্রান্ত সমস্যা—শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি ব্যতীতও উচ্চ পর্যায়ের কৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, কলাশিল্প, সাহিত্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এমন আদর্শ প্রচারিত হইতে পারে যাহা নীতির দিক্ হইতে হয়ত' পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না, অথচ সেইগুলি এমন জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে বা জনসাধারণ উহাদের প্রতি এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, হঠাৎ কোন পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে বা সেগুলির প্রচার রোধ করিলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে। সুতরাং নীতি ও জনমনের তৃপ্তি সাধন এই দুই-এর সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা হইতে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন জাতের পারস্পরিক যোগাযোগের ফলেও কৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং সে জন্যও নানা সমস্যা দেখা দেয়[১]।

(১১) অর্থনৈতিক সমস্যা—প্রতি সমাজেরই অর্থনৈতিক সংগঠন হইতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। পুঁজিবাদীদের সংস্থা, ব্যবসায়ের উত্থান-পতন, বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়।

(১২) সংখ্যালঘিষ্ঠ-সংক্রান্ত সমস্যা—যে সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনবসতি, সেখানে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে; অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এইরূপ নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা করিয়া সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই নানা প্রকার অভিযোগ করিতে থাকে। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, অন্ততঃ এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

(১৩) রাজনীতি-সংক্রান্ত সমস্যা—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আদর্শের সংঘাত, রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার-সংক্রান্ত সমস্যা, সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত সমস্যা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত সমস্যা, রাজনৈতিক নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি বহুবিধ রাজনৈতিক সমস্যা সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

---

১ কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্যাপক অর্থে কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উহার প্রতিটি 'অংশ' অপরটির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন সমাজের কৃষ্টির একাংশের যদি পরিবর্তন ঘটে এবং অপর অংশ যদি তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া না চলিতে পারে, তাহা হইলে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। ইহাকে 'cultural lag' বলে। (W. F. Ogburn, *Social Change* দ্রষ্টব্য)।

(১৪) নৈতিক সমস্যা—সমাজ-জীবনে সকলেই সমান নীতিবোধ সম্পন্ন হইতে পারে না—কিছু সংখ্যক লোকের অধঃপতন হইয়া থাকে। ইহার ফলে সমাজে চুরি, প্রতারণা, নরহত্যা ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে। নৈতিক অদর্শচ্যুতি অপরাধের সাধারণ কারণ হইলেও, অপরাধের পশ্চাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বিবিধ কারণ থাকিতে পারে। সুতরাং এ সকল কারণ অনুসন্ধান, উহাদের দূরীকরণের প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত নীতির মান উন্নয়ন ইত্যাদিও হইল উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমস্যা।

(১৫) যুদ্ধকালীন সমস্যা—যুদ্ধের সময় যখন বিভিন্ন রাজ্য পরস্পরকে আক্রমণ করে, তখন সেই বিপজ্জনক অবস্থায় নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। রাষ্ট্রকে বহু আপদ্‌কালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়—সমাজের সকলে উহাদের সম্মতি সহকারে গ্রহণ করিতে নাও পারে; সুতরাং কিভাবে সমাজের মনোবল রক্ষা করা যায়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় কি ভাবে রহিত করা যায়, দুর্নীতি কি ভাবে রোধ করা যায় ইত্যাদি সমস্যা প্রবল আকারে যুদ্ধের সময় দেখা যায়।

(১৬) আন্তর্জাতিক অশান্তিজনিত সমস্যা—যখন যুদ্ধ নাও চলে, তখনও এমন অনেক পরিস্থিতি ঘটিতে পারে যাহাতে কোন বিশেষ সমাজে সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন, কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অন্তর্বিপ্লব ঘটিলে সেই রাষ্ট্রের অনেক অধিবাসী উদ্বাস্তুরূপে নির্বিরোধী রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে পারে এবং উহার সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে। সেইরূপ এ্যাটম্‌-বিস্ফোরণ জনিত পরীক্ষার ফলে পরীক্ষা-কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানের বায়ু এরূপ দূষিত হইতে পারে যাহার ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

আমরা উপরে কতকগুলি প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করিলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সামাজিক সমস্যার সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন সম্ভব নহে।[২] বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন যুগে, যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, তাহাদের

২ অধ্যাপক ফেল্‌প্‌স্ (H. A. Phelps) বিবিধ সামাজিক সমস্যাগুলিকে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন :

(১) প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হইতে উদ্ভূত সমস্যা (যেমন, জন্ম, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যা); (২) জনসংখ্যাজনিত সমস্যা; (৩) সামাজিক সংগঠন হইতে উদ্ভূত সমস্যা (যথা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা); (৪) আদর্শের পরিবর্তন ও সংঘাত জনিত সমস্যা। (*Contemporary Social Problems*, pp. 685-86 দ্রষ্টব্য)।

কতকগুলি নূতন, আবার কতকগুলি বা নবরূপে পুরাতনের আবির্ভাব। মোট কথা, গতিশীল সমাজমাত্রই কোন-না-কোন সমস্যার সম্মুখীন হইবে।[৩]

৪। সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান (Social Pathology):

বিবিধ সামাজিক সমস্যাগুলির তীব্রতা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। **যখন কোন সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়া সমাজ-দেহকে পঙ্গু করিয়া ফেলে, তখন উহাকে সামাজিক ব্যাধি বলা যাইতে পারে। সমাজতত্ত্বের যে বিভাগ এই সকল সামাজিক ব্যাধির নিদান বা কারণ এবং উহাদের দূর করিবার উপায় লইয়া আলোচনা করে তাহাকে সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান বলে।** স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, এখানে সমস্যাবিচলিত সমাজকে রোগগ্রস্ত জীবদেহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমাজকে পূর্ণরূপে জীবদেহের সহিত তুলনা করা যায় না (পৃঃ ৫৫-৫৭); তবে বর্তমানক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাধি বলিতে অবাঞ্ছিত সামাজিক অবস্থা বুঝায়—অর্থাৎ সমাজমধ্যে জনগণের দারিদ্র্য, অপরাধপ্রবণতা, অস্বাভাবিক পরনির্ভরশীলতা, অক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষতিকর বা অমঙ্গলজনক সামাজিক অবস্থাই 'সামাজিক ব্যাধি' বলিয়া বর্ণিত হয়। সুতরাং **'সামাজিক ব্যাধি' সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা অপপ্রতিযোজন নির্দেশ করে।**[৪]

---

৩ **তুলনীয়:** "The panorama of social problems is continuously changing. Those confronting a given generation may include many of the same ones with which earlier generations had to deal, some of them in essentially the same form. Others, however, although the area and the name may be the same, have a much different specific content. A few problems are solved or dropped from the list for other reasons. But new ones emerge, it would seem, in ever greater numbers. The net effect of all is to make for continuous change in the perplexing situations or matters with which society is confronted." (T.P. Smith etc., *Social Problems*, p. 16).

৪ **তুলনীয়:** "(Social pathology is) a study of social disorganization or maladjustment in which there is a discussion of the meaning, extent, causes, results and treatment of the factors that prevent or reduce social adjustment; such as: poverty, unemployment, old age, ill health, feeble-mindedness, insanity, crime, divorce, prostitution, family tensions." (Fairchild, *Dictionary of Sociolology*).

বর্তমানের অনেক লেখক pathology. রোগনিদানতত্ত্ব বা ব্যাধিবিজ্ঞান পদটি পছন্দ করেন না। তাঁহারা বিশৃঙ্খলা বা সংগঠনের অভাব (disorganization) পদটি ব্যবহার করেন। বর্তমানের

ব্যাধিবিজ্ঞান বা রোগনিদানতত্ত্ব (pathology)-পদটি যখন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা হয়, তখন তিনটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, সমাজের একটি স্বাস্থ্যমণ্ডিত বা সুস্থ অবস্থা কল্পনা করা হয় এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে, এই অবস্থার ব্যতিক্রমেই ব্যাধির উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের যেমন বিভিন্ন প্রকারের রোগ হইতে পারে, সেইরূপ বিভিন্ন সমাজের ব্যাধিও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যদিও 'ব্যাধি-বিজ্ঞান' পদটি চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহার সহিত নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুতি বুঝায়। সুতরাং ইহার সহিত নৈতিকতাবোধের ধারণাও সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। মোট কথা, ব্যাধি-বিজ্ঞানের উপমার সহিত সামাজিক স্বাস্থ্য বা আদর্শ সামাজিক অবস্থা, উহা হইতে বিভিন্ন প্রকার বিচ্যুতির ধারণা এবং নৈতিকতার ধারণা সংশ্লিষ্ট থাকে।

যেহেতু প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলিকে ব্যাধির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সেই হেতু এই সকল সমস্যাকে বুঝিবার জন্য একটি আদর্শ সামাজিক অবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে: **সামাজিক স্বাস্থ্য কাহাকে বলে?** কিন্তু সমাজের পক্ষে এই আদর্শ অবস্থা বা সুস্থ অবস্থা ঠিক কিরূপ হইবে তাহা বর্ণনা করা বা নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। প্রতি প্রাণীর যেমন নিজস্ব বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য আছে, তথাকথিত সমাজদেহের এইরূপ কোন পৃথক্ স্বাস্থ্য নাই। 'সামাজিক স্বাস্থ্য' সমাজসংগঠনকারী পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির স্বাস্থ্য লইয়া গঠিত; অথচ সামাজিক স্বাস্থ্য বা আদর্শ সামাজিক অবস্থা বলিতে এমন কোন অবস্থা বুঝাইতে পারে না যাহাতে প্রতি ব্যক্তিরই স্বাস্থ্য বুঝায়, কারণ প্রতি ব্যক্তিই একই সময় 'আদর্শ অবস্থা'-তে থাকিতে পারে না। যদি বলা যায়, 'সামাজিক স্বাস্থ্য' বলিতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের মঙ্গল বুঝায়, তাহা হইলেও সমগ্র সমাজের দিক্ হইতে উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থার ইঙ্গিত করে না, কারণ সমাজের একাংশের যদি 'স্বাস্থ্য'-ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে 'সমগ্র সমাজ' ব্যাধি-বিহীন বলা যায় না।

দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া Humphrey বলেন: "It (pathology) became a name-calling term. As sociology passed beyond the analogic stage in its development, another conception, that of disorganization, arose." (*Principles of Sociology*, Ed. by A.M. Lee).

অতএব বলা যাইতে পারে যে, ব্যাধি-বিজ্ঞানের উপমা সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে না। বিশেষতঃ সমাজ মধ্যে এত বিভিন্ন পরিবর্তন আসে যে স্থায়ী সামাজিক স্বাস্থ্যের ধারণা করা কঠিন।[৫] তবে সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচনাকালে আমাদের একটি আদর্শ অবস্থা কল্পনা করিয়া উহা হইতে সমাজমধ্যে কিভাবে এবং কতদুর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। আবার, কোন বিশেষ সমাজের আদর্শ অবস্থা কী হইতে পারে তাহা স্থিরীকরণের জন্য ঐ সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের নমুনা বিশ্লেষণ করা উচিত। সুতরাং চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমাজকে রোগগ্রস্ত ও সুস্থ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। সুতরাং স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সামাজিক সমস্যামাত্রই কোন-না-কোন প্রকারে সামাজিক সংহতির বিরোধী এবং বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী।[৬] সামাজিক সমস্যাগুলি এমনই যে সমাজের এক অংশ বিশেষ প্রকার পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাদের সমাধান চাহে; অর্থাৎ এক প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে, আবার অন্য প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল সমস্যার সামাধানের কথা চিন্তা করা হয়।

৫। সামাজিক আদর্শচ্যুতি বা ব্যতিক্রমের অর্থ (Significance of Sociopathic Deviation):

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে, সমাজের আদর্শ (অর্থাৎ অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা) হইতে যদি ব্যক্তিবিশেষের ব্যতিক্রম ঘটে (অর্থাৎ যদি তাহার

---

৫ তুলনীয়: 'As a basis for the study of social pathology, a 'healthy' society is set up as a norm from which deviations are observed. Unhappily for the comfort of sociologists, it appears to be much more difficult to arrive at an agreement as to the health of societies than as to the health of individuals." (C.M. Rosenquist, *Social Problems*, p. 14).

৬ এইজন্য লেমার্ট (E.M. Lemert) মন্তব্য করিয়াছেন: "We may pertinently ask...whether the time has not come to break abruptly with the traditions of older social pathologists and abandon once and for all the archaic and medicinal idea that human beings can be divided into normal and pathological, or at least, if such a division must be made, to divest the term 'pathological' of its moralistic unscientific overtones.......Thus sociopathic phenomena simply become differentiated behavior which at a given time and place is socially disapproved even though the same behavior may be socially approved at other times and in other places." (*Proceedings of the Pacific Sociological Society*, 1948—Lemert's Paper on 'Some Aspects of a General Theory Sociopathic Behavior').

অপপ্রতিযোজন ঘটে), তাহা হইলেই সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক ব্যাধি ঘটে। এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তির কার্যসম্বন্ধে সমাজের সাধারণ অভিমত এবং তাহার নিজের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। এই অবস্থা বা তারতম্য ঘটিবার প্রধান কারণ হইল বস্তুগত বা সমাজগত এবং ব্যক্তি-বিশেষের মনোগত উপাদানের মধ্যে সংঘাত। এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তির উপর এমন কতকগুলি দায়িত্ব বা কার্যভার আসিয়া পড়িল যাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না বা যাহার জন্য সে উপযুক্ত ছিল না; সুতরাং নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইবার বা উপযুক্ত করিবার জন্য তাহাকে 'স্ব'-রূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হয়। আবার বহুদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় যদি কোন কারণে আকস্মিক পরিবর্তন আসে (যেমন, কোন ধনী ব্যক্তি যদি হঠাৎ সর্বস্বান্ত হইয়া যায়, অথবা একজন লোক যদি হঠাৎ অন্ধ হইয়া যায়), তাহা হইলেও জীবনে সুষ্ঠ প্রতিযোজনের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এইরূপ বহুবিধ কারণে ব্যক্তি-মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে এবং সামাজিক আদর্শ হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিতে পারে।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ যাহাকে সাধারণভাবে সুষ্ঠ বা বাঞ্ছনীয় ব্যবহার বলে তাহা যে বাস্তবিকই ন্যায়সঙ্গত বা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার তাহা নাও হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যবহার সামাজিক প্রথা বা ঐতিহ্য (**social convention**)-এর বিরুদ্ধে যায়, সেই ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হইলেও সমাজ উহাকে অনুমোদন করে না।

সামাজিক আদর্শ হইতে ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের যতই বিচ্যুতি ঘটিতে থাকে, সমাজের সাধারণ লোক ততই তাহাকে 'অদ্ভুত' বা 'অস্বাভাবিক' জ্ঞান করিতে থাকে এবং তাহাকে যেন দূরে সরাইয়া দেয়। ইহার ফলেও আবার ঐ ব্যক্তির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজনের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

সামাজিক আদর্শ হইতে যাহার বিচ্যুতি ঘটিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি (**deviant**)-এর আচরণ বিচারকালে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয় বিচার করিতে হইবে: সমাজের সাধারণ লোকের গড়পড়তা আচরণ বা আদর্শ কিরূপ? উহা হইতে ব্যক্তিবিশেষের আচরণের কি প্রকার বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? সমাজের সাধারণ লোক বা অধিকাংশ লোক ঐ প্রকার ব্যতিক্রমকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে? ঐ প্রকার 'ব্যতিক্রম' কতজন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় এবং তাহারা মিলিয়া কি কোন গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে? যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ গোষ্ঠীতে

ব্যক্তিবিশেষের স্থান কোথায়? সমাজ তাহাকে কতদূর পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং ঐ পরিত্যাগের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়া-ক্ষেত্র কতদূর সীমিত হইয়াছে?

আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে কয়েকটি প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা আলোচনা করিব।

৬। দারিদ্র্য (Poverty):

বিবিধ সামাজিক সমস্যাগুলির অন্যতম হইল দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের জন্যই অনেক সময় বিবিধ সমস্যার আবির্ভাব ঘটে। দারিদ্র্যকে বর্ণনা করার অসুবিধা হইল যে, ইহার কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নাই—এক জাতির বা এক ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান আর এক জাতি বা আর এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দরিদ্রজনোচিত মনে হইতে পারে, অথচ ঐ জাতির লোকেরা নিজেদের সেইরূপ মনে না করিতে পারে। দারিদ্র্য একটি বিমূর্ত প্রত্যয় এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে ইহার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য দারিদ্র্যের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দান করা কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন ব্যক্তিবিশেষের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যয়াধিক্যহেতু এমন পার্থক্য ঘটে অথবা উপার্জনের অভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে ব্যক্তিবিশেষ এবং তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারস্থ অন্য সকলে জীবনযাত্রার উন্নত মান রক্ষা করিতে পারে না, বরং তাহাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং সমাজের অন্য সকলের জীবনযাত্রার পশ্চাতে থাকিয়া যাইতে পারে, সেই অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে।[৭]

দারিদ্র্যের সহিত বহুবিধ সামাজিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট থাকে। দারিদ্র্য যেমন কতকগুলি সামাজিক অবস্থা তথা সমস্যা হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ইহা নূতন করিয়া কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, স্বাস্থ্যের অভাব, ভাল গৃহের অভাব, বুদ্ধির অপ্রাচুর্য, অপরাধের প্রাবল্য এইগুলি সবই দারিদ্র্যের সহিত অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট—একদিক্ হইতে এইগুলি দারিদ্র্যের কারণ, আবার অন্য দিক্

৭ তুলনীয়: "(Poverty is) that condition of living in which a person because of inadequate income or unwise expenditure, cannot maintain a standard of living high enough to provide for the physical and mental efficiency of himself and to enable him and his natural dependents to function usefully according to the standards of the society of which he is a member." (J. L. Gillin, *Poverty and Dependency*, p. 23).

হইতে ইহারা দারিদ্র্যেরই ফল বা কার্য। **দারিদ্র্যের ফলে মানুষ পুর্ণভাবে আত্মবিকাশ করিতে পারে না ও সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না বলিয়া নানাপ্রকার অপপ্রতিযোজনমূলক ব্যবহার করে এবং এইজন্য দারিদ্র্য সামাজিক সমস্যার আকার ধারণ করে।**

দারিদ্র্যের সম্ভাব্য কারণ কি কি? দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানের অসুবিধা হইল যে, বহু কারণের ফলে এবং বহুদিন ব্যাপী ঘটনার সংঘাতে দারিদ্র্যের উদ্ভব ঘটে বলিয়া ঐগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক হয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি কারণ হইল সাক্ষাৎ (immediate) কারণ এবং কতকগুলি হইল পরোক্ষ (remote বা distant) কারণ। যাহা হউক, আমরা নিম্নলিখিত অবস্থা বা ঘটনাগুলিকে দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি :

(১) ব্যক্তিগত কারণ—ব্যক্তির নিজস্ব এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে যাহার ফলে সে দরিদ্রজনোচিত জীবন যাপন করে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি কতকাংশে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইতে পারে। যেমন কেহ উত্তরাধিকার-সূত্রে ঊনমানসতা (feeble-mindness), বাতুলতা অথবা উপদংশ ইত্যাদি রোগ-প্রবণতা পাইতে পারে যাহার ফলে কর্মজীবনে সে অগ্রসর হইতে পারে না এবং দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়।

বংশগতি (heredity) ব্যতীতও এমন কতকগুলি জৈবিক কারণ থাকিতে পারে যাহার ফলে ব্যক্তিবিশেষ ক্ষীণদেহী বা দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং স্বভাবতঃই অলস হইয়া পড়ে। পরিশ্রমবিমুখতা বা অলসতার জন্য মানুষ জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া থাকে। আবার সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ব্যক্তি-বিশেষ এমন রোগে আক্রান্ত হইতে পারে যাহার ফলে সে ক্রমশঃ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ অর্থনৈতিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

আবার, সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী এবং পরিশ্রমী হইলেও ব্যক্তি-বিশেষ সু-বিচারের অভাবে অনেক সময় বিবেচনা পূর্বক অর্থ ব্যয় করিতে পারে না বলিয়া অর্থাভাব ভোগ করে।

কতকগুলি মন্দ অভ্যাস (যথা অতিরিক্ত মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি) গঠনের জন্যও অনেক সময় অযথা অর্থনাশ হয় এবং তাহার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ দরিদ্র হইয়া পড়ে।

(২) ব্যক্তিগত কারণ ব্যতীত সামাজিক পরিবেশের ফলেও অনেক সময় দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়। মানুষ যদি অসৎ সংসর্গে থাকে, তাহা হইলে অনেক সময় তাহার জীবনাদর্শ নিম্নাভিমুখী হয় এবং সেই কারণ সে নিজের উন্নতির আর কোন চেষ্টা করে না। তাহা ছাড়া, আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলেও মানুষ অনেক সময় দরিদ্রভাবেই জীবন অতিবাহিত করে।[৮]

(৩) প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলেও মানুষ অনেক সময় দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতি যেখানে অনুদার, রুক্ষ এবং কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা নাই, সেখানে মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারে না এবং এবং ইহার ফলে সে দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবনপাত করে।

(৪) সামাজির তথা ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শের অভাবেও দারিদ্র্য দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর সাধারণ লোকের দারিদ্র্যের কারণ হইল যে, তাহাদের জীবনদর্শন অনুসারে তাহারা দারিদ্র্যকে অপছন্দ করিতে শিখে নাই।

(৫) পরাধীন জাতিকে অনেক সময় বিজেতা এমনভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ করে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান এমন নিম্নাভিমুখী করিয়া রাখে যে, পরাধীন জাতির লোকেরা দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়।

(৬) সমাজমধ্যে এক শ্রেণীর লোকেরা অপর লোকদের শোষণ করার ফলেও সমাজমধ্যে ধনী ও দরিদ্রের বিভাগ হয়। ইহার ফলে ধনিক শ্রেণী অতিরিক্ত ধনী হইতে থাকে এবং দরিদ্র শ্রেণী দরিদ্রতর হয়।

(৭) কোন দেশে জনসংখ্যা যদি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেও দেশে খাদ্যাভাব তথা দারিদ্র্য দেখা দিতে পারে।

(৮) শিল্পসংস্থার মালিকদের অব্যবস্থা, ধনলোলুপতা ও ঔদাসীন্যের ফলেও সমাজের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়।

(৯) রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার ফলেও দারিদ্র্য দেখা দেখা দিতে পারে। রাষ্ট্র যদি কোন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করে, রাষ্ট্র যদি বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান

৮ Blackmar ও Gillin বলেন: "Poverty may be defined through bad associations. The crowding of the poor into large tenement houses where there is insufficient light and air breeds and intensifies poverty. ...Evil associations in general beget idleness, shiftlessness and evil habits and induce the conditions favourable to poverty." (*Outlines of Sociology*, p. 446).

করিতে না পারে, রাষ্ট্র যদি অতিরিক্ত করভারে জনগণকে নিপীড়িত করে অথবা রাষ্ট্র যদি অযথা অর্থব্যয় করে, তাহা হইলেও দেশে দারিদ্র্য দেখা দেয়।

(১০) শিক্ষার অভাব বা অজ্ঞতার ফলেও দারিদ্র্য দেখা দেখা দেয়। শিক্ষার অভাব দুই ভাবে ঘটিতে পারে—শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকার ফলে অথবা শিক্ষা গ্রহণে অপারগতার জন্য। শিক্ষাগ্রহণে অপারগতা আবার মন্দ স্বাস্থ্য, মন্দ বংশগতি ও মন্দ পরিবেশের প্রভাবে ঘটিতে পারে; এইগুলি আবার দারিদ্র্যের ফলে ঘটিতে পারে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, যেমন অজ্ঞতা ও কুশিক্ষার ফলে দারিদ্র্য ঘটে, সেইরূপ দারিদ্র্যের ফলেও অজ্ঞতা ঘটে।

আমরা এস্থলে দারিদ্র্যের কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণের উল্লেখ করিলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এত বহুবিধ কারণে দারিদ্র্যের উদ্ভব হইতে পারে যে, তাহাদের সবগুলির সুষ্ঠু বর্ণনা দান করা সম্ভব নহে।[৯] **দারিদ্র্যের প্রধান প্রধান কারণগুলি রোধ করিতে পারিলে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ উন্নততর জীবনযাত্রার মান গ্রহণ করিতে পারে—ইহার ফলে তাহারা সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুন্দর মনের অধিকারী হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে।** সুতরাং প্রতি রাষ্ট্রেরই কর্তব্য হইল উহার নাগরিকগণকে দারিদ্র্য হইতে মুক্তি (freedom from poverty) দান করা।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **দারিদ্র্য রোধ করার অর্থ অযথা বিলাসিতা সৃষ্টি নহে।** দারিদ্র্য রোধ করার অর্থ হইল মানুষ যাহাতে মানুষের মত হইয়া বাঁচিবার অধিকার লাভ করে এবং যাহাতে সে মনুষ্যনিম্ন

৯ **এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গলব্রেথ (J. K. Galbraith)-রচিত প্রবন্ধ** 'Poverty of Nations' (*The Atlantic Monthly*, October, 1962) **দ্রষ্টব্য। তিনি দারিদ্র্য (poverty)-এর নিম্নলিখিত কারণ নির্দেশ করেন:**

(1) 'The people are poor because they prefer it that way. Poverty reflects the value system of the people.'

(2) 'The country is naturally poor. The soil is sparse.'

(3) 'The country is poor because it has been kept under colonial opppession.'

(4) 'Poverty is the consequence of class exploitation.'

(5) 'Poverty is caused by insufficient capital.'

(6) 'Overpopulation is the cause of poverty.'

(7) 'Poverty is caused by incompetent economic policy.'

(8) 'Poverty is caused by ignorance.'

পর্যায়ে চলিয়া না যায়; অর্থাৎ দারিদ্র্যের ফলে যাহাতে কৃষ্টিগত, শিক্ষাগত, নীতিগত অবনতি না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং দারিদ্র্যকে প্রতিহত করার ফলে যাহাতে কতকগুলি লোকের হস্তে অপরিমিত বিত্ত সঞ্চয় বা সম্পত্তি সঞ্চয় না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্পত্তি সঞ্চিত হইলে আদর্শানুযায়ী তাহার ভোগ ও বণ্টন বাঞ্ছনীয় (পৃঃ ২১১)। অতএব দারিদ্র্য-অপসারণ ও ধনতান্ত্রিকতা-সৃষ্টি এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য করিতে হইবে।

৭। বৃত্তিহীনতা বা বেকার সমস্যা (Problem of Unemployment):

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৪৫৪) উল্লেখ করিয়াছি যে, বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না ঘটিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। **সুস্থ, সবল, সক্ষম লোক যখন বাধ্য হইয়া অলস জীবন যাপন করে, তখন বেকারসমস্যা ও বৃত্তিহীনতার সমস্যা দেখা দেয়।** আমরা প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই কোন-না-কোন প্রকার অর্থ নৈতিক যোগ্যতা স্বীকার করিয়া লই এবং ইহার ফলে প্রতি ব্যক্তিরই ঐ যোগ্যতা অনুসারে কোন বৃত্তি গ্রহণের অধিকার থাকে। সুতরাং কোন ব্যক্তি তাহার যোগ্যতা অনুসারে যখন বৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক অথচ বৃত্তি সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন ব্যক্তি-বিশেষকে 'বেকার' বলা যায়।

পূর্বতন সমাজব্যবস্থায় মানুষ যখন কৃষিকার্য বা জমির ফসল উৎপাদনের উপর নির্ভর করিত, তখন এত তীব্রভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয় নাই। কিন্তু কালক্রমে জমির যতই দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিতে লাগিল এবং মানুষ কলকারখানায় বৃত্তি সংগ্রহে আগ্রহী হইয়া উঠিল, ততই ক্রমশঃ বৃত্তির অভাব দেখা দিতে লাগিল।

বেকার সমস্যার উদ্ভব নানাভাবে হইতে পারে। উন্নত প্রকারের শিল্পের আবির্ভাবের ফলে শ্রমবিভাগ এবং বিশেষ প্রকারের কৌশলের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব হইতে মানুষ বুঝিতে পারে না কোন্ প্রকারের কৌশল তাহার বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে। শিল্পজগতে এত দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হয় যে মানুষ সহজে উহার সহিত প্রতিযোজন করিতে পারে না এবং এই কারণে প্রায়ই বেকার সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পজগতে একটি পরিবর্তনের কারণ হইল যন্ত্রযুগের (technological age)-এর আবির্ভাব। অনেকক্ষেত্রে উন্নততর যন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে অধিকসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া যায় (ইহাকে বলে rationalization); ইহার ফলে সক্ষম হইলেও অনেক সময় বেশ

কিছু সংখ্যক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় জগতে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি আছে; সুতরাং যখন উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা (demand)-এর হ্রাস ঘটে, তখন উৎপাদন (production)-ও শিল্পমালিকগণ কমাইয়া ফেলেন; এই কারণেও বৃত্তি সংগ্রহের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, বয়োবৃদ্ধির ফলেও বেকার সমস্যা দেখা দেয়। বয়োবৃদ্ধির ফলে দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন এরূপ কার্য করিতে, অথবা কুশলী কার্যপদ্ধতির আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিলে তাহার সহিত প্রতিযোজন করিতে, শ্রমিক ক্রমশঃ অপারগ হইয়া উঠে। সম্ভাব্য বৃত্তির অনুপাতে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইলেও বেকারসমস্যা দেখা দেয়।

বর্তমান শিল্পযুগে বহুদেশে অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটিলেও এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে; অর্থাৎ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ বেকার সমস্যাও বাড়িতেছে।[১০]

বেকার সমস্যা যে কোন সমাজের পক্ষেই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা। বেকার সমস্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের একাংশের মধ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্যের কুফল যে সুদূর-প্রসারী তাহা বলা বাহুল্য (পৃঃ ৪৫৩)। তাহা ছাড়া বেকার সমস্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের একদল সক্ষম, সুস্থ, সবল ব্যক্তি কর্মহীন হইয়া পড়ে; কিন্তু বৃত্তিহীন হইলেই মানুষের মন নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে না এবং তাহার মস্তিষ্কে নানা প্রকার দুষ্ট পরিকল্পনার উদ্ভব হইতে থাকে—সুতরাং এই প্রকার লোক সহজেই সমাজ-বিরোধী তথা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে অংশ গ্রহণ করে।

বেকার সমস্যা নিরোধের জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনমত জনশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত; বিবিধ বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মচারি-নিয়োগের সুষ্ঠু নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত; বৃত্তিহীনতার বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থা করা উচিত।

৮। শারীরিক পঙ্গুতা ও অসুবিধা (Physical Defects & Handicaps):

শারীরিক ত্রুটি বা পঙ্গুতা হইতে নানারূপ অসুবিধা দেয়; যেমন, কেহ অন্ধ, কেহ মূক, কেহ বধির, কেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কেহ মেরুদণ্ডের বক্রাকৃতি হইতে ভুগিতেছে, কেহ ক্ষয়রোগ হইতে ভুগিতেছে, কেহ কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছে ইত্যাদি।

---

১০ তুলনীয়: "We are in a period of increasing unemployment with increasing prosperity. In other words, the employed classes are prosperous at the expense of an increasing volume of unemployment." (Phelps, *op. cit.*, p. 83).

এই সকল রোগগ্রস্ত, পঙ্গু লোক সমাজজীবনে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই সকল লোকের প্রধান সমস্যা হইল যে, তাহারা উপযুক্ত বৃত্তি সংগ্রহে অসমর্থ এবং অনেক সময় সক্ষম আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভরশীল হইয়া জীবনযাপন করে, অথবা অনাহারে, অর্ধাহারে কালাতিপাত করে। পঙ্গুব্যক্তি তাহার এই অসামর্থ্যের জন্য জীবনসংগ্রামে তথা সমাজজীবনে ক্রমাগত পিছু হটিয়া যায়। এই কারণ এই সকল লোকের মনে হীনমন্যতা বা হীনতাবোধ (inferiority complex) দেখা দেয়। ইহার ফলে সে যখন সামাজিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে, তখন নানা প্রকার অপপ্রতিযোজনমূলক (mal-adaptive) আচরণ প্রকাশ পায়—হয়ত' সে তাহার সাধারণ আচরণে রুক্ষ ও আক্রমণোদ্যতক (agressive) হইয়া উঠে, অথবা পলায়নপর প্রতিক্রিয়া (withdrawal reaction) দেখাইয়া থাকে।

অন্ধ ব্যক্তি তাহার দৃষ্টি-হীনতার জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। সে জীবনে নানারকম কার্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এবং এইজন্য তাহাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য বিশেষভাবে পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িতে হয়। মানুষের সভ্যতার বিকাশ হইতে অন্ধ ব্যক্তি বিশেষ অনুকম্পার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সমাজ যদিও সাধারণভাবে অন্ধব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তাহা হইলেও কেবলমাত্র সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করা যায় না ; কারণ সকলেই যে সমভাবে দয়া প্রদর্শন করিবে, তাহাদের সাহায্য যে পর্যাপ্ত হইবে সে বিষয়ে স্থিরতা নাই। তাহা ছাড়া, কোন মানুষই সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা ও পরের অনুকম্পা-ভিক্ষা পছন্দ করে না।

বর্তমান কালের সভ্যজগতে এইজন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়। (ক) যে সকল রোগের (যথা, trachoma, opthalmia neonatorum ইত্যাদির) জন্য অন্ধত্ব ঘটে, সেগুলি প্রতিষেধের বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলেও অন্ধত্ব হয়। অবশ্য অন্ধত্বের সকল কারণ দূর করা সম্ভব নহে। (খ) অন্ধব্যক্তির উপযোগী শিক্ষাদানের বিবিধ ব্যবস্থা (যথা, Braille System) ইত্যাদি, অবলম্বিত হয় এবং ঐ উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। (গ) অন্ধলোককে বিবিধ বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দান করা হয় ; ইহার ফলে ভাবীজীবনে সে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে।

মূক-বধিরেরাও সমাজের পক্ষে সমস্যা, কারণ তাহাদের শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাহাদের সহিত সাধারণ উপায়ে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব নহে। তবে

তাহাদের এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সভ্য সমাজ নানাপ্রকার ব্যবস্থা সাধারণতঃ অবলম্বন করে। অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং তাহাদের বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তি সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয়।

অন্ধ ও মূকবধিরদের সমস্যার ন্যায় তীব্র না হইলেও **স্খলিত-উচ্চারণ (defective speech)-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও** কিছু পরিমাণে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। তাহাদের এই ত্রুটির জন্য তাহাদের অসুবিধা হইল যে, তাহারা সুষ্ঠুভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে বাক্‌যন্ত্রের ত্রুটির জন্য এই দোষ দেখা দিতে পারে, তাহা হইলেও মানসিক কারণেও ইহা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় আবার শৈশবে কাহারও উচ্চারণে ত্রুটি থাকিলে তাহার উপর ক্রমাগত গুরুত্ব আরোপ করিলে বা সেইদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ব্যক্তি-বিশেষ লোকসমক্ষে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে এবং তাহার ত্রুটি স্থায়িরূপ ধারণ করে।

রোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে যে সকল দৈহিক পঙ্গুতার উদ্ভব হয়, আমরা উপরে তাহাদের কয়েকটির উদাহরণ দিলাম। এইগুলি ব্যতীত ব্যক্তিগত মন্দ অভ্যাসের ফলেও কতকগুলি দৈহিক ত্রুটি দেখা দেয় (যেমন, অতিরিক্ত পানাসক্তি, দ্যূতক্রীড়াদির প্রতি আসক্তি ইত্যাদি)।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেও ব্যক্তি-বিশেষ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং **পানাসক্তি** (alcoholism)-ও একটি সামাজিক সমস্যা। কেহ কেহ মনে করেন যে, অতিরিক্ত পানাসক্তি বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত; কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ লেখকই বলেন যে, ইহা পরিবেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ই লোকে বিশেষ প্রকারের নৈরাশ্য, অসাফল্য, তীব্র শোক ইত্যাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসাবে মদ্যপান আরম্ভ করে এবং তাহা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়।[১১]

অল্প পরিমাণ মদ্যপান কার্যে উৎসাহ দান করিতে পারে এবং ইহা বিশেষ

১১ তুলনীয়: "The present view is that alcoholism is a social product and nonhereditary. Social factors, such as extreme disappointment in love, loss of a job, loss of a close friend or member of the family, disillusionment and so on, may produce situations that will make a person prone to alcoholism." (T. L. Smith etc., *Social Problems*, p. 139).

বিশেষ ক্ষেত্রে ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে, মানুষ অবসাদ-নিরোধক তথা উত্তেজক হিসাবে ইহা অল্পপরিমাণে পান করিতে আরম্ভ করিলেও প্রায়ই পরিমিত সেবনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলে এবং তখন 'মগ্যপ' হইয়া পড়ে।

মদ্যপেরা সমাজজীবনের সমস্যা। কারণ তাহারা নিজেরা অনেক সময়ই সামাজিক প্রতিবেশের সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারে না—কেহ বা আচরণে দুর্বিনীত হইয়া পড়ে, কেহ বা উদাসীন হইয়া পড়ে, কেহ বা সর্বদাই খামখেয়ালী বা অপ্রকৃতিস্থ থাকে। তাহা ছাড়া, অনেকক্ষেত্রে যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়াদির ফলে অথবা দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবিতাবস্থায় তাহারা ব্যয়াধিক্য, শারীরিক অক্ষমতা ও মানসিক ঔদাসীন্যের জন্য স্বজনবর্গ পরিপালনে অক্ষম হয় এবং তাহার ফলে তাহারা সমাজ-জীবনে 'ভার'-স্বরূপ হইয়া পড়ে।

অতিরিক্ত মদ্যপান নিরোধের জন্য সমাজ তথা রাষ্ট্রের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে প্রধানতঃ জনমনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে ; অর্থাৎ মদ্যপানের কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করিয়া তুলিতে হইবে—"মদ্যম্ অপেয়ম্, অদেয়ম্, অগ্রাহ্যম্" এই মন্ত্রে তাহাদের দীক্ষিত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সম্ভব হইলে আইন-প্রণয়ন করিয়াও মদ্যপানের ব্যবহারকে সীমিত করিতে হইবে। পানাসক্ত ব্যক্তি হঠাৎ অভ্যাস পরিবর্তন করিলে যাহাতে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ না করে, সে জন্য চিকিৎসকের সাহায্যে বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও উহার অনুকরণকারী অন্য সভ্যতার কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানে অবাধ মদ্যপানের যে প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও রোধ করিতে হইবে।

মদ্যপানের ফলে যেমন ক্ষতি হয়, সেইরূপ অহিফেন, কোকেন, সিদ্ধি, তাম্রকূট ইত্যাদি সেবনের ফলেও অল্পাধিক ক্ষতি হয়। সুতরাং এইগুলির সেবনও সমাজ কর্তৃক সীমিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই সকল কারণ ব্যতীত সাধারণভাবে বলা যায় যে, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমা যাহারা লঙ্ঘন করিয়া যায়, তাহারা সকলেই অল্পবিস্তর **বার্ধক্যজনিত অসামর্থ্য তথা পঙ্গুতার** সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিন যাহারা সমাজকে পরিচালনা করিয়াছে কালের গতিতে তাহারা নানাভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

সুতরাং বৃদ্ধদের প্রতি সমাজের বিশেষ দায়িত্ব আছে—তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, আর্থিক স্বচ্ছলতা রক্ষা, অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, ধর্মকর্মাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি সমাজের করা উচিত।

৯। মানসিক বৈলক্ষণ্য (Mental Defects):

শারীরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা—বিশেষতঃ কোন-না-কোন কারণে পঙ্গু ব্যক্তিরা —যেমন সমাজের পক্ষে সমস্যা, সেইরূপ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরাও সমাজের পক্ষে সমস্যা। মানসিক বিকারের নানা তারতম্য ঘটিতে পারে—মানসিক বিকার বলিতে যেমন বদ্ধ উন্মাদ বুঝায়, সেইরূপ সাধারণ বাতিকগ্রস্ত (বা 'ছিট'-গ্রস্ত) ব্যক্তিও বুঝায়। মানসিক অস্বাভাবিকতাকে সাধারণতঃ উদ্বায়ুরোগ (**neurosis**), বায়ুরোগ (**psychoneurosis**) এবং বাতুলতা (**psychosis**) এই কয়ভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে বাতুলতাই মানুষকে সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক কার্যের অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—ইহার দুইটি প্রধান রূপ হইল চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (**schizophrenia**) এবং খেদোন্মত্ত বাতুলতা (**manic-depressive insanity**)। চিত্তভ্রংশী বাতুলেরা যেন স্ব-রচিত জগতে সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া জীবনযাপন করে এবং ইহারা বাহ্য জগতের সংযোগ রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়; সাধারণতঃ ইহারা নানা প্রকার ভ্রান্তি—যথা, বিভব ভ্রান্তি (**delusion of grandeur**), পীড়ন ভ্রান্তি (**delusion of persecution**)—দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রকার বাতুলেরা যে কেবল সমাজজীবনের সহিত সংস্রব রাখিতে পারে না তাহা নহে, ইহারা মধ্যে মধ্যে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। খেদোন্মত্ত বাতুলেরা একবার অস্বাভাবিকরূপে উন্মত্ত হইয়া পড়ে, আবার গভীর বিষাদে নিমগ্ন হয়। এই দুইটি বিকল্প অবস্থাতেই ইহারা সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপন করিতে অক্ষম—বিষণ্ণ অবস্থা এবং উন্মত্ত অবস্থা উভয় অবস্থাতেই ইহাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব; তাহা ছাড়া, উন্মত্ত অবস্থায় ইহারা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লইয়া উঠে।

এই দুই প্রকারের বাতুলতা ব্যতীত অন্য প্রকারের অস্বাভাবিকতা ব্যক্তি তথা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন, অনুকর্ষী বায়ু (**compulsion psychoneurosis**), আবেশিক বায়ু (**obsessional psychoneurosis**) ইত্যাদি মানসিক রোগও সুষ্ঠু সামাজিক প্রতিযোজনের পথে ব্যক্তি-জীবনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

উন্মায়ুগ্রস্ত (neurotic) ব্যক্তিরাও ভাল-মন্দ, নিরাপদ-বিপজ্জনক, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে পার্থক্য করিতে পারে না।

আবার, অনেকক্ষেত্রে এরূপ হয় যে, ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সংগঠনের মধ্যে যে ঐক্য ও সংহতি আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিযঙ্গ (dissociation) দেখা দেয় ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বহু-ব্যক্তিত্ব (multiple personality) জনিত অসুবিধা দেখা দেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সুস্থিতি নষ্ট হইয়া যাইবার ফলে ব্যক্তি-বিশেষের আচরণে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় এবং সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করিতে অসমর্থ হয়।

এই সকল অস্বাভাবিকতা ব্যতীত বুদ্ধির স্বল্পতাও সামাজিক জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে। যাহাদের বুদ্ধি স্বাভাবিকতার নিম্নে তাহাদের **উনমানস (feeble-minded)** বলে। সাধারণতঃ ৯০-১০৯ বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)-কে স্বাভাবিকতার নির্দেশক ধরা হয়। ৭০-বুদ্ধ্যঙ্কের নিম্নে যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাহারা উনমানস। উনমানসদের আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—জড়ধী (idiot), ক্ষীণধী (imbecile) এবং অল্পধী (moron)। জড়ধী (বুদ্ধ্যঙ্ক ৩-২৫) ব্যক্তিরা জীবনের সাধারণ বিপদ এড়াইতে পারে না এবং ইহাদের আচরণ দুই বৎসরের শিশুর তুল্য। ক্ষীণধী (বুদ্ধ্যঙ্ক ২৬-৫০) অপরের পরিচালনায় কয়েকটি সাধারণ কার্য করিতে পারে। অল্পধী (বুদ্ধ্যঙ্ক ৫১-৭০) ৪র্থ বা ৫ম মান পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিতে পারে এবং ধরা-বাঁধা কাজ কিছু পরিমাণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সকল ব্যক্তি সমাজে সাধারণের সহিত একত্রে বসবাস করে, অথচ ইহাদের বাহ্য আচরণ স্বাভাবিক মানের অনেক নিম্নে ; সুতরাং ইহাদের লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইহাদের নিম্নবুদ্ধির জন্য ইহারা কলা-কৌশল প্রয়োজন এমন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না, ইহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রয়োজনের উপযুক্ত উপার্জন করিতে পারে না, নৈতিক পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না, এবং অনেক সময়ই (ইচ্ছায় হউক্ বা অনিচ্ছায় হউক্) অপরাধপ্রবণ হইয়া পড়ে।

আমরা বিবিধ মানসিক বৈলক্ষণ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দিলাম।[১২]

১২ বিভিন্ন প্রকারের মানসিক অস্বাভাবিকতার আলোচনার জন্য Freud, *Introductory Lectures on Psychoanalysis*, McDougall, *Outline of Abnormal Psychology* এবং গ্রন্থকার-রচিত **মনোবিদ্যা** (চতুর্থ সংস্করণ), পৃঃ ৭৪-৮১, ২১৭-১৮, ২৭৫-৭৯, ২৮৫ দ্রষ্টব্য।

সমাজের পক্ষে সকল প্রকার মানসিক বৈলক্ষণ্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কঠিন। তবে সাধারণভাবে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের এমন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা উচিত যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনে কম উত্তেজনা বা তান (tension)-এর সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে মানসিক দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে যথাসম্ভব নিষ্কৃতি পায়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে সার্থক পরিকল্পনা রচনা সুকঠিন। তাহা ছাড়া, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহানুভূতিশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাও সমাজকে করিতে হইবে; এবং স্বাভাবিকতা পুনঃপ্রাপ্তির পর সমাজ-জীবনে যাহাতে তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মোট কথা, প্রতি সমাজকেই **মানসিক স্বাস্থ্য** (**mental health**) রক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হইতে হইবে।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাহাকে **মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান** (**mental hygiene**)[১৩] বলে। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলিতে এমনই **এক বিজ্ঞান বুঝায় যাহা মানসিক অপপ্রতি-যোজন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে এবং মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মানসিক সুস্থিতি ও স্বাভাবিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে শিক্ষা দেয়।** সুতরাং ইহা কেবল তাত্ত্বিক বিজ্ঞান (theoretical science) নহে; প্রয়োগবিদ্যাও (practical science বা art)-ও বটে।[১৪]

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের কার্য দুই প্রকার। অপপ্রতিযোজন যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেইজন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা পথ নির্দেশ করেন—পিতামাতা, শিক্ষক, শিল্পসংস্থাপরিচালক, সমাজসেবক ইত্যাদি যদি মানসিক-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের

---

১৩ মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত আন্দোলনের জন্য কৃতিত্ব প্রধানতঃ বীয়ারস্ (Clifford W. Beers)-এর প্রাপ্য। তিনি ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক ছিলেন; তাঁহার মানসিক বিকারের জন্য তাঁহাকে উন্মাদাগারে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে হয়। মানসিক সুস্থতা পুনঃ-প্রাপ্তির পর তিনি মানসিক স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় আন্দোলন সুরু করেন। তিনি উন্মাদাগারে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন অন্যের জীবনে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে বিষয় তিনি বদ্ধপরিকর হ'ন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ *A Mind That Found Itself: An Autobiography* (১৯০৮) মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

১৪ তুলনীয়: "Mental hygiene refers to the prevention of inadequate adjustments and to the processes by which maladjusted persons are restored to normal living." (L. F. Schaffer, *The Psychology of Adjustment*, p. 435).

পরামর্শ অনুযায়ী চলেন, তাহা হইলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি ও স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা কমিয়া যায়।

মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীদের অপর কার্য হইল হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাহাতে মানসিক সুস্থিতি, স্থৈর্য, ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়া পায়—যাহাতে পুনরায় তাহারা সমাজে সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে সক্ষম হয়—সেই সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের দ্বিতীয় কার্য। যে কোন রোগের চিকিৎসার পূর্বে উহার কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন; মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। সুতরাং বিবিধ মানসিক বিকার বা বৈলক্ষণ্যের সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রাথমিক কার্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রয়োগ প্রয়োজন।

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্ক কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে বিষয় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরামর্শ দেয়। স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পরের সহিত এবং সাধারণ পরিবেশের সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে না পারে, তাহা হইলে দাম্পত্য শান্তি নষ্ট হয় (পৃঃ ১৭৫-৭৬)। সেইরূপ পিতামাতার প্রভাব সন্তানসন্ততির উপরও পড়ে এবং তাঁহাদের আচরণদ্বারাও সন্তানসন্ততির ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয় (পৃঃ ১৪৬ ও ১৭১-৭২)। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে পরিবারস্থ সকলের মানসিক স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করিয়া পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বাস্তবিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই হইল শিশুকে ভাবী জীবনে প্রতিযোজনক্ষম সামাজিক জীব করিয়া তোলা। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিশুমনে কতকগুলি বিষয়ে সংবাদ 'গ্রথিত' করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। শিশু তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্ব—তাহার বংশগতি ও পরিবেশ-জনিত প্রলক্ষণ, তাহার বুদ্ধি, তাহার আবেগ, তাহার প্রেষণা ইত্যাদি সব কিছু—লইয়াই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সুতরাং প্রতি শিশুর ব্যক্তিত্ব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ লাভ করে, সে যাহাতে ব্যর্থতা ও হতাশার সম্মুখীন না হয়, সে যাহাতে জীবনের বহু বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার

লক্ষ্য রাখা উচিত; বলা বাহুল্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত তাঁহারা এই কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন না।[১৫] আবার কেবল যে ছাত্রছাত্রীর মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন তাহা নহে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও মানসিক স্বাস্থ্য প্রয়োজন। কারণ যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের আচরণের সহিত নিজেকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিয়া লইতে না পারেন, যাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে, যিনি আক্রমণাত্মক (aggressive) মনোভাবসম্পন্ন, তাঁহার প্রতি ছাত্রছাত্রীরাও বাঞ্ছনীয় আচরণ দেখাইতে পারে না।

বর্তমান কালে শিল্পীয় প্রগতির ফলে বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় সমাজের জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মী হিসাবে যোগদান করে। শিল্পীয় সংস্থায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক যাহাতে শান্তিপূর্ণ থাকে, শ্রমিকদের ব্যক্তিত্ব যাহাতে সুগঠিত হয়, যে কার্যের জন্য যে উপযুক্ত সেই কার্যে সে যাহাতে নিযুক্ত হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। সুতরাং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিবেশকে মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল রাখার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক।

সমাজসেবকদেরও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন। সমাজের সাধারণ সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে যখন তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শে আসেন, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশের সহিত বিভিন্ন ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করিতে পারিতেছে না বলিয়াই সমস্যার উদ্ভব ঘটে। একাধারে সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ও ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিযোজনক্ষম করিয়া তোলাই হইল সমাজসেবকের কর্তব্য এবং এই ব্যাপারে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সমাজসেবককে সহায়তা করিয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রগতিশীল সমাজকেই জনমনের মানসিক বৈলক্ষণ্য বা বিকাররোধের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

---

১৫ পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিশুজীবনে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানা সমস্যা দেখা দেয়: আমেরিকার নিউ ইয়র্কের Institute of Child Guidance কয়েক বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া শিশু-জীবনের কতকগুলি অপ-প্রলক্ষণের এক তালিকা প্রদান করে; এইগুলি শিশুর পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে—যথা, অবাধ্যতা, ভীতি, বদমেজাজ, চৌর্যবৃত্তি, স্কুল হইতে পলায়ন, মিথ্যা কথা বলা, খাওয়াইতে কষ্ট, পরীক্ষায় অসাফল্য, কথা বলায় অসুবিধা, আঙুল চোষা, অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা, লাজুকতা, কল্পনাপ্রবণতা, ক্রন্দনশীলতা, হস্তমৈথুন, বিষাদ, কলহপ্রবণতা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, অমনোযোগিতা, অলসতা, শারীরিক অক্ষমতা ইত্যাদি।

১০। অপরাধ (Crimes) :

যে কোন সমাজের অস্তিত্ব, সংহতি ও প্রগতির জন্য প্রয়োজন সমাজস্থ সকল ব্যক্তির পক্ষে নীতিবোধসম্পন্ন ও নিয়মানুগ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। কিন্তু প্রতি সমাজেই দেখা যায় যে, সকল নাগরিক এই আদর্শ অনুযায়ী চলিতে সক্ষম হয় না এবং তাহারা বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় নীতি ভঙ্গ করে ও অপরাধের সৃষ্টি করে। সুতরাং সামাজিক জীবনের পক্ষে অপরাধ হইল এক বিরাট্ সমস্যা। বিবিধ প্রকার অপরাধের স্বরূপ ও কারণ নির্ধারণ করিয়া সেগুলি প্রতিরোধ করার চেষ্টা প্রতি সমাজেরই কর্তব্য।

(ক) 'অপরাধ'-এর অর্থ ঃ

অপরাধ কাহাকে বলে ? **ব্যাপক অর্থে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যে কোন কার্যকেই অপরাধ বলা যাইতে পারে। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'অপরাধ' বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার যে সকল বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করা হয়, সেগুলিকে ইচ্ছাপূর্বক না মানা বা সেগুলির বিরুদ্ধে যাওয়া। রাষ্ট্র সাধারণতঃ অপরাধমূলক আচরণের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।** অতএব অপরাধমূলক আচরণ বলিতে সেই সকল আচরণ বুঝায় যাহা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোন প্রকার সংস্থার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কোন ক্ষতির সৃষ্টি করে। সুতরাং সমাজ বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি বা প্রথা অনুসরণ করে, সেই-গুলিকে ভঙ্গ করা সামাজিক অপরাধ। আবার রাষ্ট্র আইনপ্রণয়ন করিয়া যে সকল কার্য করিতে নিষেধ করে, সেইগুলি ভঙ্গ করা রাষ্ট্রীয় অপরাধ। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অপরাধ সমব্যাপক নাও হইতে পারে। যেমন, চৌর্য, নরহত্যা ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অপরাধ দুই-ই ; কিন্তু পরাধীন জাতির লোকেরা হৃত স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য এমন কতকগুলি 'রাষ্ট্রীয় অপরাধ' করিতে পারে যাহা সামাজিক অপরাধ না হইতে পারে। সেইরূপ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া থাকে—এইগুলি ভঙ্গ করা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরাধজনক। তাহা ছাড়া, অপরাধের গুরুত্বেরও তারতম্য আছে। কতকগুলি অপকার্যকে 'অপরাধ' আখ্যা দেওয়া যায় এবং বাকী কতকগুলিকে কেবল 'দুর্ব্যবহার' বা 'দুষ্কার্য'

বলা যায়। আবার, কতকগুলি 'অপকার্য' আছে যেগুলি এক রাষ্ট্রে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও আর এক রাষ্ট্রে অপরাধ বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। সাধারণ অপরাধ ব্যতীত আবার কতকগুলি অপরাধ আছে যেগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়; এইগুলিকে রাজনৈতিক অপরাধ বলা যায়।

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা সাধিত অপরাধ ব্যতীত অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরী কর্তৃক সাধিত অপরাধের বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে; কারণ আশা করা যায় যে, এই সকল অল্পবুদ্ধি এবং অপরিণতবয়স্ক বালক-বালিকাদের সংশোধন সম্ভব। সুতরাং অপরিণতবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা (juvenile delinquency) পরিণতবয়স্ক দ্বারা সাধিত অপরাধ (crime) হইতে পৃথক্ করা হয়।

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে অপরাধ সম্বন্ধীয় আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ইহার কারণ এই যে, অপরাধের ফলেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে; ইহার ফলে কেবল যে একজন ব্যক্তিরই নৈতিক অধঃপতন ঘটে তাহা নহে, ইহা সংক্রামক রোগের ন্যায় সমাজ মধ্যে প্রসার লাভ করে। সুতরাং অপরাধের শ্রেণীকরণ, বয়ঃক্রম, বংশগতি, অধিবাস ইত্যাদি অনুসারে অপরাধীদের শ্রেণীবিভাগ, অপরাধের কারণ নির্ণয় ও সেইগুলি দূর করিবার উপায় নির্ধারণ, এবং অপরাধীদের পুনরায় নিয়মানুগ শৃঙ্খলানুরাগী নাগরিকে কিভাবে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে, তাহা সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শন বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে। এই প্রসঙ্গে অপরাধীকে শাস্তিদানের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতাও দার্শনিককে চিন্তা করিতে হয়।

(খ) অপরাধের কারণ:

মানুষ কেন অপরাধ করে তাহা লইয়া সুদূর অতীত হইতেই সে চিন্তা করিতেছে। একদিন ছিল যখন সে বিশ্বাস করিত অপরাধ হইল ভূতপ্রেতাদির দ্বারা আবেশের ফল; সুতরাং অপরাধীর দেহ হইতে 'অপরাধপ্রবণতা' দূর করিবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। বর্তমানের প্রগতিশীল সভ্য মানুষ ভূতপ্রেতাদির কু-প্রভাবে বিশ্বাস করে না; সুতরাং অপরাধের কারণ সম্বন্ধে এই অবৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরাধের কারণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, আমরা বর্তমানে তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করিতে পারি।

(১) **অর্থনৈতিক কারণ**—অনেকে মনে করেন যে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা বা দারিদ্র্যের প্রভাবে অনেকে অপরাধের পথে চালিত হয়। অর্থাৎ অভাবের তাড়নাই হইল অপরাধের মূল কারণ।

অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে বা অভাবের তাড়নায় যে মানুষ মধ্যে মধ্যে অপরাধজনক কার্য করিয়া থাকে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগতে অর্থ-কৌলীন্য যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম উপায়, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ৪৪৩)। ধনগত বৈষম্য সমাজে অনেক সময়ই মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করিয়া থাকে—বিত্তশালীদের অপেক্ষা বিত্তহীনেরা যেন নিম্নপর্যায় অধিকার করিয়া থাকে। এইজন্য বিত্তহীনদের ভিতর কোন কোন ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের সমপর্যায়ভুক্ত হইবার তীব্র বাসনা দেখা দেয়; কিন্তু সেই কারণ দরিদ্র মাত্রই যে অপরাধের আশ্রয় লইবে তাহা বলা যায় না। আবার, দারিদ্র্যের কোন সুনির্দিষ্ট সীমা নাই—এক সমাজ বা এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাহাকে দারিদ্র্য বলা যায়, আর এক সমাজ বা আর এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহা দারিদ্র্য না হইতে পারে। তাহা ছাড়া, দরিদ্র হইলেই অপরাধপ্রবণ হইবে তাহা নহে, বরং দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময় সাধুতাও দেখা গিয়াছে।

সুতরাং যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ফলে কতকগুলি বিশেষ প্রকারের অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলেও দারিদ্র্যই অপরাধের একমাত্র কারণ বা দারিদ্র্যের সহিত অপরাধের পারম্পর্য, এমন কথা বলা যায় না।

(২) **ভৌগোলিক কারণ**—কেহ কেহ মনে করেন যে, বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের অপরাধজনক কার্য করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন, পার্বত্য অঞ্চলে 'ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ' (অর্থাৎ নরহত্যা ইত্যাদি) অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু পর্বতের নিম্নে উপত্যকাভূমিতে 'সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ' অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্য অনুসারে এক একটি অঞ্চলকে 'দুর্বৃত্ত-অঞ্চল' (Gangland) বলা যায়।

কেবল যে স্থানগত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই অপরাধপ্রবণতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহা নহে; আবহাওয়া ও ঋতুগত পরিবর্তন অনুসারেও অপরাধের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যেমন, পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচণ্ড শীতের পর বসন্তের আবির্ভাবে কতকগুলি

অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১৬] তাহা ছাড়া, প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত ইত্যাদির সময়ও বিশেষ বিশেষ প্রকার অপরাধ ঘটিতে দেখা যায়।[১৭]

অপরাধের ভৌগোলিক কারণ সম্বন্ধীয় এই মতবাদ পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না। এমন হইতে পারে যে, কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা উন্নত ধরণের বা অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার ফলে অপরাধীরা ধরা পড়ে; সেইজন্য মনে হয় যে, ঐ অঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা অধিক। তাহা ছাড়া, এই মতবাদ একদেশদর্শী, কারণ অপরাধের অন্য যে সকল কারণ থাকিতে পারে তাহা ইহা অগ্রাহ্য করে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যপ্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশের যে প্রভাব থাকে তাহাও প্রত্যক্ষ (direct) প্রভাব নহে—ঐরূপ পরিবেশ মানবমনে যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষ অপরাধ করিতে বাধ্য হয়।

(৩) **বংশগত কারণ**—কোন কোন লেখক মনে করেন যে, অপরাধী মাত্রই হইল 'জন্মগত অপরাধী' (born criminal)। সুতরাং অপরাধের কারণ হইল জৈবিক (biological)—জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ফলেই মানুষ অপরাধ করিয়া থাকে।

এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ইতালীয় চিকিৎসক সিজারে লোম্‌ব্রোসো (Cesare Lombroso) (১৮৩৬-১৯০৯)। তিনি একবার এক কুখ্যাত ডাকাতের মৃত্যুর পর তাহার মস্তিষ্কের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া উহার অন্তর্ভাগ

১৬ বসন্তকালীন অপরাধপ্রবণতাকে প্রচলিত ভাষায় *Spring fever* বলা হয়। মানবমনে শৈত্য ও গ্রীষ্মের প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে: "It is impossible to feel affection above seventy-eight degrees or below twenty. Human nature is, then, either too solid or too liquid; and lives only to shiver or to perspire." (Sydney Smith).

১৭ তুলনীয়: "Probably the frequent opportunities offered by hot weather and warm climates for social contact have more to do with crimes of violence than the effect directly of heat. The relative strength of day and night in part limits the kind and determines the nature of crime. Meteoric conditions, storms, and sudden climatic changes affecting the nervous and mental conditions of men are conducive to crime. What influence electrical disturbances have on criminal action has never been scientifically determined, although there are specific indications that there are positive relations between the two." (Blackmar & Gillin, *op. cit.*, p. 484).

করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কের গঠন (যথা, উহার খাঁজ, করোটির অসমতা ইত্যাদি) অতি নিম্ন পর্যায়ের জীবের মস্তিষ্কের অনুরূপ। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, দৈহিক প্রত্যাবৃত্তি (**regression**)-এর ফলেই ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধিরূপে জন্মগ্রহণ করে। **পূর্বানুকৃতি (atavism)-ই হইল অপরাধের কারণ।** নৃতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী (anthropological standpoint) হইতে বলা যায় যে, অপরাধী হইল আদিম মনুষ্যজাতির পর্যায়ভুক্ত—তাহার উচ্চবক্ত্র, হস্তপদাদির গঠন, জিঘাংসাবৃত্তি, উদ্দামতা সব কিছুই বর্বর অসভ্য আদিম জাতির অনুরূপ।[১৮] তাহা ছাড়া, তিনি ইহাও লক্ষ্য করেন যে, অপরাধের সহিত ভ্রামর বা মৃগীরোগ (epilepsy) ও অন্য প্রকার নৈতিক অধঃপতনের সংযোগ আছে। অর্থাৎ অপরাধপ্রবণতা, মানসিক অস্বাভাবিকতা ও নৈতিক অধঃপতন সব কিছুই একই প্রকার দেহ-মানস বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক।

তাঁহার মতবাদের সমালোচনার ফলে লোম্‌ব্রোসো তাঁহার মতবাদের কিয়দংশ পরিবর্তন করেন। তিনি ভ্রামর বা মৃগী রোগকে অপরাধপ্রবণতার ভিত্তি করেন। অর্থাৎ তাঁহার মতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি শেষ পর্যন্ত এইরূপ দাঁড়ায়: (ক) অপরাধপ্রবণতা জন্মগত বৈশিষ্ট্য, (খ) নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে অপরাধী বাতুলেরই সমতুল্য, (গ) ভ্রামর, মৃগী বা সন্ন্যাস রোগ হইল অপরাধের ভিত্তিভূমি, (ঘ) অপরাধীর কার্যসমূহ পূর্বানুকৃতি (atavism)-রূপেই ব্যাখ্যা করা যায়,

১৮ তুলনীয়: "A criminal is an atavistic being who reproduces in his person the ferocious instincts of primitive humanity and the inferior animals. Thus were explained anatomically the enormous jaws, high cheekbones, prominent superciliary arches, solitary lines in the palms, extreme size of the orbits, handle-shaped or sessile ears found in criminals, savages and apes; insensibility to pain, extremely acute sight tattooing, excessive idleness, love of orgies and the irresistible craving for its own sake, the desire not only to extinguish life in the victim, but to mutilate the corpse, tear its flesh and drink its blood." (Lombroso, *Criminal Man*, pp. xiv, xv).

পিনেল্‌ (Pinel), মোরেল (Morel) ইত্যাদি অনেকেই বলিতেছেন যে, অপরাধ হইল নৈতিক বাতুলতা; লোম্‌ব্রোসো সম্ভবতঃ ইঁহাদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

(৬) জীববিদ্যা ও দৈহিকগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরাধীরা বিশেষ জাতিরূপ (type) গঠন করে।[১৯]

লোম্‌ব্রোসো অপরাধীদের শ্রেণীকরণ করেন এবং তাহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন—(ক) বাতুল বা উন্মত্ত অপরাধী, (খ) তীব্র আবেগের ফলে অপরাধী এবং (গ) আকস্মিক কারণে অপরাধী। যাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ যাহারা উন্মত্ত অপরাধী, তাহাদের ক্ষেত্রে দৈহিক অবনতি বা প্রত্যাবৃত্তি (regression) সুস্পষ্ট। তীব্র আবেগের প্রভাবে যাহারা অপরাধী, তাহাদের ক্ষেত্রে বাতুলতার প্রাধান্য। আকস্মিক ঘটনা সংঘাতে যাহারা অপরাধী তাহাদের আবার তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন, অর্ধ-অপরাধী, শৈশবের পরিবেশের প্রভাবে যাহারা স্বভাব অপরাধী ও পাপলুব্ধ ব্যক্তি, এবং যাহারা আকস্মিক ঘটনা প্রভাবে অপরাধী।

লোম্‌ব্রোসোর মতবাদকেই অপরাধ সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলা যায়। পরবর্তী কালে লোম্‌ব্রোসোর মতের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সত্য হইল যে (১) অনেক অপরাধীই অস্বাভাবিক, (২) বিভিন্ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরাধের বিচার করা উচিত, (৩) অপরাধীদের বিভিন্ন জাতিরূপ বা শ্রেণীবিভাগ আছে এবং সেই অনুসারে সংশোধনেরও বিভিন্ন পন্থা থাকা উচিত, ও (৪) অপরাধের আলোচনার জন্য আরোহ-পদ্ধতি (inductive method) গ্রহণ করা উচিত।

লোম্‌ব্রোসোর মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, তিনি দৈহিক গঠনের (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যের) সহিত অপরাধের সংযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। গোরিং (Charles Goring) নামক ইংলণ্ডের এক কারা-চিকিৎসক অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, অপরাধীদের সহিত নিরপরাধদের অথবা একদল অপরাধীর সহিত আর একদল অপরাধীর

১৯ জার্মান অপরাধবিজ্ঞানী নেকে (Näcke) লোম্‌ব্রোসের মতবাদের নিম্নলিখিত মূলতত্ত্ব বর্ণনা করেন:

(a) the criminal, properly speaking, is *born* so;
(b) the same as the *moral insane*;
(c) on *epileptic* basis;
(d) explicable chiefly by atavism; and
(e) forms a special *biologic* and *anatomic* type." (Quoted by DeQuiros. *Modern Theories of Criminality*. p. 17).

বিশেষ গঠনগত পার্থক্য নাই।[২০] সুতরাং বংশগতির ফলে উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধপ্রবণতারূপ বৈশিষ্ট্য পাইয়া থাকে, বা 'অপরাধী' বলিয়া একটি পৃথক্ জাতিরূপ আছে, এ কথা সত্য নহে।

অতএব, বলা যাইতে পারে যে, কেবলমাত্র দৈহিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লোম্ব্রোসো অপরাধের যে কারণ নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্ত একদেশদর্শী। তাহা ছাড়া, দৈহিক গঠনের ক্রটির জন্য (যেমন, বামনত্ব, বধিরতা, মূকত্ব ইত্যাদির জন্য) যদি কিছু ব্যক্তি অপরাধপ্রবণ হইয়া উঠে, তাহার কারণ হইল যে, তাহাদের এই দৈহিক ক্রটির জন্য তাহারা যে হীনতাবোধ করে, তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহারা অপরাধের মাধ্যমে তথাকথিত দুঃসাহসী কার্য করিয়া খ্যাতিলাভের চেষ্টা করে।

(৪) **সামাজিক কারণ**—সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে অথবা উহার সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজনের অভাবে মানুষ অনেক সময় অপরাধমূলক কার্য করে। অনেক সময়ই দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি সামাজিক প্রভাবে অপরাধের পথে অগ্রসর হয়।

অপরাধের কারণ হিসাবে যে সকল লোক সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁহাদের অন্যতম হইলেন এন্‌রিকো ফেরি (Enrico Ferri)। বলা বাহুল্য, সামাজিক কারণ বলিতে কোন একটি বিশেষ কারণ বুঝায় না। জনসংখ্যা, সাম্প্রদায়িক আচরণ ও নীতি, পারিবারিক সংগঠন, সমাজের শিল্পীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দেশের ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন, কৃষ্টিমূলক আদর্শ ও উহার পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ইত্যাদি সব কিছুই সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাদের যে কোন একটির তারতম্যে ও প্রভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়।[২১]

২০ গোরিং (Goring)-এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: "There is no such thing as an anthropological criminal type. But, despite this negation, and upon the evidence of our statistics, it appears to be an equally indisputable fact that there is a physical, mental and moral type of normal person who tends to be convicted of crime." (*The English Convict*, p. 370).

২১ Enrico Ferri, *Criminal Sociology*, pp. 1-143, 200-264, দ্রষ্টব্য।

ফেরি মনে করিতেন যে, যদি জনসাধারণ ও উহার পরিবেশ অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে শাস্তির পদ্ধতি যেরূপই হউক্ অপরাধের স্বরূপ ও সংখ্যা একই থাকিবে—ইহাকে তিনি 'অপরাধের সম্পৃক্তি-সম্বন্ধীয় নীতি' (*Law of Criminal saturation*) আখ্যা দিয়াছেন।

যেখানে ঘনবসতি (density of population), সেখানে অনেক সময়ই অপরাধের প্রাবল্য দেখা দেয়। ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে যেমন বহুজনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেইরূপ পারস্পরিক সংঘর্ষও দেখা দেয় এবং এইরূপ সংঘর্ষের ফলে কতকগুলি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। ঘনবসতির ফলে অনেক সময় দারিদ্র্য দেখা দেয় এবং উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে আসে অপরাধপ্রবণতা। আবার পরিবারমধ্যেও স্থানাভাবে পারস্পরিক আচরণের মধ্যে শালীনতা থাকে না এবং তাহার জন্যও অপরাধ দেখা দেয়। সেইরূপ, নাগরিক জীবনে ঘনবসতির ফলে জীবন যখন বৈচিত্র্যহীন ও রুক্ষ হইয়া উঠে, তখনও যেন উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যক্তিবিশেষ আকস্মিকভাবে লোমহর্ষক অপরাধজনক কার্য করিয়া বসে।

যেমন ঘনবসতির ফলে অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে, সেইরূপ জনবিরলতার ফলেও অপরাধ ঘটিতে পারে। যেখানে জনবসতি বিরল, সামাজিক জীবনে পরস্পরের সহিত যোগসূত্র নাই, সেখানে কোন উচ্চ আদর্শ গড়িয়া উঠিতে পারে না, সাম্প্রদায়িক জীবনে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও অন্তরের যোগসূত্র থাকে না, এবং এই সকল কারণেও জীবন রুক্ষ ও কঠোর হইয়া উঠে ও মানুষ বিনা দ্বিধায় কতকগুলি অপরাধ করিয়া থাকে।

কোন বিশেষ সম্প্রদায় মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ ও জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে, তাহাও অপরাধপ্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে সম্প্রদায় মধ্যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রচলিত আছে, সেখানে অপরাধের সম্ভাবনা কম হইবে আশা করা যায়। অপর পক্ষে, যেখানে নীতিবোধ নিতান্ত শ্লথ, সেখানে অপরাধের প্রাচুর্য দেখা যায় (অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সকল অপরাধ অপরাধরূপে গণ্য না হইতে পারে)। কোন কোন দেশের সামাজিক প্রথা এইরূপ হইতে পারে যে, তাহার ফলে বিশেষ প্রকারের অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে পারে (যেমন, প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান, মারাত্মক অস্ত্র লইয়া চলাফেরা ইত্যাদি)। আবার, বিশেষ বিশেষ সামাজিক, নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের প্রভাবেও বিশেষ প্রকার অপরাধ ঘটিতে পারে; যেমন, "সম্পত্তির অধিকারিত্ব চৌর্যবৃত্তিরই নামান্তর"—এই মতের প্রভাবে একদল নীতিবোধসম্পন্ন বা উচ্চ আদর্শাভিমুখী ব্যক্তি ধনীর সম্পত্তিলুণ্ঠনের প্রচেষ্টা করিতে পারে। যদিও রাষ্ট্রমধ্যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিয়া অপরাধ রোধের প্রচেষ্টা করা হয়,

তাহা হইলেও কোন বিশেষ অনটন জনমনে এরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তাহার ফলে ঐ আইনভঙ্গ ও আনুষঙ্গিক অপরাধ সাধিত হইতে পারে।

পারিবারিক প্রভাবেও মানুষ কুপথে চালিত হয়। পারিবারিক জীবনে যেখানে অশান্তি—দাম্পত্যজীবনে যেখানে কলহ, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস—সেখানে মানুষ তথাকথিত সমাজবিরোধী কার্য করিয়া অশান্তি পরিহার করিতে চায়। তাহা ছাড়া, এইরূপ পরিবার মধ্যে যে সকল শিশু লালিত-পালিত হয়, তাহারাও উত্তর জীবনে অপরাধী হইতে পারে। (পৃঃ ৮৭ ও ১৪৬)।

সমাজ মধ্যে অপরাধীদের বিশেষ বিশেষ দল (gang) গড়িয়া উঠিতে পারে এবং ইহাদের মন্দপ্রভাবেও অনেক নিরীহ ব্যক্তি কু-পথে চালিত হয়। কু-সাহিত্যের প্রভাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন অপরাধের বিস্তারিত অথচ মুখরোচক কাহিনী পাঠে পাঠকদের মনে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হইতে পারে।

দেশে হঠাৎ অর্থনৈতিক অথবা অনুরূপ বিপর্যয়ের ফলে (যথা, দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদির ফলে) নানা অভাব অনটন দেখা দিতে পারে এবং সেজন্যও লোকে চৌর্য, প্রতারণা ইত্যাদি অপরাধের পথে অগ্রসর হয়।

কর্মক্ষেত্র (field of employment)-এতে অশান্তি বা অতৃপ্তির জন্যও মানুষ কখনও কখনও অপরাধের পথে চালিত হয়। মানুষের পক্ষে কেবলমাত্র কোন বৃত্তি পাওয়াই যথেষ্ট নহে, ঐ বৃত্তি তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন; নহিলে নানারূপ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও বিচারকমণ্ডলী যদি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও দেশে দ্রুতগতিতে অপরাধের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।

বাস্তবিক সামাজিক পরিবেশ এত বিরাট্ ও ব্যাপক এবং ইহা এত বিভিন্ন দিক্ হইতে মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে যে ইহাদের সম্পূর্ণ তালিকাদান এবং অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহাদের সম্ভাব্য প্রভাব সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। তাহা হইলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, অপরাধের ক্ষেত্রে বহুমুখী সামাজিক পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে যে সকল সামাজিক কারণে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সেগুলি যদি আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্ণয় করিতে পারি এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে অপরাধও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, সামাজিক কারণ

যেখানে সামাজিক গঠনের মধ্যে গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট, সেখানে সামাজিক কারণ সহজে দূর করা যায় না।

(৫) **মানসিক কারণ**—অপরাধমূলক কার্য মাত্রই মানসিক প্রতিক্রিয়া। সুতরাং যে কোন অপরাধকে বিশ্লেষণ করিলেই তাহাতে অপরাধীদের মনের পরিচয় কোন-না-কোন ভাবে পাওয়া যায়। তবে কতকগুলি অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সামাজিক বা জৈবিক বা অন্য প্রকার কারণ নাই, অথচ ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধজনক কার্য করিয়া ফেলে। সাধারণতঃ এই সকল ক্ষেত্রে মানসিক কারণের উল্লেখ করা হয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির অতি সামান্য নগণ্য বস্তু চুরি করিবার অদমনীয় ইচ্ছা দেখা দেয়; একজন হয়ত' ধনী ব্যক্তি, তাঁহার কলম কিনিবার অর্থের অভাব নাই, অথচ তিনি সুবিধা পাইলেই পরের কলম চুরি করেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তি একটি মানসিক রোগস্বরূপ।[২২]

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের উন্নতির ফলে মনের অবচেতন স্তরের প্রভাব স্বীকৃত হইতে লাগিল। ইহার ফলে দেখা গেল যে, অনেক সময় অবচেতন স্তরে কামের প্রভাবে অনেক অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং অপরাধপ্রবণতা হইল এক প্রকার মানসিক রোগবিশেষ।[২৩]

আমরা ৯ম অনুচ্ছেদে কয়েক প্রকার মানসিক বৈলক্ষণ্যের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধের পথে পরিচালিত হয়। যেমন, চিত্তভ্রংশী বাতুলেরা অনেক সময় পীড়ন ভ্রান্তির প্রভাবে কাল্পনিক উৎপীড়ককে হত্যা পর্যন্ত করিতে পারে। আবার বিভব ভ্রান্তির প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ মনে করিতে পারে যে, সেই সর্বশক্তিমান্ শাসক এবং সে যাহা ইচ্ছা করিতে

২২ চুরি করিবার এইরূপ অস্বাভাবিক ইচ্ছাকে *Kleptomania* বলে। অনেকে মনে করেন যে, ইহার মূলে আছে অবদমিত কাম (repressed libido).

২৩ L. P. Thorpe, 'A Psychological View of the causes of Criminal Behavior' (*The Journal of Clinical Psychopathology*, April, 1946) দ্রষ্টব্য।

যেখানে অপরাধপ্রবণতা মানসিক রোগবিশেষ (neurosis), সেখানে অনেক সময় অপরাধীর মনে পাপের ধারণা থাকে এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শাস্তি পাইতে চায় ও সেইজন্য অপরাধজনক কার্য করে। ডঃ আব্রাহামসেন্ (Abrahamsen)-এর ভাষায়: "Some crimes are motivated not by the wish for profit but by an unconscious need to be punished." (*Crime & the Human Mind*, p. 32).

পারে। সেইরূপ খেদোন্মত্ত বাতুলেরা উদ্দাম অবস্থায় নানাপ্রকার অপরাধ-জনক কার্য করিতে পারে এবং বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে পারে। অনেক সময় নিজের তীব্র হীনতাবোধ হইতেও ব্যক্তিবিশেষ অপরাধ-জনক কার্যে লিপ্ত হইতে পারে।[২৪]

তাহা ছাড়া, আবেগজনিত দ্বন্দ্ব (emotional conflict)-এর ফলেও মানুষ অনেক সময় অপরাধজনক কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। মানুষ যখন এইরূপ দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে না, তখন অপরাধমূলক আচরণরূপ অস্বাভাবিক কর্মপন্থার আশ্রয় লয়।

যাহারা প্রকৃত উন্মাদ হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা বাতিকগ্রস্ত এবং বাতুলতা-অভিমুখী (psychopath) তাহারাই সমাজের পক্ষে অধিকতর বিপদজনক; কারণ এরূপ ব্যক্তি সমাজমধ্যে সাধারণ বা স্বাভাবিক লোকের ন্যায় বিচরণ করে এবং সমাজ ইহাদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারে না। ইহারা বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ হইলেও স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার সীমারেখায় অবস্থিত এবং হঠাৎ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও অপরাধমূলক কার্যের মাধ্যমে ইহারা আত্মপ্রকাশ করে। ইহাদের মধ্যে যেমন উদ্দাম, অবিবেচক ব্যক্তিও আছে, সেইরূপ ধীরমস্তিষ্ক, 'কর্তব্য' সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিও আছে।[২৫]

---

২৪ মনোরোগচিকিৎসাবিশেষজ্ঞ ডঃ ব্লয়লার (Bleuler) তাঁহার *Text book of Psychiatry*-তে ভাগ্‌নেয়ার (Wagner) নামক একজন শিক্ষক ভ্রান্তির প্রভাবে কি-ভাবে অনেকগুলি অপরাধজনক কার্য করে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন: "Wagner, thirty-nine years old, murdered his four children and his wife while they were sleeping; the following night he set fire to several houses in another village, where he had previously been a teacher, and was shooting at the male inhabitants, of whom he killed nine and seriously wounded eleven." ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন: "His accusations against himself he transferred to his family; all Wagners should be exterminated; then his hatred extended to all mankind, above all to the inhabitants of his district who had treated him badly."

২৫ ইহাদের উল্লেখ করিয়া মরিস্ (Albert Morris) বলেন: "Among them are criminals who are reckless and wild headed, spendthrifts and adventurers, astute swindlers with clever schemes for getting 'easy money', pugnacious individuals who just can't keep out of troubles, and persons who make a serious mistake and are sorry for it over after." (*Criminology*, p. 81).

এই সকল মানসিক কারণ ব্যতীত আমরা সাধারণভাবে উনমানসতা (feeble-mindedness)-কেও অপরাধের অন্যতম মানসিক কারণ বলিতে পারি। যাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারা সহজেই অপরের অভিভাবনের প্রভাবে আসিয়া পড়ে এবং এই কারণ মন্দলোকদ্বারা অপরাধমূলক কার্যে প্ররোচিত হয়। তাহা ছাড়া, তাহাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি কম থাকার জন্যও তাহারা নিজেরা কর্তব্য-অকর্তব্য, ভাল-মন্দ নির্বাচন করিতে পারে না; এইজন্যও তাহারা পাপের পথে অগ্রসর হয়। অল্পধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে চোর, ঠগ, ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং অনেক নারী পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু বুদ্ধির স্বল্পতা ঘটিলেই যে ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধী হইয়া পড়িবে এবং উহার আধিক্য ঘটিলে নৈতিক জীবন যাপন করিবে এমন কথা বলা যায় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এমন সুকৌশলে অপরাধজনক আচরণ করিতে পারে যে তাহারা সহজে ধরা পড়ে না। বাস্তবিক, কোন কোন অপরাধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল অপরাধ সাধন করিবার জন্য গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল। কোন কোন মনোবিৎ মনে করেন যে, প্রতারণা, গচ্ছিত ধন আত্মসাৎকরণ ইত্যাদি কার্য সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু যৌন অপরাধ, চুরি, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি কার্য নিম্ন বুদ্ধিশালীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

বাস্তবিক, বুদ্ধির পরিমাণের সহিত অপরাধপ্রবণতার কোন সুস্পষ্ট পারম্পর্য বিষয়ে মনোবিদ্‌গণ একমত নহেন। অপরাধের বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে, এবং বুদ্ধির স্বল্পতা উহার অন্যতম কারণ। বুদ্ধির স্বল্পতা ঘটিলে অপরাধের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি বা উনমানস ব্যক্তিমাত্রই অপরাধী হইবে এমন কথা বলা যায় না।[২৬]

২৬ এইজন্য পিন্‌টনার্ (Pintner) মন্তব্য করিয়াছেন: "The type of crime a delinquent commits has certainly some relation to his intelligence, but it is difficult to disentangle this *one* factor from all the others that are at work leading to the commitment of different sorts of crime." (*Intelligence Testing*, p. 393). [অপরাধ ও বুদ্ধির পারম্পর্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য গ্রন্থকার -রচিত 'মনোবিদ্যা', পৃঃ ২২৩-২৭ দ্রষ্টব্য।]

মন্তব্য ঃ

আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে অপরাধের কতকগুলি প্রধান প্রধান কারণের উল্লেখ করিলাম। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন এক বিশেষ প্রকারের কারণ দ্বারা সকল প্রকার অপরাধকে ব্যাখ্যা করা যায় না। **বিবিধ কারণের সংঘাতে ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধের পথে চালিত হয়, এবং প্রতি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই কারণ-সমাবেশের এক অনুপমত্ব বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।**[২৭] যে কোন অপরাধের তথা অপরাধীর বিচার করিতে হইলে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) অপরাধীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব—অর্থাৎ তাহার দেহ-মানস গঠন বৈশিষ্ট্য, (২) তাহার প্রাকৃতিক, তথা কৃত্রিম পরিবেশ এবং (৩) তাহার সামাজিক পরিবেশ। ইহাদের বিভিন্ন প্রকার মিথস্ক্রিয়তার ফলে কতকগুলি ব্যক্তি অপরাধের পথে চালিত হয় এবং তাহাদের অপরাধের বৈচিত্র্য ঘটে।

১১। অপরিণতবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা (Juvenile Delinquency):

(ক) 'দুষ্ক্রিয়তা' কাহাকে বলে ?

সামাজিক সমস্যামাত্রই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং এই কারণ অপরাধমাত্রই সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সকল অপরাধ যখন অপ্রাপ্তবয়স্কেরা করিয়া থাকে তখন তাহা অধিকতর দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। কারণ বর্তমানে যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তাহারাই ভাবীকালে নাগরিক হইবে। সুতরাং ইহারা যদি বাল্যাবস্থা বা কৈশোরে অপরাধমূলক কার্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভাবী কালে তাহারা ঐ ভাবেই জীবন যাপন করিবে এবং তাহাতে সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইবে। তাহা ছাড়া, অপরিণতবুদ্ধি বালকবালিকাদের বিচারশক্তি বিশেষ থাকে না এবং এই কারণে তাহারা সহজেই অপরাধমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; অথচ অপরাধমূলক কার্যের অনেক প্ররোচক (যথা, অর্থলোভ, কাম, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা ইত্যাদি) তাহাদের ক্ষেত্রে বিশেষ

২৭ তুলনীয়: "There is no cause of crime. Criminal behavior, like all other behavior, is a continuously growing pattern of activity drawn by the interplay of *many* forces within and without the criminal person. It cannot be too strongly emphasized that *for every man the combination is unique and the results are unique.*" (Morris, *op cit.*, p. 69).

প্রভাব বিস্তার করে না। এইজন্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধমূলক কার্য সমাজের পক্ষে এক বিশেষ সমস্যা। প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণ অপরাধ (crime) হইতে পৃথক্ করিবার জন্য **অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধকে 'দুষ্ক্রিয়তা' (delinquency) বলা হয়।**

অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ সম্বন্ধে প্রথমেই দুইটি প্রশ্ন উঠে: (ক) অপ্রাপ্তবয়স্ক কাহাদের বলা যায়? অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে সীমারেখা কি ভাবে নির্ধারিত করা যায়? (খ) দুষ্ক্রিয়তা বলিতে কী বুঝায়? কোন্ শ্রেণীর কার্যকে এই আখ্যা দেওয়া যায়? বলা বাহুল্য, এই দুইটি প্রশ্নেরই কোন সুস্পষ্ট, সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দান সম্ভব নহে। সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ষোল হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সীমারেখার মধ্যে যে সকল বালক-বালিকা থাকে তাহাদের সাধারণতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ঊর্ধ্ব সীমারেখা লইয়া প্রায়ই মতভেদ ঘটিয়া থাকে—বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন বয়ঃক্রমকে অপ্রাপ্তবয়স্কের ঊর্ধ্বসীমারূপে গণ্য করা হয়। আইনের সুবিধার জন্য সাধারণতঃ একটি সীমারেখা স্থির করিতে হয়; নহিলে কোন ব্যক্তি সত্যই বিচারবিবেচনা-সম্পন্ন মার্জিতবুদ্ধি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হইয়াছে কি না তাহা ব্যক্তিবিশেষের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করা যায়।[২৮]

'দুষ্ক্রিয়তা' বলিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কৃত যে কোন সমাজবিরোধী এবং আইন-বিরুদ্ধ কার্য বুঝায়। ব্যাপক অর্থে বালকবালিকা কর্তৃক কৃত যে কোন নীতিবিরোধী বা সামাজিক আদর্শবিরোধী কার্যই লইল দুষ্ক্রিয়তা; যেমন, মিথ্যা কথা বলা, সমবয়স্কদের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করা, স্কুল হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি (পৃঃ ৪৬৫, পাদটীকা, দ্রষ্টব্য)। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার দৃষ্টি হইতে এবং মনোবিদ্যার দৃষ্টি হইতে ইহারা সকলেই 'দুষ্ট' ছেলে-মেয়ে (Problem Children); কিন্তু 'দুষ্ট' হইলেই আইনের দৃষ্টি হইতে দুষ্ক্রিয়তাকারী (delinquent) না হইতে পারে। তবে আইনের দৃষ্টি হইতে

২৮ ধরা যাউক্ যে, ষোল বৎসর হইল অপ্রাপ্তবয়স্কের ঊর্ধ্বতম সীমারেখা। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যেই মাত্র কোন ব্যক্তি 'ষোলবৎসর একদিন' হইল, অমনি তাহার বুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা 'সুপক্ক' হইয়া উঠিল!

রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট আদেশের বিপরীত কার্য যখন অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সাধিত হয়, তখন তাহাকে দুষ্ক্রিয়তা বলে।[২৯]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অপরাধ (crime) ও দুষ্ক্রিয়তা (delinquency)-এর মধ্যে পার্থক্য করার যৌক্তিকতা হইল যে, যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক তাহাদের বিচারবিবেচনাশক্তি গঠিত হয় নাই এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ নাই। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের যেরূপ শাস্তি হওয়া উচিত অপ্রাপ্তবয়স্কদের সেরূপ হওয়া উচিত নহে।[৩০]

(খ) দুষ্ক্রিয়তার কারণ কি কি ?

সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, সকল অপরাধের সকল কারণের সুনির্দিষ্ট তালিকা করা সম্ভব নহে, সেইরূপ অপ্রাপ্তবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তাব সকল কারণ নির্ধাবণ দুরূহ। দুষ্ক্রিয়তা সমাজের সাধারণ গতীয়তার একপ্রকার অপ-প্রকাশ। অপরাধী বালক-বালিকার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের সহিত চলমান সামাজিক পরিবেশের সহিত মিথস্ক্রিয়তার ফলেই অপরাধ-প্রবণতার প্রকাশ। এই মিথস্ক্রিয়তা সকল ক্ষেত্রেই ঘটিতেছে, কিন্তু কোন একদল বালক-বালিকা অপরাধপ্রবণ হইতেছে এবং আর একদল হইতেছে কি-না, তাহা নির্ধারণ করাই এক বিশেষ সমস্যা। দুষ্ক্রিয়তা কেবলমাত্র দুষ্কার্যকারীর ব্যক্তিত্বের দোষেই ঘটে না ; অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ, দারিদ্র্য অথবা আকস্মিক

---

২৯ বয়সের ক্ষেত্রে যেমন উর্ধ্বসীমারেখা কৃত্রিমভাবে নির্ধারণ করা হয়, দুষ্ক্রিয়তানির্দেশক অপকার্যের তালিকাও সেইরূপ কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত হয়। এইজন্য নয়মেয়ার্ (M. H. Neumeyer) বলিয়াছেন : "The line of demarcation between a delinquent and a nondelinduent or between a delinquent and a child requiring protection or treatment for health or welfare reasons, is not very rigid It is frequently difficult to distinguish between those who have 'sinned and those who have been 'sinned against'." (*Juvenile Delinquency in Modern Society*, pp. 16. 17).

৩০ তুলনীয় : "The judicially accepted distinction between criminal act and a 'delinquent' act is inherent in the theory tha juveniles are not motivated by the same responsible considerations a are assumed to actuate the adults. Legally and sociologically, th distinction is justified by a recognition of the need for differential treat ment of juvenile offenders." (Fairchild, *Dictionary of Sociology*, Art. o '*Delinquency*').

বিত্তশালিতা, অসৎসংসর্গ, অবাঞ্ছনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কুরুচির পরিচায়ক আমোদ-প্রমোদ, কৃষ্টিমূলক আদর্শের দ্রুত পরিবর্তন, সামাজিক কু-প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীর মনে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিত্বের উপর ইহাদের সংঘাতে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হইতে পারে। অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন 'উপাদান'গুলির মধ্যে গৃহ বা পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক। যে গৃহে পিতামাতা নৈতিক আদর্শ অনুধাবন করে না, যেখানে তাহারা স্খলিত জীবন যাপন করে, যেখানে তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কলহ ও অবিশ্বাসে পূর্ণ, যেখানে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে, সেখানে তাহাদের কু-আদর্শের ফল সন্তান-সন্ততির আচরণে প্রকাশমান হইবে। অপরপক্ষে, যে পরিবারে নৈতিক আদর্শ অক্ষুন্ন থাকে, কৃষ্টির সমতা আছে, অর্থনৈতিক স্থিতি আছে, শিক্ষার সমাদর আছে, গঠনগতবৈশিষ্ট্যের দিক্ হইতে সেই গৃহ বা পরিবারই আদর্শ বা সুস্থ গৃহ এবং এই প্রকার গৃহে যাহারা লালিত পালিত হয়, তাহারা সরল, নীতিবোধসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদাশীল হইতে পারে।[৩১] এই প্রকার পারিবারিক পরিবেশই দুষ্ক্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।

তাহা ছাড়া, সন্তান-সন্ততি যদি অবাঞ্ছিত হয় (পৃঃ ৮৭), তাহা হইলেও তাহাদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাহাদের মনের অবচেতনস্তর যেন 'প্রতিবাদ'-ঘোষণার ছলেই বিবিধ সামাজিক আদেশ ও আদর্শ-ভঙ্গ করে এবং দুষ্ক্রিয়তার পথে অগ্রসর হয়।[৩২]

দৈহিক স্বাস্থ্যের অভাবও দুষ্ক্রিয়তাব কারণরূপে কার্য করিতে পারে। রোগক্লিষ্ট, ভগ্নস্বাস্থ্য, দৈহিক দোষযুক্ত বালক-বালিকার মনে অনেক সময় এমন হতাশার ভাব ও হীনতাবোধ আসিতে পারে যাহার ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়া উঠে।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবেও অপরাধপ্রবণতা সৃষ্ট হইতে পারে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে। বিদ্যালয়গুলিতেই গৃহের বাহিরে

---

৩১ L. J. Carr, *Delinquency Control*, pp. 110-112, দ্রষ্টব্য।

৩২ তুলনীয়: "All too often children are born to parents who for reasons of health or economics do not want or should not have them.... It is an unfortunate trick of fate that brings a child into such homes. In all of these cases the circumstance that is likely to lead towards delinquency and crime is not the poverty or lack of care, although these may enter, but the child's own feeling that he is not wanted and does not rightfully belong to the family circle." (Morris, *op. cit.*, p. 172).

অধিকাংশ সময় বালক-বালিকারা অতিবাহিত করিয়া থাকে। সুতরাং একজন বালক বা বালিকা বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা পায়, যে সকল সহপাঠী বা সহপাঠিনীদের সাহচর্যে সে থাকে, যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার অধীনে সে পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের প্রভাব যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে সেও মন্দ পথে যায়। তাহ ছাড়া বাল্যে ও কৈশোরে যে প্রকার আমোদ-প্রমোদ সে উপভোগ করে, সেগুলি যদি নির্দোষ না হয়, সেগুলির মধ্যে যদি শ্লীলতা বা শালীনতার অভাব থাকে, তাহা হইলেও ব্যক্তি-বিশেষ দুষ্ক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে।[৩৩] দুর্নীতিমূলক চলচ্চিত্র, অভিনয়, মন্দসাহিত্য এইগুলিও কিশোরমনে বিকৃতরুচি ও অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, সংসর্গের কুপ্রভাবেও অনেকে বিপথগামী হয়।

জনসংখ্যা তথা জনবসতির ঘনত্বের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন আসে, বা যে আদর্শসংঘাত ঘটে, তাহার ফলেও কিশোরমনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীর মনে কাম তথা যৌন সম্পর্ক বিষয়ে নানা কুতূহল ও সমস্যা দেখা দেয়। সেগুলির সুষ্ঠু সমাধান করিতে না পারায় তাহাদের মনে নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং অনেকে দুষ্ক্রিয়তার পথে চলে।

অর্থ-নৈতিক নির্ভরশীলতা ও দারিদ্র্যের ফলেও অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্র পরিবার মাত্রই দুষ্ক্রিয় সন্তানের জন্ম দিবে, ইহা বলা যায় না।[৩৪] (পৃঃ ৪৬৮)।

৩৩ কিশোর মনে অবসর-বিনোদনের প্রভাব সম্বন্ধে চিকাগো সহরে অধ্যাপক বার্জেস্ (Burgess)-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন ১৯৪১ সালে বিশেষভাবে অনুসন্ধান কার্য চালান। এই কমিশন লক্ষ্য করেন যে, যদি কিশোর-কিশোরীদের অবসর-বিনোদনের পরিকল্পনা সুপরিচালিত হয়, তাহা হইলে দুষ্ক্রিয়তার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

৩৪ অধ্যাপক বার্ট একটি হিসাব করিয়া দেখেন যে, দুষ্ক্রিয়কারীদের ১৯% অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। [Cyril Burt, The *Young Delinquent* (1938), pp. 68-69 দ্রষ্টব্য]। হিলি (Healy) এক সময় মনে করিতেন যে, দারিদ্র্য দুষ্ক্রিয়তার একটি প্রধান কারণ; পরে ব্রোনার (Bronner)-এর সহিত যে অনুসন্ধান কার্য চালান, তাহাতে তিনি দারিদ্র্যের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করেন। দারিদ্র্য হইতে সরাসরি দুষ্ক্রিয়তার উদ্ভব হয় না; তবে দারিদ্র্যের ফলে যদি ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব দেখা দেয়, তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুষ্ক্রিয়তার উদ্ভব ঘটিতে পারে।

যে পরিবারে, যে সমাজে আদর্শ ও শৃঙ্খলাবোধ বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, সে পরিবারে বা সমাজে যেমন নিয়মানুগ, আদর্শবোধসম্পন্ন সন্তানের অভাব ঘটিতে পারে, সেইরূপ যে পরিবার বা সমাজে কঠোর শৃঙ্খলার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেইখানে অল্পবয়স্কদের মনের অবচেতনে এমন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যাহার ফলে তাহারা দুষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে তাহাদের 'প্রতিবাদ' জানাইতে পারে। সুতরাং যেমন শাসনের অভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিতে পারে, সেইরকম কঠোর শাসনের প্রভাবেও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে।

যে কোন দুষ্ক্রিয়তার কারণ নির্ধারণ করিতে হইলে কেবলমাত্র বাহ্য উপাদানগুলি নিরূপণ করাই যথেষ্ট নহে, দুষ্ক্রিয়তাকারীকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা প্রয়োজন। দুষ্ক্রিয়তাকারীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে আবাল্য বিশ্লেষণ করিলে কেন সে বিপথগামী হইয়াছে তাহা অনেক পরিমাণ বুঝা যাইতে পারে।[৩৫] মোট কথা, দুষ্ক্রিয়তাকারীকে নিন্দা করা বা শাস্তি দেওয়াই যথেষ্ট নহে; উহার পূর্বে জানিতে হইবে যে, যে সরল শিশুরূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সে কেন, কিসের প্রেরণায়, কিসের প্রতিবাদে, কোন্ অভিমানে, দুষ্ক্রিয়তার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি অপরাধ ও অপরাধীর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা পৃথক্‌ভাবে স্থির করিতে হইবে।

(গ) মন্তব্য :

দুষ্ক্রিয়তার সম্ভাব্য কারণসমূহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দিলাম তাহার আলোকে আমরা বলিতে পারি যে, শিশুমঙ্গলের আদর্শ ও উহার প্রয়োগের অভাবেই প্রধানতঃ অপ্রাপ্তবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তাজনিত সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং সমস্যা উদ্ভবের পূর্বেই যদি উহার কারণকে রোধ করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজ মধ্যে প্রতি শিশুরই সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হইয়া থাকিবার দাবী স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাকে তাহার উপযুক্ত সুযোগ দান করিতে হইবে।

আমরা সাধারণভাবে মন্তব্য করিতে পারি যে, অপ্রাপ্তবয়স্কেরা যখন তাহাদের মনের অজ্ঞাতসারে অপরাধের পথে অগ্রসর হয়, তখন উহার দায়িত্ব তাহাদের পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা সমগ্র সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই এই

---

৩৫ তুলনীয় : "The central problem in any given case is the delinquent himself, who must be *understood* in order to be dealt with effectively." (Neumeyer, *op. cit.*, p. 224).

দুষ্ক্রিয়তার সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্য প্রতি শিশুরই কয়েকটি প্রাথমিক অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে :[৩৬]

(১) প্রত্যেকেই দাবী করিতে পারে যে, তাহার পারিবারিক পরিবেশ—বিশেষতঃ তাহার পিতামাতা অথবা তাঁহাদের পরিবর্তে অন্য অবিভাবকদের পারস্পরিক সম্পর্ক—যেন স্বাভাবিক হয়।

(২) তাহার দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় ;

(৩) সে যেন আর্থিক স্বাচ্ছল্য ভোগ করে—অন্ততঃ তাহাকে যেন অস্বাভাবিক আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে না হয় ;

(৪) সে যেন উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় ;

(৫) সে যেন ভবিষ্যতে তাহার উপযুক্ত বৃত্তি সংগ্রহ ও সৎভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুতির সুযোগ পায়।

১২। শাস্তির যৌক্তিকতা—শাস্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (The justification of punishment—Different Theories) :

সমাজ অপরাধমূলক কার্য সহ্য করে না। যে কোন অপরাধমূলক কার্য হইতে বিবিধ প্রকার অপচয় বা ক্ষতির সৃষ্টি হয়—অপরাধ মাত্রই সমাজের অল্পবিস্তর অর্থ-নৈতিক অপচয় বা ক্ষতি সাধন করে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির বিঘ্ন ঘটায় এবং সমাজের তথা ব্যক্তির নৈতিক ক্ষতি করে। সুতরাং এই বহুবিধ অপচয় বা ক্ষতি যাহারা করিয়া থাকে সমাজ তাহাদের নানাপ্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ রাষ্ট্র সমাজের পক্ষ হইতে শাস্তি বিধান করিয়া থাকে।

শাস্তি মাত্রই অপরাধীকে মানসিক বা দৈহিক উৎপীড়ন দান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দান করা সমর্থনীয় নহে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে : অপরাধীকে শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে কেন এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয় ? বাস্তবিক যখন আমরা ধীর বুদ্ধিতে অপরাধীর অপরাধ তথা শাস্তি সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন বিভিন্ন মনোভাবের উদয় হয়। যখন আমরা চিন্তা করি যে, অপরাধী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সমাজের স্বাভাবিক জীবন হইতে

৩৬ R. C. Dexter, *Social Adjustment*, Ch. V, দ্রষ্টব্য।

বিচ্ছিন্ন হইয়া কারাগারের ক্ষুদ্র কক্ষে কালাতিপাত করিতেছে তখন আমাদের মনে অনুকম্পার উদয় হয়।[৩৭] আবার যখন অপরাধীর অপরাধের কথা চিন্তা করি—যখন চিন্তা করি যে তাহার সামাজিকতাবোধ ও নীতিবোধ কত নিম্ন পর্যায়ের, সমাজের সে কত ক্ষতি সাধন করিয়াছে, তখন আমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। তাহা ছাড়া, যখন ভাবি যে, এই অপরাধী আমাদেরই সহ-নাগরিক, সেও আমাদের মত সুস্থ, স্বাধীন, সামাজিক জীবনযাত্রার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন আমরা ভাবিতে থাকি তাহাকে কিভাবে সংশোধন করিয়া সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং সমাজ-জীবন যাহাতে অধিকতর কলুষিত না হয় তাহার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

অপরাধ ও শাস্তিবিধান সম্বন্ধে এই বহুমুখী চিন্তাধারার ফলে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

(ক) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory of Punishment):

এই মতের সমর্থকেরা বলেন যে, অপরাধী যখন অপরাধ করে, তখন সে কোন-না-কোন ভাবে সমাজের ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং **সমাজের যে ক্ষতি সাধন সে করিয়াছে, সেই ক্ষতিই তাহার উপর প্রত্যাবৃত্ত হওয়া উচিত**। শাস্তির মাধ্যমে—যন্ত্রণাদানের মাধ্যমে—তাহার দ্বারা সাধিত ক্ষতি সম্বন্ধে তাহার অবগতি জন্মান যায়। শাস্তি হইল পাপের বেতন। সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ করিয়াছে; সুতরাং যতক্ষণ না শাস্তি বিধানের

৩৭ কারাবাসকারীর প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার এক প্রবন্ধে বলেন:

"Behind the door, within the wall
Locked, they sit the numbered ones......

Two years, three years, seven years stolen from life's brief span—each year of twelve months, each month of thirty days, each day of twenty-four hours—how terribly long it all seems to the prisoner, how wearily time passes." (*Modern Review*, 1935. Reprinted in *India and the World*, p. 136.)

মাধ্যমে ক্ষুব্ধ সমাজমন শান্ত হয়, ততক্ষণ অপরাধীকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।[৩৮] অর্থাৎ শাস্তি-বিধানের তাৎপর্য হইল অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া সে যে সামাজিক ক্ষতি করিয়াছিল তাহাকে বিফল করিয়া দেওয়া।

শাস্তির স্বরূপ কী হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতিশোধাত্মক মতবাদের সমর্থকগণ দুই দলে বিভক্ত। একদল বলেন যে, যে যেমন ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছে তাহার ঠিক সেইরূপ ক্ষতি সাধন করিতে হইবে। শাস্তিদানের ক্ষেত্রে কঠোর হইতে হইবে। ইঁহারা হইলেন কঠোরতাবাদ (rigorism)-এর সমর্থক। যদি অপরাধী একজন নিরীহ ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে অপরাধীরও চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিতে হইবে।[৩৯] তাহা ছাড়া যে অঙ্গ ব্যবহার করিয়া অপরাধী অপরাধমূলক কার্য সাধন করে, প্রয়োজন হইলে তাহার সেই অঙ্গ নাশ করিতে হইবে! যেমন, একজন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চুরি করিয়াছে অতএব তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দিতে হইবে।

অপর আর একদল বলেন যে, অপরাধীর শাস্তিবিধানকালে সকল সময় অতিরিক্ত কঠোর হইলে চলিবে না। মানুষ অনেক সময় আকস্মিক উত্তেজনার বশে অথবা দুর্বল মুহূর্তে অপরাধজনক কার্য করিয়া ফেলে; সুতরাং শাস্তিদানের সময় মানুষের সহজাত দুর্বলতার কথা চিন্তা করিতে হইবে। অপরাধীর উদ্দেশ্যের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে; অর্থাৎ অপরাধী কেন, কিসের প্রেরণায় ও কোন্ মুহূর্তে অপরাধ করিয়াছিল তাহা বিচার করিতে হইবে। এইজন্য শাস্তিদানকালে ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া উভয়ের সংমিশ্রণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৪০]

(খ) প্রতিষেধাত্মক মতবাদ (Deterrent, Preventive or Exemplary Theory of Punishment)—

এই মতবাদের সমর্থকেরা বলেন যে, **শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল অপরাধ নিবারণ**। যে অপরাধী সে ত' সমাজের ক্ষতি করিয়াছে, এবং সেই ক্ষতির

---

৩৮ তুলনীয়: "A wrong against social law is a wrong against humanity, and cannot be forgiven until the offended majesty of the law has been appeased, *i.e.*, until the wrongness and essential nullity of the act has been made apparent. It is here that the justification of punishment has been found." (Mackenzie, *Manual of Ethics.*, p. 374).

৩৯ তুলনীয়: "Tit for tat, eye for an eye, tooth for a tooth, nail for a nail." (যেমন কর্ম, তেমন ফল)।

৪০ তুলনীয়: "Justice should be tempered by mercy."

সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নহে। কিন্তু মানুষের এমনই অনুকরণবৃত্তি যে, সে যদি দেখে একজন অপরাধ করিয়াছে তাহা হইলে সেও প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং অপরাধীকে এমন কঠোর শাস্তি দান করিতে হইবে যাহাতে অন্য লোকে শিক্ষালাভ করে। অপরাধ লঘু হইলে শাস্তিও লঘু করিবার প্রয়োজন নাই। লোককে নিরস্ত বা প্রতিহত করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। সুতরাং শাস্তিদান কালে কঠোর হইতে হইবে। অপরে যাহাতে দেখিয়া শিখে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই প্রকার অপরাধের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।[৪১] সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এইজন্য এই প্রকার শাস্তিবিধানের সমর্থকেরা "আদর্শ" (exemplary) শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

(গ) সংস্কারমূলক বা শিক্ষামূলক মতবাদ (Reformative or Educative Theory of Punishment) :

এই মত অনুসারে অপরাধীদের শাস্তিদানের অর্থ তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা। অপরাধীও অপরাধের পূর্বে নাগরিকের সকল মর্যাদার অধিকারী স্বাধীন ব্যক্তি ছিল; আবার সে যাহাতে তাহার পুরাতন অবস্থা ফিরিয়া পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং **শাস্তি এমন হওয়া উচিত যাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের চারিত্রিক সংশোধন ঘটে;** শাস্তির মধ্যে প্রতিশোধের মনোভাব যেন না থাকে।

মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার সাম্প্রতিক প্রগতির ফলে এই মতবাদ বিশেষভাবে সমর্থন লাভ করিয়াছে। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরাধও হইল মানসিক বৈলক্ষণ্যের প্রকাশ। দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন রোগীকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা উচিত, সেইরূপ অপরাধরূপ মানসিক রোগের

৪১ একবার একজন ভেড়া চুরির অপরাধে ধৃত হয়। তাহাকে শাস্তি দিবার কালে বিচারক বলেন: "You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen." (যে ভেড়া চুরি করার জন্য তুমি ধরা পড়িয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না; আর যাহাতে ভেড়া চুরি না যায়, অর্থাৎ তুমি বা অন্য কেহ যাহাতে ভেড়া চুরি করিতে সাহস না পাও তাহার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে)।

ক্ষেত্রেও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজন—সে যাহাতে অপরাধপ্রবণতারূপ মানসিক রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও এই মত সমর্থন করা হয়, কারণ অপরাধীকে সমাজ হইতে পৃথক্ বা বহিষ্কৃত করিয়া রাখিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না—অপরাধীর মনে যদি এমন পরিবর্তন আনা যায় যাহাতে সে আর সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে না, তাহাতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি।

মন্তব্য :

শাস্তিবিধানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এই সকল বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিলে আমরা লক্ষ্য করি যে, ইহাদের প্রতিটির মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত আছে। বর্তমান সভ্যসমাজে শাস্তির মধ্যে ঠিক প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করে না। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রতিহিংসার নীতি সমাজবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমর্থন করা যায় না। অতএব কঠোরপন্থী প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (rigoristic retributive theory) পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। অপরাধী মানুষ কেন, কোন্ দুর্বল মুহূর্তে বা কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া অন্যায় করিয়াছিল তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করিতে হইবে। সসীম দুর্বল মানুষকে সর্বদা সহানুভূতিশীল মনোবৃত্তি লইয়া বিচার করিতে হইবে।[৪২] তবে উচ্চ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে হয় যে, শাস্তিদানকারী এবং শাস্তিভোগকারী যেন উভয়েই নিরপেক্ষ দৃষ্টি হইতে বোধ করে যে, শাস্তিভোগ হইল অপরাধ বা অন্যায়েরই প্রতিফলস্বরূপ এবং নীতির অমোঘবিধান অনুসারে ইহার কোন অন্যথা হইতে পারে না। অতএব নরমপন্থী প্রতিশোধাত্মক মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য আছে; তবে এ ক্ষেত্রে 'প্রতিশোধ' পদটি উহার প্রচলিত হিংসাত্মক অর্থে গ্রহণ করিলে চলিবে না—উহাকে 'নীতির সংরক্ষণ' (vindication of the Moral Law) অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।[৪৩]

৪২ মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, "Frailty, thy name is woman"; কিন্তু এক হিসাবে বলা উচিত, "Frailty, thy name is humanity."

৪৩ অপরাধীকে দৈহিক শাস্তি দান করিয়া কতদূর ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে, পাপকার্য ও দৈহিক যন্ত্রণা এই দুই-এর মধ্যে পরিমাণগত সমতা কতদূর রক্ষিত হইতে পারে,

অপরাধ-নিবারণ বা প্রতিষেধও যে সমাজের লক্ষ্য তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শাস্তিবিধানের সময় অপরাধের গুরুত্বের প্রতি উদাসীন থাকা চলে না। তবে অযথা কোন বিশেষ অপরাধীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর হওয়া বা সমাজের অন্য সকলকে 'শিক্ষা' দিবার জন্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া উচিত নহে। অতএব প্রতিষেধাত্মক বা প্রতিরোধাত্মক মতবাদ যখন অযথা কঠোর হইয়া ব্যক্তি-বিশেষকে সামাজিক শিক্ষার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেয়, তখন উহাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না।

সংস্কারমূলক মতবাদ অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের কথা বলে; সমাজ-কল্যাণের দিক্ হইতে ইহা যে একান্ত বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সকল রহস্য উদ্ঘাটন করা এবং তাহার উন্নতির বা সংশোধনের সঠিক উপায় নির্ধারণ করা বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, নৈতিক আদর্শের দিক্ হইতে অপরাধী যখন বুঝিতে পারে যে, সে অপরাধ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে শাস্তিদান করা হইয়াছে, তখনই তাহার প্রকৃত চারিত্রিক সংশোধন ঘটে।[৪৪] বলাবাহুল্য, খুব অল্পসংখ্যক অপরাধী ব্যক্তিই এইরূপ দার্শনিকোচিত মনোভাব গ্রহণ করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে যে আধিক্য

সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ইউইং (A. C. Ewing) বলেন: "I am not clear that there can be an objectively right proportion between two such incommensurable entities as pain and sin.......Punishment is a way of telling a person that he has acted wrongly more emphatically than can be told by mere words." (*Second Thoughts in Moral Philosophy*, p. 136).

[এই প্রসঙ্গে Ewing-রচিত *Morality of Punishment*, pp. 83-119 দ্রষ্টব্য।]

৪৪ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-র ভাষায়: "......neither reformation nor prevention is likely to be effected by punishment *unless it is recognised that the punishment is a vindication of the law*......It is only when an offender sees the punishment of his crime to be the natural or logical outcome of his act that he is likely to be led to any real repentance." (*op. cit*, p. 376). সেইরূপ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন: "That the end of punishment is partly protective or preventive and partly reformative cannot be denied. But punishment has at the same time a *retributive* character." (Prof. P. B. Chatterji, *Principles of Ethics*, p. 238).

বা অতিশয়োক্তি আছে তাহা পরিহার করিয়া উহার সমন্বয় সাধনই বাঞ্ছনীয়। **শাস্তির উদ্দেশ্য হইল ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষণ, অপরাধের প্রতিষেধ বা পুনরাবৃত্তিনিরোধ এবং অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন।** ইহাদের যুক্ত সমাবেশেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ।[৪৫]

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ তথা রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি-বিশেষকে শাস্তি দিবার অধিকার থাকে যদি সমাজ ও রাষ্ট্র অপরাধের বিবিধ সামাজিক কারণ দূর করিতে পারে। যদি রাষ্ট্র নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দান না করিতে পারে, তাহাদের দারিদ্র্য না দূর করিতে পারে, তাহাদের উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা না করিতে পারে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিয়া জীবনযাত্রার মান না উন্নত করিতে পারে, যদি উচ্চ পর্যায়ের কৃষ্টিমূলক ও শিক্ষামূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে না পারে, যদি মানসিক দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বাহ্য বা পরিবেশগত কারণগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত না করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকগণের অপরাধপ্রবণতার জন্য শাস্তি দিবার অধিকার থাকে না। তাহা ছাড়া, কারাগারেরও সংশোধন আবশ্যক। সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত কারাগারগুলিতে বিবিধ প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা দিবার কৌশল উদ্ভাবন করা হইত। শাস্তিবিজ্ঞান (Penology)-এর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হওয়ার সহিত কারাগারগুলিরও সংশোধন আবশ্যক। কারাবাসের সময় অপরাধী যাহাতে প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং সে যাহাতে কারাবাসের পর স্বাধীন ও সৎউপায়ে জীবিকা অর্জন করিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপ্রাপ্তবয়স্ক দুষ্ক্রিয়তাকারীদের শাস্তির সমস্যাও এই প্রসঙ্গে উঠে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে যেরূপ শাস্তি প্রযোজ্য অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের উপর তাহা প্রয়োগ করা চলে না। **অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে চারিত্রিক সংশোধন (reformation)-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।** তাহাদের

৪৫ তুলনীয় : "Under the more enlightened conditions of modern society the objects of punishment are clearly defined as (1) the protection of society, (2) the prevention of crime, (3) the reform of criminals. The whole object of punishment is to improve the conditions of society." (Blackmar & Gillin, *Outlines of Sociology*, p. 494).

অপরাধের ক্ষেত্রে তাহাদের পারিপার্শ্বিক ও মানসিক কারণগুলি বিশেষ যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধারণ কারাগারে তাহাদের নিক্ষেপ করা যায় না, কারণ সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক 'অভিজ্ঞ' অপরাধীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অধিকতর চারিত্রিক অবনতি ঘটারই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশেষ প্রকার **সংশোধনাগার** (reformatory) আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কি প্রাপ্তবয়স্ক, কি অপ্রাপ্তবয়স্ক, সকল ক্ষেত্রেই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর অপরাধীকে শাস্তিদান অপেক্ষা অপরাধের মূল কারণগুলি দূর করার ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকতর সজাগ থাকিতে হইবে।

তাহা ছাড়া, **নাগরিকের মনে সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ জাগরিত করা প্রয়োজন।** সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহার ফলে নাগরিক সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে। এই কারণে শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকের মনে সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠা, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, বৃদ্ধের প্রতি মর্যাদা, অসহায়, শিশু ও নারীর প্রতি সহানুভূতিশীলতা, অপরের ন্যায়সঙ্গতভাবে অর্জিত সম্পত্তির প্রতি লোলুপতা সংবরণ এবং সর্বোপরি মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সামাজিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রগতি

সমাজ মাত্রই আন্তর্ব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে—গতীয়তাই হইল সমাজের ধর্ম। ইহার ফলে সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন আসিয়া পড়ে; এই সকল পরিবর্তনের ফলে সমাজের পরিবর্ধন ঘটে—কোথাও বা সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, কোথাও বা ইহার গতি ব্যাহত হয়; কোথাও বা নূতনের আবির্ভাব ঘটে, কোথাও বা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সমাজকে বুঝিবার জন্য সমাজের এই গতির ধারা লক্ষ্য করিতে হইবে।

১। সামাজিক পরিবর্তন (Social change)—পরিবর্তনের সহিত পরিবর্ধন, বিবর্তন ও প্রগতির সম্পর্ক (Relation of Social Change to Social Development, Evolution & Progress):

সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন গতিতে সদাসর্বদাই ঘটিতেছে; কোথাও বা দ্রুতগতিতে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, কোথাও বা ইহা মন্থর গতিতে চলিতেছে। **সামাজিক পরিবর্তন বলিতে সমাজের স্বরূপ ও সংগঠনগত পরিবর্তন, সামাজিক গোষ্ঠী, সংস্থা ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন, সমাজমধ্যে আন্তর্গোষ্ঠীয় ও আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের পরিবর্তন সব কিছুই বুঝায়।**[১]

সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যে পরিবেশের মধ্যে একটি সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে যদি ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে, জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে, অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে সমাজজীবনের উপর উহার প্রভাব আসিয়া পড়ে; কারণ এইরূপ পরিবর্তনের সহিত ব্যক্তিজীবনে নূতনভাবে প্রতিযোজনের প্রয়োজন হয় এবং তাহার ফলে

---

১ তুলনীয়: "The alteration in the nature, content, and structure of groups and institutions and in the relationships among men, groups and institutions, durning a sequence of time, constitute the field for social change."(J. B. Gittler, *Social Dynamics*, p. 241).

সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটে। সেইরূপ জৈবিক পরিবর্তন (biological changes)-এর ফলে নানারূপ সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু সমাজজীবনে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় নানারূপ কৃষ্টিমূলক প্রলক্ষণ সৃষ্টি বা আবিষ্কারের ফলে। কৃষ্টির সকল 'উপাদান' বা 'অংশ' যে সকল সময় একইভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা নহে; ইহার ফলে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে নানারূপ ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়।[২] যাহা হউক, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কৃষ্টির ক্ষেত্রে নূতন অবদান বা নূতন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাহার ফলে উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। আবার সামাজিক পরিবর্তন ঘটার ফলে নূতন আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং তাহা সার্থক হইলে আরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং নূতন আবিষ্কারের ফলে সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আবার নূতন আবিষ্কার ঘটে।[৩] সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্টিমূলক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য সাধন করিয়া থাকে, আবার সামাজিক পরিবর্তন কৃষ্টিমূলক পরিবর্তনের পরিচায়ক। (পৃঃ ২৮০-২৮৪)।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যয়কে মূল প্রত্যয় (basic concept) রূপে গ্রহণ করিয়া আমরা সামাজিক পরিবর্ধন, বিবর্তন ও প্রগতিকে ব্যাখ্যা করিতে পারি।

পরিবর্ধন বা প্রচয় (development) পদটি জীবদেহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় এবং ইহার উপমায় আমরা সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। পরিবর্তনের ফলে জীবদেহে কোষসমূহ সংখ্যায় বর্ধিত হইতে থাকে, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং জীবদেহে জটিল সংগঠনের সৃষ্টি হয়। সমাজের ক্ষেত্রেও এই উপমা পুরাপুরি প্রযোজ্য না হইলেও আমরা দেখি যে, সামাজিক সংগঠনও ধীরে ধীরে পর্যায় বা স্তরের মধ্য দিয়া সরল হইতে

২ সমাজবিজ্ঞানে 'পরিবর্তন' (change) প্রত্যয়টি বিশেষভাবে প্রবর্তন করেন F. G. Ogburn তাঁর *Social Change* নামক গ্রন্থে। (পৃঃ ৪৪৬, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। তিনি বিশেষভাবে সংস্কৃতিমূলক পরিবর্তনকেই সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন।

৩ সামাজিক পরিবর্তনের ধারা কি ভাবে চলে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেঙ্গলার্, সোরোকিন্, টয়েনবি কৃষ্টির পরিবর্তনকে চক্রক (cyclic) পরিবর্তন বলিয়া বর্ণনা করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অবনতির বিকল্প পর্যায় চক্রক গতিতে চলে। অগ্‌বার্ণ এই মত পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন না।

জটিল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। **শক্তি, সংগঠন, জটিলতাবৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যের প্রকাশই হইল সামাজিক পরিবর্ধনের পরিচায়ক।** সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, বহুমুখী সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্ধন ঘটাইয়া থাকে ; আবার সামাজিক পরিবর্ধন সামাজিক পরিবর্তনের পরিচায়ক।

প্রাণিজগতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার ফলে নূতন জীবের বিবর্তন ঘটে। অনুরূপ ঘটনা সমাজের ক্ষেত্রেও ঘটে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'বিবর্তন' প্রত্যয়টি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে ব্যবহার করেন হারবার্ট স্পেন্সার। তিনি মনে করেন যে, সমগ্র বিশ্বজগতে (বিশেষতঃ প্রাণিজগতে) যে বিবর্তনের ধারা চলিয়াছে তাহারই অন্যতম প্রকাশ ঘটিয়াছে সমাজের গতিতে। প্রাণিজগতে যেমন ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ফলে সরল হইতে জটিল, সমজাতীয় হইতে ভিন্ন জাতীয়ের উৎপত্তি ঘটে, সেইরূপ সমাজজীবনেও জটিল ও নূতনের বিবর্তন ঘটিতেছে। তবে প্রাণি-জগতের বিবর্তনের উপমা সমাজ-জীবনে কত দূর প্রযোজ্য হইবে, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। (পৃঃ ৪৮-৪৯, ৫৬-৫৭)।

সমাজে যে পরিবর্তন চলিয়াছে তাহার ফলে সমাজ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদিও পরিবর্তনের ফলে প্রগতি সাধিত হয়, তাহা হইলেও সকল সামাজিক পরিবর্তনই যে সামাজিক প্রগতি সাধন করে তাহা নহে। **'প্রগতি' পদটি প্রধানতঃ নৈতিকতার পরিচায়ক,** কারণ প্রগতির সহিত ঔচিত্যের ধারণা সংশ্লিষ্ট থাকে ; প্রগতি ঘটিয়াছে কি না তাহা এক বিশেষ আদর্শের সহিত তুলনায় বিচার করিতে হইবে। অপর পক্ষে, সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা বাস্তবতার ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট। সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা কালে সমাজজীবনে কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা বিচার করিতে হইবে ; সামাজিক প্রগতি বিচারকালে সমাজজীবনে কী হওয়া উচিত এবং তাহার আলোকে উন্নততর সমাজব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।[৪]

আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলিতে পারি যে, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন এবং প্রগতি এই প্রত্যয়গুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং

৪ সামাজিক প্রগতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন দার্শনিক বেকন (Francis Bacon), দেকার্ত (Descartes), তুর্গো (Turgot), সাঁসিমো (Saint-Simon) এবং কোঁৎ (Comte)। বর্তমান কালের কোন কোন লেখক সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রগতি-পদটি ব্যবহার পছন্দ করেন না ; কারণ ইহা প্রধানতঃ দার্শনিক ও নৈতিক প্রত্যয়।

অনেক সময় পরস্পরের সহিত সমার্থক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তবে ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায়। সামাজিক পরিবর্তন হইল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং ইহারই পটভূমিতে পরিবর্ধন সাধিত হয়। পরিবর্ধনের ফলেই সাধারণতঃ সামাজিক জটিলতা, পরিপুষ্টি ও প্রসার ঘটে। এই পরিবর্ধনকে যখন জীবজগতের পরিবর্তনের সহিত তুলনা করা হয়, তখন সাধারণতঃ 'বিবর্তন' পদটি ব্যবহার করা হয়। **সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে নূতনের অভ্যুদয়, বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ভেদ, এবং সমজাতীয় হইতে ভিন্নজাতীয় গোষ্ঠীর উদ্ভবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়** (পৃঃ ৪৭)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পরিবর্ধনের ফলেই বিবর্তন ঘটে এবং বিবর্তন হইল পবিবর্ধনের পরিচায়ক। পরিবর্ধন তথা বিবর্তন সমাজকে কখনও প্রগতির পথে লইয়া যায়, কখনও বা উহার বিপরীত পথেও লইয়া যায়। অতএব, সামাজিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা বিবর্তনের যখন সমালোচনা বা বিচার করা হয়, তখনই প্রগতির প্রশ্ন উঠিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন বা প্রগতি যাহা কিছুই আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহাই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ **আন্তর্ব্যক্তিক আচরণের ভিত্তিতেই সমাজের পরিবর্তন বা অনুরূপ কোন গতি ব্যাখ্যা করিতে হইবে**, কারণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে যেমন ব্যক্তি থাকিতে পারে না, সেইরূপ ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেও সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকে না।[৫] সমগ্র সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সমাজগঠনকারী ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে সমাজের গতিশীলতার বিচার না করিলে উহা নিতান্ত অবাস্তব হইবে।

২। সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Chief Characteristics of Social Change):

সামাজিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে পাইয়াছি। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব।

---

৫ তুলনীয়: "The social relation is a relation of man to man, not man apart from the relation, nor the relation apart from the man, and social devolopment is the development of men in their mutual relations." (L. T. Hobhouse, *Social Development : Its Nature & Conditions*, p. 76.)

গতির দ্রুততা বা আকস্মিকতা হইল সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তনের গতি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও আমরা বলিতে পারি যে, সামাজিক পরিবর্তনের গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত। ভূতাত্ত্বিক বা ভৌগোলিক পরিবর্তন যে গতিতে সাধিত হয়, সামাজিক পরিবর্তন তাহা অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে হয়। এক এক সময় সামাজিক পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হয় যে উহা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যে কোন সমাজকে যদি যুদ্ধপরবর্তী যুগের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলেই সর্বত্র কী বিরাট্ পরিবর্তন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুদূর অতীত হইতে মানুষ যে সামাজিক সংঘ ও সংস্থা সংগঠন করে, মানুষ যে মূল্যবোধের ধারণা অনুসারে জীবনকে রূপায়িত করে, তাহা যেন এক এক ঘটনা সংঘাতে আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্তন ব্যতীত, সমাজজীবনে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতেও নানা পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল যে, পরিবর্তনের মধ্যেও উহার একটি **আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বা নিরবচ্ছিন্নতা** থাকে। এই কারণে পরিবর্তনের মধ্যেও প্রতি সমাজের একটি নিজস্ব ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কারণে একই প্রকার পরিবর্তনের সহিত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে নিজেকে প্রতিযোজনের প্রচেষ্টা করে।

সামাজিক পরিবর্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার **আপেক্ষিক অনিশ্চয়তা**। এই অনিশ্চয়তার জন্য সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের পশ্চাতে এত বিভিন্ন প্রকারের কারণ বর্তমান থাকে এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এত অনিশ্চিত যে, কোন সামাজিক পরিবর্তনের গতিপথ সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিবে, অথবা জনগণের গ্রীষ্মকালীন আচরণের সহিত বা শীতকালীন আচরণের কী পার্থক্য ঘটিবে তাহা আমরা পূর্ব হইতে বলিতে পারি, কিন্তু কোন সমাজ-ব্যবস্থায় আগামী দশ বৎসরে কী পরিবর্তন হইবে তাহা আমরা পূর্ব হইতে সঠিকভাবে কল্পনা বা অনুমান করিতে পারি না।[৬] অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে

৬ এইজন্য MacIver ও Page বলিয়াছেন: "As we pass from the physical sciences to the biological and then to the social, the conditions are more unstable as well as more complex, and therefore the limits of prediction are increasingly narrow......The number of variables is too great and

সামাজিক পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হইলেও যে অর্থে পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উহা সম্ভব সে অর্থে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহা সম্ভব নহে, কারণ স্বাধীন, সচঞ্চল, সজীব মানুষ লইয়া সমাজ গঠিত। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যখন সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা করিতে হয়, তখন সাধারণত: সমাজমনের উপর ঐ প্রকার পরিবর্তনের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন।

বৈচিত্র্য হইল সামাজিক পরিবর্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন কখনও প্রগতির পরিচায়ক, কখনও বা অবনতির পরিচায়ক ; সামাজিক পরিবর্তন কখনও দীর্ঘস্থায়ী, কখনও বা অল্পস্থায়ী ; কখনও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, কখনও বা কল্যাণকর ; কখনও বা সুপরিকল্পিত, কখনও বা পরিকল্পনাবিহীন ভাবে চলিতে থাকে ; কখনও বা বহুমুখী, কখনও বা একমুখী। বহু বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজের গতিপথ রচিত হয় বলিয়া সমাজ জীবনেও বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ হইল যে, এক একটি পরিববর্তনের পশ্চাতে **বহুবিধ কারণের সমাবেশ** ঘটে। এই কারণগুলি আবার কোথাও একাধিক ঘটনা পরম্পরায় (sequence of events ভাবে) আসে, কোথাও একাধিক কারণের কেন্দ্রীকরণে (convergence) ঘটে, কোথাও বা একই মূল কারণের নানাদিকে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, কোথাও বা বিভিন্ন কারণের সমাবেশে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৪৯২-৪৯৩) বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক, জৈবিক, ও যন্ত্রবিজ্ঞান বা শিল্প-বিজ্ঞানসংক্রান্ত পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই

their relation to one another is too uncertain." (*Society*, p. 510). সেইরূপ Spahr ও Swenson বলেন : "It has been urged repeatedly that the chief function of science is to predict......but '*accurate* prediction is confined almost solely to those fields of the exact sciences in which the ability of human beings to control or affect the results is negligible." (*Methods & Status of Scientific Research*, pp. 22, 23).

সকল লেখক অবশ্য এই মত গ্রহণ করেন না। যেমন, H. Hart বলেন : "Not only is all scheduling based upon routine forecasts of human behavior but specific & fairly complex events and trends can (in some cases) be predicted with resonable margin of error". (*Technology & Social Change* Ed. by Allen &c., p. 472).

সকল কারণসমূহের মধ্যে **যন্ত্রবিজ্ঞান-সংক্রান্ত পরিবর্তন** (technological changes)-এর প্রভাবই সমাজ-জীবনে সর্বাধিক।[৭]

যন্ত্র শিল্পের প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ তাহা নহে ; যন্ত্র-শিল্পের প্রসার যন্ত্রের ব্যবহারকারীদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহারই ফলে ক্রমশঃ আবার বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সামাজিক পরিবর্তনই যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা সাধিত হয় না। সেইজন্য সকলপ্রকারের সামাজিক পরিবর্তনকে শিল্পীয় পরিবর্তনরূপে ব্যাখ্য করা সমীচীন নহে।[৮] আদর্শগত বা মূল্য-গত ধারণার পরিবর্তনেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক পরিবর্তনের এই সকল বিবিধ কারণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এমন একটি জটিল পরিবেশের সৃষ্টি করে যাহার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে শিল্পীয় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় ; আবার শিল্পীয় বা যন্ত্রবিদ্যাগত পরিবর্তনের ফলে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

৩। সামাজিক পরিবর্ধন (Social Development) :

(ক) সামাজিক পরিবর্ধনের লক্ষণ :

সামাজিক পরিবর্ধনের ফলে সমাজের এরূপ প্রসার ঘটে যাহার ফলে সমাজ মধ্যে নূতন ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে, অথবা পুরাতন পরিস্থিতির সহিত নূতন ভাবে প্রতিযোজন ঘটে এবং সমাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বহুমুখী হয়। **যখন কোন সমাজে জনসংখ্যার আধিক্য ঘটে, যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, স্বাধীন কার্য ও চিন্তার অধিকার জনগণ লাভ করে এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক**

---

৭ শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি যে সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে, তাহার উদাহরণ প্রসঙ্গে Ogburn বলেন : "That technology is considered a cause of social chang is indicated by various expressions often heard. Gunpowde destoyed feudalism. Railroads created cities. The steamengin increased divorce. The automobile is moving the department stor and the supermarket to the suburbs. The airplane reranked the gre military power." (Allen &c., *op. cit.*, p. 13).

৮ মার্ক্সবাদীরা সামাজিক পরিবর্তনকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনরূপে বর্ণনা করেন। অর্থনৈতি পরিবর্তন সাধারণতঃ শিল্পীয় পরিবর্তন দ্বারা বিশেষভাবে সাধিত হয় : এইজন্য মার্ক্সবাদীরা শিল্প পরিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

নির্ভরশীলতা ও সামঞ্জস্য দেখা দেয়, তখন ঐ সমাজের প্রকৃত পরিবর্ধন ঘটিয়াছে বলা যায়।[৯]

ইহাদের কোন একটির অভাব ঘটিলে সমাজের সুষ্ঠু পরিবর্ধন ব্যাহত হয় অথবা উহা আংশিক হয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধিকাংশ সমাজেরই পরিবর্ধন আংশিক; অন্ততঃ উহা সর্বাঙ্গীণ নহে। এই কারণে যখনই কোন সমাজের পরিবর্ধনকে বিচার করিতে হয়, তখনই উহার পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এবং উহার সহিত সামাজিক প্রগতির প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

তাহা ছাড়া, সামাজিক পরিবর্ধনের আর একটি অসুবিধা হইল যে, অনেক সময় একটি উপাদানের সহিত আর একটির প্রাথমিক বিরোধ দেখা দেয়। যেমন, কার্য ও চিন্তার স্বাধীনতার সহিত যোগ্যতার বিরোধ দেখা দিতে পারে; সেইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সহিত স্বাধীনতার বিরোধ দেখা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, সমাজের যেখানে আংশিক পরিবর্ধন ঘটিয়াছে, স্বাধীনতার সম্বন্ধে উচ্চ নৈতিক ধারণা ঘটে নাই, মানুষ যেখানে পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারে নাই বা বুঝিবার চেষ্টার মত মানসিক উদারতা গঠন করিতে সক্ষম হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্ধন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতির উপর নির্ভর করে—বাস্তবিক, ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতিকে বাদ দিয়া কোন প্রকার সামাজিক পরিবর্ধন বিচার করা সম্ভব নহে। যেখানে ব্যক্তির নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটে নাই, সেখানে কার্য ও চিন্তার স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয় এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ বলিতে যে উদারতা ও সহানুভূতিশীলতার প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটে। এইজন্য সামাজিক পরিবর্ধন ও নৈতিক উন্নতি বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও শেষ পর্যন্ত উহাদের মিলিত হইবার সম্ভাবনা তথা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

(খ) সামাজিক পরিবর্ধনের মূল উপাদান বা কারণ:

সামাজিক পরিবর্ধনের মধ্যে যে জটিলতা ও বৈচিত্র্য থাকে তাহা কোন একটি বিশেষ কারণ বা ঘটনার দ্বারা সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। একাধিক ঘটনার সংঘাতে এই পরিবর্ধন সম্ভব হয়। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি এবং যেভাবে উহাদের বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেই একই কথা

৯ তুলনীয়: "......a community develops as it advances in (1) scale, (2) efficiency, (3) freedom and (4) mutuality." (Hobhouse, *op. cit.*, p. 78).

এখানে প্রযোজ্য। আমরা সামাজিক পরিবর্ধনের কারণসমূহকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করিতে পারি—প্রাকৃতিক পরিবেশগত, জৈবিক, মনোগত এবং সামাজিক।

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের তারতম্য অনুসারে মানুষের প্রতিক্রিয়ারও তারতম্য ঘটে এবং তাহার ফলে সামাজিক পরিবর্ধনও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের পক্ষে অতিরিক্ত উত্তাপে বা অতিরিক্ত শৈত্যে সুষ্ঠুভাবে কর্ম করা সম্ভব নহে; সেইজন্য অতিরিক্ত গ্রীষ্মপ্রধান বা অতিরিক্ত শীতপ্রধান দেশের লোকেরা কর্মঠ হইতে পারে না—গ্রীষ্মে আলস্য আসে এবং শীতে জড়তা আসে। অপর পক্ষে নাতিশীতোষ্ণ দেশের অধিবাসীরা সুষ্ঠু ও কর্মঠ হইয়া উঠিতে পারে। সেইরূপ, যেখানে জমি রুক্ষ ও অনুর্বর, সেখানে মানুষ স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া সুসংহত সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে না—অপর পক্ষে যেখানে ভূখণ্ড উর্বর, সেই দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয় এবং উর্বর জমিকে কেন্দ্র করিয়া ঘনবসতিপূর্ণ সমাজ গড়িয়া উঠে। আবার যেখানে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, সেখানে শিল্পের উন্নতি ঘটে। সেইরূপ, বিশেষ প্রকার ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাবেও বিশেষ প্রকারের সামাজিক সংগঠন রূপ লাভ করে। সমুদ্রতীরবর্তী জনগণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তাহা প্রকাশ না পাইতে পারে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের অনুকূলে আনয়নের জন্য মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা করে এবং তাহার ফলে প্রাকৃতিক অবদানের সহিত মানুষের কলাকৌশল তথা উদ্ভাবনী শক্তির সমাবেশ হয়। সুতরাং মানুষের মন নিতান্ত নমনীয় ও নিষ্ক্রিয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ তাহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চলে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহাই সমাজের পরিবর্ধনেব উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মনের উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে এবং মানুষ তখন যে কার্য করে তাহার সাফল্য-অসাফল্য মানুষ কি-ভাবে ঐ পরিবেশকে গ্রহণ করিবে তাহা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ কোন বিশেষ পরিবেশের সহিত তথাকার অধিবাসীদের মানসিক প্রতিযোজনের ফলেই সামাজিক পরিবর্ধন সম্ভব হয়।[১০]

---

১০ অধ্যাপক হব্‌হাউস্ (Hobhouse)-এর ভাষায়: "The physical environment—apart from climatic or other variations in nature in itself—ceases to be a fixed quantity. It begins to be in part an artefact. It is man with his desires, his knowledge, his powers of organization,

পারস্পরিক সংযোগ, ভাবের আদান প্রদান, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা ইত্যাদি ব্যাপারে ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(২) জৈব কারণ—কোন সমাজের স্থিতি ও পরিবর্ধন নির্ভর করে সেই সমাজ যাহারা গঠন করিয়াছে তাহাদের বাঁচিয়া থাকার উপর। মানুষ যে ভাবে তাহার দৈহিক প্রয়োজন তৃপ্ত করিতে পরিবে, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিবে, বংশরক্ষা করিতে পারিবে, তাহার উপর সামাজিক পরিবর্ধন অনেকাংশে নির্ভর করে। তবে কেবলমাত্র জৈব প্রয়োজন তৃপ্ত করার উপরই সামাজিক পরিবর্ধন নির্ভর করে না—মানুষ যে পরিমাণে প্রাথমিক জৈব প্রয়োজন তৃপ্ত করিয়া উহার উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হয়, সেই পরিমাণে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জীবদেহের উপমা সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায় না; তাহা ছাড়া, জৈব বিবর্তন যে ভাবে বা যে গতিতে চলে, ঠিক সেইভাবে সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। জৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংগ্রাম ও হিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; কিন্তু সামাজিক পরিবর্ধন বলিতে সকল ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তির প্রাধান্য বুঝায় না (পৃঃ ৪৮)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জীব জগতে যে অর্থে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটিতেছে, সমাজের পরিবর্ধন ও অগ্রগতির ফলে ঠিক সেই অর্থে প্রাকৃতিক নির্বাচন ত' ঘটেই না, বরং অনেকাংশে উহা সীমিত হয়।[১১] সুতরাং যে পরিবেশের ফলে সমাজে কেবল দৈহিক শক্তির

habits of industry and the like, to which the physical environment sets a problem, and it is in strictness the solution of this problem which *inter alia* conditions development.......The environment never makes arts or institutions, these proceed from the energy of human thought and will, but the environment does go to determine the lines on which human energy can succeed and so to decide what experiments and tentative beginnings will ripen into institution." (*op. cit.*, p. 97).

১১ কেহ কেহ বলেন যে, সামাজিক জীবনে যে, সংঘর্ষ তাহা সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে না হইতে পারে; ঐরূপ সংঘর্ষ (অর্থাৎ struggle for existence) সাধারণতঃ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না। জীবজগতে এইরূপ সংঘর্ষের ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে এবং অযোগ্যের বিনাশ ঘটে; কিন্তু আন্তর্গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ফলে যে দুর্বল গোষ্ঠী একেবারে অবলুপ্ত হইয়া যায় তাহা নহে।

প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না, বরং সমাজে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তাহাই প্রকৃত পরিবর্ধনের পরিচায়ক। যে সমাজ এই বৈচিত্র্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ তথা ব্যবহার সাধন করে, সেই সমাজেই প্রকৃত বর্ধন ঘটে।[১২]

(৩) মনোগত কারণ—সামাজিক পরিবর্ধন যে কেবল পরিবেশগত ও জৈবিক কারণে সংঘটিত হয় তাহা নহে; মানুষের মনে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে যাহার ফলে সামাজিক পরিবর্ধন সাধিত হয়। মানুষের যে সকল স্বাভাবিক বৃত্তি আছে তাহাদের সমন্বয়ের ফলেই সমাজ পরিপুষ্টি লাভ করে। মানুষের পক্ষে ঠিক কোন্ মানসিক বৃত্তি সামাজিক পরিবর্ধনের উপাদান জোগাইয়া থাকে, সে বিষয় মনোবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ যূথচারিতাবৃত্তি (herd instinct), কেহ অপত্যস্নেহ (parental feeling), কেহ কাম ও আক্রমণাত্মক বৃত্তি (love and aggression)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ৭৯-৮৬) এই সকল মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা পুনরায় এই মন্তব্য করিতে পারি যে, কোন একটি বিশেষ প্রাথমিক মানসিক বৃত্তির দ্বারা সামাজিকতাবোধ সৃষ্ট হয় নাই। সামাজিকতাবোধ নিজেই একটি মুখ্য বৃত্তি এবং উহাকে কোন উপজাতবৃত্তি না বলাই শ্রেয়ঃ।

মানুষের মনে এই সামাজিকতাবোধ থাকার জন্য মানুষ পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারে। সকল সময়ই যে সকল মানুষ সুষ্ঠু আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে তাহা নহে, তবে মানুষ যে অন্যের জন্য চিন্তা করিতে, অন্যের সাহিত সহযোগিতা করিতে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে সক্ষম হয়, তাহা এই সামাজিকতাবোধের জন্যই সম্ভব হয়।

মানুষের ভিতর যে মূল সামাজিক প্রবৃত্তি আছে তাহারই ফলে তাহার পক্ষে অন্য ব্যক্তির (বিশেষতঃ সমগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তির) প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হয় এবং সমগ্র সমাজ জীবন এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতি সে আগ্রহ

১২ তুলনীয়: "The best environment, would not be that which selects some special quality for survival, but that which makes room for the greatest wealth of diversity.......The Society which can turn to good uses the greatest diversity of character is likely to lead the fullest life." (Hobhouse, *op. cit.*, p. 118).

ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সামাজিক বৃত্তিরূপ মূলবৃত্তি (root interest) হইতে সহানুভূতি ও সামাজিকতাবোধের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলা যায়।[১৩]

(৪) সামাজিক কারণ—সমাজ কোন স্থিতিশীল সত্তা নহে; ইহার মধ্যে সদাসর্বদা পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। সমাজসংগঠনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠী ও সংঘের সহিত ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমাজে নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন ঘটিতেছে—কোথাও কোন প্রথা বা আচার-ব্যবহার বা আদর্শ প্রসার লাভ করিতেছে, কোথাও কোন আদর্শ বা সংস্থা পরিত্যক্ত হইতেছে, কোথাও বা উহা পরিমার্জিত হইতেছে। এইভাবে সমাজমধ্যে প্রতিক্ষেত্রেই—পারিবারিক জীবনে, ধর্মীয় সংস্থায়, রাষ্ট্রে, শিল্পসংস্থায় সর্বত্রই—কোথাও নূতনের আবির্ভাব ঘটিতেছে, কোথাও পুরাতনের সমাধি রচিত হইতেছে, আবার কোথাও নূতন ও পুরাতনের সংশ্লেষণ ঘটিতেছে। সমাজমধ্যে যে কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিথস্ক্রিয়া ঘটিতেছে তাহা নহে; এক গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর, এবং ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠীরও মিথস্ক্রিয়া ঘটিতেছে। এই কারণ ধর্মীয় সংস্থা পারিবারিক গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পারিবারিক গোষ্ঠী ধর্মীয় সংস্থাকে প্রভাবিত করিতেছে; শিল্পীয় সংস্থা এবং শিল্পের অগ্রগতি পারিবারিক জীবন, ধর্মীয় সংস্থা রাষ্ট্র ইত্যাদি অন্যসকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আবার অন্যগুলির দ্বারা প্রভাবিতও হইতেছে। এইভাবে সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে সর্বদাই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

সামাজিক পরিবর্ধন কোথাও সমাজের সংগঠনগত পরিবর্তনের ফলে সাধিত হয়,

১৩ অধ্যাপক হবহাউস্ মনে করেন যে, মানুষের মূলবৃত্তিগুলির কতকগুলি অহংকেন্দ্রিক (বা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সম্বন্ধীয়), কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি জিগীষা, কৌতূহল ইত্যাদি সম্বন্ধীয়, আর কতকগুলি সংগঠনমূলক। সামাজিকতাবোধরূপ বৃত্তি ইহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে রূপ ধারণ করে, তাহারই ফলে অধিকাংশ মানুষ সমাজের সহিত সুসংবদ্ধভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের চেষ্টা করে এবং ইহারই ফলে সামাজিক পরিবর্ধন ঘটে। অবশ্য সংমিশ্রণ, সামঞ্জস্য ও প্রতিযোজনের স্বরূপ বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন আকার ধারণ করে—কোথাও ইহা সার্থক হয়, আবার কোথাও বা ইহা ব্যর্থ হয়। অধ্যাপক হবহাউসের ভাষায়: "the fusion of the social interest in its collective form with other root-interests, such as the constructive, the cognitive, the sympathetic, and the egoistic provides the basis of a corporate feeling which in general unites a man to the society to which he belongs, but in a spirit which varies very greatly in accordance with the ingredients and temper of fusion." (*op. cit.*, p. 174).

কোথাও সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে সাধিত হয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, গঠনগত পরিবর্তন সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন করে এবং সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন গঠনগত পরিবর্তন আনয়ন করে; বাস্তবিক সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক মনোভাব পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না।

সামাজিক পরিবর্ধনের কারণসমূহের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলিতে পারি যে, সামাজিক পরিবর্ধন মূলতঃ মানসিক পরিবর্ধনেরই প্রকাশ। প্রাকৃতিক, জৈবিক, সামাজিক যে কোন কারণই ব্যক্তিমনের উপর প্রতিক্রিয়া করে বলিয়াই সামাজিক প্রচয় বা পরিবর্ধন সম্ভবপর হয়। মানুষের মন এই প্রকার পরিবেশের সম্মুখীন হইলে একবার সে উহার সহিত নিজের সম্পর্ক, আবার নিজের সহিত অপরের সম্পর্ক নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করে। কোথাও বা সে আত্ম ও পরের বিভেদ অতিক্রম করিয়া সমাজের সহিত সুষ্ঠু-প্রতিযোজন করে বা আবার কোথাও বা বিভেদের মধ্যেই সমাধানের পথ অনুসন্ধান করে।[১৪]

(গ) সামাজিক পরিবর্ধনের নীতি (Laws of Social Development):

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ বিভিন্ন সার্বিক নীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতির কথা অনেকে বলেন। সকল ক্ষেত্রেই যে সুষ্ঠু নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে; তবে সামাজিক পরিবর্ধন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নীতির কথা কোন কোন লেখক বলেন:

(ক) সামাজিক সংগঠনের পরিবর্ধন সম্বন্ধে বলা হয় যে, একটি সমাজ কর্তৃক অপর একটি সমাজ বিজিত হওয়ার ফলে যদি দুইটি সমাজ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের সংগঠনে অতি দ্রুত পরিবর্তন আসে।[১৫] বিজয়ী

১৪ তুলনীয়: "Social development..., though an organic harmony in ideal, is not a physical but a spiritual growth. The problem is dual. Man has to deal with the physical world and with his relations to his fellows, and this second part of his task includes within it the ultimate difficulty—his relations to himself". (*Ibid.*, p. 316).

১৫ তুলনীয়: "Whenever two societies conjugate through a process of conquest of one by the other, a great and rapid evolution of stucture succeeds." রাট্‌সেন্‌হোফার (Ratzenhofer) ইত্যাদি এই নীতির সমর্থক।

জাতির কৃষ্টি বা সমাজব্যবস্থা বিজিত জাতির কৃষ্টিকে কিছুদিন অবদমিত করিয়া রাখে; তখন বিজয়ী জাতির সামাজিক সংগঠন ও কৃষ্টির দ্রুত বিস্তার ঘটিতে থাকে। বিজয়ী ও বিজিত জাতি সহ-অবস্থান করার ফলে যেখানে সঙ্করবর্ণের উদ্ভব ঘটে, সেখানে আবার নূতন করিয়া সামাজিক প্রতিযোজনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং এইভাবে সমাজের জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডে নরমান্-বিজয়ের পর যে সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আমরা এইরূপ দ্রুত জটিলতাবৃদ্ধি তথা পরিবর্ধনের উদাহরণ পাই।

মোটকথা, দুইটি অল্পবিস্তর বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সহ-অবস্থিতির ফলে নূতন করিয়া পারস্পরিক প্রতিযোজনের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহার ফলে মিলিত অবস্থার সামাজিক সংগঠনে দ্রুত জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এইরূপ জটিলতা বৃদ্ধি যে কেবল এক সমাজ কর্তৃক অপর সমাজ জয় করার ফলেই সংঘটিত হয় তাহা নহে। একই ভৌগোলিক অবস্থিতির মধ্যে যদি দুই বা ততোধিক আত্মসচেতন গোষ্ঠী পরস্পরকে অবদমিত করিবার প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে প্রতি গোষ্ঠীর পক্ষেই নূতন করিয়া প্রতিযোজনের প্রশ্ন উঠে এবং দ্রুত সামাজিক পরিবর্ধন ঘটে। বর্তমানকালে শিল্পীয় বিদ্যার অগ্রগতির ফলে শিল্পসংস্থার সহিত প্রতিযোজনের প্রচেষ্টায় পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, কৃষ্টিমূলক, শিক্ষামূলক সকল গোষ্ঠীর মধ্যেই দ্রুত পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে।[১৬]

(২) সামাজিক সংস্থাগুলির পরিবর্ধন সম্বন্ধে বলা যায় যে, ব্যবহার বা প্রয়োগের ফলে ইহারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয় এবং ব্যবহার বা প্রয়োগের অভাব ঘটিলে উহারা ক্ষীণবল বা অবলুপ্ত হইয়া পড়ে। কালের গতিতে কতকগুলি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, প্রথা অব্যবহার্য হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পরিবর্তে নূতনের আবির্ভাব ঘটে।

(৩) সমাজ মাত্রেরই একটি মানসরূপ আছে এবং এইজন্য মানস দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়া পড়ে (পৃঃ ৫৮-৬৩)। সুতরাং মানসিক অগ্রগতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, যেখানে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন

১৬ এইজন্য Ratzenhofer প্রমুখ-প্রদত্ত উপরের সূত্রটিকে পরিবর্তন করিয়া Blackmar ও Gillin বলেন: "Whenever two or more peoples, or class-consciona groups, come into contact with each other in one geoprapbic unity, social structures and institutions will experience rapid development, provided one party struggles to dominate the others." (*Outline of Sociology*, p.325).

সমাজের বা বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন এক সমাজ বা এক কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা অপর সমাজ বা কৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মনে উদ্দীপনের সৃষ্টি করে। সুতরাং বিভিন্ন সমাজের তথা কৃষ্টিপর্যায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে সামাজিক প্রসার ও পরিবর্ধন ঘটে।[১৭]

(৪) সমাজের যে মানসরূপ আছে তাহারই ফলে উহা উদ্দেশ্যসাধনাভিমুখী হইয়া উঠে। (পৃঃ ৬৪-৬৭)। উদ্দেশ্যসাধনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, অনগ্রসর সমাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহা ক্রমশঃ বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনাভিমুখী হইয়া উঠে এবং ব্যক্তিগত উন্নতি বা প্রগতি সামাজিক উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং উহা সামাজিক উন্নতির অগ্রগতির পথে চলে।[১৮]

এই সকল নীতি পর্যাপ্ত না হইলেও ইহাদের সাহায্যে আমরা সামাজিক পরিবর্ধনের গতিপথ সম্বন্ধে আভাষ পাই। অবশ্য কোন বিশেষ সমাজের পরিবর্ধন অনুধাবন করিতে হইলে কেবল কয়েকটি সার্বিক নীতি জানাই পর্যাপ্ত নহে, ঐ বিশেষ সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিও আলোচনা করিতে হইবে এবং উহার আলোকে ঐ সমাজের পরিবর্ধন ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

(ঘ) সমাজের পরিবর্ধনের গতি সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ :

সামাজিক পরিবর্ধনের গতিপথ ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতবাদ গঠন করিয়াছেন। আমরা এক্ষেত্রে দুইটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করিতে পারি। যাঁহারা **ভাববাদী** (idealist), তাঁহারা সাধারণতঃ সামাজিক পরিবর্ধনকে উহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

১৭ তুলনীয় : "All development in spiritual matters depends on the stimulating effects of contact with a different stage of culture upon the self-consciousness of a people." (Tiele, *Elements of the Science of Religion*, Vol. I, p. 239).

১৮ সামাজিক উদ্দেশ্যে (social telesis)-এর উপর Ward বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন : "The spontaneous progress which one finds in the more undeveloped societies gives way to telic or purposive progress and individual telesis or direction of progress gives way, on the whole, to collective telesis." (Quoted by Ross, *Foundations of Sociology*, p. 64).

ইহারা বলেন যে, সামাজিক পরিবর্ধন মূলতঃ মনের প্রকাশ; সুতরাং উহা কোন্ আদিম অবস্থা হইতে উহার যাত্রা সুরু করিয়াছিল তাহার আলোচনা না করিয়া উহা কোন্ লক্ষ্যকে পাইবার প্রচেষ্টা করিতেছে তাহাই প্রধানতঃ বিচার করা উচিত। মানুষের প্রাচীনতম ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা এমন কোন অবস্থার প্রমাণ পাই না যখন কোন প্রকার সমাজব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আদিম সমাজব্যবস্থা লইয়া পরিকল্পনা করার কিছু ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক মূল্য থাকিলেও, ইহাই পর্যাপ্ত নহে। মানুষ তথা মানবীয় সমাজকে বুঝিতে হইলে মানুষ কী ছিল তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া মানুষ কী হইতে চায়, সে কোন্ লক্ষ্যপথে যাইতে চায়, সে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা করিতেছে, তাহা বিচার করিতে হইবে। মানুষের সামাজিক পরিবর্ধনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সামাজিক বা আন্তর্ব্যক্তিক আচরণের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত নৈতিকতাবোধের বিকাশ। নৈতিকতাবোধকে সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে হইলে কোন্ যুগে বা কোন্ সমাজে কোন্ আদর্শ কেবলমাত্র প্রচলিত ছিল তাহাই আলোচনা না করিয়া মানুষ কেন নৈতিক আদর্শের উপর মূল্য আরোপ করে, মানুষের প্রকাশের মধ্যে তাহার স্বরূপের বা আদর্শের কী পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

তাহা ছাড়া, ভাববাদীরা সাধারণতঃ ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ তথা মানুষের সমাজ মধ্যে এক বিরাট্ চিচ্ছক্তি বা ব্রহ্মশক্তি পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং মানুষের মধ্যে দেবত্ব সুপ্ত আছে। মানুষের কর্তব্য হইল সামাজিক তথা ব্যক্তিগত জীবনে এই দেবত্বকে বিকশিত করিয়া তোলা। সামাজিক পরিবর্তনের উত্থান-পতনের মাধ্যমে মানুষ কতদূর তাহার এই লক্ষ্যকে পাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

অপরপক্ষে, যাঁহারা **স্বভাববাদী** (naturalist), তাঁহারা প্রকৃতির অন্য বিভাগে (যেমন, প্রাণি-জগতে) যে ভাবে বিবর্তন চলিয়াছে সেইভাবেই তাঁহারা সামাজিক গতিকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সামাজিক পরিবর্ধন ব্যাপকতর প্রাকৃতিক বিবর্তনেরই বিশেষ রূপ এবং ইহাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্রহ্ম বা অনুরূপ পরমসত্তা কল্পনার প্রয়োজন নাই। স্বভাববাদের অন্যতম সমর্থক স্পেন্সার (H. Spencer) মনে করেন যে, সামাজিক পরিবর্ধনের মাধ্যমে সদাসর্বদা আন্তর সম্পর্কের সহিত বাহ্য সম্পর্কের প্রতিযোজন (**continuous adjustment of internal relations to external**

relations)-এর প্রচেষ্টা চলিতেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বর্তমানের সমাজব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত সামাজিক স্বার্থের অনেকাংশে প্রতিযোজন বা মিলন সম্ভব হইয়াছে এবং এই কারণে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন ব্যক্তি ও সমাজ—আন্তর ও বাহ্য সম্পর্ক—এই দুই-এর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে এবং তখন সমাজে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান থাকিবে।

হবস্, রুসো ইত্যাদি লেখকগণ স্বভাববাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক পরিবর্ধনকে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক সমাজবিহীন অবস্থায় বাস করিত; কিন্তু এই অবস্থায় যে সকল অসুবিধা দেখা দিত তাহা দূরীকরণের জন্য মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিল (পৃঃ ৪৩-৪৭ ও ৩৮৬-৮৭)।

মার্ক্স অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজের পরিবর্ধন ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন যে, কোন বিশেষ যুগের জনগণের জীবন-দর্শন, আদর্শ, লক্ষ্য, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি হইল সেই যুগের বা সেই সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। সমাজে উৎপাদনব্যবস্থা যে ভাবে চলে তাহার দ্বারাই কোন সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিরূপিত হয় এবং এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজের সংগঠন রচিত হয়।[১৯] পুঁজিবাদীরা দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নানা প্রকার তথাকথিত আদর্শ প্রচার করিয়া জনগণকে উহা পালন করিতে বাধ্য করে। বাস্তবিক ধর্মীয় বা অন্য প্রকার আদর্শের কোন বস্তুগত বা যথার্থ ভিত্তি নাই। তবে মার্ক্সবাদীরা ইহাও বলেন যে, চিরদিন এই নিপীড়ন ব্যবস্থা চলিতে পারে না—সমাজমধ্যে শ্রেণী-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। এই সংঘাতের ফলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের করায়ত্ত হইবে; কিন্তু রাষ্ট্রের চরম মূল্য নাই—সমাজপরিবর্ধনের ফলে রাষ্ট্রও একদিন অবলুপ্ত হইবে (পৃঃ ৩৯৬)। মার্ক্সবাদীদের মতে সমগ্র সমাজের এই গতিপথ **ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ** (inexhorable historical

---

১৯ তুলনীয়: "The sumtotal of these relations of production constitutes the economic structure of society—the real foundation, on which rise legal and political superstructures and to which correspond definite forms of social consciousness." (Marx, *Critique of Political Economy*, Tr. by N. I. Stone, pp 11-12).

forces)-এর অমোঘ নীতিতে রচিত হইয়া থাকে এবং এ বিষয়ে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই।[২০]

মন্তব্য ঃ

আমরা উপরে সামাজিক পরিবর্ধন সম্বন্ধীয় দুইটি ভিন্নমুখী মতবাদের আলোচনা করিলাম। স্বভাববাদের মূল্য হইল যে, ইহা সমাজের পরিবর্ধনের ধারার স্বাভাবিক বা বাস্তব গতিপথ নির্ধারণের চেষ্টা করে। কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, এক একজন লেখক এক একটি বিশেষ প্রত্যয় দ্বারা সকল সমাজের সকল পরিবর্ধনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের মতবাদ একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, স্বভাববাদের সাধারণ ত্রুটি হইল যে, ইহা কেবলমাত্র মানুষ কোন্ কোন্ পর্যায় বা ধারার মধ্য দিয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করে, কিন্তু মানুষের সমাজপরিবর্ধনের লক্ষ্য কী হইবে তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিবর্ধনের লক্ষ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করা উচিত। এই দিক্ হইতে ভাববাদের মূল্য আছে। সামাজিক পরিবর্ধনকে সুষ্ঠুভাবে বিচার করিতে হইলে সামাজিক প্রগতির আদর্শে ঐ বিচার হওয়া প্রয়োজন এবং এইজন্য কোন্ লক্ষ্যের পথে উহা যাইতেছে এবং যাওয়া উচিত তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন। এইজন্য স্বভাববাদ ও ভাববাদের অতিশয়োক্তি পরিহার করিয়া উহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) সমাজ পরিবর্ধনে ধর্মের স্থান ঃ

সমাজসংগঠনের মূলে যে সকল সংযোজনশীল শক্তি (cohesive force) ক্রিয়া করে তাহাদের অন্যতম হইল ধর্ম। এইজন্য ধর্মের মূল্যের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমরা পূর্বে (পৃঃ ৩২১-২৩ ও ৩৫৬-৫৮) ধর্মের

---

২০ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইতিহাসের নির্দিষ্ট গতিপথ ব্যাখ্যা করিয়া G. Plekhanov বলেন : "*The development of the social environment is subject to its own laws.* This means that its characteristics depend just as little on the will and consciousness of men as the characteristics of the geographical environment. The productive action of man on nature gives rise to a new form of dependence of man, a new variety of his slavery : *economic necessity.......The producer proves to be the slave of his own creation......* Then terminates the kingdom of *necessity ; there begins the reign of freedom which itself proves to be necessity.*" (*The Development of the Monist View of History*, Eng. Tr., pp. 273-74).

সামাজিক মূল্য (বিশেষতঃ উহার সংহতি স্থাপনের শক্তি) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সকল ক্ষেত্রেই যে ধর্ম সামাজিক সংহতি ও ঐক্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে তাহা নহে, ইহা অনেক স্থলে বিভেদেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে ; তবে একটি বিশেষ ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে উহা ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। বর্তমানে ধর্মের প্রভাব কমিয়া আসিলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইহা মানব মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত। প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শের দার্শনিক মূল্য যাহাই হউক্, প্রত্যক্ষ শক্তি হিসাবে উহা সমাজমধ্যে এক কালে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে ধর্মের নিম্নলিখিত প্রভাবের বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি :

(ক) আদিমযুগে মনুষ্যসমাজে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সুগঠিত হয় নাই এবং রাষ্ট্রীয় নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তিত হয় নাই, তখন ধর্মই ছিল একমাত্র সামাজিক শক্তি যাহা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিত।

(খ) প্রাচীন সামাজিক গোষ্ঠীর জনগণের বিবিধ ধারণা, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার সব কিছুই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয় এবং এইভাবে প্রাচীনকালে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

(গ) মানুষের নৈতিকতাবোধ গঠনের মূলে ধর্মীয় প্রভাব বিশেষ কার্যকরী ছিল। প্রাচীন মানুষের মধ্যে ইহা ভীতির উদ্রেক করিয়া মানুষকে নৈতিক কার্যে নিয়োজিত করিত ; বর্তমানে মানুষের মনে আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অনুকম্পা ও প্রেম ইত্যাদি ধারণার সৃষ্টি করিয়া মানুষকে উহা কঠোর কর্তব্যের সম্মুখীন হইবার প্রেরণা জোগায়।

(ঘ) মানুষের মনে ইহা এককালে দেশপ্রেমও জাগরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

(ঙ) ধর্মের সহিত অজ্ঞাত রহস্যময় শক্তিকে জানিবার কৌতূহল সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহা প্রাচীন মানব মনে জ্ঞানপিপাসা জাগরিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, প্রাচীন যুগের ধর্মমতের সহিত অনেক কুসংস্কার বিজড়িত থাকিলেও তদানীন্তন মানবমনের ইহা অপরিহার্য ছিল।[২১] এই কারণ ধর্মকে সামাজিক সংহতি-সাধক শক্তিসমূহের অন্যতম বলা যায়।

---

২১ তুলনীয় : "In the childhood of the race religion served a similar purpose to that of science in the more developed social life of the present. It is poor food for the mind of the fully developed man, but it was a fitting food to the ignorant, superstitious creature of primitive times." Blackmar & Gillin, *op. cit.*, p. 265).

৪। জননীতি (Ethos) :

সমাজের পরিবর্ধন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রতি সমাজেই কতকগুলি আচার-ব্যবহার আদর্শ, প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে সকলের অনুসরণযোগ্য সার্বিক কর্মপন্থা সৃষ্ট হয়। সমাজের জনসাধারণ যদি ইহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহা **জননীতি** (Ethos [২২] of a people) বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং যাহা জনসাধারণের বিবিধ আচার ও প্রথার মাধ্যমে সৎ-অসৎ বা ভাল-মন্দ এইরূপ নৈতিকবোধের সৃষ্টি করে, তাহাকে জননীতি বলে। জননীতির মাধ্যমে এক সামাজিক গোষ্ঠী হইতে অপর সামাজিক গোষ্ঠীকে পৃথক্ করা যায়। সুতরাং **জননীতি হইল কোন জনসমষ্টির কৃষ্টির পরিচায়ক, ও উহার মূল্যবোধের প্রকাশক এবং উহা ঐ গোষ্ঠীর নৈতিক পরিবেশ** (moral atmosphere)-**এর প্রতি ইঙ্গিত করে।**

২২ ইংরাজি *Ethos* পদটি নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যে প্রধানতঃ নিছক আবেগ হইতে নীতিকে পৃথক্ করিয়া জন্ম ব্যবহৃত হয়। আরিষ্টটলের আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রে ব্যক্তি-বিশেষ যাহা করে তাহা বুঝাইবার জন্ম এই পদটি ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ সমাজতত্ত্বে ইহা জননীতি অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

তুলনীয় : (১) "Ethos : 1. *Aesthetics*—(a) Originally, the element in a literary work treating morals or character as distinguished from that treating passions...... ; later moral and intellectual beauty as distinguished from pathetic or emotional quality....... (b) According to Aristotle, especially in regard to dramatic composition, that element in character which determines what a man *does*......

2. The character, sentiment or disposition of a community or people ; the spirit which actuates manners and customs, especially moral attitudes, practices and ideals." (Webster's *Dictionary*).

(২) "Ethos—The basic character of an ethnic group which makes it distinct from all other ethnic groups." (Zadrozny, *Dictionary of Social Sciences*).

(৩) "Ethos—The totality of the distinctive ways of living that separate one group from another, especially its values. Ethos also denotes the emotional quality possessed by socially patterned behavior." (Winick, *Dictionary of Anthropology*).

(৪) "The Ethos of a people......constitutes the atmosphere in which the best members of a race habitually live ; it constitutes the universe of their moral activities. It is the morality of our world." (Mackenzie, *A Manual of Ethics*, pp. 330-31)

জননীতির পরিচায়ক হিসাবে আমরা উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারি :

(১) কোন গোষ্ঠীর মধ্যে জনসাধারণ বিশেষ বিশেষ কর্মপন্থা অনুসরণ করার ফলে ইহা নির্ধারিত মান (standardized group action) বলিয়া পরিগণিত হয়।

(২) যে সকল প্রথা কোন জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় মধ্যে আদর্শ বা জননীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে উহা হইতে ব্যতিক্রম সমাজ সমর্থন করে না।

(৩) যে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণের মাধ্যমে জননীতি একটি সুস্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে, সেই সমাজের জনসাধারণের পক্ষে বিকল্প কর্মপন্থার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা কম এবং তাহাদের মানসিক দ্বন্দ্বের অবকাশ বেশী ঘটে না। কিন্তু যে সমাজে জননীতি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই, সেই সমাজে জনসাধারণের পক্ষে মানসিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা অধিক।

(৪) জননীতির সহিত এই ধারণা বিজড়িত থাকে যে, উহা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের অনুকূল।

(৫) ব্যক্তি-বিশেষ যখন জননীতির প্রভাবে কার্য করে, তখন তাহার এই বিশ্বাস থাকে যে, সে সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এবং সমাজের আদর্শ অনুসারে কার্য করিতেছে এবং ঐ কার্যে তাহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

(৬) সামাজিক পরিবর্তনের সহিত জননীতিরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে এবং এইজন্য একযুগে বা সমাজে যাহা নৈতিক বলিয়া পরিগণিত হইত, হয়ত' আর এক যুগে বা আর এক সমাজে তাহা নৈতিক বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। তবে জননীতি একবার সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহার পরিবর্তন বিশেষ সময়সাপেক্ষ এবং সমাজের সাধারণ যে-কোন পরিবর্তনের ফলে উহা পরিবর্তিত হয় না।

(৭) জননীতি সমাজ মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করার পর যদি জনসাধারণের একাংশের আচরণের মধ্যে উহা হইতে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় (পৃঃ ৪৪০-৪১)।

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জননীতি যখন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং জনসাধারণ যখন উহার প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মনে এমন এক নৈতিকবোধ জাগরিত হয় যাহার ফলে সে নিজের 'অহং'-কে ভুলিয়া নিজেকে

সমাজের 'অংশ' বলিয়া মনে করে। তাহার ব্যক্তিগত অহংবোধের ধারণা (ego consciousness)-এর সহিত 'সামাজিক অহং' (social self)-এর ধারণা বিজড়িত হয় এবং অনেক সময় তাহার ব্যক্তিগত অহং বা অস্মিতা যেন এই সামাজিক অহং-এর অধীন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ইহার বিরুদ্ধে সে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না।[২৩] সুতরাং মানুষ সামাজিক অহং-এর প্রভাবে যতদূর সম্ভব সামাজিক আদর্শ বা জননীতির আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিবার চেষ্টা করে।[২৪]

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জননীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন হেগেল্ (Hegel)। তিনি বলেন যে, জননীতি কেবল মানুষের মনের প্রকাশ নহে—ইহা হইল ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ব্রহ্মের যে মানস ধারণা বিশ্বরূপে প্রকাশ লাভ বরিয়াছে, তাহাই আর একভাবে প্রকাশ লাভ করে জননীতির মাধ্যমে। জননীতি বলিতে মানুষের ইচ্ছাধীন কোন পরিবর্তনশীল নীতি বুঝায় না—জননীতি বা নীতি হইল বাস্তব, উহা চিরন্তন সত্যেরই প্রকাশ। রাষ্ট্র হইল এই জননীতিরই মূর্ত প্রকাশ। ঐতিহাসিক বিবর্তন কোন আকস্মিক ঘটনা-সমাবেশ নহে—ব্রহ্মশক্তি জনমন ও সমাজের মধ্য দিয়া যখন নিজেকে প্রকাশ করে, তখন উহা জননীতি ও রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের মাধ্যমে যে জননীতি প্রকাশিত হয়, তাহার দাবী কেহ অস্বীকার করিতে পারে না—ব্যক্তির ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র, এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা কার্যপন্থার ঊর্ধ্বে হইল জননীতি। বাস্তবিক, ব্যক্তি-বিশেষ যদি তাহার প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে এই জননীতি অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে—সে সর্বদা ইহারই ইঙ্গিতে

২৩ সমাজমন বলিতে কেহ কেহ পৃথক্ অতি-ব্যক্তিক সত্তার কল্পনা করেন কিন্তু এইরূপ মনের সম্পূর্ণ পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। (পৃঃ ৬০-৬৩)। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আদিম মানুষের ব্যক্তিগত মনকে সামাজিক বা গোষ্ঠী-চেতনা বিশেষভাবে অভিভূত করিয়া রাখিত। সামাজিক চেতনার এই রূপকে ক্লিফোর্ড (Cliford) 'tribal self' নামে অভিহিত করিয়াছেন—ইহার প্রভাবে আদিম মানুষ নিজেকে ভুলিয়া গোষ্ঠীর সহিত একাত্ম বোধ করিত।

২৪ ব্যক্তি-মনের অবচেতনে সামাজিক ধারণাও যে কার্য করে তাহার স্বীকৃতি দান করিয়া মনোবিৎ য়ুঙ্ প্রতি ব্যক্তির অন্তরে ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান (individual Unconscious) ও সমষ্টিগত নির্জ্ঞান (collective or racial Unconscious)-এর যুগ্ম অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন।

পরিচালিত হইতেছে।[২৫] কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, যাঁহারা মহৎ ব্যক্তি (great men) তাঁহারা সামাজিক নীতির প্রভাবমুক্ত ; কিন্তু হেগেল ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, তথাকথিত মহৎব্যক্তিও জননীতির প্রভাব হইতে স্বাধীন হইতে পারে না।[২৬]

হেগলীয় দর্শনের ত্রুটি হইল যে, ইহা সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে যে তাহাতে ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যাহাই জননীতি তাহাই যে অভ্রান্ত ও শাশ্বত, এ মত গ্রহণ করা যায় না। জননীতি অনেক স্থলে কল্যাণকর ও অভ্রান্ত হইলেও, উহা সকল সমাজে বা সকল যুগে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না। এইজন্য আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যক্তিমন জননীতির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে বা স্বাধীন সমালোচনা করিতে পারে। ব্যক্তির যে নিজস্ব সমাজাতিরিক্ত একটি সত্তা আছে তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে হইবে, নহিলে ব্যক্তিবিশেষ সামাজিক যন্ত্রে পরিণত হইবে। (পৃঃ ১০১ ও ৩৯৪)। প্রতি সমাজের জননীতি মাত্রই যদি অভ্রান্ত হইত, তাহা হইলে প্রগতিশীল সমাজ ও অনগ্রসর সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য সম্ভব হইত না ; তাহা ছাড়া, একই সমাজে এক কালে যাহা জননীতি বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে, পরবর্তী যুগে তাহার মধ্যে মানুষ হয়ত' কুসংস্কার বা ভ্রান্তি আবিষ্কার করিয়াছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে নৈতিক প্রগতি সম্ভব হইত না। সুতরাং সমাজ মধ্যে জননীতির মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও আমরা সকল সমাজের সকল জননীতিকে চরম ও শাশ্বত মূল্য দান করিতে পারি না।

২৫ তুলনীয় :

"In the floods of life, in the storm of deeds,
Up and down I fly,
Hither, thither weave,
From birth to grave,
An endless weft,
A changing sea
Of glowing life.
Thus in the whistling loom of time I ply,
Weaving the living robe of Deity." (Goethe).

২৬ মহৎ ব্যক্তির উপর জননীতির প্রভাবের উল্লেখ করিয়া হেগেলীয় দার্শনিকেরা বলেন যে, "The great men, too, have to suck at the breast of the Universal Ethos."

৫। সামাজিক প্রগতি (Social Progress):

সমাজসম্বন্ধীয় কোন আলোচনার পরিশেষে সাধারণতঃ প্রশ্ন উঠে: মানবসমাজ কি সত্যই কোন প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে হইলে 'প্রগতি'-পদের তাৎপর্য ও প্রগতির আদর্শ সম্বন্ধে প্রথমে মীমাংসা প্রয়োজন এবং তাহার পর মানবসমাজের ঐতিহাসিক ধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহা সত্যই কোন প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে কি না এবং ভবিষ্যতে সমাজের ধারা কোন্ পথে চলিতে পারে তাহা বিচার করিতে হইবে।

(ক) পরিবর্তন ও প্রগতি:

মানবসমাজে যে প্রতিনিয়তই কোন-না-কোন পরিবর্তন আসিতেছে, মানবসমাজের যে পরিবর্ধন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। কিন্তু পরিবর্তন তথা পরিবর্ধন মাত্রই কি সামাজিক প্রগতি সূচনা করে? সমাজের গতি বহুমুখী—বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ধারায় সমাজ অগ্রসর হইতেছে; এই সকল গতি বা পরিবর্তন পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া কখনও বা একটি অপরটিকে প্রতিহত করে, আবার কখনও বা একটি অপরটিকে শক্তিশালী করিয়া তোলে—ইহারা কখনও বা সমাজকে অগ্রগমনের পথে লইয়া যায়, আবার কখনও বা সমাজের অবনতি ঘটায়।[২৭] সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, মানব-সমাজ যদিও সদা পরিবর্তনশীল, উহা সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল নহে; অর্থাৎ পরিবর্তনমাত্রই প্রগতির পরিচায়ক নহে। সমাজের বাস্তব গতিপথ অনুধাবন করিলে আমরা দেখি যে, উহা সর্বত্র সরল নহে,—বরং সমাজের পথপরিক্রমা বক্র ও ঋজু; উহার মধ্যে উত্থান-পতন আছে। সামাজিক গতির আদিম অবস্থা হইতে যদি উহাকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখি যে, সমাজের আদি স্তরে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল তাহা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া অনেক স্থলে শৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল সঙ্কীর্ণ প্রথা বা সামাজিক নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেগুলির আবার অনেক স্থলে

---

২৭ তুলনীয়: "There is not, in fact, one movement, but many movements, and these impinge on one another, but more often to deflect or even to cancel." (L. T. Hobhouse, *Social Evolution & Political Theory*, p 150).

সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়াই জনগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। একদিকে যেমন এই সকল প্রগতিমূলক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ প্রগতির পরিপন্থী পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। সমাজমধ্যে যেমন সাম্যের ধারণা দেখা দিল, সেইরূপ অনৈক্য ও বৈষম্যও দেখা দিল; সমাজমধ্যে কর্তৃস্থানীয় লোকেরা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং তাহাদের স্বাধীনতা অনেকক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইল। সুতরাং সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, সমাজ সকল সময়ই যে অগ্রগতি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা নহে। সমাজ কোথাও অগ্রগমন করিতেছে, কোথাও পশ্চাদপসরণ করিতেছে, আবার কোথাও বা অল্পবিস্তর স্থিতিশীল হইয়া আছে; অর্থাৎ সমাজের প্রতি সংস্থাই যে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্যায়ে চলিয়াছে তাহা নহে। সুতরাং প্রগতি বলিতে যদি কোন আদর্শের দিকে অগ্রগমন বুঝায় তাহা হইলে আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত প্রতি পর্যায়েই মানুষের বাস্তব অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।[২৮]

অতএব, আমরা বলিতে পারি যে, সামাজিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সামাজিক প্রগতির সহিত সমার্থক নহে। সামাজিক প্রগতি মাত্রই কোন-না-কোন সামাজিক পরিবর্তন বুঝায়; কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন হইলেই তাহা সামাজিক প্রগতি না হইতে পারে। প্রগতি-পদটির সহিত মূল্যবোধের ধারণা বিজড়িত আছে; কিন্তু পরিবর্তন বলিতে কেবলমাত্র বাস্তবঘটনা-পরম্পরা বুঝায়। (পৃঃ ৪৯৪)।

(খ) 'প্রগতি'-পদের অর্থসম্বন্ধে মতবিরোধ:

আমরা সামাজিক পরিবর্তন বিচারকালে 'প্রগতি'-পদটি ব্যবহার করিলেও 'প্রগতি'-পদের তাৎপর্য নির্ধারণ বা উহার কোন সুষ্ঠু সংজ্ঞা দান নিতান্ত কঠিন।

---

২৮ অধ্যাপক হব্‌হাউসের ভাষায়: "Assuming that progress means an advance towards an ideal that would commend itself to a rational judgment of value, it is impossible to maintain that the successive steps which lead from savagery to the civilization of our own day involve point by point a corresponding betterment in the actual life of the people as a whole." (*Ibid.*, p 160). সেইরূপ Blackmar & Gillin বলেন: "Observation and historical retrospect at once convince us that change is not always progress. Just as, according to the accepted doctrine of evolution, there is not only a development of life, but also a regressive action, so in society there is a working downward as well as upward." (*op. cit.*, p. 414).

এই অসুবিধার কারণ হইল যে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন সমাজে প্রগতির বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। মানবসমাজের পক্ষে প্রগতি যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু প্রগতি কী তাহা বর্ণনা করা দুরূহ।[২৯] বাস্তবিক, সমাজের যোগ্যতা বা উন্নতি বৃদ্ধি কিসে ঘটিতে পারে?

কেহ কেহ মনে করেন যে, বস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিই হইল প্রকৃত উন্নতি। অর্থনৈতিক উন্নতি বলিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় বৃদ্ধি বুঝায়; কিন্তু কোন্ পরিমাণ উন্নতি ঘটিলে যে উহা পর্যাপ্ত হইবে তাহা বলা কঠিন। শিল্প ও উৎপাদনের প্রাচুর্যের ফলে যদি সমাজ মধ্যে বিত্ত সঞ্চয় হয়, তাহা হইলেই কি উহা পর্যাপ্ত হইবে?

কেহ কেহ মনে করেন যে, যন্ত্রশিল্প (technology)-এর উন্নতি ঘটিলেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে। কিন্তু সমাজ মধ্যে নানাপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়াই যথেষ্ট নহে, এই সকল যন্ত্র মানবের প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু প্রকৃত মানব কল্যাণ যে কী সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

কেহ কেহ বলেন যে, যাহা আমাদের বাসনা পূর্ণ করে, তাহাই হইল বাঞ্ছনীয় এবং বাঞ্ছনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য ও জনসাধারণের মধ্যে সুষম বণ্টনই হইল প্রগতির পরিচায়ক। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তু কামনা করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক সময়ই বিরোধ দেখা দেয়। যদিই বা বিভিন্ন ব্যক্তির কাম্য বস্তুর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তাহা হইলেও একটি অসুবিধা থাকিয়া যায়। মানুষ যাহা কামনা করে, মানুষের পক্ষে কি তাহাই বাঞ্ছনীয়? বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছনীয় কি সর্বত্র সমার্থক? তাহা ছাড়া, বাসনার পরিতৃপ্তিতেই যে সকল সময় সুখ হয় তাহা নহে, অনেক সময় দেখা যায় যে, বাসনাকে সংযত করার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ।

এই সকল অসুবিধার জন্য একদল সমাজতাত্ত্বিক সমাজবিদ্যা হইতে 'প্রগতি' পদটি পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন যে, ঐ শাস্ত্রে মূল্য বিচার

---

২৯ অধ্যাপক হার্ট (Hornell Hart) তাঁহার *Tke Technique of Social Progress* গ্রন্থে প্রগতিকে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন: "Progress consists in those biological and cultural changes which, on the whole and in the long run, release, stiumlate, facilitate and integrate the purposes of men."; কিন্তু তিনি তাঁহার ৬৮৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে কি ভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্য মুক্ত, উদ্দীপিত ও সমন্বিত হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। এক পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্র যখন আর একটি রাষ্ট্র আক্রমণ করিতে যায়, তখন কি উহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য উদ্দীপিত ও মুক্ত হয় না? কিন্তু যুদ্ধকে নিশ্চয়ই প্রগতিমূলক উদ্দেশ্য বলা যায় না।

(value judgment)-এর কোন স্থান নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমাজবিদ্যার লেখকেরা মূল্যবোধ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারেন না[৩০] (পৃঃ ২৭-২৮)। যদিই বা আদর্শ সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিৎ 'বৈজ্ঞানিক' হিসাবে উদাসীন থাকিতে পারেন, সমাজদার্শনিক তাহা পারেন না। সমাজদর্শনের পক্ষে মূল্যায়ন বা মূল্যবিচার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সামাজিক পরিবর্ধন হইতে নৈতিক পরিবর্ধন পৃথক্ করা সম্ভব নহে।[৩১] এইজন্য সমাজদর্শন প্রথমতঃ, বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মূল্যবিচারের যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা বিচার করিতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ, সমাজদর্শন ইহাদের আলোকে একটি ব্যাপক ও উচ্চতর আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করিতে পারে।

(গ) সামাজিক প্রগতির লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও বহুমুখিতা :

সামাজিক প্রগতিকে বিচার করিতে হইলে মনোগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই উহা বিচার করিতে হইবে। মনোগত (subjective) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমবা বলিতে পারি যে, যাহা মানুষের নীতি ও বুদ্ধির যুগ্ম প্রসার ঘটায় তাহা প্রগতির পরিচায়ক এবং বস্তুগত (objective) দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যাহা সমাজ মধ্যে যে পরিমাণে পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় ক্ষেত্রে সাম্য, সামঞ্জস্য ও শান্তি বিধান করিতে পারে, যাহা মানবকে প্রাকৃতিক পরিবেশেব সহিত উচ্চতর উপায়ে প্রতিযোজন করিতে সক্ষম করিয়া তোলে, যাহা শিক্ষা ও উচ্চপর্যায়ের অন্যান্য কৃষ্টির প্রসার ঘটায়, যাহা ব্যক্তিগত কল্যাণে সমগ্র সমাজকে নিয়োজিত করিতে পারে, এবং সর্বোপরে যাহা সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তাহা সামাজিক প্রগতির নির্দেশক।

সমাজের যত পরিবর্ধন ঘটিতে থাকে, ততই সমাজ মধ্যে দৃঢ় ও জটিল সম্বন্ধ দেখা দেয়। সুতরাং যাহা ব্যক্তির সহিত বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সৌহার্দ্য ও নিগূঢ়

৩০ বাস্তব ঘটনার বিচারক হিসাবে সমাজতত্ত্ববিৎ মূল্যসম্বন্ধে কী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিবেন, সে বিষয় MacIver ও Page বলেন : "The only clean and indubitable sense in which sociology can be value-free is that in dealing with value-facts the sociologist should never suffer his own valuations to intrude into or affect his presentation of the valuations which are registered in the facts themselves." (*Society*, p. 617).

৩১ এই কারণ Hobhouse বলেন : "In sum, as a whole and in its completeness, social development coincides with ethical development." (*Social Development*, pp. 93, 94).

সম্পর্কের সৃষ্টি করে, তাহা সামাজিক প্রগতির পরিচায়ক। সমাজ যতই বিস্তৃতি ও পরিব্যাপ্তি লাভ করে এবং ইহার মধ্যে গঠনবৈচিত্র্য প্রকাশ পায় ও পরস্পর নির্ভরশীল ও প্রতিযোজনশীল সংস্থা গড়িয়া উঠে, ততই বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে প্রগতিলাভের সম্ভাবনা।

সমাজ মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির জীবনধারণের মান পূর্বাপেক্ষা যত উন্নত হয়, তাহাদের আহার ও বাসস্থান সংগ্রহ ও সম্ভোগ যত সুবিধাজনক হয়, সমাজ ততই বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উন্নততর হয় বলা যায়।

সমাজ মধ্যে জনস্বাস্থ্য যত উন্নত হয়, রোগের বিস্তার যত কমিয়া যায়, মৃত্যুর হার যত কমিয়া যায়, স্বাস্থ্যমণ্ডিত জীবনধারণের আশা যত বাড়িতে থাকে, ততই সমাজের প্রগতি ঘটিতে থাকে বলা যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা এক বা কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকে, জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা যদি সঙ্কুচিত হয়, যদি তাহাদের মতপ্রকাশের সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে উহা রাজনৈতিক প্রগতির পরিচায়ক নহে। অপরপক্ষে, যদি নাগরিকগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে, যদি জনসাধারণের হস্তে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে, যদি শাসনসংস্থা জননির্বাচিত হয় এবং জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহা রাজনৈতিক প্রগতির পরিচায়ক হইবে।

শিল্পীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সমতা স্থাপিত হয়, যন্ত্রবিজ্ঞানের যদি উন্নতি হয়, জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য যদি উহা প্রয়োজিত হয়, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যদি সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, শ্রমিকগণ যদি শিল্পসংস্থার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে. যদি সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হস্তে অপরিমিত বিত্তের সঞ্চয় না হইয়া সমাজ মধ্যে সুষ্ঠুভাবে উহা বণ্টিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, ঐ সমাজ শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

জ্ঞানের বিস্তারের সহিত যদি সমাজ মধ্যে মানুষের সুবিধা ও সমৃদ্ধির জন্য উহাকে প্রয়োগ করা যায়, যদি প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহা হইলে তাহা প্রগতির পরিচায়ক।

সমাজের অস্তিত্ব ব্যক্তির কল্যাণের জন্য এবং ব্যক্তি সমাজের দাস নহে (পৃঃ ১০০-১০৩), এই নীতি যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে সমাজ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য পরিচালিত হয়, সেই সমাজই প্রগতির পরিচায়ক।

আন্তর্ব্যক্তিক ক্ষেত্রে যে সমাজ অধিকতর সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা সমাজ সংগঠনকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মনে সহানুভূতি সৃষ্টি করিতে পারে, যেখানে পারস্পরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অভাব অভিযোগ বিচারের সময় মানুষ কেবলমাত্র তীব্র এবং সাময়িক আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় না, সেই সমাজই অধিকতর অগ্রগতির পরিচয় দেয়।[৩২]

এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রগতির আন্তর ও বাহ্য, মানস এবং বস্তু-কেন্দ্রিক, বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক বিচার করিলে বলিতে হয় যে, সমাজের মধ্যে **আন্তর বা মানস উৎকর্ষের স্থান বস্তুকেন্দ্রিক উন্নতির ঊর্ধ্বে।** অবশ্য সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মানস উন্নতি ঘটিলে তাহার পরিচয় বাহ্য জগতে প্রকাশ পায়; কিন্তু মানস উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করার অর্থ হইল যে, কেবল বাহ্য বা বস্তু কেন্দ্রিক সমৃদ্ধির দ্বারাই সমাজের প্রগতির বিচার করা উচিত নহে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানস উন্নতি বলিতে কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য বুঝায় না—বুদ্ধির সহিত নীতির উন্নতিও উহা ইঙ্গিত করে। সুতরাং সামাজিক প্রগতি বিচার করিতে হইলে ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতি যে সমাজ যত মর্যাদা দান করিতে পারে, সেই সমাজ ততই প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে বলা যায়।[৩৩] ব্যক্তি-বিশেষের মর্যাদা স্বীকৃতির অর্থ ইহা নহে যে,

৩২ প্রগতির মানসিক ও বাহ্য বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক গিডিংস্ (Giddings) বলেন: "Subjectively, progress is an expansion of both the moral and the mental life. Objectively, the result of expanding reason and enlarging sympathy in a multiplication of social relationships." (*Principles of Sociology*, p. 358).

৩৩ সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক হিসাবে যে ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া Seth বলেন যে, ইহা হইল প্রকৃতপক্ষে "progressive discovery of the individual' (*A Study of Ethical Principles*, p. 323)। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ক্রম বিবর্তনের ফলেও যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে মর্যাদা পাইতে লাগিল তাহার উল্লেখ করিয়া মেইন্ (Sir Henry Maine) বলেন: "The individual is steadily substituted for the family, as the unit of which civil laws take account......The movements of the progressive societies has hitherto been a movement from status to contract." (*Ancient Law*, 11th Ed., pp. 168 & 170).

সামাজিক চেতনার অবলুপ্তি ঘটিবে, বরং ইহার অর্থ হইল যে, সমাজও সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে।[৩৪] বাস্তবিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রগতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

(ঘ) মানসিক প্রগতি বা প্রচয়ের লক্ষণ :

সামাজিক প্রগতির বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা মানসিক প্রচয় (mental development)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি ; সুতরাং সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের মানসিক পরিবর্ধন বা প্রচয় সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা প্রয়োজন। মানসিক পরিবর্ধন সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইলে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ, নীতিবোধের বিকাশ ও ধর্মবোধের বিকাশ আলোচনা করিতে হইবে।

মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞানের[৩৫] বিকাশের ফলে মানুষ আদি যুগ হইতেই প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাকে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে এবং তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষ তাহার বিবর্তনের প্রথম যুগে নিছক খাদ্য সংগ্রাহক ছিল ; সেই অবস্থা হইতে উন্নতি লাভের পরবর্তী স্তরে মানুষ প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তিকে নানারূপে ব্যবহার করিতেছে। ক্রমশঃ সে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিকে নানাভাবে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহারই ফলে উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প-পদ্ধতি ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। লিখন-পদ্ধতির উদ্ভব আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা—ইহার ফলে মানুষের পক্ষে ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞানের সংরক্ষণ সম্ভব হইল। (পৃঃ ২৬৪, পাদটীকা)। মানুষের জ্ঞানের বিস্তারের ফলে যে কেবলমাত্র কয়েকটি প্রয়োগ-বিস্তারই উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহা নহে ; মানুষের জ্ঞান ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিল। মানুষ চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনার সাহায্যে নানা বিষয়ে

---

৩৪ তুলনীয় : "The growth of society is.. a growth in a sort of self consciousness—an awareness of itself—expressed in the general ways of thought, action etc. embodied in its institutions ; and the individual gets his growth in self-consciousness in a way which shows by a sort of recapitulation this twofold movement of society......The individual moves directly toward an ethical goal.......The social or communal growth shows the same ethical tendency." (Baldwin, *Social & Ethical Interpretations*, pp. 540-43).

৩৫ কোঁৎ, বাক্‌ল্, মিল, মান্‌হাইম্ ইত্যাদি জ্ঞানের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আলোচনায় সক্ষম হইল—তাহার চিন্তা মূর্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই সীমিত রহিল না, সে বিমূর্ত বিষয়েরও কল্পনা করিতে সক্ষম হইল। কোঁৎ মনে করেন যে, মানুষের চিন্তাধারা তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়া গিয়াছে—প্রথম স্তরটি ছিল কল্পনার যুগে, দ্বিতীয় স্তরটি হইলবিমূর্ত চিন্তার স্তর এবং তৃতীয় স্তর হইল বিজ্ঞানের যুগ (পৃঃ ৩৩৭, পাদটীকা ৪২)। কোঁতের এই পর্যায়ভাগ সকলে গ্রহণ না করিলেও[৩৬], ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টির আদি যুগে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা দেখিয়া মানুষ উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার উদ্ভট ও জটিল কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু পরে সে যেমন একদিকে প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতির বহু রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে, অপর দিকে সে অতীন্দ্রিয় সত্য সম্বন্ধেও বহু চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মানুষের যেমন বুদ্ধির বিবর্তন ঘটিয়াছে, সেইরূপ ধর্মীয় মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রহস্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রাচীন মানুষের যে বিচিত্র অনুভূতি ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে তাহার মধ্যে ধর্মের অনুভূতি ঘটিয়াছিল। অবশ্য ধর্মের আদি যুগে তাহার মনে বিস্ময় ও ভয়ের এক মিশ্র অনুভূতি ছিল। তাহার ধর্মের আদি স্তরে ইন্দ্রজাল ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল—মানুষ নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রকৃতিকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিত, আবার প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্যময় শক্তি লুকায়িত ছিল তাহার নিকট সে আবার আত্মনিবেদন বা নতি স্বীকারও করিত। এইভাবে ধর্মের আদি স্তরে ধর্ম বলিতে বুঝাইত রহস্যময় শক্তি সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা, উহার প্রতি ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল ইত্যাদির সংমিশ্রণে বিচিত্র অনুভূতি এবং উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের

৩৬ অধ্যাপক হব্‌হাউস্ মনে করেন যে, মানুষের জ্ঞান নিম্নলিখিত পর্যায়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে :

(১) লিখন-পদ্ধতির উদ্ভবের পূর্বযুগ (The Pre-literate Societies, subdivided on the basis of primary economy),

(২) প্রাথমিক বিজ্ঞানের পর্যায় (The Stage of Proto-Science in the ancient East),

(৩) চিন্তার যুগ (The Stage of Reflection in the later East—China, Palestine and India),

(৪) বিচার বিশ্লেষণের যুগ (The Stage of Critical & Systematic thought as in Greece).

(৫) বর্তমান স্বাধীন চিন্তার যুগ। [*Morals in Evolution* দ্রষ্টব্য]।

নানাপ্রকার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ। ধীরে ধীরে মানুষের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটিল। সে প্রথমে জগতের মূলে জগৎ-পরিচালকরূপে তাহারই অনুরূপ নানা দেবদেবী কল্পনা করিল—ইহা হইল বহুদেববাদ। আবার একদল জগতের মূলে দুইটি শক্তির কল্পনা করিল—ইহা হইল দ্বৈতবাদ। মানুষের ধর্মীয় ভাবের চরম পরিণতিতে সে এক পরমপুরুষের কল্পনা করিতে পারিল—ইহা হইল ঐক্যবাদ (monism)। (পৃঃ ৩০৬-৩২০)।

ধর্ম মানুষের মনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—ধর্মের মাধ্যমেই সে জীবনে আত্মিক তৃপ্তি বোধ করে, উচ্চতর মূল্যবোধের ধারণা করিতে পারে। তাহা ছাড়া, সমাজবিবর্তনের আদি স্তরে ধর্ম সামাজিক সংহতি বিধানের কাযেও বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। (পৃঃ ৩২১-২৩ ও পৃঃ ৫০৯-১০)।

আদিম সমাজব্যবস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য স্থাপনের জন্য এবং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি প্রথা (customs) গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সমাজের সাধারণ ব্যক্তি উহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষ এই সকল সামাজিক প্রথাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মানুষের নৈতিক ধারণা এই সকল সামাজিক প্রথার সহিত বিজড়িত ছিল। মানুষ যখন আদি যুগে এই সকল প্রথার প্রাধান্য স্বীকার করিত, তখন সে নীতি ও প্রথা (morality ও custom)-এর ভিতর বিশেষ পার্থক্য করিতে সমর্থ হইত না। তাহার নিকট সামাজিক প্রথাসমূহ ছিল অলঙ্ঘনীয়—সে ঐ সম্বন্ধে 'কেন' ও 'কি'-র প্রশ্ন উত্থাপন করিত না এবং বিনা দ্বিধায় উহাদের গ্রহণ করিত।[৩৭] তাহার বিচারশক্তি উন্নততর হওয়ার ফলে সে ক্রমশঃ উহাদের নৈতিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল—সে ক্রমশঃ নীতি ও প্রথার ভিতর পার্থক্য করিতে লাগিল এবং প্রথামাত্রই তাহার নিকট আর অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে হইত না। সে নীতিকে প্রথার উর্ধ্বে স্থান দিতে শিখিল। পূর্বে যেখানে ছিল প্রথার সহিত সংমিশ্রিতভাবে কতকগুলি অস্পষ্ট নৈতিক ধারণা (moral ideas), ক্রমশঃ সেখানে দেখা দিলে 'নীতি'-প্রত্যয় সম্বন্ধে ধারণা (idea about morality)।

---

৩৭ প্রাচীনকালে মানুষ তাহার ব্যক্তিগত বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল প্রথাকে বিশ্লেষণ করিত না—বরং তাহার ব্যক্তিগত অহং-প্রত্যয় বোধকে পরাভূত করিয়া তাহার গোষ্ঠীর চেতনা (group consciousness) তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিত। (পৃঃ ৫১৩, পাদটীকা ২৩)

প্রথা হইতে যখন নীতির পৃথকীকরণ ঘটিল, তখন তাহার অর্থ নহে যে অনৈতিক অবস্থা বা নীতিবিহীন অবস্থা (non-moral state) হইতে নৈতিক অবস্থা (moral state)-এর উদ্ভব ঘটিল। প্রকৃতপক্ষে, সুপ্ত, অপ্রকাশিত নৈতিকতা হইতে ধীরে ধীরে নীতিবোধ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল।[৩৮]

মোট কথা, নৈতিক বিবর্তনের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হইল সামাজিক প্রথার স্তর হইতে নীতি সম্বন্ধে পৃথক্ ধারণার উদ্ভব।[৩৯]

নৈতিক বিবর্তনের ফলে মানুষ নৈতিক বিচারের সময় পূর্বে যেখানে বাহ্য আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিত, সে স্থলে সে আচরণকারীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

নৈতিক বিবর্তনের ফলে মানুষের মনে কর্তব্যের ধারণা ও সংখ্যা সম্বন্ধে পরিবর্তন ঘটিল। পূর্বে যেখানে 'কর্তব্য' বলিতে মানুষ কয়েকটি সীমিত প্রথার অনুশাসন অনুযায়ী কার্য করা বুঝিত, আজ সেখানে প্রথার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তাহার কর্তব্যবোধ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। পূর্বে মানুষের কর্তব্যক্ষেত্র সীমিত ছিল—তাহার স্বদলের প্রতি সে কতকগুলি আচরণপালনের মধ্যেই তাহার কর্তব্য সমাপ্ত মনে করিত; কিন্তু আজ সে ক্রমশঃ নৈতিক উন্নতির ফলে বিশ্বমানবের কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হয়ত' সে সকল ক্ষেত্রে ঐ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে পারে না; তাহা হইলেও ঐ আদর্শের মূল্য সে স্বীকার করিয়াছে।

নৈতিকতাবোধের প্রগতির সহিত সে অনেক স্থলে কঠোরতা পরিহার কবিয়া নরমপন্থী হইতে সক্ষম হইয়াছে। অতীতে যেখানে সে রুক্ষতা, কর্কশতা, দৈহিক শক্তির

---

৩৮ তুলনীয়: (১) "Moral Progress is morality in progress, progre-ssive morality, never, at any stage, a progress *to* morality, or a progrss from the non-moral to the moral stage." (*A Study of Ethical Principles*. p. 318).

(২) "When we speak of a development of morals, we do not mean a development out of something non-moral, but only of a development within the field of morals." (Ginsberg, *Sociology*, p. 197).

৩৯ নৈতিক বিবর্তনের এই গতিপথের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া Dewey & Tufts বলেন: "*Conscience* is thus substituted for *custom; principles* take the place of *external rules*."

প্রাধান্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিত, আজ সে সেখানে দয়া, মায়া, করুণা, প্রেম, উদারতা ইত্যাদিকে মূল্য দান করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(ঙ) প্রগতি সম্বন্ধে নৈরাশ্য ও তাহার প্রত্যুত্তর :

আমরা উপরে সামাজিক প্রগতির যে কথা উল্লেখ করিলাম, সকলে তাহা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন না। অনেকেই মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকাশ্যে নৈরাশ্যজনক মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।[৪০]

মানবসমাজের প্রগতি যে সর্বাঙ্গীণ এবং উহার গতি যে সর্বত্র সমতা রাখিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মানুষের সামাজিক পরিবর্তন সর্বত্রই প্রগতির পরিচায়ক নহে—উহার মধ্যে উত্থান-পতন আছে। মানুষ যেমন বহুদিকে উন্নতিও করিয়াছে, সেইরূপ অনেক ক্ষেত্রে তাহার অবনতিও ঘটিয়াছে। তাহা হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ যে আজ তাহার অবনতি সম্বন্ধে সচেতন, মানুষ যে আজ উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহার সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। তাহার সাফল্যের অভাব দেখিয়া সকল সময় তাহার বিচার করিলে চলিবে না—সে কি করিতে চাহিয়াছে বা চেষ্টা করিয়াছে, সে কোন্ আদর্শের উচ্চস্তরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

৪০ তুলনীয় : "The mighty forces, which are at this moment acting in society, are not and cannot be in harmony, for they are not governed by Love. They jar; they are discordant. Life now has little music in it. It is not only in the field of battle that men fight. They fight on the Exchange. Business is war......Religion is war...... Politics is war......" (Channing, *Works*, I, pp. 502-503).

পরিশিষ্ট (ক)

সমাজতত্ত্বের পথিকৃৎ

সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিদ্যা (sociology) বিজ্ঞান হিসাবে অপেক্ষাকৃত নবীন। সাধারণতঃ ফরাসী চিন্তাবিৎ কোঁৎকে সমাজতত্ত্বের জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। আমরা এখানে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে কোঁৎ এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজনের অবদানের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সমাজতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-গুলির আলোকেই সমাজদর্শন বিভিন্ন সমস্যার সম্যক্ আলোচনা করিতে পারে। এই কারণ কয়েকজন প্রধান প্রধান সমাজতত্ত্ববিদের মতবাদের আলোচনা প্রয়োজন।

(১) ওগুস্ত্ কোঁৎ (Auguste Comte):

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে উহার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সাধারণতঃ কোঁতের নাম উল্লেখ করা হয়। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সে এক রাজভক্ত ক্যাথলিক পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, বাল্যকাল হইতেই আচার-আচরণে এবং ধর্মীয় মতবাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অবিশ্বাসবাদী এবং চরমপন্থী—তিনি তথাকথিত সনাতন কোন আদর্শেরই বিশেষ মূল্য স্বীকার করেন নাই। দর্শন শাস্ত্রে তিনি দৃষ্টবাদ (positivism) প্রচার করেন—যাহা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এরূপ কোন কিছুর অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। (পৃঃ ৩৩৭)। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ হইল *The Positive Philosophy*—ইহা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি ১৮৩০ হইতে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত বার বৎসর কাল ধরিয়া ইহা রচনা করেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ *A System of Positive Polity: A Treatise in Applied Sociology*—ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত এবং ১৮৫১ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি ইহা রচনা করেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে তাঁহার মূলতত্ত্বের আরও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা ও বিস্তৃততর প্রয়োগ করেন।[১] ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কোঁতের মৃত্যু হয়।

১ এই দুই প্রধান গ্রন্থের আপেক্ষিক মূল্য লইয়া সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মিল্ (Mill) প্রথম গ্রন্থেরই সুখ্যাতি করেন; কিন্তু বর্তমানে অনেক লেখক দ্বিতীয় গ্রন্থেরই অধিকতর সুখ্যাতি করেন। বার্নেস্ (Barnes) বলেন: "Though *Polity* is verbose,

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য :

(ক) কোঁতের মতে সমাজদর্শন ও সমাজতত্ত্বে অযথা কোন প্রকল্প গঠন করা উচিত নহে। তাঁহার মতে প্রতিটি প্রকল্প বাস্তব ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

(খ) অভিজ্ঞতার প্রাধান্য স্বীকার করার জন্য কোঁতের দর্শনে সকল ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতি (inductive method)-কে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করা হইয়াছে।

(গ) কোঁৎ তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method)-এর মূল্যও স্বীকার করিয়াছেন। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আছে, সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রেও সেইরূপ উহার মূল্য আছে। কোঁৎ এই কারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method)-এর উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। মানবের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের নামই ঐতিহাসিক পদ্ধতি। বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞানের ইহাই যথোপযুক্ত পদ্ধতি।

(ঘ) বিজ্ঞান হিসাবে সমাজ-বিদ্যার পক্ষে বাস্তব সামাজিক ঘটনা (social facts) ব্যতীত অন্য কিছুই আলোচনা করা উচিত নহে। সামাজিক ঘটনাগুলি দুই শ্রেণীর নিয়ম দ্বারা অনুশাসিত হয়। এক প্রকার নিয়ম সামাজিক সংহতি (social order) ব্যাখ্যা করে—এইগুলিকে বলা হয় 'সামাজিক স্থিতি সম্বন্ধীয় নিয়ম' (Laws of social statics); আর এক প্রকার নিয়ম সামাজিক পরিবর্তন তথা প্রগতি ব্যাখ্যা করে—ইহাদের বলা হয় 'সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম' (Laws of social dynamics)।

(ঙ) তিনি মনে করিতেন যে, বৌদ্ধিক প্রগতিই সামাজিক প্রগতির পরিচায়ক। তিনি বৌদ্ধিক প্রগতির তিনটি স্তরের উল্লেখ করেন—যথা, কাল্পনিক স্তর, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিদ্যাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় স্তর এবং বৈজ্ঞানিক স্তর।

(চ) সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণসমূহ তিনি জাতিগত পরিবর্তন, জলবায়ুগত পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই প্রধানতঃ নিহিত দেখেন।

---

prolix, involved and repetitious, nearly all Comte's chief postulats are developed in it with far greater maturity and richness of detail than in the *Philosophy*." (*An Introduction to the History of Sociology*, p. 8১).

(ছ) সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির পৃথক্‌ সত্তা থাকিতে পারে না—সমাজের মধ্যে থাকার ফলেই ব্যক্তির বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটে।

(২) হার্বার্ট্‌ স্পেন্সার (Herbert Spencer) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাতনামা দার্শনিকদের অন্যতম হইলেন স্পেন্সার। ১৮২০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৯০৩ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ন এবং তিনি সকল ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ হইল *Social Statics*—ইহা ১৮৫০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ সালে তাঁহার *Principles of Psychology* প্রকাশিত হয়—ইহাতে তিনি পুরাতন অনুষঙ্গবাদ (associationism)-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনের ব্যাখ্যা দান করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থ *Synthetic Philosophy*-এর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন—ইহা দশ খণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইহার প্রথম খণ্ড *First Principles* প্রকাশিত হয়—ইহা পরবর্তী খণ্ডসমূহের উপক্রমণিকা-স্বরূপ। ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় *Principles of Biology*-র দুইখণ্ড, তাহার পর ১৮৭০ এবং ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয় *Principles of Psychology*-র দুইটি খণ্ড (এই দুই খণ্ড তাঁহার এই নামে প্রকাশিত পূর্ব-গ্রন্থের বিস্তৃততর সংস্করণ)। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁহার *Principles of Sociology*-র প্রথম খণ্ড; কিন্তু ইহার পর তিনি নীতির বিবর্তনের প্রতি মনোযোগ দেন এবং ১৮৭৯-১৮৯৩ সালের ভিতর প্রকাশ করেন তাঁহার *Principles of Ethics*-এর দুই খণ্ড। ১৮৭৯ সালে তাঁহার *Principles of Sociology*-র দ্বিতীয় খণ্ড এবং ১৮৯৬ সালে উহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এইভাবে *Synthetic Philosophy*-র ১০ খণ্ড সমাপ্ত হয়।

স্পেন্সারের মতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(ক) কোঁতের ন্যায় স্পেন্সারও সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে গণ্য করেন এবং ঐ ভাবেই উহার বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন। তবে তিনি কোঁতের উপর যথেষ্ট অগ্রগতি করেন। তিনি মনোবিদ্যা ও ইতিহাস হইতে সমাজতত্ত্বের প্রচুর উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

(খ) তিনি বিবর্তনবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে সামাজিক সকল ঘটনাই কি ভাবে প্রাথমিক অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রগমন করিয়াছে, তাহার আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।[২]

(গ) স্পেন্সারের সমাজদর্শনে স্বভাববাদ (naturalism) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism)-এর এক সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। স্বভাববাদের প্রভাবে তিনি একদিকে যান্ত্রিকতাবাদ সমর্থন করেন[৩] এবং অপর দিকে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(ঘ) স্পেন্সার অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সার্বিক সূত্রেরই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহের দ্বারা প্রয়োগ করেন। (তিনি তাঁহার পদ্ধতিকে বলেন deduction fortified by induction)।

(ঙ) তিনি সমাজকে দেহধারী জীবের উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। (পৃঃ ৫৩)।

(চ) তিনি সমাজ ও ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—ব্যক্তি যেমন সমাজকে প্রভাবিত করে, সমাজও সেইরূপ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে।

(ছ) তিনি মনে করেন যে, সুখই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং সমাজের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হইল সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক সুখের উৎপত্তি। সমাজের সহিত যে মানুষ সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোজন করে, সেই সর্বাপেক্ষা সুখী হইতে পারে।

(জ) বিবর্তনবাদী হিসাবে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, সমাজজীবনের যে কোন একটি অংশে পরিবর্তন আসিলে উহা অন্যান্য অংশকে বিভিন্নভাবে আঘাত করিবে।

---

২ স্পেন্সার কর্তৃক প্রদত্ত বিবর্তনের সংজ্ঞা এইরূপ : "Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion ; during which matter passes from indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity ; and during which the retained motion undergoes a parallel transformation. "(*First Principles*, Part II, Ch. xvii).

৩ তুলনীয় : "The course of civilization could not have been other than it has been," (Spencer, *Social Statics*, p. 233).

(ঝ) তিনি বিবর্তন ও প্রগতিকে সমার্থকভাবে ব্যাখ্যা করেন, কারণ তাঁহার মতে বিবর্তনমাত্রই স্বাভাবিক বা স্বয়ংক্রিয় গতিতে উন্নততর বা যোগ্যতর অবস্থার উদ্বর্তন করে এবং এই কারণ উহা প্রগতিশীল।

(৩) লেস্টার্ ফ্রাঙ্কলিন্ ওয়ার্ড (Lester Franklin Ward): আমেরিকা মহাদেশের সমাজবিদ্যার জনক হইলেন লেস্টার্ ওয়ার্ড। ইনি ১৮৪১ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় (Illinois) রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে ইনি পরলোক গমন করেন। বাল্যকালে ইঁহাকে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ হইল *Dynamic Sociology*—ইহা ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ওয়ার্ড প্রথমাবস্থায় স্পেন্সার দ্বারা প্রভাবিত হইলেও স্পেন্সারের মতের বিরোধিতা করেন। ১৮৯৩ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Psychic Factors of Civilization* প্রকাশিত হয়—ইহাতে তিনি মনোবিদ্যার ভিত্তিভূমিতে সমাজ তথা মানবীয় সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করেন এবং এক হিসাবে ইহা সমাজ মনোবিদ্যা (Social Psychology)-এর উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করে। ১৮৯৮ সালে *Outlines of Sociology* প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে *Pure Sociology* এবং তাহার পর ১৯০৬ সালে *Applied Psychology* প্রকাশিত হয়।

ওয়ার্ডের সমাজতত্ত্বে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

(ক) ওয়ার্ডের সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়। তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতির মূল্য স্বীকার করিলেও মানসিক 'উপাদান'-সমূহ এবং সামাজিক বিবর্তনে উহাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(খ) তিনি সমাজবিদ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—একটি হইল শুদ্ধরূপ (pure), আর একটি হইল প্রায়োগিক (applied) বিভাগ। শুদ্ধ সমাজবিদ্যা সামাজিক ঘটনাসমূহের স্বরূপ ও কারণ আলোচনা করে এবং প্রায়োগিক সমাজবিদ্যা উহাদের উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা করে।[৪]

(গ) শুদ্ধ সমাজবিদ্যায় যে জ্ঞান লাভ করা যায়, প্রায়োগিক সমাজবিদ্যায় সামাজিক উন্নতিকল্পে উহার প্রয়োগ করা উচিত।

৪ তুলনীয় : "Just as pure sociology seeks to answer the questions, What, Why and How, so applied sociology aims to answer the question What for." (Ward).

(ঘ) সামাজিক বিবর্তন হইল বিশ্বের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবর্তন ঘটিতেছে তাহারই প্রকাশ। ইহার মাধ্যমে সংগঠনমূলক সৃজনী শক্তির প্রকাশ ঘটিতেছে।

(ঙ) মানবীয় সমাজ বিবর্তনে নারীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিও সমাজব্যবস্থায় পুরুষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইলেও জৈব সংগঠনের দিক্ হইতে নারীর স্থান পুরুষের উপরে।[৫]

(চ) তাঁহার মতে গতীয় সমাজবিদ্যা (dynamic sociology)-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছয়টি[৬]—(১) সুখ বা তৃপ্তি সকল বাসনার বা প্রচেষ্টার লক্ষ্য, (২) প্রগতির মাধ্যমেই মানুষ সুখ পায়; (৩) সক্রিয় চেষ্টার মাধ্যমেই প্রগতি লাভ হয়; (৪) নূতন উন্নতিশীল মতবাদ গঠনের মাধ্যমেই মানুষ নূতন কর্মের প্রেরণা পায়; (৫) জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমেই মানুষ নূতন মতবাদ গঠন করিতে পারে; (৬) শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। সুতরাং শিক্ষাই হইল চরম সুখের আকর। এই শিক্ষা আবার ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন—অভিজ্ঞতা, শৃঙ্খলা বা সংযম, কৃষ্টি, গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে।

(ছ) সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্পেন্সারের ন্যায় ওয়ার্ড বিবর্তনবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু স্পেন্সার মনে করিতেন যে, সামাজিক বিবর্তনও জৈব বিবর্তনের ন্যায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে। এই স্থলে ওয়ার্ডের সহিত স্পেন্সারের পার্থক্য—ওয়ার্ড মনে করেন যে, মানুষের কর্তব্য হইল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া। সুতরাং যে পরিবর্তনে সমাজে নূতনের সৃষ্টি হয়, সেই পরিবর্তনই প্রগতি নামের যোগ্য। ওয়ার্ড মনে করেন যে, সমাজের যে কেবল মানসরূপ আছে তাহাই নহে—ইহা উদ্দেশ্য-সাধনাভিমুখীও বটে। উদ্দেশ্য সাধনাভিমুখিতাই সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান

৫ এই মতবাদকে বলা হয় Gynaecocentric Theory; এই মতবাদ অনুসারে, "the female sex is primary and the male secondary in the organic scheme, ...originally and normally all things centre, as it were, about the female." (Ward, *Pure Sociology*, p. 296).

৬ *Dynamic Sociology*, pp. 108-09.

বৈশিষ্ট্য। এইজন্য তিনি সামাজিক উদ্দেশ্যমুখিতা (Social Telesis) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন।[৭]

(জ) শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সমাজতন্ত্র (sociocracy)-কে আদর্শ হিসাবে গণ্য করেন। তিনি মনে করেন, যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও প্রগতির জন্য সমবেত প্রচেষ্টায় রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। সকলকে সমান সুযোগ দান করিয়া তাহার যোগ্যতা অনুসারে তাহাকে মর্যাদা দান করা হইল সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

(৪) উইলিয়াম্ গ্রাহাম্ সাম্‌নার্ (William Graham Sumner):

সাম্‌নার্ একজন আমেরিকাবাসী সমাজতত্ত্ববিৎ। তিনি ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। তিনি পরে ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৯১০ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ হইল *Folkways*—ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত। তাঁহার রচনাসমূহও গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার মতবৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(ক) সাম্‌নার স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উভয় মতবাদ দ্বারাই প্রভাবিত হ'ন এবং তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ (*laissez faire*)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

(খ) যদিও তিনি প্রতি সামাজিক সংস্থার উৎপত্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন অসম্ভব বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেও তিনি সঙ্ঘ-গঠনকারী চারিটি শক্তির উল্লেখ করেন—ক্ষুধা, কাম, অহমিকা, ভয়। এইগুলিই জনগণের আচরণ-পদ্ধতি (folkways) নির্ধারণ করে।[৮]

(গ) সামাজিক বিবর্তনের অর্থ হইল বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন। তিনি মনে করেন যে, প্রতিযোগিতা ও বিরোধ (competition & conflict)

---

৭ Telesis-পদের ব্যাখ্যা করিয়া Vine বলেন : "Telesis is merely a conscious hastening of evolution and is artificial only in the sense that it is planned and deliberate." (*Sociological Theory*, pp. 87-88). [পৃঃ ৫০৬, পাদটীকা ১৮]।

৮ তুলনীয় : "The folkways are not the creations of human purpose and wit; they are like products of natural forces which men unconsiously set in operation, or they are like the instinctive ways of animals." (Sumner, *Folkways*, p. 4).

হইল সামাজিক জীবনের ধর্ম ; অপরের সহিত তথাকথিত সহযোগিতা মানুষ নিছক বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনেই দেখাইয়া থাকে।

(ঘ) চারিটি সঙ্ঘ-সংগঠনকারী শক্তির সমতুল্য চারিপ্রকার সামাজিক সংস্থা আছে—আত্মরক্ষামূলক, আত্মপ্রসারসূচক বা বংশরক্ষামূলক, আত্মতৃপ্তিকর এবং ভয়নিরোধক।

(ঙ) তিনি সামাজিক প্রথার প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এইগুলির ফলেই বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়।

(৫) এমিল্ ডুর্কহাইম্ (Emile Durkheim):

ডুর্কহাইম্ একজন প্রখ্যাতনামা ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ। ১৮৫৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ হইল *The Division of Labour in Society*—ইহা ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে *The Rules of Sociological Method* প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে তিনি *Suicide* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার শেষ গ্রন্থ হইল *The Elementary Forms of Religious Life*—ইহা ১৯১২ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

ডুর্কহাইমের সমাজবিদ্যার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) তিনি স্বাধীন বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিদ্যাকে মর্যাদা দান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দর্শনের প্রভাব হইতে উহাকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(খ) বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিদ্যার লক্ষ্য হইল সামাজিক ঘটনা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা। সামাজিক ঘটনামাত্রেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং জৈবিক বা মনোগত বা অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহাকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(গ) সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি-মনের উপর সঙ্ঘের প্রভাব (বিশেষতঃ সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী কিভাবে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা) আলোচনা করিয়াছেন।

(ঘ) আদিম অবস্থা হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাজবিবর্তনের গতিপথ তিনি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, সমাজ যতই অগ্রগমন করে, ততই উহার মধ্যে শ্রমবিভাগ ঘটিতে থাকে এবং ইহার ফলে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) তাঁহার মতে সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ হইল জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং ইহার ফলে কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়া থাকে সে বিষয় তিনি চিন্তা করেন।

(চ) সমাজবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রে অধীতব্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—বিবিধ সামাজিক নিয়ম, পরিসংখ্যান বা ঘটনাবলীর সংখ্যামূলক হিসাব এব ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাস।

(৬) মাক্স ভেবের (Max Weber) :

ভেবের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্মান সমাজতত্ত্ববিৎ। ১৮৬৪ সালে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৯২০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ হইল *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*—ইহা ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার মতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নরূপ :

(ক) সমাজতত্ত্ব হইল একটি বিজ্ঞান। সামাজিক ক্রিয়াকে বুঝা এবং ব্যাখ্যা করাই হইল সমাজতত্ত্বের প্রধান কার্য। বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির জাতিরূপ আলোচনা করা এবং সার্বিক নিয়ম গঠন করা সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

(খ) সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধেয় বিষয়বস্তু হইল সামাজিক ক্রিয়া। সামাজিক ক্রিয়ার উৎপত্তি আলোচনা করিবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রেষণার আলোচনায় উপনীত হন।

(গ) তিনি সামাজিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘসমূহ (social collectivities)-এর আলোচনা কালে উহাদের মানস সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উহাদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন।[১]

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যাকালে তিনি মার্ক্সবাদের সমালোচনা করেন; তিনি ধর্ম ও অর্থনীতির আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যেই সামাজিক পরিবর্তনের কারণ আবিষ্কার করেন।

১ তুলনীয়: "It may......be convenient or even indispensable to treat social collectivities, such as states, associations, business corporations, foundations as if they were persons." (Weber, *The Theory of Social & Economic Organization*, p. 101).

(৭) ভিল্‌ফ্রেডো পারেতো (Vilfredo Pareto):

পারেতো একজন ইটালীয় সমাজতত্ত্ববিৎ। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইটালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অশান্তির সময় ইঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। ইনি উদারনৈতিক ছিলেন এবং রাজনৈতিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অনেক সময় ইনি স্বীয় মত প্রকাশ করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ হইল *Mind and Society*—তাঁহার সত্তর বৎসর বয়সে ইহা প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯২৩ সালে পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মতবৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ব রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তিনি কোঁৎ ও স্পেন্সারের মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া তীব্র সমালোচনা করেন।

(খ) তিনি সামাজিক ঘটনাসমূহকে যৌক্তিক (logical) ও অযৌক্তিক (non-logical) কার্য, এই দুই ভাগে ভাগ করেন। তাঁহার মতে মানুষের তথা-কথিত যৌক্তিক কার্যাবলী বুঝিতে হইলে তাহার অযৌক্তিক কার্যসমূহ বুঝা উচিত।

(গ) আমাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, আমরা অযৌক্তিক কার্যসমূহ আলোচনার জন্য অনেক সময় উহাদের উদ্দেশ্য বাহির করিবার চেষ্টা করি, অথচ যুক্তির মাধ্যমে উহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, প্রতি সামাজিক গোষ্ঠীর যে সকল নিষেধাত্মক প্রথা (taboo) আছে, সেগুলি আলোচনা কালে উহাদের যুক্তিসম্মত উদ্দেশ্য নির্ধারণের চেষ্টা করা বৃথা।[৭]

(ঘ) পারেতো সামাজিক জনগোষ্ঠীসমূহ উচ্চ ও নিম্ন এই দুই পর্যায়ে ভাগ করেন এবং সামাজিক আবর্ত (social circulation এবং mobility)-এর ফলে কি ভাবে উহাদের পরিবর্তন ঘটে তাহা আলোচনা করেন।

(ঙ) পারেতো গণতন্ত্রকে বিশেষ সুনজরে দেখেন নাই এবং অনেকে মনে করেন যে ফ্যাসিস্ত মতের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল।

(চ) মানুষ যে মূলতঃ যুক্তিসম্পন্ন জীব নহে এবং সে যে অযৌক্তিকতা দ্বারা অনেক সময় পরিচালিত হয়, তাহার প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

---

৭ পারেতো অযৌক্তিক কার্যাবলীকে residues of sentiments ভাবে বর্ণনা করেন, এবং এইগুলিকে যখন যুক্তির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়, তখন উহাদের নাম দেন Derivations।

(৮) লিওনার্ড ট্রেলনি হব্‌হাউস্ (Leonard Trelawny Hobhouse):

ইনি একজন ইংরাজ দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। স্পেন্সারের ন্যায় ইনিও বহু বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধীন চিন্তানায়কভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি হইল: *The Theory of Knowledge, Mind in Evolution, Morals in Evolution, Social Evolution and Political Theory, Development & Purpose—An Essay towards a Philosophy of Evolution, The Metaphysical Theory of the State, The Rational Good, The Elements of Social Justice, Social Development—its nature and conditions.*

হব্‌হাউসের মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ:

(ক) দর্শনে তিনি প্রধানতঃ অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন এবং সাধারণতঃ একদেশদর্শিতা পরিহার করেন। তাহা ছাড়া, তিনি ডারুউইন্ ও স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ন।

(খ) তিনি প্রধানতঃ নীতির উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেন। মানুষের চিন্তার অগ্রগতির সহিত তাহার নীতিবোধ কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা তিনি আলোচনা করেন। বিভিন্ন সংস্থামূলক সংগঠনের মাধ্যমে কিভাবে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন।

(গ) বিবর্তনবাদের প্রভাবে তিনি মানুষের মনের জৈবিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি মানুষের সহজাত বৃত্তি এবং উহাদের সম্ভাব্য নমনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কারণ তিনি মানুষ কিভাবে নূতন সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তাহার সাহজিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে তাহা তিনি বর্ণনা করেন।

(ঘ) তিনি নীতির বিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার আলোচনা পরিসমাপ্ত করেন নাই—তিনি উহার মূল্যায়নেরও প্রচেষ্টা করেন। সামাজিক পরিবর্তন মাত্রই যে প্রগতির পরিচায়ক নহে, তাহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে, প্রকৃত সামাজিক পরিবর্ধন নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক হওয়া উচিত। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নৈতিকতার আদর্শ হিসাবে তিনি সামাজিক সামঞ্জস্য (social harmony)-এর উল্লেখ করেন।

(ঙ) রাষ্ট্রীয় সংস্থার আলোচনাকালে তিনি হেগেলীয় মতবাদের সমালোচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রকে স্বরূপতঃ চরম লক্ষ্য মনে করেন না; তবে তিনি রাষ্ট্রকে অপ্রয়োজনীয় সংস্থা বলেন না, তিনি উহাকে উপায়স্বরূপ মনে করেন। তাহা ছাড়া, তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র নীতির উর্ধ্বে হইতে পারে না—যেমন আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তিরই নৈতিক দায়িত্ব আছে, সেইরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতি রাষ্ট্রেরই অন্য রাষ্ট্রের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব আছে।

(চ) সমগ্র সামাজিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই তিনি সহযোগিতার আদর্শকে উচ্চতর আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং দৈহিক বলের প্রাধান্যকে সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দান করেন নাই।

(৯) পিটিরিম্ সোরোকিন্ (Pitiram Sorokin) :

ইনি রাশিয়ার এক অখ্যাত গ্রামে ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেণ্ট্ পিটারস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ইনি ১৯১৭ সালে তদানীন্তন রুশ সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কিন্তু পরে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। ইনি শেষ পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথাকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল : *The Sociology of Revolution, Social Mobility, Society, Culture & Personality, The Crisis of our Age, The Reconstunction of Humanity, Sociocultural Causality, Fads and Foibles in Modern Sociology, SOS : The Meaning of our Crisis.*

তাঁহার মতবৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(ক) সোরোকিন্ মনে করেন যে, সমাজতত্ত্ব হইল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অর্থপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা।

(খ) সামাজিক গোষ্ঠী বলিতে পরস্পর ক্রিয়াশীল সুসংহত সঙ্ঘ বুঝায়।[৮]

৮ তুলনীয় : "A social group, as a totality of interacting individuals, is organized when its central act of meanings and values, as the reason for their interaction, is somewhat consistent within itself and assumes the form of the law-norms........." (*Society, Culture & Personality*, p. 70).

(গ) তিনি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

(ঘ) তিনি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং তিনি বিদ্রোহকে যুক্তিশক্তির উপর জৈবশক্তির প্রাধান্য বলিয়া বর্ণনা করেন।

(ঙ) সামাজিক গতীয়তা (social mobility)-কে তিনি চক্রবাল-সমান্তরাল (horizontal) এবং লম্ববান্ (vertical) এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। যখন একই পর্যায়ের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমপর্যায়ের পরিবর্তন অনুধাবন করে, তখন হইল উহা সমান্তরাল এবং এক পর্যায় হইতে ভিন্ন পর্যায়ে গমন হইল লম্বমান্ পরিবর্তন।

(চ) তিনি কৃষ্টিকে ভাবপ্রবণ (ideational), আদর্শপ্রবণ (idealistic) এবং সংবেদনপ্রবণ (sensate) এই কয়ভাগে বিভক্ত করেন।

পরিশিষ্ট (খ)

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

(সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু)

1. Explain fully the scope of Social Philosophy. Is it any *special branch* of Philosophy ?

2. What are the possible objections to the study of Social Philosophy ? How would you refute them ?

3. State fully the utility and necessity of a philosophical study of the social phenomena.

4. What are the special features of a philosophical examination of the social phenomena ? How does it differ from the psychological and sociological examinations of the same ?

5. Give examples of some social facts, and explain how they are approached differently by a philosopher, by an ethicist, by a psychologist and by a sociologist.

6. "No proper study of social phenomena is possible. The *science* of Sociology is impossible in the face of variable and fluctuating data, and the so called philosophical evaluation of social phenomena ends in a number of shibboleths"—Do you agree ?

7. State the chief features of Social Philosophy. What, in your opinion, should be its proper method of study ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সমাজদর্শন ও অন্যান্য কয়েকটি শাস্ত্র)

1. What are the Social Sciences ? What is the position of Sociology among the Social Sciences, and how does it stand related to Social Philosophy ?

2. Explain the difference in outlook between Sociology and Social Philosophy. What is the position of value in sociological and social philosophical studies? Should Sociology be 'value-free'?

3. "As a *science* Sociology does not have as its object the determination or modification of social values" —Do you agree? Compare the sociological attitude to value with the philosophical.

4. Comment on the following:

(a) "Social Philosophy is the 'religion' of Sociology."

(b) "The philosophical problems which arise in Sociology are not tiresome *foreign* bodies."

5. What is Psychology? How far does it help philosophical evaluation of social phenomena?

6. Explain fully the relation between Social Psychology and Social Philosophy.

7. "The human self is essentially a social process." Explain the significance of this statement in the context of the study of man.

8. Is a socio-psychological study of man adequate enough for a proper evaluation of man, or should we move forward to philosophy?

9. What is Politics? How is the science of Politics related to Social Philosophy?

10. What is Ethics? Is it the same as, or different from, Social Philosophy?

11. "Social Philosophy might indeed be said to be a part of Ethics, or Ethics might be said to be a part of it"—Discuss.

12. "Ethics and Social Philosophy are both value-sciences. Hence Social Philosophy is a superfluous appendage to Ethics"—Do you agree?

তৃতীয় অধ্যায়

(সমাজ)

1. What are the different senses of the term 'Society' ? How would you account for its origin ?

2. Did man have a primitive non-social or asocial state ? Is society a later product formed by a contract ?

3. Discuss : "Society is revealed as the extension of individuality".

4. What are the characteristics of Social Evolution ? Can it be explained in purely biological terms ?

5. Does the Darwinian concept of evolution apply to Social Evolution ?

6. Comment on the following views :

(a) Society is a mechanical aggregate.

(b) Society is a biological organism.

(c) Society is a mental entity.

(d) Society is super-individual.

7. Discuss the nature of Collective Will. Do you think that society has an over-individual mind of its own ?

8. Explain fully the ideal of Common Good. What is it that determines the 'commonness' of the Common Good, and in what does consist its 'goodness' ?

9. Comment on the following :

(a) The common good is the greatest good of the greatest number.

(b) The common good is the economic prosperity of the masses.

(c) The only true good is to be good.

(d) The common good is the universal good.

চতুর্থ অধ্যায়

(সমাজ ও ব্যক্তি)

1. Explain the relation of individual to society. In what sense does man possess social nature ?

2. Explain the psychological basis of the social nature of man. What is there in man's mental constitution that makes him a social being ?

3. Give a short account of man's dependance on society. Can he have any being *outside* society ?

4. What is gregariousness ? Do you believe that man possesses a special gregarious instinct that makes him a social creature ?

5. Discuss the relative importance of the following in the constitution of man's social nature :

Gregariousness, Love & Aggression, Parental feeling, Imitation.

6. What is Socialization ? How is the socialization of an individual effected ? Does an individual lose his individuality by this process ?

7. Explain : "Socialization is a process by which the personality of an individual is *created.*"

8. "An individual who has not been properly socialized forfeits his right to live in society"—Discuss.

9. Write a short essay on *Socialism* vs. *Individualism.*

10. What are the different senses of the terms 'Socialism' and 'Individualism' ? Can the two be reconciled ?

11. Can there be any non-social ideal for man ? Discuss with reference to Bradley's conception of Ideal Morality.

12. Can there be duties *outside* society ? Discuss.

13. Comment on the following : "Society is paramount over us *qua* selves, but powerless over us *qua* true individuals or souls." (Urwick).

পঞ্চম অধ্যায়

(সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও সংস্থা)

1. State the features of a social group. Explain and illustrate its different forms.

2. Explain the distinguishing features of the following : (a) Primary & Secondary Group ; (b) Dyad and Triad ; (c) In-group and Out-group.

3. What is a Primary Group ? What are its essential properties ? Is every primary group a face-to-face group ?

4. What is a Community ? How is a Community distinguished from an association ?

5. What is a Social Institution ? Write a note on its structure and origin.

6. What is the special role of Social Institutions in the formation of the social ideals ? What is the source of the strength of Social Institutions ?

7. Discuss the view that long-standing social institutions are a hindrance to individual progress. Is it proper for an individual to revolt against an established social order ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

(পারিবারিক সংস্থা ও বিবাহ)

1. What are the main features of the Institution of Family ? What are its functions and uses ?

2. Give a short account of the evolution of family. What might be the character of the earliest form of family ? Was it polygamous or monogamous, patriarchal or matriarchal ?

3. Give a critical assessment of the merits and demerits of the institution of family.

4. What are the defects and shortcomings of family ? Do you think that the institution of family has outlived its utility ?

5. Define Marriage. Illustrate its different forms. What is its importance as a social institution ?

6. Discuss how the personality of an individual may be moulded by entering into married life.

7. What are the conflicting ideals of married life? Is marriage a convenient contract for sexual gratification, or is it a sacrament and a means for spiritual upliftment?

8. Give a short account of the value of the monogamous system of marriage.

9. State the arguments for and against divorce. Would you advocate a very liberal system of divorce, or would you concede divorce under very limited circumstances?

10. What are the possible causes of unhappiness in married life? Give your suggestion as to how they may be removed.

11. State the arguments for and against the practice of birth-control, and give your own opinion on it.

12. State the main features of the ideal of Varnāśrama Dharma of ancient India.

13. Write short notes on:

(a) Polygamy; (b) Polygyny & Polyandry; (c) Matriarchal & Patriarchal Families; (d) Sexual Communism; (e) Group-Marriage; (f) Marriage by capture, by exchange & by consent; (g) Dysgenic Marriage; (h) Marxist Theory of Family; (i) Neighbourhood.

সপ্তম অধ্যায়

(সম্পত্তি)

1. Define the characteristics of Property and Ownership. Discuss how the institution of property has gradually evolved.

2. What are the different types of property? Give illustrations.

3. Analyse psychologically the desire for ownership, and discuss whether there is any philosophical justification for ownership of property.

4. Discuss the ethico-social value of property, with special reference to the Labour Theory & Teleological Theory. Is property a kind of theft ?

5. Discuss "Personality shall always be put above property—the values of the person above the values of property." (Urban).

6. Give a critical review of the Marxist criticism of the Institution of property.

7. What are the evils of Private Ownership, and what controls would you suggest ?

অষ্টম অধ্যায়

(শিক্ষা ও শিক্ষায়তন)

1. What is Education ? What, in your opinion, are the aims of education ?

2. Discuss the following :

(a) Education is a process that goes on throughout life, and that is promoted by every experience.

(b) Education is any consciously directed effort to cultivate and develop our power.

(c) Education is the manifestation of the perfection that is already in man.

(d) Education means an all-round drawing out or unfolding the best in child and man.

(e) Education is a cultural process, the way in which a new-born human infant is transformed into a full member of a specific human society.

(f) Education is derived from two Latin words, *e*, meaning 'out', and *duco*, meaning 'to lead'; hence education etymologically means 'that which brings out the inherent powers, capacities and potentialities of man.'

(g) Education is derived from Latin *educare*, which means 'to improve upon', 'to chasten'. Hence the task of

an educationist is to instil some new ideal in the minds of the young.

(h) Education is not limited to any fixed period of life. The whole life is one continuous process of education.

3. Explain fully the sociological significance and importance of education.

4. What is an educational institution ? What are its different kinds ? Give a short account of their functions.

5. What is Vocational (Technical) Education ? What are its merits and drawbacks ?

6. Which of the following two statements would you accept ?—

(a) Every scheme of education must make an adequate arrangement for proper vocational training for which an individual is found fit.

(b) Every educational scheme should emphasise upon a general liberal education. The so-called vocational education only results in the mechanisation of life and mind.

7. Do you support any kind of state control in the sphere of education ? Should there be state-controlled colleges and universities ? What should be the attitude of the State to the educational institutions ?

8. What, in your opinion, should be the educational policy of a State ? Do you think that the governing bodies of Schools, Colleges and Universities should be manned by Government officers ?

9. Attempt a philosophical evaluation of the aims and ideals of education. Discuss in this connection the merits and demerits of Naturalism, Realism, Pragmatism and Idealism as theories of education.

10. Discuss the following statements :

(a) The aim of all instruction is, and can be, nothing but the development of *human nature*.

(b) There can be no absolutely fixed ideal education. Every educational ideal should be tested in terms of actual experience.

(c) Every scheme of education should be scientific in outlook, and realism absorbs the constructions of modern scientific thought.

(d) "Education means that the origin of man is God, the nature of man is freedom and the destiny of man is immortality."

11. How far would you advocate the maxim of 'Back to Nature' in the field of education ?

12. Explain fully the Pragmatic Theory of Education with special reference to the view of Dewey. Would you admit the Pragmatists' contention that the only alternative to employing the pragmatic method is to follow a rule blindly ?

13. Why is the Realistic Theory of Education so called ? What are the elements specially emphasised upon by the realists in the field of education ?

14. Why do the Idealists hold that true education is self-education ? Does the idealistic theory possess any special advantage over its rivals ?

15. What are the special problems of education in Democracy ? How would you solve them ?

16. What is Social Education ? What is its special importance ? Give a short scheme of Social Education with special reference to the conditions in India.

17. Give a pen-picture of the Educational System of Ancient India.

নবম অধ্যায়

(কৃষ্টি ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা)

1. What is Culture ? What are its different senses ? State the distinguishing features of Culture. Attempt a classification of Culture Traits.

2. Distinguish between :
(a) Culture and Civilisation,
(b) Culture and Education,
(c) Culture and Custom,
(d) Culture and Art,
(e) Material and Non-material Culture.

3. What is the social significance of Culture ? State its influences upon the Individual Mind.

4. Trace the different stages of Cultural Evolution.

5. What is a Cultural Association ? What is the special role of cultural associations in the social life of man ?

6. What is a Cultural Discipline ? Describe the role of Philosophy as a cultural discipline or cultural Science.

7. What are the fundamental trends of Indian Culture ? Compare them with the dominant themes of Western Culture.

8. Are the cultures of different human societies opposed to one another, or can they be synthesised ? Can there be any Universal Culture ?

9. In what sense is culture necessary for human life ? Do you think that a cultural understanding is essential for easing international tension ?

দশম অধ্যায়

(ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থা)

1. What is Religion ? Analyse religious consciousness. Is it necessary for the social life of man ?

2. Trace the origin and evolution of religion. What, in your opinion, is the nature of the earliest form of religion ?

3. Explain fully the doctrine of *Mana*. What are its advantages over the rival theories ?

4. Is Magic prior to Religion, or Religion prior to Magic ? Discuss.

5. What is the importance of religion in individual life as well as in society ? What is the sociological significance of religion ?

6. State the role of the Church as a social institution.

7. What is the nature of the philosophical examination of religion ? Does Philosophy create any new religion ?

8. Discuss the materialistic and the naturalistic contention that religion is unnecessary and that the world can be explained without postulating any Supreme Mind.

9. Can we consistently adhere to the agnostic attitude to God ? Discuss.

10. Discuss the positivistic claim that the worship of God should be substituted by the worship of Humanity.

11. Explain and examine the Marxist interpretation of religion. Why has it been said that religion is the opium of life ?

12. Examine the Freudian theory of religion as a mere illusion.

13. Do you think that all propositions about God are nonsense ?

14. Examine the validity of the challenges against religion made by the Marxists, the Psycho-analysts and the Logical Positivists.

15. Give your own views as to the proper relation between the Church and the State.

16. "Whatever might have been the value of religion in the ancient world, it has very little importance for the modern man."—Do you agree ?

একাদশ অধ্যায়

(রাষ্ট্র)

1. What is State ? What are the factors that enter into the constitution of a state ?

2. Distinguish between

(a) State and Government,

(b) A state and a nation,

(c) A state and a community.

3. Explain the proper relation between a state and a society. Discuss "The State is a structure not coeval with society."

4. Trace the origin of the State. Discuss in this connection the different traditional theories of the origin of the state.

5. State the value and importance of the State from a sociological standpoint.

6. Discuss the following :

(a) The State is an abstract legal concept and possesses an artificial personality.

(b) The State is a mechanical aggregate of individuals who are otherwise independent.

(c) The State is a product of contract.

(d) The State is the march of God in this world and is its own end.

(e) The State is simply a product of Society at a certain stage of socio-economic revolution and will wither away.

7. State fully the Metaphysical theory of the State propounded by Hegel. How was it subsequently modified by Green and Bosanquet ? How far would you accept it ?

8. Does the State possess any personality of its own? Discuss in this connection the validity of the following statements :

(a) The State is a person.

(b) The State is a Super-person.

(c) The State is an organ of class-rule.

9. What are the functions of a State ? "The state is not an essential social institution, and contains within itself the seeds of its own destruction."—Do you agree ?

10. Write an essay on each of the following :

(a) Democracy vs. Dictatorship ;

(b) Nationalism vs. Internationalism.

11. What are the causes of war ? How can war be prevented ?

12. Give a critical and comparative review of the ideals of militarism and non-violence.

13. What is Sovereignty ? Where should it properly reside ?

14. What are the rights and duties of citizenship ? Are there any *natural* rights ?

দ্বাদশ অধ্যায়

(সামাজিক সমস্যা ও ব্যাধি)

1. What is a Social Problem ? When is a problem so called ?

2. State the origin and extent of the Social Problems. Give some concrete examples of Social Problems.

3. What is Social Pathology ? Is the expression a happy one ?

4. Write notes on the following :

(a) Poverty as a social problem ;

(b) Unemployment as a social problem ;
(c) Social deviation and the problem of the deviants ;
(d) Physical handicaps as a social problem ;
(e) Feeble-mindedness as a social problem.
(f) Blackmarketing as a social problem.

5. What is a crime? Distinguish between a crime and a sin. Is every legal offence a social crime ?

6. Is a man justified under any circumstance in procuring the necessaries of life by violating the State-laws ?

7. Are the public in a democratic state justified in destroying public properties on the plea that the State belongs to them ?

8. State and examine the different theories as to the cause and origin of crimes. Which of them would you accept, and why ?

9. "There are no criminals, but only crimes"—Discuss.

10. Is there any socio-philosophical justification of punishment ? Discuss.

11. What should be the aim of punishment—retribution, prevention or reformation ?

12. When is a state justified in punishing the offenders ? Is its duty over as soon as certain offenders are brought to book and punished ?

13. What is juvenile delinquency ? How does it differ from a crime ? What are the causes of delinquency ? What remedies would you suggest for its prevention ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(সামাজিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রগতি)

1. What is Social Change ? What are its characteristics ? How does it differ from Social Development and Social Progress ?

2. What are the marks of Social Development? What are the subjective and objective factors that contribute to such development?

3. Is social development a mere natural process, or is it teleological in character?

4. Explain the role of religion as a social cohesive force.

5. What is Ethos? Discuss the Hegelian conception of Ethos.

6. What is Social Mind? Is it any separate entity over and above the individual mind, and overpowering it?

7. What is Social Progress? Is every social change or evolution a mark of social progress?

8. State the diffrent criteria of social progress. Which of them is the most important criterion of progress?

9. Social Progress really involves the progressive discovery of the individual. Do you agree?

10. In the light of recent world-events, are we really justified in speaking of any genuine human progress?